The Secret History of al-Qa'ida by Abdel Bari Atwan

ইন সার্চ অফ অ্যা

সিক্রেট হিস্ট্রি

আবদুল বারি আতওয়ান

সিদ্দিক ইবনে মুসা
অনূদিত

ইন সার্চ অফ অ্যা

সিক্রেট হিস্ট্রি

আবদুল বারি আতওয়ান

ইন সার্চ অফ অ্যা
সিক্রেট হিস্ট্রি

ভাষান্তর

সিদ্দিক ইবনে মুসা

ইন সার্চ অফ অ্যা সিক্রেট হিস্ট্রি
আবদুল বারি আতওয়ান

ভাষান্তর
সিদ্দিক ইবনে মুসা

প্রকাশক ও সম্পাদক
এম এ রহমান

প্রকাশকাল
জাতীয় বইমেলা ২০২১

প্রকাশনা
রেডলাইন
বাংলাবাজার, ঢাকা

পরিবেশক
পড় প্রকাশ
৩৭ নর্থব্রুক হল রোড
বাংলাবাজার, ঢাকা

বাংলার প্রকাশন
১০৬ ফকিরাপুল, ঢাকা

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, ওয়াফিলাইফ, নিয়ামাহ শপ, ইস্তিকামাহ শপ,
বইজগৎ, পথিকশপ ডটকম, মোল্লার বই ডটকম

খুচরা মূল্য : ৪৭০ টাকা মাত্র

In Search of a Secret History
By Abdel Bari Atwan
Published by : redline
E-mail : redlinebook21@gmail.com
fb/redlinepublications

***

***

উৎসর্গ

লেখকের উৎসর্গ

আমার পরিবারের প্রতি—বাসিমা, খালেদ, নাদা এবং করিম।

আমার মা জারিফা আতওয়ানের স্মরণে, যিনি ২০০৩ সালের আগস্ট মাসে গাজা উপত্যকার রাফাহ্ শরণার্থী শিবিরে ইনতেকাল করেন।

* * *

অনুবাদকের উৎসর্গ

আব্বু এবং আম্মু—যাদের হাতে আমার লেখাপড়ার হাতেখড়ি...

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

ওসামা বিন লাদেন

দ্বিতীয় অধ্যায়

ধর্মযোদ্ধা

তৃতীয় অধ্যায়

আদমবোমা এবং শাহাদাত

চতুর্থ অধ্যায়

সাইবার জিহাদ

প ঞ্চ ম অ ধ্যা য়

আল-কায়েদা ইন সৌদি আরাবিয়া

ষ ষ্ঠ অ ধ্যা য়

আল-কায়েদা ইন ইরাক

স প্ত ম অ ধ্যা য়

আল-কায়েদা ইন ইসলামিক মাগরেব

অষ্টম অধ্যায়

আল-কায়েদা ইন ইউরোপ

নবম অধ্যায়

আল-কায়েদার ভবিষ্যৎ

প্রকাশকের কথা

দুনিয়ার আরও হাজারটা টপিক থাকতে বই প্রকাশের জন্য এমন জটিল আর বিপজ্জনক একটা টপিকে বেছে নেন যখন কোনো প্রকাশক, তখন তিনি এর কৈফিয়ত দেওয়ার দায়টাও এড়াতে পারেন না। মূলত সেই দায়বদ্ধতা থেকেই দুটি কথা বলতে চাই।

বলাবাহুল্য যে অনেক ভেবেচিন্তেই আমার প্রকাশনার ক্যারিয়ার শুরু করেছি এই বইটি দিয়ে; কিংবা আরও সুনির্দিষ্টভাবে বললে এই বিষয়টি দিয়ে। 'টেররিজম', 'ওয়ার অন টেরর', 'ইসলামিক মিলিট্যান্সি', 'ইসলামিক জিহাদ', বা 'গ্লোবাল ইসলামিক জিহাদ'—যাই বলা হোক না কেন; প্রত্যেকে নিজস্ব চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির জায়গা থেকে বিবিধ অভিধায় চিহ্নিত করলেও বিষয় মূলত একটাই। সংশ্লিষ্ট-বিষয়ে এটাই আমাদের প্রথম বই এবং আশা করি এই কন্টেন্টের ওপর আরও কিছু কাজ রেডলাইন থেকে আসবে। যাইহোক এবার কৈফিয়তের দিকে যাওয়া যাক।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর তারিখটি বিশ্ব ইতিহাসের অন্যতম স্মরণীয় একটি দিন। প্রবল প্রতাপশালী আমেরিকার জন্য যারপরনাই বিপর্যয় আর দুর্ভোগ ডেকে আনে এই দিনটি। মুহূর্তেই বিশ্ব-রাজনীতির অনেক হিসেব-নিকেশ উল্টে যায়। আমূল বদলে যায় ভবিতব্য ইতিহাসের মানচিত্র।

ঘটনাটি ঘটার পর, ৭ অক্টোবর ২০০১ তারিখে প্রেসিডেন্ট বুশ জাতির উদ্দেশে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে ঘোষণা করেন ঐতিহাসিক 'ওয়ার অন টেরর' বা 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অনন্ত যুদ্ধ'। তার সেই ভাষণে মোটাদাগে দুইটি ব্যতিক্রমধর্মী বার্তা চিহ্নিত করা যায়। প্রথমত তিনি ইঙ্গিত করেন—এটি সাময়িক যুদ্ধ না হয়ে একটি প্রলম্বিত ও দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধ হতে যাচ্ছে; যা আমেরিকানদের দেখা অন্য যুদ্ধগুলো থেকে ব্যতিক্রম। দ্বিতীয়ত, তিনি এই যুদ্ধকে একটা বৈশ্বিক যুদ্ধের মতো করে চিত্রায়িত করেন। স্পষ্টতই হুমকির সুরে তার ঘোষণা বিবৃত হয়—'এই অঞ্চলের প্রতিটি জাতিকে এখন একটি সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আপনারা হয়তো আমাদের সাথে থাকবেন, নয়তো সন্ত্রাসীদের পক্ষে। সন্ত্রাসীদের প্রশ্রয় দেওয়া প্রতিটি দেশ আমাদের শত্রু বলে বিবেচিত হবে।'

প্রেসিডেন্ট বুশের এই পদক্ষেপ কতটা বুদ্ধিদীপ্ত ছিল, তা ইতিহাস তার পৃষ্ঠায় লিখতে শুরু করেছে। তবে এ কথা সত্য যে, তার প্রতিটি বক্তব্য, হুমকি ও হুঁশিয়ারি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবেই পালিত হয়েছিল। পৃথিবীর সকল জাতি ও রাষ্ট্র

সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ও আমেরিকার পক্ষে দাঁড়িয়েছে। প্রায় দুই দশক যাবৎ এই যুদ্ধ প্রলম্বিত হয়েছে।

কিন্তু এরপর? কার কী অর্জন, আর কার কী বিসর্জন, তা সম্ভবত খুব দ্রুতই স্পষ্ট হতে শুরু করেছে। বিশেষত যখন ২০১৯ এর শেষ দিক থেকে আমেরিকা সরাসরি তালেবানের সঙ্গে আলোচনার টেবিলে বসতে শুরু করে এবং হোয়াইট হাউজের বিভিন্ন বিবৃতিতে তালেবানের 'টেররিস্ট' বা 'সন্ত্রাসী' হওয়ার বিষয়টিকে প্রত্যাখ্যান করা হয়। সম্ভবত ২০১৫ সালের শুরুর দিকে হোয়াইট হাউজের তৎকালীন ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি এরিক শুলজ 'তালেবান সন্ত্রাসী গোষ্ঠী কি-না' সাংবাদিকদের এমন এক প্রশ্নের জবাবে প্রথমে ঘোষণা করেন—'আমি তালেবানদের সন্ত্রাসী গোষ্ঠী মনে করি না, তারা সশস্ত্র বিদ্রোহী।' এরপর থেকেই এই ধরনের ঘোষণা বারবার আমরা শুনেছি।

এ পর্যায়ে আমাদের সামনে কিছু মিলিয়ন ডলারের প্রশ্ন এসে দাঁড়ায়, যেগুলোকে আমরা কোনোভাবেই এড়িয়ে যেতে পারি না। তাহলে কি আমেরিকার 'টেরোরিজম' ও 'সন্ত্রাসবাদে'র সংজ্ঞা বদলে যাচ্ছে? আমেরিকা কি তাদের ঘোষিত ওয়ার অন টেররে হেরে যাচ্ছে? এই যুদ্ধে আমেরিকার পরাজয় মানে পুরো পৃথিবীর মার্কিন মিত্রদের পরাজয়, তাহলে কথিত এই সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বৈশ্বিক পরাজয়-পরবর্তী পৃথিবীর অবস্থা কেমন হবে?

বলাবাহুল্য যে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর সময়ই বলে দেবে, তবে সেই সময়কে মোকাবিলা করার জন্য আমাদের আগ থেকেই প্রস্তুত থাকতে হবে। ফলে, 'জঙ্গিবাদ', 'সন্ত্রাসবাদ', 'জিহাদ', 'গ্লোবাল জিহাদ' ইত্যাদি ধারণা ও প্রবণতার বিষয়ে পশ্চিমা বয়ানের বাইরে আমাদের নতুন বোঝাপড়া তৈরি করতে হবে। এজন্য প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট-বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা, পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে পুনর্চিন্তা, পুনর্ভাবনা ও পুনর্মূল্যায়নের অবকাঠামো তৈরি করা। আমাদের উচিত এসব বিষয়ে পশ্চিমের তৈরি করা গতানুগতিক বয়ানের বাইরে আমাদের নিজস্ব বয়ান তৈরি করা। কারণ, পশ্চিম নিজেই তার বয়ান থেকে সরে আসতে শুরু করেছে। আর ঠিক এই ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারবে আশা করি আমাদের এই বই, এটাই আমাদের উদ্দেশ্য, বাসনা ও কৈফিয়ত।

বাংলা ভাষায় এই টপিকে যত বই এসেছে, তার অধিকাংশই বলতে গেলে পশ্চিমা বুলিবাগিশতার সারাংশ। সেই তুলনায় আতওয়ানের লেখা অনেক বেশি নির্মোহ, বস্তুনিষ্ঠ ও তাত্ত্বিক।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এখানে আল-কায়েদার জন্মলগ্ন থেকে ২০০৭ পর্যন্ত সময়ের ঘটনাবলি আলোচিত ও বিশ্লেষিত হয়েছে। এই ধারাবাহিকতায় লেখা

আতওয়ানের পরবর্তী বইগুলোও আমরা খুব শীঘ্রই পাঠকদের সমীপে উপস্থিত করতে আগ্রহী ইনশাআল্লাহ।

প্রিয় পাঠক, এই বইটি পড়ার পর আপনি সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন আমরা আমাদের উদ্দেশে কতটা সফল। তবে এ কথা জোর দিয়েই বলতে পারি, বইটি পড়ার পর আপনি বলতে বাধ্য হবেন সংশ্লিষ্ট-বিষয়ে এটি অনন্য এবং ব্যতিক্রম একটি কাজ। বইয়ের শৈল্পিক বর্ণনাভঙ্গি, গতিময় ধারাবিবরণী, গল্পের ফাঁকে ফাঁকে তত্ত্ব ও বিশ্লেষণের নৈপুণ্য আপনাকে মোহাবিষ্ট করে তুলবে। এর প্রতিটি অধ্যায় একেকটি অন্ধকার দরজা পেরিয়ে আপনাকে নিয়ে যাবে এমন এক গভীর ও রহস্যময় জগতে, যেখানে সর্বসাধারণের প্রবেশ নিষেধ।

১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২১
এম এ রহমান
প্রকাশক ও সম্পাদক
রেডলাইন
redlinebook21@gmail.com

অনুবাদকের কথা

পৃথিবীব্যাপী যখন 'করোনা ভাইরাস' মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে, তখন ৮ মার্চ ২০২০ জানা গেল বাংলাদেশেও থাবা বসিয়েছে এই মরণঘাতী ভাইরাস। ১৬ মার্চ বন্ধ করে দেওয়া হলো সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। করোনা আতঙ্কে তখন ঘরবন্দি জীবনযাপন করছি। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় পড়াশোনাও দ্রুতই লাটে উঠে। সময় কাটতে থাকে গল্প, উপন্যাস, নন-ফিকশন, আর্টিকেল ইত্যাদি পড়ে কিংবা আল-জাজিরা, ভাইস, টিআরটি, সিএনএন, ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক এর ডকুমেন্টারি দেখে। অনলাইন নিউজ পোর্টালেও কদাচিৎ ঢুঁ মারা হয়। (অতি সামান্য; কারণ কোভিড-১৯ বাদে অন্য কোনো নিউজ তখন থাকত না বললেই চলে)

হঠাৎ ৫ মে বিবিসি বাংলার একটি নিবন্ধে চোখ আটকে গেল, যার শিরোনাম ছিল 'ব্ল্যাক সোয়ান' বা 'কালো রাজহাঁস তত্ত্ব'। খুব সহজ করে বলতে গেলে, যেসব ঘটনাকে 'ব্ল্যাক সোয়ান' বলে চিহ্নিত করা হয়, তার কিছু বৈশিষ্ট্য এমন—

• যা ঘটে খুবই আচমকা, কোনো পূর্বাভাস ছাড়া। একেবারেই আন-প্রেডিক্টেবল।

• এসব ঘটনার ব্যাপ্তি এবং ভয়াবহতা গোটা বিশ্বকে নাড়িয়ে দেয়।

• বিশ্ব ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ বাঁক বদলের সূচনা করে এবং এসব ঘটনার প্রভাব হয় সুদূরপ্রসারী।

নিবন্ধটির তালিকাভুক্ত গত তিরিশ বছরের সবচেয়ে বড় পাঁচটি ব্ল্যাক সোয়ান ইভেন্টের ক্ষেত্রে এসব বৈশিষ্ট্য একেবারেই স্পষ্ট; যার পঞ্চম নম্বরটি হলো 'করোনা মহামারি'।

অপর চারটির মধ্যে 'আরব বসন্ত', '২০০৮ সালের অর্থনৈতিক ধ্বস', 'সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙন' ব্ল্যাক সোয়ান ইভেন্টের সাথে সাদৃশ্য জ্ঞাপন করতে পারলেও যে জিনিসটি আমার চিন্তাজগৎকে ঘোলা করে দেয় সেটা হলো 'নাইন ইলেভেনের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের হামলা'। কিন্তু কোনো জঙ্গি হামলা কীভাবে বিশ্ব ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ বাঁক বদলের সূচনা করতে পারে?

উক্ত প্রতিবেদনে নাইন ইলেভেনকে ব্ল্যাক সোয়ানের আওতায় আনার কারণ হিসেবে বলা হয়েছে—'যদি সাম্প্রতিক বিশ্ব ইতিহাসে পূর্বের যুগের সঙ্গে পরবর্তী যুগের পরিষ্কার ছেদ ঘটিয়ে দিয়েছে এমন একটি মুহূর্তের কথা বলতে হয়, তবে বলা যায় সেই মুহূর্তটি হচ্ছে, ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর সকাল ৮টা বেজে ৪৬মিনিট, ৪০সেকেন্ড। দিনটি ছিল মঙ্গলবার। নিউইয়র্কের আকাশ ছিল নীল,

রোদে ঝলমল। আমেরিকান এয়ারলাইন্সের বোয়িং সেভেন-সিক্স-সেভেন ঠিক ওই মুহূর্তটিতে সোজা এসে আঘাত করে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের নর্থ টাওয়ারে। নাইন-ইলেভেন অ্যাটাকের আগে যুক্তরাষ্ট্রের ধারণাই ছিল না তারা এমন ভয়াবহ হামলার শিকার হতে পারে। ১১০ তলা ভবনটির ৮০তম তলার কাছে এক বিরাট গর্ত তৈরি করে এটি ঢুকে পড়ে ভেতরে, ২০ হাজার গ্যালনের জেট ফুয়েলসহ বিস্ফোরিত হয়। সেই একটি মুহূর্তেই নির্ধারিত হয়ে গেল বিশ্বের পরবর্তী কয়েক দশকের অনেক কিছুর গতিপথ। যদিও ওসামা বিন লাদেন এই ঘটনার আগ থেকেই আমেরিকার 'মোস্ট ওয়ান্টেড' তালিকাভুক্ত ছিল, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তখনও ওসামা বিন লাদেন কিংবা আল-কায়েদা নামে কিছু চিনত না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন প্রতিরক্ষা এবং পররাষ্ট্রনীতির প্রধান লক্ষ্য যেখানে ছিল কমিউনিজম ঠেকানো, নাইন-ইলেভেন পরবর্তী সময়ে কমিউনিজমের জায়গাটি দখল করে নেয় জঙ্গিবাদ। সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের নামে ইসলামি জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে অনন্ত লড়াইয়ে নামে বুশ প্রশাসন।

আফগানিস্তানে তালেবানের বিরুদ্ধে লড়াই দিয়ে শুরু হয়েছিল এই 'ওয়ার অন টেরর', যার পরবর্তী টার্গেট হয়েছিল ইরাক। এখনো অব্যাহত এই যুদ্ধের পেছনে যুক্তরাষ্ট্র খরচ করেছে শত শত কোটি ডলার, প্রাণ গেছে লাখ লাখ মানুষের, কিন্তু এটির শেষ এখনো দেখা যাচ্ছে না।' মোটামুটি এমনটিই ছিল নিবন্ধের বিবরণ।

কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় তৃষ্ণা নিবারণ হয় না আমার। এ দিকে সামনে যত দূর পর্যন্ত দৃষ্টি যায় তাতে কেবল করোনা আতঙ্ক এবং অখণ্ড অবসর; পরীক্ষা নেই, টিউশন নেই;—থাকার মধ্যে আছে কেবলই বই, ডকুমেন্টারি ফিল্ম এবং রুটিনমাফিক ফেইসবুকিং।

'ওয়ার অন টেরর', 'আল-কায়েদা', 'বিন লাদেন' 'নাইন ইলেভেন' সম্পর্কে জানার জন্য ইউটিউব ডকুমেন্টারির পাশাপাশি তাই দ্বারস্থ হলাম Michael Scheuer, Jason Burke, Steve Coll, Lawrence Wright, Rohan Gunaratna, Abdel Bari Atwan প্রমূখের গবেষণালব্ধ বইসমূহের। এসব অধিকাংশই ছিল তথ্যবহুল এবং সমৃদ্ধ। তবে একেবারেই ভিন্ন ফ্লেভারের ছিল আবদুল বারি আতওয়ানের 'The Secret History of Al Qai'da'। বইটিকে উপর্যুক্ত সবগুলো বিষয়বস্তুর সারাংশ বললে অত্যুক্তি হবে না মোটেও। লেখক এখানে অত্যন্ত নির্মোহ ও নিরপেক্ষতা বজায় রেখে বিন লাদেন ও আল-কায়েদার পুরো ইতিহাসকে বিবৃত করেছেন। তিনি কেন এই বই লিখতে গেলেন? আতওয়ান জানাচ্ছেন—'আল-কায়েদা এজেন্ডাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে সমর্থন করি না। এই নেটওয়ার্কটির বিভিন্ন দিক আলোচনার মাধ্যমে—যেটা এত গভীরভাবে এর পূর্বে আমি কখনো আলোচনা করিনি—আমি কেবল চাচ্ছি

সেগুলোকে সকলের সামনে উন্মোচিত করতে এবং যেখানে সম্ভব এর পেছনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দাঁড় করাতে। আল-কায়েদা এবং এর নেতাদের নিয়ে আমার প্রত্যক্ষদর্শী জ্ঞান, আল-কায়েদা ক্যাম্প পরিদর্শন ও এর প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার এবং অনেক বছরের পর্যবেক্ষণ, অধ্যয়ন, অভিজ্ঞতার ফলাফল হলো এই বক্ষ্যমাণ বই।' লেখক মহোদয় তার এই বইয়ে আল-কায়েদার বিভিন্ন কার্যক্রম, কর্মপন্থা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে এর হাইপ্রোফাইল নেতৃবৃন্দ, বিশেষ করে বিন লাদেনের বিভিন্ন ভাষ্য ও বিবৃতির মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। আল-কায়েদা ইন অ্যারাবিয়ান পেনিনসুলা, আল-কায়েদা ইন দ্য ল্যান্ড অফ টু রিভার্স, আল-কায়েদা ইন ইসলামিক মাগরেব, আল-কায়েদা ইন ইউরোপসহ এই মুভমেন্টের অন্যান্য আঞ্চলিক ফ্র্যাঞ্চাইজি; প্রত্যেকটির প্রধান নেতৃবৃন্দ, স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য, কর্মপন্থা ও স্ট্রাটেজির আলাদা বিবরণ দিয়েছেন। এ ছাড়াও প্রাসঙ্গিক আরও বহু কিছু উল্লেখ করেছেন, যার অধিকাংশই প্রায় আমাদের কাছে অজানা।

আশ্চর্য হলেও সত্য যে, লেখকের মতে আমেরিকা ও তার পশ্চিমা মিত্ররা আল-কায়েদাকে প্রতিহত করার জন্য যেসব কলাকৌশল ও প্রচেষ্টা ব্যয় করছে, সেগুলোই আল-কায়েদাকে দিন দিন আরও শক্তিশালী করছে, তাকে ছড়িয়ে দিচ্ছে দিক-দিগন্তে। মূলত প্রাচ্যে পশ্চিমের আগ্রাসী নীতিই আল-কায়েদার জন্ম দিয়েছে, তাকে টিকিয়ে রেখেছে এবং তার শক্তি ও রসদের জোগান দিচ্ছে। তাই যতদিন মধ্যপ্রাচ্যে ও অন্যান্য মুসলিম ভূখণ্ডে পশ্চিমা দখলদারির নীতির অবসান না হবে, ততদিন কেবল আল-কায়েদার উপস্থিতিই থাকবে না, বরং এর শক্তিও অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

বইটির লেখক ফিলিস্তিনের এক শরণার্থী শিবিরে জন্ম নেওয়া আবদুল বারি আতওয়ান লন্ডনভিত্তিক অ্যারাবিক নিউজ এজেন্সি আল-কুদস আল-আরাবির প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের একজন, এবং দীর্ঘ প্রায় দুই যুগ যাবৎ তিনি এর সম্পাদক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তার সাংবাদিক জীবনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি—যা তাকে খ্যাতির শীর্ষ চূড়ায় আরোহণ করিয়েছে; তা ছিল বিন লাদেনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ। পশ্চিমা ঘরানার একমাত্র সাংবাদিক তিনি, যিনি আল-কায়েদা প্রধানের সঙ্গে সবচেয়ে দীর্ঘ সময় কাটিয়েছেন তার প্রধান ঘাঁটি তোরাবোরার দুর্গম্য পাহাড়ি গুহায়—প্রায় তিন দিন। এ সময় তিনি তাকে কাছ থেকে দেখেছেন, তার মুখ থেকে নিজের অতীত কার্যকলাপ এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা শুনেছেন।

সাক্ষাৎকারের ঘটনাটির ১৯৯৬ সালে। এই ঘটনার পর থেকে লেখক বিন লাদেনের ব্যক্তিত্ব ও তার প্রতিষ্ঠিত গ্লোবাল জিহাদিস্ট মুভমেন্ট 'আল-কায়েদা' সম্পর্কে ব্যাপক আগ্রহী হয়ে ওঠেন। অতঃপর দীর্ঘ এক দশকের বিস্তৃত গবেষণার

পর *The Secret History of Al Qai'da* নামে তার এই বিখ্যাত গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় এবং বেশ সাড়া জাগায়।

বইটি লেখা হয়েছে প্রধানত পশ্চিমাদের উদ্দেশ্যে, যারা আল-কায়দাকে ভুল বোঝার ফলে তাদের পাতানো ফাঁদে পা দিয়ে এক ক্ষয়কারী যুদ্ধের চোরাবালিতে আটকে পড়েছে এবং বারংবার নিজেদের ভুল নীতির কারণে সেই চোরাবালির আরও গভীরে তলিয়ে যাচ্ছে। লেখকের উদ্দেশ্য বলতে গেলে পশ্চিমা নীতিনির্ধারকদের সামনে আল-কায়েদার সঠিক রূপ ও প্রকৃতিকে তুলে ধরা, যেন তারা নিজেদের ভুল নীতি থেকে সরে এসে সুনিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে নিজেদের ও তাদের জনগণকে রক্ষা করতে পারে।

বইটি এতই জনপ্রিয়তা পেয়েছে যে, আল-জাজিরার তথ্যমতে এখনো পর্যন্ত পনেরোটি ভাষায় এটি রূপান্তরিত হয়েছে। ব্রিটেন ভিত্তিক সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন 'দ্য স্পেকট্যাটর' (THE SPECTATOR)-এর মতে, 'আল-কায়েদার রোমাঞ্চকর ইতিহাস এর চাইতে ভালো আর কোথাও বর্ননা করা হয়নি।' ব্রিটিশ পলিটিশিয়ান এবং সাবেক মেম্বার অফ পার্লামেন্ট টনি বেন (Tony Benn) বইটি সম্পর্কে মন্তব্য করেন, 'এখন পর্যন্ত এই বিষয়ে সেরা বই'। বইটিকে বাংলাভাষী পাঠকের পাঠসম্ভারে যুক্ত করার আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াসের মাধ্যমে হয়তো বিশ্বের ষোলোতম ভাষায় এর অনুবাদ প্রকাশিত হচ্ছে।

উল্লেখ্য, এটি আমার প্রথম প্রকাশিত বই হলেও ক্রমিকমান হিসেবে তৃতীয় অনুবাদ। প্রথম অনুবাদ Michael Scheuer এর 'Osama Bin Laden' 'ওয়ার্ল্ড'স মোস্ট ওয়ান্টেড ম্যান' নামে প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। দ্বিতীয় অনুবাদ (দ্বৈত) Scott Horton এর 'Fool's Errand: Time to End the War in Afghanistan' অতিসত্বর প্রকাশিত হবে আশা করছি। উল্লিখিত বই দুটিতে পাঠকদের বোঝার সুবিধার্থে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে টীকা, পরিশিষ্ট এবং পরিমার্জন আবশ্যক বিধায় তৃতীয় অনুবাদটিই প্রথম প্রকাশিত হলো। বইটির সম্পাদনা ও প্রকাশনায় যাদের চিন্তা ও পরিশ্রম ব্যয় হয়েছে, তাদের সকলের প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সবশেষে কামনা করব বইটি সর্বমহলে সমাদৃত হোক এবং ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করুক, যেন এই সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে ভবিষ্যতে আরও রোমাঞ্চকর বই উপহার দিতে পারি।

ধন্যবাদান্তে,
সিদ্দিক ইবনে মুসা
নভেম্বর, ২০২১

মুখবন্ধ

৭ জুলাই ২০০৫ সালে লন্ডনে আত্মঘাতী বোমা হামলার মৃতদেহ এবং ধ্বংসলীলা তিক্তভাবে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আল-কায়েদা আজ অবধি পশ্চিমা নিরাপত্তা এবং স্থিতিশীলতার ওপর সবচেয়ে শক্তিশালী হুমকি হিসেবে আছে। আমার মতে, পশ্চিমা সরকারব্যবস্থাগুলো বিশেষ করে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ এবং ব্রিটেনের প্রেসিডেন্ট টনি ব্লেয়ার এই হুমকির মাত্রা, এর উত্থানের উৎস এবং একে মোকাবিলা করার পন্থা সম্পর্কে মোটেই অবগত নন।

ত্রিশ বছর যাবৎ লন্ডনে বসবাসরত একজন আরব মুসলিম এবং মধ্যপ্রাচ্য রাজনীতি বিশেষজ্ঞ একজন সাংবাদিক হিসেবে আমার বিশ্বাস, এই বইয়ে আমি আল-কায়েদার একটি অনন্য বিশ্লেষণ এবং পশ্চিমা সভ্যতায় এর প্রভাবকে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছি। আমি মুসলিম এবং পাশ্চাত্যসভ্যতা—দুটো সম্পর্কেই জ্ঞান রাখি এবং আমার বিশ্বাস—'মোকাবিলা নয় বরং সমঝোতাই একমাত্র পথ'। পশ্চিমারা যদি প্রকৃতই আল-কায়েদার হুমকি থেকে বাঁচতে চায়, তবে প্রথমে তাদেরকে এর প্রকৃতি ও রাজনৈতিক ভিত্তিকে বুঝতে হবে, যেটা ইতিমধ্যেই সমগ্র বিশ্বব্যাপী অসংখ্য ফ্র্যাঞ্চাইজি গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। তাদেরকে অবশ্যই জানতে হবে, কীভাবে ন্যায়সংগত ক্ষোভের প্রতিক্রিয়া দেখাতে হয় এবং অর্থপূর্ণ সমঝতায় পৌঁছুতে হয়। এই প্রক্রিয়ায় ভূমিকা পালনের জন্যই বক্ষ্যমাণ বইয়ে আল-কায়েদার উৎপত্তি, সদস্য সংখ্যা, তাদের লক্ষ্য, প্রভাব এবং কৌশল সম্পর্কে বিশ্লেষণধর্মী এবং বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করা হয়েছে।

আল-কায়েদার এজেন্ডাকে আমি কোনোভাবেই অনুমোদন অথবা সমর্থন করি না। এই নেটওয়ার্কটির বিভিন্ন দিক আলোচনার মাধ্যমে—যেটা এত গভীরভাবে এর পূর্বে আমি কখনো আলোচনা করিনি—আমি কেবল চাচ্ছি সেগুলোকে সকলের সামনে উন্মোচিত করতে এবং যতটুকু সম্ভব এর পেছনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দাঁড় করাতে। আল-কায়েদা এবং এর নেতাদের নিয়ে আমার প্রত্যক্ষদর্শী জ্ঞান, আল-কায়েদার ক্যাম্প পরিদর্শন ও এর প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার এবং অনেক বছরের পর্যবেক্ষণ, অধ্যয়ন ও অভিজ্ঞতার ফলাফল হলো এই বক্ষ্যমাণ গ্রন্থ। লন্ডনের সেই ভয়াবহ ঘটনাই প্রমাণ করে যে, আল-কায়েদা আরও বিবর্তিত এবং বিস্তৃত হয়েছে; এর দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বিদ্যমান এবং তারা ধৈর্য সহকারে এবং নাছোড়বান্দারূপে সেগুলো অর্জন করেই চলছে। আল-কায়েদার নতুন কাঠামোতে ছোট ছোট স্বতন্ত্র গ্রুপ বিদ্যমান, যারা তাদের ভাবাদর্শ ধারণ করে এবং মূল নেতৃত্বের সাথে সামান্য বা একেবারেই সরাসরি সম্পৃক্ততা না রেখে

স্থানীয়ভাবে গঠিত হয় এবং স্বাধীনভাবে কার্য সম্পাদন করে থাকে। এগুলো মোটেও তাদের দুর্বল হওয়ার লক্ষণ নয়—যেমনটা অনেকেই ধারণা করে রেখেছে। অনেক বিশেষজ্ঞই এরূপ ধারণা উপস্থাপন করতে চায়, কিন্তু বাস্তবতা সম্পূর্ণ এর বিপরীত। সমান্তরালভাবে এবং দ্রুতগতিতে বিস্তৃত হয়ে দিনে দিনে আল-কায়েদা আরও বড় এবং আরও শক্তিশালী হয়ে উঠছে। এর ভাবাদর্শ এবং স্ট্র্যাটেজি ইন্টারনেটে ব্যাপকভাবে সহজলভ্য, যেটা কোনো লাইসেন্স বা অনুমোদন ছাড়াই কোনো ব্যক্তি বা গ্রুপ অনুসরণ করতে পারছে এবং এর কাঠামোর মধ্যে থেকেই সফলভাবে অপারেশন পরিচালনা করছে।

জর্জ ডব্লিউ বুশ প্রায়ই বলেন যে, সেখানকার আল-কায়েদার সাথে লড়াই করে এই নেটওয়ার্কের আমেরিকায় আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যই তিনি ইরাকে আমেরিকান সৈন্য পাঠিয়েছেন। অথচ ইরাক আগ্রাসনের আড়াই বছর পরও আল-কায়েদা কেবল আমেরিকার বন্ধু আরবদেশগুলো—যেমন মিশরের তাবা এবং শারম-আল-শেইখ, জর্ডানের আকাবা, মরক্কোর কাসাব্লাঙ্কা প্রভৃতি জায়গায় হামলার সক্ষমতাই অর্জন করেনি; বরং ইস্তাম্বুল, মাদ্রিদ এবং লন্ডন হয়ে স্বয়ং এখন আমেরিকার ঘাড়ের ওপর তপ্ত নিশ্বাস ছাড়ছে।

ইরাকে আমেরিকার সামরিক ব্যয় ইতিমধ্যেই ২৫০ বিলিয়ন ডলারে ঠেকেছে। কিন্তু এই ব্যয়বহুল 'ওয়ার অন টেরর' এর পরও আল-কায়েদাকে অজেয় ও দুর্দান্ত বলেই মনে হচ্ছে। বাস্তবিকপক্ষে, তাদের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধকেই তারা নিজেদের লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যম বানিয়ে নিয়েছে। ইরাককে তারা তাদের প্রশিক্ষণ শিবির হিসেবে ব্যবহার করছে এবং আমেরিকার বৈদেশিক নীতিই আল-কায়েদার এযাবৎকালের সর্বশ্রেষ্ঠ রিক্রুটমেন্ট অফিসার হিসেবে কাজ করছে।

আল-কায়েদাকে তার অক্সিজেন সরবরাহ ব্যাহত করার উদ্দেশ্যে মুসলিমবিশ্বে মধ্যমপন্থা বিকাশের নামে এবং চরমপন্থা দূরীভূত করার লক্ষ্যে হাস্যকরভাবে আমেরিকান এবং ব্রিটিশ সরকার বরং এর উল্টোটাই করে চলছে। এর বিপরীতে আল-কায়েদাই বিভিন্ন উপায়ে পশ্চিমা সমাজগুলোর পরিবর্তনকেও প্রভাবিত করছে। এর সুস্পষ্ট উদাহরণসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো আমেরিকা এবং ব্রিটেনে বিভিন্ন কঠোর আইন প্রণয়নকে উদ্দীপিত করা এবং ২০০৪ সালে স্পেনের সাধারণ নির্বাচনে সরকারে পরিবর্তন আনা।

'মুসলিম মাত্রই আমেরিকার জনগণ বা পশ্চিমা সভ্যতাকে ঘৃণা করে'—এরূপ যেকোনো ধারণাই ভ্রান্ত এবং বিপজ্জনক। মুসলিমরা মূলত যে বিষয়টা ঘৃণা করে, সেটা হলো তাদের বৈদেশিক নীতি। কেবল মুসলিমরাই এরূপ ঘৃণা পোষণ করে না, বরং অন্য আরও অনেকেই করে। উদাহরণস্বরূপ, আরব লীগ এবং দক্ষিণ

আমেরিকার দেশগুলো থেকে ৩৩ জন নেতা ২০০৫ সালের মে মাসে প্রথমবারের মতো ব্রাজিলে একত্রিত হয়েছিল। যেটাকে দেখা হয়েছিল আমেরিকার বৈশ্বিক কর্তৃত্বের বিপরীতে নতুন জোট গঠনের একটি ধাপ হিসেবে। এ ছাড়াও আমেরিকার আগ্রাসনকে সমর্থন করে, ইউরোপে এরূপ দেশ—যেমন স্পেন, গ্রীস প্রভৃতি দেশের সংখ্যা শতকরা ১০ ভাগেরও কম। দুটি পক্ষের মধ্যে সমানে সমান বিরোধিতা এটাই প্রকাশ করে যে, বিশ্ব এখন সভ্যতার সংঘর্ষে (Clash of Civilization) লিপ্ত। অপরদিকে বর্তমান সময়ে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো মুসলিম সভ্যতার পক্ষে বলার মতো কেউ নেই, যদিও মাঝেমধ্যে কেবল পশ্চিমাপন্থি দুর্নীতিবাজ স্বৈরাচারীরা গণতান্ত্রিক এবং পুঁজিবাদী উপায়ে এর পক্ষে বলার প্রয়াস করে।

আল-কায়েদা সংগঠনটি হয়তো-বা বিবর্তিত হয়েছে; কিন্তু তাদের অভিযোগ এবং দাবি-দাওয়াসমূহের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। পশ্চিমা নেতাদের উচিত এটিকে উপেক্ষা না করে বরং এর গুরুত্ব উপলব্ধি করা। অথচ টনি ব্লেয়ার তা উপেক্ষা করেছে এবং লন্ডনের বোমা হামলাটি যে মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকান প্রকল্পে তার সহায়তার সাথে সরাসরি সম্পর্কিত, এটা মেনে নিতে অস্বীকার করেছে। তাহলে কেন স্প্যানিশরা ২০০৪ সালের ১০ মার্চে তাদের কমিউনিকেশন সিস্টেমের ওপর চালানো ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের জন্য এরূপ সম্পৃক্ততাকে দায়ী করেছিল এবং ভোটের মাধ্যমে সেই সরকারে পরিবর্তন এনেছিল যেটা কিনা ইরাকে আমেরিকার আগ্রাসনকে সমর্থন দিত? কেনই-বা ওসামা বিন লাদেন প্রশ্ন রাখেন, আল-কায়েদা কি সুইডেনের মতো দেশেও হামলা চালায়নি?

এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য কাউকে খুব বিচক্ষণ অথবা বিজ্ঞ বিশ্লেষক হতে হয় না। ওসামা বিন লাদেন এবং আল-জাওয়াহিরি এর কারণসমূহ সম্ভাব্য সকল বোধগম্য ভাষায় বারংবার ব্যাখ্যা করেছেন এবং বলে দিয়েছেন যে, মুসলিমদের রক্তের বদলা নিতে এসব রক্তাক্ত আক্রমণও অবিরাম চলতে থাকবে।

২০০৪ সালের ৪ নভেম্বরের মার্কিন নির্বাচনের ৫ দিন পূর্বে আমেরিকান জনগণের উদ্দেশে বিন লাদেনের বার্তাকে স্মরণ করুন। এতে তিনি ১১ সেপ্টেম্বরের হেতু ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, আমেরিকার সাথে তার বৈরিতার সূত্রপাত ঘটেছে ১৯৮২ সালেই, যখন আমেরিকা ইসরাইল কর্তৃক লেবানন আগ্রাসনকে অনুমোদন দেয় এবং আমেরিকা তাদের ষষ্ঠ বহরের মাধ্যমে সেটাতে সহায়তা করে। সেই বার্তার একাংশে উঠে এসেছে—

'আমি সেসব মর্মস্পর্শী দৃশ্য, রক্ত, ছিন্নভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, সর্বত্র নারী ও শিশুদের কাতরানো কখনই ভুলে যেতে পারি না; ঘরবাড়িগুলোকে তাদের

বাসিন্দাসহই ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল এবং উঁচু উঁচু স্থাপনাসমূহ চূর্ণবিচূর্ণ করে দেওয়া হয়েছিল। যখন আমার লেবাননের ধ্বংসস্তূপের কথা মনে হয়, সাথে সাথেই আমার এটাও মনে হয় যে, আমাদেরও উচিত সেই একই উপায়ে সেসব নিপীড়নকারীদের শাস্তি দেওয়া এবং আমাদেরও উচিত আমেরিকান স্থাপনাগুলোও সেভাবেই ধসিয়ে দেওয়া।'

আল-জাজিরা সম্প্রচারিত সেই একই বার্তায় বিন লাদেন সিনিয়র বুশ কর্তৃক ইরাক অবরোধেরও তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন, যার কারণে লক্ষ লক্ষ ইরাকিকে মৃত্যুমুখে পতিত হতে হয় এবং যেটি মানব-ইতিহাসে বিদিত শিশুদের ওপর চালানো সবচেয়ে বড় গণহত্যা। এবং জুনিয়র বুশ কর্তৃক ইরাকে লক্ষ লক্ষ পাউন্ড বোমা এবং বিস্ফোরক নিক্ষিপ্ত করে লক্ষ লক্ষ শিশু হত্যারও নিন্দা জানান, যেটি করা হয়েছিল কেবল পুরোনো এক দালালকে সরিয়ে একটি নতুন পুতুল সরকার প্রতিস্থাপনের জন্য, যারা ইরাকের তেল অপহৃত করতে এবং অন্যান্য নিপীড়ন চালাতে সহায়তা করবে।

তবে আমি সর্বদাই সত্যিকারের নিন্দা জানাই নিরীহ পশ্চিমা জনগণের ওপর আল-কায়েদার এসব হামলার। আমি আমার যৌবনের বেশিরভাগ সময় লন্ডনে কাটিয়েছি এবং আমি এই শহরের মানুষদের ভালোবাসি। আমি পশ্চিমা গণতন্ত্র, সভ্যতা, স্বাধীন বিচারব্যবস্থা, নাগরিক সুবিধা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং সুযোগের সমতার তারিফ করি এবং সমর্থন করি।

আমার ধারণা মতে, প্রেসিডেন্ট বুশ এবং প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের মতো নেতৃবৃন্দ কর্তৃক তাদের জনগণের স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রণীত পদক্ষেপসমূহ পুরোপুরিভাবে ভুল এবং এ সবকিছুকেই আল-কায়েদা তাদের মাস্টারপ্ল্যান বাস্তবায়নে কাজে লাগাচ্ছে। সেসবই আমি এই বইয়ে আলোচনা করেছি। ওসামা বিন লাদেন নিশ্চিতভাবেই সঠিক সময় তাদের সেসব মারাত্মক বিচ্যুতিসমূহকে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হবেন না।

আল-কায়েদা বর্তমানে কোন অবস্থানে আছে বা এটি কোন দিকে ধাবিত হচ্ছে; এর লক্ষ্য কী এবং সামর্থ্য কীরূপ; তাদের অভিযোগ এবং চ্যালেঞ্জ এর সামনে পশ্চিমাদের করণীয় কী—এসব বিষয় তুলে ধরাই বক্ষ্যমাণ বইয়ের উদ্দেশ্য। আমি এই বইয়ে ইরাকে তাদের দুর্দান্ত অভিযানসমূহকেও বিবেচনায় এনেছি এবং দেখানোর চেষ্টা করেছি, কীভাবে এই দেশটি আমাদের দেখতে পাওয়া সবচেয়ে নির্মম এবং আক্রমণাত্মক আল-কায়েদা যোদ্ধাদের উৎপাদনকারী কারখানায় পরিণত হলো। অধিকন্তু আন্তর্জাতিক অপারেশন পরিচালনার জন্য ইরাক বর্তমানে আল-কায়েদার একটি প্লাটফর্মে পরিণত হয়েছে। আমি লক্ষ করেছি, সাম্প্রতিক সময়ে মিশর, মাদ্রিদ, লন্ডন প্রভৃতি হামলাগুলোর পেছনে ইরাক এবং সেখানকার

আল-কায়েদা নেতৃবৃন্দ—যেমন আবু মুসআব আল-জারকাভি, আবু মুসআব আল-সুরি প্রমুখের সরাসরি সম্পৃক্ততা বিদ্যমান। আল-কায়েদা কেবল পশ্চিমা বিশ্বকেই অস্থিতিশীল করতে চাইছে না বরং তারা মধ্যপ্রাচ্যেও এরূপ করতে চাইছে। বিভিন্ন অধ্যায়ে আমি ইন্টারনেটের ভূমিকা এবং যুদ্ধের একটি সেক্টর হিসেবে সাইবার জিহাদের উত্থান নিয়ে আলোচনা করেছি, আত্মঘাতী হামলার ধারণা এবং এর ইতিহাসকে তুলে ধরেছি; আল-কায়েদার অর্থনৈতিক স্ট্র্যাটেজি বর্ণনা করেছি, বিশেষ করে যার কারণেই সৌদি আরব এবং আমেরিকা আল-কায়েদা নিয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত। সর্বোপরি আল-কায়েদা মধ্যপ্রাচ্যের নিপীড়ক শাসনব্যবস্থাসমূহে অন্তর্বিস্ফোরণ ঘটানোর জন্য এবং তেলের দাম বৃদ্ধি করে ও বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ক্ষয়কারী যুদ্ধে পশ্চিমাদের জড়িয়ে রাখার মাধ্যমে অর্থনীতিকে শুকিয়ে ফেলে দেউলিয়াত্বের দিকে ঠেলে দেওয়ার লক্ষ্যে যে উচ্চ মানের কলা-কৌশল অনুসরণ করছে, তার বিবরণ তুলে ধরেছি।

বইটি শুরু হয়েছে ওসামা বিন লাদেনের সাথে ব্যক্তিগতভাবে আমার সাক্ষাৎ এবং সেই ভ্রমণের বর্ণনা নথিভুক্ত করার মাধ্যমে। তিনি তখনই বিশ্বের মোস্ট ওয়ান্টেড ছিলেন এবং আরও বেশি মোস্ট ওয়ান্টেড হওয়ার দিকে এগিয়ে চলছিলেন। যেসব ব্যক্তিদের নিয়ে সবচেয়ে বেশি লেখা হয় এবং যারা সবচেয়ে আলোচিত-সমালোচিত, তিনি তাদের মধ্যে একজন। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে বিপরীত মনে হলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় তাকে নিয়ে রচিত গ্রন্থসমূহ বিভ্রান্তিকর। আল-কায়েদার প্রতিষ্ঠাতা এবং অগ্রদূতদের প্রতি গভীর দৃষ্টিপাত না করে আল-কায়েদার কোনো ইতিহাসকে তুলে ধরা সম্ভব নয়। এই বইয়ের প্রথম দুই অধ্যায়ে তার চিত্রায়ণ এবং আধুনিককালের জিহাদের সবচেয়ে প্রভাবশালী এবং প্রধান বক্তা হিসেবে তার ক্রমবিকাশকে তুলে ধরা হয়েছে। যেসব পাঠক বিন লাদেনের জীবনী সম্পর্কে অবগত আছেন, তারাও এটিকে এখানে নতুনরূপে দেখতে পাবেন।

মধ্যপ্রাচ্যে আমার ভ্রমণসমূহের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমি দেখেছি যে, বিশ্বের ১.৩ বিলিয়ন মুসলিম জনগোষ্ঠীর বিশাল অংশের মধ্যে বিন লাদেন এবং আল-কায়েদার প্রভাব ক্রমবর্ধমান। অধিকন্তু, আল-কায়েদার সাথে লড়াইটি সামঞ্জস্যহীন। আত্মপ্রসাদে মগ্ন পশ্চিমাদের থেকে আশা করা যায় না যে, এই যুদ্ধে তারা জয়ী হবে। অন্যদিকে বিন লাদেন এবং আল-কায়েদা তাদের দিক থেকে ধৈর্যশীল এবং তাদের দীর্ঘস্থায়ী স্ট্র্যাটেজি এবং একনিষ্ঠ ভাবাদর্শ বিদ্যমান। যদি পশ্চিমারা আল-কায়েদার সাথে লড়তেই চায়, তবে প্রথমে তাদের উচিত একে বুঝে নেওয়া। আল-কায়েদাকে তাচ্ছিল্য করা তাদের জন্যই বিপজ্জনক, কারণ এটি বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার মতো কোনো বিষয় নয়।

উপক্রমনিকা

ডেরার অভ্যন্তরে : তোরাবোরায় বিন লাদেনের অতিথি হয়ে

এই অধ্যায়ে যেসময়কার ঘটনাবলি নথিভুক্ত করা হয়েছে, সেসময় আফগানিস্তানে ব্যাপক হুলুস্থুল অবস্থা বিরাজ করছিল। ইসলামিক স্টেট অফ আফগানিস্তানের অবৈধ সরকারের সাথে দুই বছর গৃহযুদ্ধের পর তালেবানরা (পাকিস্তানের সমর্থনপুষ্ট হয়ে) ১৯৯৬ সালে কাবুল দখল করে নেয়। কিন্তু তখনও প্রধান প্রধান শহরগুলোর বাইরে বিভিন্ন যুদ্ধবাজ নেতাদের ক্ষমতাকে কুক্ষিগত রাখার চেষ্টার ফলে দেশজুড়ে অস্থিতিশীলতা বিরাজ করছিল।

অদ্ভুত আমন্ত্রণ

১৯৯৬ সালে আমি বিন লাদেনের সাথে তোরাবোরায় তার গোপন ঘাঁটিতে তিন দিন কাটাই। এর পূর্বে অথবা আজ অবধি তার সাথে এত ব্যাপক সময় কাটানো পশ্চিমা ঘরানার একমাত্র সাংবাদিক আমিই। আমার ত্রিশ বছরেরও বেশি সময়ের ক্যারিয়ারে বিভিন্ন অর্জনের মধ্যে এই যাত্রাটি নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল এবং এটি বিন লাদেন এবং আল-কায়েদা সম্পর্কে আমার ব্যাপক কৌতূহলকে তুলে ধরে।

অক্সফোর্ড স্ট্রিটে ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত বিন লাদেনের 'এডভাইস এন্ড রিফর্ম কমিটি (ARC)' সংগঠনটির লন্ডন শাখার একটি অফিস ছিল। এই অফিসটি খালিদ আল-ফাওয়াজ পরিচালনা করত, যাকে কেনিয়ার নাইরোবি এবং তানজানিয়ার দারুস-সালামে আমেরিকান দূতাবাসের বোমাহামলায় পরিকল্পনার অভিযোগে ১৯৯৮ সালে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড গ্রেপ্তার করে।

বিশিষ্ট আরব সাংবাদিকরা আল-ফাওয়াজকে 'ব্রিটেনে বিন লাদেনের দূত' বলেই অভিহিত করে। ১৯৯৬ সালের নভেম্বর মাসে আমি যে পত্রিকার প্রধান সম্পাদক, সেই আল-কুদস আল-আরাবি পত্রিকার অফিসে এসেছিল সে। কিছু বিনীত ভূমিকা এবং আলাপ-আলোচনার পর সে আমার কাছে জানতে চেয়েছিল আমি কি সম্প্রতি আত্মগোপনে যাওয়া বিন লাদেনের সাক্ষাৎকারের জন্য আফগানিস্তান ভ্রমণে ইচ্ছুক কিনা। এই অপ্রত্যাশিত আমন্ত্রণ আমাকে বিহ্বল করে দেয়; কারণ বিন লাদেন ইতিমধ্যেই আমেরিকার এক নম্বর শত্রু হওয়ার দিকে ভালোভাবেই এগিয়ে চলছিলেন এবং তিনি আরবদের মাঝে একজন

প্যারাডক্সিকাল সামরিক ব্যক্তিত্ব, ক্যারিশম্যাটিক চরিত্র, ধনকুবের এবং অতিমাত্রায় বিপজ্জনক হিসেবে আলোচিত ছিলেন।

প্রচলিত নিয়মে সাংবাদিকরাই সাক্ষাৎকারের জন্য আবেদন করে থাকে; কিন্তু এটিসহ অন্যান্য সমস্ত কিছু সম্পাদনের জন্যই বিন লাদেনের নিজস্ব পদ্ধতি বিদ্যমান ছিল। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মিডিয়াকে কীভাবে কাজে লাগাতে হয়, সে সম্পর্কে তার সুনিপুণ জ্ঞান প্রতীয়মান হচ্ছে। যখন তিনি আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনি চেয়েছিলেন সমগ্র বিশ্বই এটি সম্পর্কে অবগত হোক। তাই তিনি আল-ফাওয়াজকে অন্যান্য পছন্দসই মিডিয়া ব্যক্তিত্বকেও সাক্ষাৎকারের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে নির্দেশ দেন।

সংবাদপত্র সেক্টর থেকে কেবল ব্রিটিশ সাংবাদিক রবার্ট ফিস্ক এবং আমি নির্বাচিত হয়েছিলাম। আমেরিকা কর্তৃক বিশ্বব্যাপী অসৎ শাসনব্যবস্থাগুলোকে পৃষ্ঠপোষকতা এবং ইসরাইলসংক্রান্ত আমেরিকান নীতির সমালোচনা করে তার দুঃসাহসিক প্রবন্ধগুলোর জন্য বিন লাদেন রবার্ট ফিস্ককেও খুব সমীহ করতেন। আল-ফাওয়াজ আমাকে জানিয়েছিল যে, আমাকে নির্বাচন করা হয়েছিল কারণ আমি নির্দিষ্ট কিছু আরব শাসনব্যবস্থার অনমনীয় সমালোচক এবং আমি ১৯৯১ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধের বিরোধিতা করেছিলাম, যেগুলোকে বিন লাদেন খুবই প্রশংসা করেন। বাস্তবিকপক্ষে আল-কুদস আল-আরাবিই একমাত্র স্বাধীন আরবি পত্রিকা ছিল। অ্যারাবিয়ান নিউজপেপার ইন্ডাস্ট্রি সম্পূর্ণভাবে সরকারি স্বার্থের অধীনে পরিচালিত হতো। তবে আমার পত্রিকা ছিল সামান্য কয়েকটি পত্রিকার মধ্যে অন্যতম, যা বিন লাদেনের সাথে একটি সাক্ষাৎকার ছাপাতে সমর্থ হয়েছিল।

ব্রডকাস্ট নেটওয়ার্কগুলির মধ্যে বিবিসির সাথে যোগাযোগ করা হয়েছিল, কিন্তু এর পরিচালকরা এতে সাড়া দেননি। কারণ তারা বিন লাদেনকে ততটা হাইপ্রোফাইলধারী বলে মনে করেননি যে, এর জন্য আফগানিস্তানে কোনো টেলিভিশন ক্রু পাঠাতে হবে। একই কারণে আমেরিকান নেটওয়ার্ক সিবিএসও এই সুযোগটি হাতছাড়া করে। কিন্তু বৃটেনের চ্যানেল ফোর সুযোগটিকে স্বাগত জানিয়েছিল এবং একজন ক্রু প্রেরণ করেছিল। জালালাবাদের একটি হোটেলে সেই প্রোডিউসারের সাথে আমার দেখা হয়—যখন আমিও বিন লাদেনের সাথে সাক্ষাৎকার অভিযানে ছিলাম। সে সময় আমাদের উদ্দেশ্যের ব্যাপারে আমরা খুবই গোপনীয়তা বজায় রাখছিলাম। তখন কেবল সিএনএন রিপোর্টার পিটার বার্গেনই বিন লাদেনের বিশাল গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। আল-ফাওয়াজের আমন্ত্রণে তিনি খুবই আগ্রহান্বিত হয়েছিলেন এবং তার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, এটি খুবই মূল্যবান একটি সুযোগ।

পরবর্তী সময়ে আমি জানতে পেরেছিলাম যে, বিন লাদেনের লোকেরা সিএনএন ক্রুকে বিশ্বাস করতে পারেনি। তারা আশঙ্কা করছিল যে, এর মাধ্যমে হয়তো সিআইএ অনুপ্রবেশ করতে পারে। সিএনএন এর ক্রুকে তাই চোখ বেঁধে দূরবর্তী একটি এলাকার অস্থায়ী শিবিরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং সাক্ষাৎকারটি এক ঘণ্টারও কম সময় ধরে হয়েছিল। অর্থাৎ স্পষ্টতই বিন লাদেন খুবই সাবধানী ছিলেন।

আমি আল-ফাওয়াজকে বিনীতভাবে উত্তর দিয়েছিলাম যে, আমি তার এই আমন্ত্রণে খুবই উৎসাহী কিন্তু তারপরও এই বিষয়ে চিন্তার জন্য কিছু সময় চাইলাম। এর পেছনে অবশ্য বেশ কিছু কারণ ছিল, যেগুলোর অধিকাংশই আমার নিরাপত্তাজনিত ভীতিসংক্রান্ত। সেসময় আফগানিস্তানকে ভয়াবহ গৃহযুদ্ধ গ্রাস করেছিল এবং সেখানে আইনের সামান্য ছোঁয়াও ছিল না। সেখানে কোনো সরকার, কোনো পুলিশ কিংবা কোনো নিরাপত্তা বাহিনীর অস্তিত্বই ছিল না। অপরাধ একটি নজিরবিহীন মাত্রায় পৌঁছেছিল এবং কিডন্যাপিং ছিল একটি মামুলি ব্যাপার মাত্র। যদি কোন মুক্তিপণ পাওয়ার আশা না থাকত, তবে যুদ্ধবাজ গোত্রপ্রধানের লোকেরা পকেটের পাঁচ ডলারের জন্যই মানুষ খুন করে ফেলত। এ ছাড়া আমি পশতুও বলতে পারি না এবং আফগানিস্তানে খুব কম লোকই ইংরেজি বা আরবি বলতে জানে (কেবল এই দুইটি ভাষাই আমি বলতে পারি)। এবং এ জাতীয় কোনো পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে তা থেকে উত্তরণের জন্য কারও সাথে কথা বলতে পারা নিয়েও আমি চিন্তিত ছিলাম। তা ছাড়া আমি এটি নিয়েও উদ্বিগ্ন ছিলাম যে, সেসময় বেশ কিছু দেশ বিন লাদেনকে হন্য হয়ে খুঁজছিল, তাদের সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টরাও আমাকে ফলো করতে পারে। তিনি তখন বর্তমান সময়ের মতো এত বিখ্যাত কিংবা সমালোচিত কোনোটিই ছিলেন না। কিন্তু তখনও তিনি তার দেশ সৌদি আরবে দুটি হামলার জন্য অভিযুক্ত ছিলেন। একটি হলো ১৯৯৫ সালে রিয়াদে বোমা বিস্ফোরণ এবং অন্যটি ১৯৯৬ সালের খোবার টাওয়ারে বোমা হামলা—যেটিতে উনিশ জন আমেরিকান সৈন্য নিহত হয়েছিল। আমেরিকা থেকে পাকিস্তান অবধি বিভিন্ন দেশের কাছে স্পষ্টতই তিনি ভয়ানক বিপজ্জনক বলে চিহ্নিত ছিলেন এবং তিনি সৌদিআরব কর্তৃক বেশকিছু হত্যা প্রচেষ্টার সম্মুখীনও হয়েছিলেন। যদি আমি অনিচ্ছাকৃতভাবেও কোনো সিক্রেট সার্ভিসের জন্য বিন লাদেনের সন্ধান দেওয়ার কারণ হয়ে যাই, তবে খুব সম্ভবত তাদের আক্রমণে আমি নিজেও মারা পড়ব। অথবা এর বিপরীতে যদি বিন লাদেনের লোকেরা উক্ত লড়াইয়ে জিতে যায়, তবে তারা নিশ্চিতভাবেই আমাকে স্পাই হিসেবে চিহ্নিত করবে; যার পরিণতি হবে আরও ভয়াবহ। অর্থাৎ আমার জন্য সেটি ছিল একটি উভয় সংকট অবস্থা।

ইতিপূর্বে সেই সময়ই আমার মধ্যে এরূপ ধারণা গড়ে উঠেছিল যে, বিন লাদেন নিজেকে মুসলিমবিশ্বে ঐতিহাসিকভাবে অপরিসীম তাৎপর্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হিসেবেই প্রমাণ করবেন। আমি জানতাম, বেশকিছু হাইপ্রোফাইলধারী পশ্চিমা সাংবাদিক তার সাথে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছিল যদিও তাদের মধ্যে খুব সামান্য সংখ্যকই সেই সুযোগ পেয়েছিল। আর আমাকে কিনা এই লোভনীয় সুযোগটি অফার করা হলো এবং তার ঘাঁটিতেই ভ্রমণের আমন্ত্রণ জানানো হলো! অতএব, এরূপ কোনো সুযোগকে আমি কোনোভাবেই হাতছাড়া করতে পারলাম না।

দুই সপ্তাহ পর একজন শ্মশ্রুধারী লোক আমার কানে কানে এসে বলল যে, সব আয়োজন সম্পন্ন করা হয়েছে। আমাকে আফগানিস্তান সীমান্তের পার্শ্ববর্তী পাকিস্তানের শহর পেশোয়ারে উড়াল দিতে হবে এবং সেখানে পৌঁছে হোটেল কন্টিনেন্টালে যাওয়ার পর ফয়সাল নামক একজনকে কল দিতে হবে, যার মোবাইল নম্বর আমাকে একটি কাগজে হিজিবিজি করে লিখে দেওয়া হয়েছিল। এটিই ছিল একমাত্র তথ্য যেটা অগ্রিমভাবে এই যাত্রা সম্পর্কে আমাকে দেওয়া হয়েছিল।

চূড়ান্ত সতর্কতা

শুরু থেকেই আমি জানতাম যে, আমি কোথায় যাচ্ছি, কী করছি সে সম্পর্কে আমি কাউকে কিছু বলতে পারব না। এরূপ তথ্য তাদের জন্য, আমার নিজের জন্য এবং সম্পূর্ণ মিশনের জন্যই বিপজ্জনক হবে। সৌভাগ্যক্রমে ঠিক সেই সময়ই, আল-জাজিরা কাতারের একটি টেলিভিশন টক-শোতে অংশগ্রহণের জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানায়। এটি সেই অঞ্চলে ভ্রমণের জন্য আমাকে একটি স্বাভাবিক কারণ সরবরাহ করে। কেবল আল-কুদসে আমার সহকারীই জানত প্রকৃতপক্ষে আমি কোথায় যাচ্ছি। এমনকি এ সম্পর্কে আমার স্ত্রী বা সন্তানদেরও কোনো ধারণা ছিল না। যখন সেই টক-শো শেষ হয়; আমি আমার কাতারের সহকর্মীদের জানাই যে, আমি একটি সংক্ষিপ্ত ছুটি যাপনের জন্য দুবাই যাচ্ছি। এর থেকে বেশি সত্য বলা আমার পক্ষে তখন সম্ভবপর ছিল না!

পেশোয়ার

পরের দিন বিকালের শেষলগ্নে আমি পেশোয়ারে অবতরণ করি। যখন আমি হোটেল পার্ল কন্টিনেন্টালে রিসিপশন ডেস্কে চেকিং-এর জন্য দাঁড়াই এবং নিজেকে খুবই চোরাগোপ্তা হিসেবে অনুভব করতে থাকি, তখনই আমি আমার নাম ধরে ডেকে ওঠা একটি পরিচিত সৌদি কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে ভীষণ চমকে উঠি। আমি পেছন ফিরে তাকানোর পর অনেক আগের পরিচিত একজন সৌদি আমার গালে

চুমু খায় এবং আমাকে অভিবাদন জানায়। অতি দ্রুতই যে সৌদি দলটির সাথে সে ছিল, তাদের প্রত্যেকেই আমার সাথে কোলাকুলি করে এবং প্রত্যেকেই আমার কাছে জানতে চায় যে পৃথিবীর অন্যান্য জায়গায় না গিয়ে আমি এই উদ্ভট জায়গায় কী করছি। বহু বছর ধরে সৌদি শাসনব্যবস্থার সমালোচক হবার পরও আমি সৌদিতে খুব বিখ্যাত কেউ ছিলাম না এবং তাই আমি খুবই ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম যে, যদি আমার থেকে সন্দেহজনক কিছু প্রকাশ পেয়ে যায়, তবে সৌদি নিরাপত্তা সংস্থাকে তারা সতর্ক করে দিতে পারে এবং তখন আমাকে ফলো করা হবে এবং আমার প্রকৃত উদ্দেশ্যও উন্মোচিত হয়ে যাবে।

সামান্য গল্পগুজবের পর আমি জানতে চাইলাম যে, তারা নিজেরাই বা পেশোয়ারে কী করছে। 'আমরা একটি প্রতিনিধিদলের অংশ হিসেবে এসেছি'—আমার অনাহূত সঙ্গী উত্তর দিলো। 'আমিও আফগানিস্তানে একটি তদন্ত অভিযানে আছি'—আমি কৃতজ্ঞচিত্তে এবং চটপটভাবে উত্তর দিলাম এবং আরও যোগ করলাম—'আমি আগামীকালই আমার তদন্ত-কার্য শুরু করব'। আমার অতিথি বলল, 'আবদুল বারি, তাদের উচিত ছিল তোমার বদলে অন্য কাউকে এখানে পাঠানো। এটি খুবই বিপজ্জনক জায়গা এবং এখানে নিরাপত্তার কোনো বালাই নেই'। এবং এরপর কয়েক ঘণ্টা যাবৎ তার কাহিনি বলে আমাকে ক্লান্ত করে দেওয়া (এটা লেখার জন্য আমি দুঃখিত যে, সে আমাকে বিরক্ত করে ছেড়েছিল) অব্যাহত রাখল। অবশেষে আমি মধ্যরাতের পর আমার রুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করতে সক্ষম হলাম এবং সেই ক্ষুদ্র কাগজের টুকরোর ভাঁজটি খুললাম, যেটাতে ফয়সালের নাম্বার লেখা ছিল। কল করতেই অপরপ্রান্ত থেকে আরও অধিকতর চাঁচাছোলা কণ্ঠে উত্তর এলো, 'আগামীকাল সকাল দশটায় তৈরি হয়ে থাকবেন। আর কিছু বলা সম্ভব নয়। ফোনে কথা বলা অনিরাপদ'।

সীমান্ত পারাপার

পরদিন সকাল দশটায় ফয়সাল আমার হোটেল রুমের দরজায় কড়া নাড়ে। সে ছিল শ্মশ্রুমণ্ডিত, মাঝারি গড়নের কালো চামড়ার যুবক এবং সে পাকিস্তানিদের মতোই পোষাক পরেছিল। সে খুব কম কথা বলেছিল কিন্তু আমার মনে হয়েছিল যে, আমি তার মধ্যে সৌদি উচ্চারণ ধরতে পেরেছিলাম। সম্ভবত জেদ্দা অথবা মক্কার টান, তবে আমার ভুলও হতে পারে।

যাত্রার সময় আমার পরিধানের জন্য ফয়সাল একটি আফগানি পোশাক নিয়ে এসেছিল। তার মধ্যে ছিল ঢিলেঢালা বস্তার মতো একটি ট্রাউজার, একটি লম্বা জামা এবং একটি পাগড়ি। সেই পাগড়িটি আমার মধ্যে একটি আত্মসচেতন অনুভূতির সৃষ্টি করেছিল, যদিও সেইরূপ কোনো পোশাক আমি আমার জীবনে

কখনোও পরিধান করিনি। সেই সময় পাকিস্তানের নিরাপত্তা সংস্থাসমূহ আরবদেরকে আফগানিস্তান প্রবেশে বাধা দিচ্ছিল এবং তখন ফয়সাল আমাকে আশ্বস্ত করেছিল যে, এই পোশাকে কোনো পশতু গোত্রীয় নেতা মনে করে আমাকে খুব সহজেই সীমানা পার হতে দেওয়া হবে। যদিও আমি তাতে পুরোপুরিভাবে আশ্বস্ত হইনি, তবুও আমি আমার পক্ষে যতদ্রুত সম্ভব সেগুলো পরিধান করে নিলাম। কিন্তু পাগড়িটির ক্ষেত্রে ব্যাপরটি খুব সহজ ছিল না; সেটি একটি জটিল পদ্ধতিতে মাথার চারপাশে পেঁচিয়ে বাঁধতে হয়। (লন্ডনে আমার বাসার ওয়্যারড্রবে সেই পোশাকগুলো এখনো আছে এবং যেকোনো আরমানি পোশাকের চেয়েও সেগুলো আমার বেশি পছন্দনীয়; কারণ সেগুলো সর্বদা আমাকে সেই অ্যাডভেঞ্চার এবং সেসব আফগান পর্বতমালার কথা মনে করিয়ে দেয়।)

পোশাক পরিধানের পর ফয়সাল আমাকে দ্রুতই আয়োজন সম্পর্কে জানিয়ে দেয়। দুজন তালেবান আমাকে পেশোয়ার এবং জালালাবাদের মধ্যবর্তী বর্ডার এবং নিরাপত্তা চৌকিগুলো চোরাইভাবে অতিক্রম করিয়ে দেবে এবং অন্য কয়েকজন আমাকে বিন লাদেনের নিকট প্রেরণের অভিযানকে কার্যকর করবে। তখন অবধি আমাকে কোনো ইঙ্গিতও দেওয়া হয়নি যে, কোথায় বিন লাদেনের সাথে সাক্ষাৎ করা হবে।

আমি ইতিপূর্বে ভালোভাবেই অবগত ছিলাম যে, যাত্রাটি অতিমাত্রায় ভয়ানক হবে। আমরা পর্বত-আচ্ছাদিত সীমান্ত অঞ্চল দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলাম, যেগুলো আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শনকারী যুদ্ধবাজ গোত্রসমূহই পুরোপুরিভাবে নিয়ন্ত্রণ করে এবং অপহরণ, ডাকাতি আর খুনই হচ্ছে যাদের দৈনন্দিন কাজ। আমি এটাও জানতাম যে, যদি পাকিস্তানি নিরাপত্তারক্ষীরা আমার সত্যিকারের আরব পরিচয়কে আবিষ্কার করতে পারে, তাহলেও আমি গুরুতর বিপদে পড়ব।

এসব ভীতির সংমিশ্রণে ফয়সাল আরও একটি অতিরিক্ত উপাদান যোগ করল—'নিয়মিত নিরাপত্তা চৌকি এড়ানোর জন্য আমরা যেসব রাস্তা দিয়ে এগোব, সেগুলোর বেশ কিছুতে স্থলমাইন থাকার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।' স্বাভাবিকভাবেই আমি মৃত্যুভয়ে কাঁচুমাচু হয়ে পড়ে রইলাম।

আমার সকল জিনিসপত্রই ফয়সাল আমাকে হোটেল রুমে রেখে যেতে বলেছিল এবং আমি আমার সাথে কোনো কিছুই নিতে পারিনি। ফয়সালের সাহচর্যে আমার নতুন পোশাকে আমি বাস স্টেশনে গেলাম এবং পূর্বের কথা মোতাবেক দুইজন তালেবানের সাথে সাক্ষাৎ হলো। তাদের চালচলন ছিল খুবই বিনয়ী এবং তাদের বয়স হয়তো বিশ বছরেরও কম হবে। তারা ছিল সম্পূর্ণ নিরস্ত্র, এমন একটি জায়গায় যেখানে শিশুরাও অস্ত্র বহন করে এবং এজন্য স্বভাবতই তারা

সম্মুখ বিপদ-আপদের মধ্যে খুব ভরসাজনক ও আস্থাভাজন সহচর ছিল না। ফয়সাল আমাদের রেখে চলে গেল এবং আমরা ছোট একটি টয়োটা পিকআপে আরও পনেরো জন যাত্রীসমেত গাদাগাদি করে বসলাম। অতঃপর ছোকরা ড্রাইভার তীক্ষ্ণ শব্দ তুলে ভয়াবহ গতিতে গাড়ি ছুটিয়ে দিলো।

আমার দুই তালেবান সঙ্গী তাদের নিজস্ব ভাষা ব্যতীত আরবি বা অন্য কোনো ভাষার একটি শব্দও উচ্চারণ করেনি। যেহেতু আমিও পশতু বলতে পারতাম না, তাই অঙ্গভঙ্গি এবং ইশারা-ইঙ্গিতের মাধ্যমেই শব্দহীন বাক্যালাপে আমাদের যোগাযোগ চালিয়ে যেতে হচ্ছিল। চেকপয়েন্টে এলে কখনো কখনো এ নিঃশব্দ কথোপকথনে যাত্রাবিরতি দিতে হতো। যতবারই আমরা নিরাপদভাবে কোনো পাকিস্তানি চেকপয়েন্ট অতিক্রম করতাম, ততবারই একটি তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠত আমাদের মুখে।

আমি লক্ষ করছিলাম, যখনই আমার পোশাক এবং পাগড়িতে তাদের নজর পড়ত, তারা তাদের উল্লাসকে লুকিয়ে রাখতে পারত না। আমার সন্দেহ হচ্ছিল তারা আমার ভ্রমণের উদ্দেশ্য জেনে গেল কি না অথবা আমাকে কোনো হিরোইন চোরাকারবারী বা অস্ত্র ব্যবসায়ী অথবা এমন একটি দেশে জিহাদে যোগ দিতে ইচ্ছুক কোনো কপর্দকহীন সহকর্মী বলে মনে করছে কি না, যেখানে জিহাদ কখনো শেষ হবে বলে মনে হচ্ছে না। যদিও আমার পোশাক আমার চারপাশের লোকদের সাথে মিল রেখেই নির্বাচন করা হয়েছে, তবুও আমার নিজেকে খুব বেমানান মনে হচ্ছিল। আমার সহযাত্রীরা আমার দিকে অদ্ভুতভাবে তাকাচ্ছিল এবং বেশ কয়েকবার আমি দেখতে পেলাম সহকারী ড্রাইভার গাড়ির আয়নায় আমাকে সন্দেহপূর্ণ চোখে অবলোকন করছে। অবশেষে আমি উপলব্ধি করলাম, এসবের কারণ হলো আমার পোশাকগুলো খুবই পরিচ্ছন্ন, ভাঁজহীন এবং স্পষ্টতই ব্র্যান্ড-নিউ ছিল। তরুণ ড্রাইভার বাতাসের সাথে পাল্লা দিয়ে গাড়ি চালাচ্ছিল এবং তার মরচে ধরা পুরোনো গাড়ি আঁকাবাঁকা পাহাড়ি রাস্তার কোনাগুলোতে ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ তুলে অগ্রসর হচ্ছিল।

পাকিস্তানে তখন জরুরি অবস্থা বিরাজ করছিল এবং নিরাপত্তা বাহিনী খুবই তৎপর ছিল। বহু সংখ্যক রোডব্লকে আমাদের থামতে হয়েছিল; কিন্তু সবগুলোই আমরা নিরাপদে অতিক্রম করেছিলাম এবং কোনো লুটেরা উপজাতীর খপ্পরেও আমাদের পড়তে হয়নি। অবিশ্বাস্য সৌভাগ্যের সাথে আমরা কোনো অযাচিত ঘটনার সম্মুখীন হওয়া ছাড়াই 'খাইবার পাস' এসে পৌঁছুলাম। সেখানে বর্ডার ক্রসিংটি ছিল দুই পর্বতের মধ্যবর্তী দশ মিটারেরও কম প্রশস্ত একটি পথ।

আমাদের গাড়ি থেকে নামতে হলো এবং রাস্তায় সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকা পাকিস্তানি সেনা এবং গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের সামনে দিয়ে হেঁটে যেতে হলো। তারা

প্রত্যেককেই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল; কিন্তু কেবল তাদেরকেই থামাচ্ছিল যারা লাগেজ বা অন্যকোনো সন্দেহজনক জিনিস বহন করছিল। যেহেতু আমিই কেবল ক্যামেরা এবং একটি টেপ রেকর্ডার সম্বলিত একটি ছোট ব্যাগ বহন করছিলাম, তাই কোনোপ্রকার প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়া ছাড়াই আমরা পার হয়ে গেলাম। এটা সম্ভবত এই কারণেও যে, পাকিস্তানের সাথে তালেবানদের সুসম্পর্ক ছিল; বিশেষ করে পাকিস্তানি আর্মিদের সাথে এবং তাই আমার দুই সঙ্গীই ছিল যেকোনো ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্ট থেকেও বেশি আস্থাজনক পরিচয়পত্র।

অতঃপর সেই সরু পথ ধরে আধা কিলোমিটার হাঁটার পর আমরা বর্ডার ক্রসিংয়ের আফগান সাইডে এসে উপস্থিত হলাম। সেটিকে চিহ্নিত করছিল একটি লাঠি থেকে ঝুলানো ধুলোতে সাদা হয়ে যাওয়া একটি ছিন্ন কাপড়ের টুকরো, যেটি চোখে পড়ার মতো তেমন কিছুই ছিল না। এই অভ্যর্থনা পতাকার পাশেই পাগড়ি পরিহিত এবং শ্মশ্রুমণ্ডিত দানব আকারের একটি মানুষ বসেছিল। সে কারও সাথেই কথা বলছিল না এবং তার হাবভাব এমন ছিল যে, কোনো কিছুই তার পাত্তা পাবার যোগ্য নয়। আমরা পুনরায় গাড়িতে চড়লাম এবং সামান্য সময় পরেই একটি কবরস্থানের সামনে দিয়ে অতিক্রম করলাম, যেখানকার প্রবেশদ্বারে বৃত্তাকারভাবে বিশ থেকে ত্রিশটি লাল এবং সবুজ ইসলামিক ও আরব পতাকা পতপত করে উড়ছিল। কেউ একজন ব্যাখ্যা করে বলেছিল যে, সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে জিহাদে শরিক হওয়া বেশকিছু আরব মুজাহিদকে এখানে সমাহিত করা হয়েছে। আমি ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বললাম এবং আমরা কিছুক্ষণ সেসব কবরের মাঝে হেঁটে হেঁটে তাদের নামের পাঠোদ্ধার করে কোরআনের আয়াত তেলাওয়াত করলাম। সেখানে ইয়েমেন, সৌদি আরব, মিশর এবং অন্যান্য আরব দেশের যোদ্ধারা ছিল এবং যে লড়াইয়ে তারা শহিদ হয়েছিল সেগুলোর নাম তাদের প্রত্যেকের কবরের ফলকে খোদাই করা ছিল। এটি ছিল একটি বড় সাক্ষী যে, কীভাবে এই জিহাদ সমগ্র মুসলিমবিশ্বের জনগোষ্ঠীকে একত্রিত করেছিল।

অতঃপর আমরা একটি ছোট শহরতলীর বাজারে এসে পৌঁছুলাম। রাস্তার পাশের একটি রেস্তোরাঁ দেখিয়ে আমার দুই সঙ্গী তাদের মুখের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে আমাকে বুঝাতে চাইল যে, তারা এখন মধ্যাহ্নভোজ করবে। ইতিমধ্যে আড়াইটা বেজে গিয়েছিল এবং আমি অনুভব করলাম, আমিও ভয়ানকভাবে ক্ষুধার্ত; অতএব আমি ব্যাপকভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে তাদের সাথে সম্মত হলাম।

উক্ত রেস্তোরাঁর টেবিলগুলো সরাসরি পাহাড় থেকে কেটে আনা গাছের ডালপালা দিয়ে তৈরি ছিল এবং টেবিলের উপরিভাগে বিবর্ণ মরচেপড়া টিন লাগানো ছিল। খাবার হিসেবে এলো নামপরিচয়হীন সুরুয়া বিশেষ, যার উপরিভাগে তেলের একটি পুরু আস্তরণ ভাসছিল এবং সেখানে এক টুকরো

মাংসও ছিল, আল্লাহই ভালো জানেন কোথা থেকে এটি এলো। আরও ছিল একটি ধাতব পিরিচে আধ পিস আলু, কয়েক টুকরা পাউরুটি এবং তিনটি ধাতব গ্লাসে পানি। এসব পরিবেশনের পরই সেই ভোজ পরিপূর্ণ হয়েছিল।

আমার দুই সঙ্গী সেই খাবার গলাধঃকরণ করে বেশকিছু ঢেকুর তুলল এবং এরূপ নেয়ামতের জন্য বারংবার আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল। অতঃপর আমরা নিকটস্থ একটি মসজিদে নামাজের জন্য রওনা হলাম। আমি মসজিদের ইমামের সামান্য কিছু পড়াই বুঝতে পেরেছিলাম, কিন্তু বেশিরভাগই আমার বোধগম্যতার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে ছিল।

তখনও আমার কোনো ধারণাই ছিল না যে, আমরা কোথায় আছি, আফগানিস্তান নাকি অন্যত্র। তবে সেই সীমান্তবর্তী শহরতলীতে একটি বাস স্টেশনও ছিল, যেখানে আমার দুই সঙ্গী আমাকে নিয়ে এলো। তালেবানে তাদের অন্তর্ভুক্তির গুণবলে এবং হয়তো তাদের নিজ দেশ বিধায় তারা আমাকে ড্রাইভারের ঠিক পরের সারিতে বসার অনুরোধ করল, যেটাকে বলা যেতে পারে ফার্স্টক্লাস। সৌজন্যতাবশত এবং সম্মান-প্রদর্শনপূর্বক তারা পেছনের সিটে গিয়ে বসল, যেটাকে বলা যেতে পারে সেকেন্ডক্লাস; অন্তত আমার দৃষ্টিতে সেরূপই মনে হয়েছিল।

পাকিস্তান বর্ডার থেকে জালালাবাদ যেতে সর্বোচ্চ চার ঘণ্টা সময় লাগা উচিত। কিন্তু সেখানে এটি উল্লেখযোগ্যভাবে নির্ভর করে গাড়ি ও তার ড্রাইভারের মর্জি এবং যাত্রীদের সহযোগিতার ওপর। আমাদের গাড়িটি ছিল প্রাচীন কলকব্জাবিশিষ্ট, যেটি আফগান জিহাদকে উতরে যেতে সক্ষম হয়েছে এবং খুব সম্ভবত সেই জিহাদে হয়তো কোনো-না-কোনোভাবে অংশগ্রহণও করেছিল। যাত্রাপথে আমাদের তিনবার গাড়ি থেকে নামতে হয়েছিল। দুইবার গাড়ির চাকা ফেটে গিয়েছিল কিন্তু তৃতীয়বারে গাড়ির চাকা একেবারে গভীর কাদার মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে যায়। যখন এটি পরিষ্কার বুঝা গেল যে, ড্রাইভার যতই তার ইঞ্জিনকে তর্জন-গর্জন করাক না কেন, গাড়ি এক ইঞ্চিও নড়বে না, তখন যাত্রীদের কাঁধ এবং পেশিশক্তি ইঞ্জিনকে অতিরিক্ত শক্তির জোগান দিতে ব্যয় হলো।

পাকিস্তানের গাড়িগুলো লেফটহ্যান্ড ড্রাইভ এবং তারা সামান্য কয়েকটি দেশের একটি, যারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এই উত্তরাধিকার বহন করে চলেছে তাদের স্বাধীনতা অর্জনের পরও। আফগানিস্তানে ট্রাফিক চলাচল একটি প্রহেলিকা বা রহস্য। এটি পুরোপুরিভাবে নির্ভর করে ড্রাইভারের মেজাজ এবং রাস্তার খানা-খন্দকের ওপর। সুনিপুণ সাপের মতো কোনো গাড়িকে একবার ডানে আরেকবার বামে যেতে হয় সেসব গর্তকে এড়ানোর জন্য, যেগুলো বোমা, ট্রাক্টর, লরি বা অন্যান্য ঘর্ষণজনিত কারণে বা এগুলোর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তৈরি হয়েছে।

তালেবানের অধীনে আফগানিস্তান

ঘাড় এবং পিঠের তীব্র ব্যথা নিয়ে কিন্তু নিরাপদভাবেই আমি জালালাবাদ এসে পৌঁছুলাম। আমার দুই সঙ্গী আমাকে ভ্রমণ পথের পরবর্তী ঠিকানায় নিয়ে এলো এবং নিশ্চিতভাবেই সম্মুখে তাদের আরও পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিকল্পনা রয়েছে। তারা তাদের চালান অর্থাৎ আমাকে জালালাবাদ অঞ্চলের একটি সেইফ হাউজে ন্যাস্ত করে প্রস্থান করল। তারপর আমি কখনোই আর তাদেরকে দেখতে পাইনি।

আমাকে চা আপ্যায়ন করা হলো এবং সেই বাড়ির মালিকের সাথে কথা বলতে বলতে বসার সময় আমাকে জানানো হলো যে, কম্পিউটারের সামনে গাদাগাদি করে বসে যে দুটি বালক 'নিনটেনডো' গেম খেলছে, তারা হলো বিন লাদেনের ছেলে সা'দ এবং মুহাম্মাদ। আমি তখন শহরের সামান্য কয়েকটি হোটেলের একটিতে আবির্ভূত হয়েছিলাম। 'এভার হোয়াইট মাউন্টেইন' নামক বিখ্যাত নামটি ছিল অতিত গৌরবের একটি ধ্বংসাবশেষ। এটি লজ্জাজনকভাবে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল যে, আফগানিস্তানও একদা অধিষ্ঠিত এবং স্থিতিশীলই ছিল। কমলা গাছ ও গোলাপ ফুলের বাগান দিয়ে ঘেরা এবং খুবই স্থানবহুল হওয়া সত্ত্বেও দুজন ব্রিটিশ টেলিভিশন জার্নালিস্ট ছাড়া হোটেলটি সম্পূর্ণ খালিই ছিল। তারা এবং আমি একসাথে ডিনার করি এবং এইবার ডিনারে গরু এবং মুরগির মাংসের সুরুয়ার সাথে সাথে ভাত এবং রুটি উভয়ই ছিল।

হোটেলটির মালিক ছিল কাবুলি। সে খুবই অনুসন্ধিৎসু ছিল এবং লোকের হাঁড়ির খবর রাখতে চাইত। বোমাবর্ষণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সে জালালাবাদে হঠাৎ করেই আগমন করে এবং সেই হোটেলটি কিনে নেয় অথবা সম্ভবত জব্দ করে নেয়। আমার পরিচ্ছদের কারণে সে ভেবেছিল আমি কোনো পশতুন আফগান। কিন্তু যখনই আমি তাকে ইংরেজিতে উত্তর দিলাম, তখন সে খুবই সন্দেহপ্রবণ আর কৌতূহলী হয়ে উঠল। আমি আফগানিস্তানে কি করছি সেটা নিয়ে সে বিরামহীন প্রশ্ন করে যেতে লাগল। আমি চালাকি করে তাকে বিশ্বাস করাতে সক্ষম হয়েছিলাম যে, আমার বাবা ছিল পশতুন কিন্তু মা ছিল ইংরেজ। কিন্তু তখনই সে প্রশ্ন করে বসল, তাহলে আমি কেন পশতু বলতে পারি না। তখন আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে দাবি করলাম, 'আমি যখন ছোট ছিলাম তখনই আমার বাবা মারা গিয়েছিলেন এবং আমার মা—যিনি একটি পশতু শব্দও জানতেন না—আমাকে বড় করে তুলেছিলেন।' আমার প্রকৃত উদ্দেশ্য গোপন করার জন্য আমার এরূপ কপটচারী হওয়া অত্যাবশ্যক ছিল। এবং তা ছাড়াও হোটেল মালিকের বিরামহীন জিজ্ঞাসাবাদ ছিল প্রচণ্ড বিরক্তিকর। যখন সে অবশেষে আমাকে প্রশ্ন করায় ক্ষান্ত দিয়েছিল এবং আফগানিস্তানের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ আরম্ভ করেছিল, তখন আমি খুবই খুশি হয়েছিলাম।

আমার কাছে মনে হয়েছিল সে হয়তো-বা নাজিবুল্লাহর সমর্থক ছিল (সাবেক সোভিয়েতপন্থি আফগান প্রেসিডেন্ট, যাকে ১৯৯২ সালে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়)। কারণ সে প্রবল উৎসাহে তার এবং তার নেতৃত্বের গুণাবলির বর্ণনা দিচ্ছিল। অপর দিকে আবার তালেবানের প্রশংসাও করেছিল প্রকৃতই অথবা কেবল ঝামেলা এড়ানোর জন্য এবং তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য। সে স্বীকার করে যে, তালেবানের শাসনই এই শহরে নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে, যেটি অতি সাম্প্রতিক সময়েও রাস্তার চোর-ডাকাত-বাটপারদের কুক্ষিগত ছিল। এর দ্বারা সে যুদ্ধবাজ নেতাদেরকেই ইঙ্গিত করেছিল, যাদের ভাড়াটে গুন্ডারা সকল জিনিস থেকেই ট্যাক্স আদায় করত। সময়ে সময়ে তাদের কেউ কেউ সুযোগ পেলেই ধর্ষণের মতো অপরাধেও লিপ্ত হতো, যেটা আফগান সমাজে ঘটা সম্ভব সর্বাধিক নিকৃষ্ট অপরাধ বলে বিবেচিত।

আমাদের ডিনারের সামান্য পরেই বিদ্যুৎ চলে গেল। তখন আমরা মোমবাতির আলোয় হাতড়ে হাতড়ে আমাদের সুসজ্জিত কামরায় পৌঁছুলাম। যখন আমি হোটেল মালিককে জিজ্ঞেস করেছিলাম কখন বিদ্যুৎ আসতে পারে, তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, সাত মিনিট পরও আসতে পারে আবার সাত ঘণ্টা পরও আসতে পারে। কেবল আল্লাহ এবং তালেবানরাই সঠিক বলতে পারবে। পরের দিন বিকালে যখন আমি হোটেল ত্যাগ করি, তখনও অবধি সেখানে বিদ্যুৎ আসেনি এবং আমার সন্দেহ হয়, আজও সেখানে বিদ্যুৎ এসেছে কি না।

এভার হোয়াইট মাউন্টেইনে আমার সেই রাত্রিযাপন ছিল পুরোদস্তুর একটি নির্যাতন। কারণ সেখানকার কীটপতঙ্গগুলো আমার সাথে বিছানা ভাগাভাগি করে নেওয়ার কারণে সেখানে ঘুমানো পুরোপুরি অসম্ভব ছিল। আবার সেসব ছারপোকা এবং মাছির কোনো কোনোটি মারাত্মক বিষাক্ত জাতের ছিল।

শুক্রবার সকালে হোটেল এভার হোয়াইট মাউন্টেইনে বিন লাদেনের দূতের আগমন ঘটল। তিনি আমাকে অবগত করলেন এবং ক্ষমা চাইলেন যে, শাইখ সেইদিনও সাক্ষাৎ করতে পারবেন না—অতএব আমাকে অপেক্ষা করতে হবে। আমি তাকে জানালাম যে, আমি খুব তাড়ার মধ্যে আছি এবং এই সোমবারই আমার লন্ডনের অফিসে উপস্থিত হওয়ার জন্য আমি অঙ্গীকারাবদ্ধ। তিনি সেটি বুঝেছিলেন বলে মনে হয়েছিল। তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, তিনি তার সর্বাধিক চেষ্টাই করবেন। সেই দূত ছিলেন প্রকৃতপক্ষে মিশরীয় নাগরিক আবু হাফস আল-মাসরি, যিনি মুহাম্মাদ আতেফ নামেও পরিচিত। তিনি সেই সময়ে আল-কায়েদার মিলিটারি অপারেশনের প্রধান ছিলেন। যদিও আমার সেই সময়ে তার সম্পর্কে কোনো ধারণাই ছিল না এবং তাকে দেখেও আমি সেরূপ জ্ঞান করিনি। এ ছাড়াও তিনি ছিলেন লম্বা এবং পাতলা, সবুজ চোখের অধিকারী, কালো চামড়া,

শ্মশ্রুমণ্ডিত এবং যৌবন ও প্রাণশক্তিতে পরিপূর্ণ, সমীহ উদ্রেককারী এক চেহারার অধিকারী। তিনি ছিলেন অতিশয় নম্র এবং অত্যধিক মৌলবাদী। তার আন্তরিকতা এবং তার গভীর বিশ্বাসকে আমি শ্রদ্ধা না করে পারিনি। আমার মনে হয় তার প্রতি আমার শ্রদ্ধাকে তিনিও উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

তখন আবু হাফস আমাকে ইসলামাবাদের মিশরীয় দূতাবাসে ১৯৯৫ সালের হামলার ঘটনা শুনিয়েছিলেন। তিনি বলেন, 'সেটি ছিল দূতাবাসে আমাদের ভাইদের ওপর মিশরীয় সিক্রেট এজেন্টদের করা যৌন নিপীড়ন এবং শারীরিক অত্যাচারের বদলাস্বরূপ একটি প্রতিশোধ।' এসব কারণে সেটিকে তারা ধ্বংস করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তারা কৌশল মোতাবেক একটি ছোট গাড়ির সাহায্যে গেট ভেঙে ফেলেন এবং তারপর ১৫০০ কেজি বিস্ফোরকভরতি একটি ট্রাক পাঠিয়ে দূতাবাসটি গুঁড়িয়ে দিয়েছিলেন। যখন একই কৌশলে ১৯৯৮ সালে নাইরোবি এবং দারুস-সালামের আমেরিকান দূতাবাসে হামলা করা হয়েছিল, তখনই আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, এটি আবু হাফসেরই কাজ। (সর্বশেষ আমি তার সাথে কথা বলেছিলাম ২০০১ সালের নভেম্বর মাসে তোরাবোরায় আমেরিকার বোমা বর্ষণের পর। তিনি আমাকে টেলিফোন করে একটি বার্তা সম্প্রচারের জন্য বলেছিলেন, যেটি কেবল আমরাই সম্প্রচার করেছিলাম। তিনি তখন জানিয়েছিলেন, 'ওসামা বিন লাদেন নিরাপদেই আছেন, পাঁচজন আরব মুজাহিদ শহিদ হয়েছেন এবং শাইখ বিন লাদেন আমেরিকার ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার কসম করেছেন।' এই ঘটনার কিছুদিন পরই কাবুলে একটি আমেরিকান মিসাইল হামলায় তার মৃত্যু হয়।)

দুপুর তিনটায় হোটেলের সামনে একটি লাল গাড়ি এসে থামল। তাতে ছিল একজন ড্রাইভার, দুজন সশস্ত্র ব্যক্তি এবং আরও একজন লোক, যাকে আমি এর পূর্বে কখনো দেখিনি। সেই লোকটিই আমাকে বলেছিল যে, আমরা শাইখের সাথে দেখা করতে যাচ্ছি এবং আমাকে অবগত করা হয়েছিল যে, যাত্রাটি খুবই কষ্টসাধ্য, ক্লান্তিকর এবং বিপজ্জনক হতে পারে। যেখানে বিন লাদেনের ইমারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা এমনিতেই একটি দুরূহ ব্যাপার, তার ওপর আবার এই সাবধানবাণী! রাস্তাটি ছিল কাঁচা এবং এটি চলছিল পাহাড় এবং উপত্যকাময় গ্রামাঞ্চলের মধ্য দিয়ে। এসব গ্রামগুলি একটি অপরটির সাথে ভীতিকর আঁকাবাঁকা রাস্তার মাধ্যমে সংযুক্ত ছিল। এটা আমার দুর্ভাগ্য ছিল যে, আমাদের এই রাস্তা পাড়ি দিতে হচ্ছে সূর্য ডোবার পর অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে। আমার মনে হচ্ছিল আমরা অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি দিচ্ছি এমন এক গাড়িতে, যার চালক ছিল মৃত্যুপাগল ধরনের। সে যেন এই মোহে আবিষ্ট ছিল যে, সে কোনো আঁকাবাঁকাহীন রাজপথে গাড়ি চালাচ্ছে। সময়ে সময়ে সে তার অ্যাক্রোবেটিক দক্ষতা প্রদর্শন করার লোভ সামলাতে পারছিল না এবং

গাড়িটি একবার এদিক আরেকবার ওদিক ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দে দোলাচ্ছিল। অর্ধেক পথ যাওয়ার পর আমাদের থামতে হলো; কারণ একটি বিশাল আকৃতির পাথর সে রাস্তাটা বন্ধ করে দিয়েছিল। ড্রাইভার মহাশয় উচ্ছ্বাসের সাথে ঘোষণা করল, সম্প্রতিই এটি পাহাড় গড়িয়ে রাস্তায় পড়েছে। আমার আত্মা উড়ে গেল এবং আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম এটি কোনো স্বাভাবিক ব্যাপার কি না। সে আরও উচ্ছ্বাসের সাথে ঘোষণা করল যে, এটি খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার এবং সামনে এরূপ আরও ঘটতে পারে। কারণ এখন শীতকাল এবং মাটি খুবই ঝরঝরে। তারপর সে তার বন্ধু আবু উবাইদার ঘটনা শুনাতে লাগল, যে কয়েকদিন পূর্বে এই রাস্তাতেই মারা গিয়েছে। সেই ঘটনায় পাহাড় থেকে একটি পাথর গড়িয়ে তার গাড়িতে আঘাত করে এবং তাকে পিষ্ট করে দেয়। তখন আমি একটি গভীর শ্বাস নিয়ে অন্ধকারাবৃত পর্বতমালার প্রতি দৃষ্টিপাত করলাম এবং সুরা ফাতিহা তেলাওয়াত আরম্ভ করলাম।

এরপর সাত ঘণ্টা নিদারুণ যন্ত্রণা ও নুড়ি পাথরের সাথে কুস্তি লড়ে এবং বিপৎসংকুল পর্বত পাড়ি দেওয়ার পর আমরা পূর্বের চেয়ে ভিন্ন রকমের আরেকটি বাধার সম্মুখীন হলাম। সেটি ছিল ভয়ংকরদেহী সশস্ত্র একটি তালেবান দল, যাদের দেখে শুনে সুনিশ্চিতভাবে বোঝার উপায় ছিল না যে, তারা আমাদেরকে বন্ধু নাকি শত্রু হিসাবে গণ্য করবে। যখন আমরা গাড়িতে করে তাদের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে সামনে এগুচ্ছিলাম, তখন আমি আমার পাকস্থলীর মোচড় অনুভব করছিলাম। কিন্তু আমার এরূপ তটস্থ হওয়ার কোনোই প্রয়োজন ছিল না। কারণ তারা কেউই আমাদের দিকে দ্বিতীয়বার তাকায়নি এবং তারা আমাদের কাছ থেকে কোনো পরিচয়, আমরা সেখানে কি করছি বা কোথায় যাচ্ছি সে সম্পর্কেও কিছু জানতে চায়নি। তারা কেবলই আমাদের সামনে অগ্রসর হওয়ার জন্য পথ করে দিয়েছিল। সত্যি বলতে আমি আমার সম্পূর্ণ ভ্রমণে একবারের জন্যও তল্লাশি বা প্রশ্নের মুখোমুখি হইনি। অথচ আমি এর বিপরীত আশা করছিলাম; যেহেতু সমগ্র বিশ্বই তখন বিন লাদেনকে খুঁজছিল। যে কয়েকজন সাংবাদিককে বিন লাদেনের সাক্ষাৎকার নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল তাদের মতো আমাকে চোখ বেঁধে নেওয়া হয়নি। আমি এটাকে একটি লক্ষণ হিসেবে নিয়েছিলাম যে, বিন লাদেন হয়তো আমাকে তার বিশ্বস্ত এবং আস্থাভাজন হিসেবেই গণ্য করছেন। অচিরেই গাড়িটির যোগাযোগ যন্ত্র বিপ বিপ করে উঠল। আমার সঙ্গী সম্মুখে একটি বার্তা পাঠাল যে, 'আমরা নিকটবর্তী'। তৎক্ষণাৎ একটি গাড়ি আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। সেটা সশস্ত্র লোকজনে পরিপূর্ণ ছিল এবং গাড়িটির ছাদ একটি আরপিজি লাঞ্চার এবং মেশিনগান দিয়ে সজ্জিত ছিল। প্রকৃতপক্ষে সেটিই ছিল আমার এই যাত্রার মূল গন্তব্যের প্রতীক।

তোরাবোরার ঈগলের নীড়ে

আমরা অবশেষে ঈগলের নীড়ে উপস্থিত হলাম। তোরাবোরার আরব-আফগান ঘাঁটি এই নামেই পরিচিত ছিল (আরব-আফগান সেসব মুজাহিদদেরই বলা হয়, যারা বিভিন্ন আরব দেশ থেকে দলে দলে আফগানিস্তানে এসে ভিড় জমায় এবং প্রথমে সোভিয়েত তারপর আমেরিকান আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করে। তারাই পরবর্তী কালে আল-কায়েদার মূল ভিত্তি গড়ে তোলে।) আমরা তখন সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে তিন হাজার ফুট ওপরে ছিলাম এবং গাড়ির হেডলাইটে আমি তুষার আচ্ছাদিত পর্বতপার্শ্বে মানুষের খননকৃত অনেকগুলো গুহা দেখতে পেয়েছিলাম। আমি অস্পষ্টভাবে দেখতে পেয়েছিলাম, সশস্ত্র মুজাহিদদের ছোট ছোট দল এখানে সেখানে ঘোরাফেরা করছিল। আমি আমার যাত্রার বেশিরভাগ সময়ই আতঙ্কিত অবস্থার মধ্যে কাটিয়েছি। কিন্তু বিন লাদেনের গুপ্ত ডেরায় পৌঁছুনোর পর আমি অনেকটাই পরিত্রাণের মত অনুভূতি—বরং নিরাপত্তা অনুভব করতে লাগলাম। (আমার কখনোই মনে হয়নি বিন লাদেন বা তার লোকদের থেকে ভীতিকর কিছু ঘটতে পারে।)

একটি গুহার প্রবেশ পথের সামনে এসে গাড়িটি থামল। ভেতর থেকে মৃদু আলো আসছিল। যখনই আমি গাড়ি থেকে নামলাম, খুবই ঠান্ডা বাতাস এসে আমার মুখে আঘাত হানল এবং আমার পাগড়িটিকে উড়িয়ে নিতে চাইল। অন্ধকারে কোন কিছু দেখতে না পেয়ে আমি দ্রুত সেই গুহার দিকে রওনা দিলাম এবং একাকী সেটাতে প্রবেশ করলাম। আমার সাথে সাক্ষাতের জন্য সেখানে একজন লোক দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে চিনতে পেরে আমি পুরোপুরিভাবে বিস্মিত হয়েছিলাম; কারণ তিনি ছিলেন একজন সিরিয়ান লেখক, যাকে আমি লন্ডন থাকতেই খুব ভালোভাবে চিনতাম। তার নাম ছিল ওমর আবদুল হাকিম, তবে তিনি আবু মুসআব আল-সুরি নামেই অধিক পরিচিত ছিলেন। তিনি জিহাদ ও ইসলাম বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। আমরা কিছুক্ষণ কথা বললাম এবং আমি জানতে পারলাম যে, তিনি আল-কায়েদায় যোগদানের জন্য স্পেন ছেড়ে চলে এসেছেন, যেখানে তার নাগরিকত্ব এবং স্ত্রীও ছিল। পরবর্তী সময়ে তিনি তালেবানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মোল্লা ওমরের মিডিয়া উপদেষ্টা হয়ে ওঠেন। আরেকটি গুহার পথ দেখিয়ে তিনি আমাকে বললেন 'এদিকে আসুন, আপনার জন্য শাইখ অপেক্ষা করছেন।'

অবশেষে আমি ২৩ নভেম্বর মধ্যরাতের কিছু পূর্বে ওসামা বিন লাদেনের সাথে সাক্ষাৎ করি। তিনি কোলের ওপর একটি কালাশনিকভ নিয়ে কার্পেটের ওপর আসন কেটে বসে ছিলেন। সেখানে আরও অনেকেই উপস্থিত ছিল, কিন্তু তাকে দেখেই আমি সহসা অসাড় হয়ে গিয়েছিলাম। সংবাদমাধ্যমে পরিচিত কাউকে

সামনাসামনি দেখা সর্বদাই অপরূপ; তবে সেটি আরও প্রকট হতে বাধ্য যদি তিনি এমন কেউ হন, যাকে বিশ্বব্যাপী গোয়েন্দা সংস্থাগুলো হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

বিন লাদেন তার রাইফেলটি মাটিতে রেখে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি প্রাণবন্ত হাসিমুখে আমার দিকে এগিয়ে এলেন; কিন্তু আমার পোশাকের বাহার দেখে তার সেই হাসিটি সহসাই অট্টহাসিতে রূপান্তরিত হলো। তিনি আমাকে উষ্ণভাবে জড়িয়ে ধরলেন এবং আমার যাত্রা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন আমার নিজেকে একজন সম্ভ্রান্ত অতিথি হিসেবে মনে হচ্ছিল এবং প্রকৃতপক্ষেই আমাকে সর্বাধিক সম্মানের সাথে অভ্যর্থনা জানানো হয়েছিল। বিন লাদেন বললেন যে, তিনি আশা করছেন আমি খুব ক্লান্ত নই এবং জানালেন, আমরা সামান্য পরেই একসাথে ডিনার করব। তিনি আমাকে একটি বেঞ্চিতে বসতে ইঙ্গিত করেন। সেটিকে পর্বতমালার ওক গাছের ডালপালা থেকে বানানো হয়েছে এবং পেরেক দিয়ে নিচে আটকে রাখা হয়েছে। পাতলা একটি গদি দিয়ে সেটিকে আচ্ছাদিতও করা হয়েছিল।

আমার স্বাচ্ছন্দ্য এবং শান্তিবিধানের জন্য বিন লাদেন প্রচেষ্টা করছিলেন এবং যেকোনোভাবেই হোক তাকে আমার খুবই পরিচিত বলে মনে হচ্ছিল; সম্ভবত সেটিই ছিল তার ক্যারিশম্যাটিক সত্তা। তিনি অনাড়ম্বরভাবে এবং অনেকটা ঘরোয়াভাবেই গালগল্প করছিলেন এবং আমাকে জানিয়েছিলেন যে, তোরাবোরা তার নিকট খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। সোভিয়েত বিরোধী জিহাদের সময় তিনি এটাকে প্রধান ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন এবং বর্তমানে এটাকে অবকাশ যাপন ও চিন্তা এবং পরিকল্পনার কাজে ব্যবহার করছেন।

যারপরনাই বিলাসিতায় অভ্যস্ত অন্যতম ধনাঢ্য আরব পরিবারের সন্তান ওসামা বিন লাদেনকে এরূপ একটি গা হিম করা এবং নিচুমানের গুহায় দেখতে পেয়ে আমি খুবই আশ্চর্য হয়ে পড়েছিলাম। এমনকি যখন আমার কাছে এটা পরিষ্কার হয় যে তার ঘাঁটি পর্বতের কোন উঁচু স্থানেই হবে, তবুও আমি কখনই তাকে এরূপ কোন জায়গায় আশা করিনি। কমপক্ষে পরিমিত স্থান সংকুলান সমৃদ্ধ কোন গৃহে আশা করেছিলাম। কিন্তু বিন লাদেন আমাকে জানালেন যে, তিনি ধনসম্পত্তির আকাঙ্ক্ষা করেন না। তার অন্যান্য ভাইদের বিপরীতে তিনি সর্বদাই বিনীত জীবনযাপন করেছেন।

আমি তাকে তীব্র শীত সম্পর্কে অভিযোগ করতেই তিনি আমাকে বললেন যে, আমি আসলে খুব ভাগ্যবান যে এখন শীতকাল। যখন রবার্ট ফিস্ক তার সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য এসেছিল, তখন ছিল গ্রীষ্মকাল এবং সেই জায়গাটি কাঁকড়া-বিছে দিয়ে পরিপূর্ণ ছিল। গুহার সেই রুমটি সম্ভবত ছয় বর্গমিটার ছিল। রুমটির প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল তাফসির এবং ইসলামি ইতিহাসের বইয়ে সমৃদ্ধ একটি বিশাল

লাইব্রেরি। রুমের বাকি দেয়ালজুড়ে কালাশনিকভ রাইফেল বিভিন্ন খিল থেকে ঝুলানো ছিল।

আমি তখন সরাসরি নিজ চোখে দেখতে পেয়েছিলাম যে, ওসামা বিন লাদেন ছিলেন পাতলা গড়নের, দীর্ঘদেহী এবং তিনি কোন দৃশ্যমান শারীরিক দুর্বলতা থেকে মুক্ত ছিলেন। তিনি তার দাড়িকে লম্বা হবার জন্য ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং আফগানি পোশাক পরিধান করেছিলেন। শীত থেকে বাঁচার জন্য তিনি একটি তুলাভরতি কমব্যাট জাকেট পড়েছিলেন যেগুলো সাধারণত স্পেশাল কমান্ডো সদস্যরা পড়ে থাকে। তিনি বারবার সেটিকে একটি আফগানি চাদর দিয়ে আবৃত করে দিচ্ছিলেন। তিনি হয়তো সাদা পাগড়ি পরিধান করতেন বা পাতলা চাদর দিয়ে মাথা ঢেকে রাখতেন।

আমি আবিষ্কার করলাম বিন লাদেনের ব্যবহার ছিল অত্যধিক নম্র এবং তার সাথে দুই দিন কাটিয়েই আমি বুঝে ফেলেছিলাম যে, তার সঙ্গলাভ করা আসলেই খুব সৌভাগ্যের ব্যাপার। তার গলার স্বর ছিল অনুচ্চ কিন্তু সুস্পষ্ট। তিনি ভরসা জাগানিয়া শৈলীতে অবিরাম হাসতেন যেটা তার এবং অতিথির মধ্যকার দূরত্বকে কমিয়ে দিত; বিশেষ করে এমন ক্ষেত্রে এটা আরও সত্য যদি কেউ তার সাথে প্রথম সাক্ষাৎ করে। আমাদের প্রারম্ভিক আলাপচারিতার সময়ই আমি আমার যাত্রার অসুবিধাগুলো যেমন আমার পিঠ, ঘাড় এবং পেট ব্যথার অভিযোগ করতে শুরু করেছিলাম। কিন্তু তখন তিনি হাসতে শুরু করলেন এবং বললেন যে, তিনি প্রকৃতপক্ষে অন্য আরেকটি ঘাঁটিতে থাকেন যেটা আরও অনেক উঁচুতে অবস্থিত। কিন্তু আমার আরামের জন্যই তিনি অর্ধেক পথে নেমে এসে আমার সাথে সাক্ষাতের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তখন সাথে সাথেই আমি তার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম।

আচমকাই বাইরে ব্যাপক জোরালো চিৎকার শুরু হলো এবং তারপরই ভয়ানক গোলাগুলির শব্দ ভেসে আসলো। আমি ভয়ে জমে গেলাম এবং আমার নিমন্ত্রণকর্তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার পূর্বেই তিনি দ্রুত বেগে বাইরে চলে গেলেন। তারপর আরও গোলাগুলি আরম্ভ হলো এবং আমি আর্টিলারি শেল নিক্ষেপের ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ এবং রকেট নিক্ষেপের শব্দও শুনতে পেলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালো যে, ঘাঁটিটি আক্রমণের শিকার হয়েছে এবং আমিও আমার জীবন সায়াহ্নে এসে পৌঁছেছি। সামান্য পরেই বিন লাদেন নিরুদ্বেগভাবে ফিরে এলেন। এরপর আমাকে ভয় পাইয়ে দেওয়ার জন্য তিনি ক্ষমা চাইলেন এবং ব্যাখ্যা করলেন যে, এটি ছিল একটি অনুশীলন মাত্র, যেটির মধ্য দিয়ে তার লোকেরা দৈনন্দিন ভিত্তিতে গমন করে; যাতে করে তারা সর্বদাই যেকোনো পরিস্থিতিতে

মোকাবিলার জন্য সতর্ক এবং প্রস্তুত থাকতে পারে। এটি শুনে আমি সামান্য স্বস্তি পেলাম; কিন্তু আমি পুরোপুরিভাবে আশ্বস্ত হতে পারলাম না।

একটি পরিমিত সান্ধ্যভোজ

আমাদের প্রারম্ভিক কথোপকথনের শেষ পর্যায়ে কেউ একজন ঘোষণা করল যে, ডিনার প্রস্তুত হয়েছে। আফগানিস্তানে আসার পর থেকে আমি খুবই করুণ খাবার-দাবারের সম্মুখীন হচ্ছিলাম বিধায় আমি অধীরভাবে কোনো ভোজন প্রত্যাশা করছিলাম। আমি কল্পনা করেছিলাম যে, বিন লাদেনের সাথে সাক্ষাতের পর হয়তোবা আমরা কোন হরিণ বা খাসির রোস্ট দিয়ে ভোজ সারবো। ঈগলের ডেরার সুযোগ-সুবিধা প্রত্যক্ষ করার পর আমি আমার প্রত্যাশাকে বাস্তবতার পর্যায়ে নামিয়ে আনলাম এবং সম্ভাব্য খাবার হিসেবে মুরগির তরকারি কল্পনা করছিলাম। কিন্তু সেই ডিনারের আইটেমগুলো দেখার পর আমি খুবই অবাক হয়েছিলাম। সেখানে ছিল আরবীয় স্টাইলে তুলা-বীজের তেলে ডুবানো আলুর চিপস, এক প্লেট ডিম ভাজি—যেটা একজন মানুষের জন্যই পুরোপুরি যথেষ্ট নয়, বাকি পাঁচজনের কথা না হয় বাদই দিলাম। আরও ছিল মিশরের গ্রামগুলো থেকেও বহুকাল পূর্বে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া নোনতা পনির এবং কিছু বনরুটি, যেগুলোকে হয়তোবা বালিতে চুবিয়ে আনা হয়েছিল; কারণ যখন আমি সেই রুটি খাচ্ছিলাম তখন বালিতে আমার মুখ কিচকিচ করছিল। কয়েক লোকমা খাওয়ার পর আমি বানিয়ে বললাম যে, আমি স্বাস্থ্যগত কারণে সচরাচর ডিনার করি না। তারা আমার ওজরকে মেনে নিল এবং তাদের খাওয়া-দাওয়া চালিয়ে যেতে লাগল।

বিন লাদেনের পছন্দনীয় একটি খাবার পরবর্তী সময়ে আমাকে পরিবেশন করা হয়েছিল, সেটার মধ্যে ছিল দই এবং ভাত; এর সাথে পাউরুটি এবং ওপরে চর্বি ভাসমান টমেটোর সসে রান্না করা আলুর তরকারি। সেগুলো আমাকে খুব কষ্ট করে গলার মধ্যে পুরতে হয়েছিল, এবং এরপরই আমি সুড়ঙ্গের বাইরের একটি ওক গাছের নিচে এসে বমি করে দিয়েছিলাম।

(সম্প্রতি বিন লাদেনের খুব কাছের একজন লোক আমাকে জানায়, যখন আল-কুদস আল-আরাবিতে উক্ত ভ্রমণ নিয়ে প্রথম একটি আর্টিকেল প্রকাশ হয়েছিল, সেটাকে বিন লাদেন চার বার পড়েছিলেন। প্রত্যেকবারই সেসব খাবারের ভীতিপ্রদ বর্ণনায় তিনি প্রাণখুলে হেসেছিলেন এবং বলেছিলেন যে, যদি আমি তার সাথে পরবর্তী সময়ে আবার সাক্ষাৎ করতে পারি, তবে তিনি অবশ্যই আমাকে সবচেয়ে উত্তম মেষশাবকের রোস্ট দিয়ে আপ্যায়ন করাবেন)।

আমার সাথি-সঙ্গীদের ভোজ সমাপ্ত হতে হতে আমি আমার চারপাশ নিয়ে যতই চিন্তা করতে লাগলাম, আমার চিন্তা ততই জট পাকাতে লাগল। বিন

লাদেনের এরূপ জীবন প্রণালি বেছে নেওয়া দেখে আমি হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলাম। বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের অধিকারী, সুপরিচিত এবং সম্ভ্রান্ত একটি পরিবারের এই লোকটিকে কোন সে প্রেরণা এসব ভয়ানক এবং রূঢ় পর্বতসমূহের মধ্যে এরূপ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যবিহীন জীবন যাপনে প্রলুব্ধ করছে, যেখানে সর্বদাই আক্রমণের আশঙ্কা বিরাজমান এবং যে কোন মুহূর্তে আটক হওয়া কিংবা জীবননাশের সম্ভাবনা বিদ্যমান, এবং যাকে অনেক দেশই তখন হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছিল? তখনই বিন লাদেন তার মৃত্যুভীতিহীনতা এবং শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বললেন এবং জানালেন এটা তার জন্য কতটা বেদনাদায়ক যে, তিনি এখনো জীবিত আছেন! যখন তিনি তার সেইসব মুজাহিদ সাথিদের কথা আলোচনা করেছিলেন যারা ইতিমধ্যেই শাহাদাত বরণ করে জান্নাতবাসী হয়ে গেছে, তখন তার চোখ ভিজে এসেছিল এবং তিনি আবেগ তাড়িত হয়ে পড়েছিলেন।

আমি তার সম্পত্তির পরিমাণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি প্রকৃতপক্ষে ঠিক কতটা সম্পত্তির মালিক সেটা না বললেও এ কথা স্বীকার করেন যে, এরূপ আত্মগোপনে থাকার পরও জটিল এবং গোপন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তিনি বিস্তীর্ণ বিনিয়োগ পরিচালনা করছেন। তিনি বলেন যে, তার এই সম্পত্তি কেবল উম্মাহর জন্যই। তিনি বলেছিলেন, 'এটি উম্মাহর দায়িত্ব যে, তারা তাদের সম্পত্তিকে সামগ্রিকভাবে এই প্রচেষ্টায় ব্যয় করবে'। আমি লক্ষ করেছিলাম, তিনি খুব কমই 'আরব' শব্দটি ব্যবহার করছিলেন। তিনি সর্বদা 'উম্মাহ', 'ইসলাম' এরূপ শব্দসমূহ ব্যবহার করছিলেন। তিনি বলেন, সমগ্র উম্মাহ বিদ্যুৎপ্রবাহের মতোই একে অপরের সাথে সংযুক্ত। তার এরূপ চমৎকার শব্দালংকারের ব্যবহার আমাকে বিস্মিত করেছিল।

এভাবে এরূপ জমকালো কথোপকথন চলতে থাকে। বিন লাদেনের মিডিয়া উপদেষ্টা পাশেই বসে ছিলেন। কিন্তু যখন শাইখ কিছু নির্দিষ্ট বিষয় বলতে শুরু করলেন তিনি সেটা নিয়ে খুশি হলেন না। তিনি আমাকে জানালেন সেসব নিয়ে লেখা যাবে না এবং আমি আজ অবধি সেরূপ কিছু করিনি। সেসব সংবেদনশীল আলোচনায় সুদান-সরকার এবং এর নেতৃবর্গ অন্তর্ভুক্ত ছিল, যারা সাম্প্রতিককালে আমেরিকার নির্দেশে বিন লাদেনকে তাদের দেশ থেকে বিতাড়িত করেছে। তিনি তার কণ্ঠে অনেকটা চাপা দুঃখ এবং তিক্ততা নিয়ে বলেছিলেন যে, তারা অনৈসলামিক এবং তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সবমিলিয়ে তিনি সেই দেউলিয়া রাষ্ট্রটিকে নিজের পকেট থেকে প্রায় তিনশ মিলিয়ন ডলার সাহায্য করেছিলেন। তারা তাকে দেশত্যাগ করতে বলার পর তিনি তাদেরকে সেসব লোন পরিশোধের অনুরোধ জানিয়েছিলেন। বিন লাদেন স্মরণ করছিলেন—'তারা আমাকে বলল, তাদের কাছে কোনো টাকা নেই এবং সেটাই সত্য ছিল। তখন

তারা সেসব টাকার পরিবর্তে আমাকে গম, ভুট্টা এবং গবাদিপশু দেওয়ার অফার করল এবং পরামর্শ দিলো যে, আমি সেসব বিক্রি করে আমার টাকা উঠিয়ে নিতে পারব।' বিন লাদেনের চোখে একইসাথে উল্লাস এবং গভীর বেদনা ফুটে উঠল এবং তখন তিনি হেসে হেসে বললেন, 'কে আছে যে পলায়মান ওসামা বিন লাদেনের কাছ থেকে গবাদিপশু এবং ভুট্টা কিনবে?!'

বিন লাদেনের মধ্যে আমি একটি প্রাণবন্ত কৌতুক-রসবোধের উপস্থিতি দেখতে পেয়েছি এবং তিনি এরকম অপ্রত্যাশিত মুহূর্তেও কৌতুক করতে জানতেন। আরব উপদ্বীপে (সৌদি আরব এবং অন্যান্য উপসাগরীয় দেশে) আমেরিকান বাহিনীর উপস্থিতি নিয়ে একটি দীর্ঘ, ক্রুদ্ধ এবং তীব্র নিন্দার পর তিনি বলেন, নিশ্চিতভাবেই তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল তেল সম্পদ। কেবল তেল আত্মসাতের জন্যই তারা সামরিক শক্তি প্রয়োগ করেছে। আত্মসাতের উদ্দেশ্য না থাকলে তাদের কখনোই সেরূপ করার প্রয়োজন ছিল না। কারণ, আমরা তো সেই তেল তাদের কাছেই (ন্যায্যমূল্যে) বিক্রি করতাম। কেননা আমরা তো এই তেল পান করতে পারব না!

সাক্ষাৎকারের সময় তিনি তার ভয়েস রেকর্ডিং করার অনুমোদন দেননি। একনাগাড়ে নোট করার দরুন আমার হাত অবশ হয়ে গিয়েছিল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, কেন তিনি এর চেয়ে সহজ উপায় অর্থাৎ কথোপকথন রেকর্ড করার অনুমতি দিচ্ছেন না? তখন তিনি স্পষ্ট কিছু বলেননি। পরবর্তী সময়ে তার উপদেষ্টা আমাকে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, (অবশ্য তিনিও রেকর্ডিং করতে দেননি) বিন লাদেন মনে করেন, যদি তিনি কোনো ধর্মতাত্ত্বিক বা কোনো ব্যাকরণগত ভুল করেন এবং সেটা যদি রেকর্ডও হয়ে যায়, তবে সেগুলোকেও তার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে। সেই সময় তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ ইসলামি বিশারদ ছিলেন না, কিন্তু সেই লক্ষ্যে তিনি কঠোর পরিশ্রম করছিলেন। আমি তখন উপলব্ধি করেছিলাম যে, মুসলিমবিশ্বে তার ভাবমূর্তির জন্য তিনি কতটা সচেতন ছিলেন।

যখন সান্ধ্যভোজের অন্যান্য অতিথিরা ঘুমানোর উদ্দেশ্যে গুহা থেকে চলে গেলেন, তখন প্রায় মধ্যরাত্রি পার হয়ে গিয়েছিল। গুহাটিতে কেবল দুটি বিছানা ছিল। বিন লাদেন আমাকে একটি অফার করলেন এবং অন্যটি তিনি নিলেন। আমি আজ অবধি যত বিছানায় শুয়েছি তার মধ্যে সেটি ছিল সবচেয়ে অস্বাভাবিক। তোশকটি ছিল ভয়াবহ শক্ত ও ঝুলকালিমাখা এবং কম করে হলেও বিশ বছরের পুরোনো। বালিশগুলোও প্রায় একই বয়সের ছিল এবং বহু পূর্বেই সেগুলো তাদের কোমলতা হারিয়েছে। সবচেয়ে ভীতিকর ব্যাপারটি ছিল বিছানার পাশে বেশ কয়েক

বাক্স হ্যান্ডগ্রেনেড এবং বাক্সের চারপাশে হেলান দেওয়া কালাশনিকভ এবং অন্যান্য রাইফেল।

রুমটিতে আদিম কালের উষ্ণব্যবস্থা ছিল, যা বর্তমানে বিলুপ্তপ্রায়। এর গঠন উপাদান ছিল একটি পানির ট্যাংক এবং লাকড়ির চুলা। এর ওপর থেকে একটি পাইপ ছাদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই বিলুপ্তপ্রায় সিস্টেম—যা কেবল আফগানিস্তানে প্রচলিত ছিল—বর্তমান ইউরোপের কোনো আধুনিক উপকরণের মতো না হলেও বেশ কার্যকরী বলা যেতে পারে। কিন্তু গুহাটিতে যথেষ্ট উষ্ণতা থাকা সত্ত্বেও আমার সামনে আরও একটি নিদ্রাহীন রাত অপেক্ষা করছিল। যে অস্ত্রাগার আমাকে ঘিরে ছিল, সেটি আমাকে খুব উদ্বিগ্ন করে রেখেছিল। তখন আমার আগ্নেয়াস্ত্র সম্পর্কে তেমন জ্ঞানই ছিল না এবং আমি খুবই উদ্বিগ্ন ছিলাম এই ভেবে যে, না জানি কোনো কিছু আপনা আপনি সেগুলোকে সক্রিয় করে দেয়।

কিন্তু ওসামা বিন লাদেনের এরূপ কোনো অনিদ্রাজনিত সমস্যা ছিল না। তার প্রিয় কালাশনিকভটি তিনি বিছানার পাশে মাটিতে রেখে শুয়ে পড়লেন এবং গভীর ও প্রশান্ত ঘুমে তলিয়ে গেলেন। যদি আমি কোনো গুপ্তঘাতক বা মুনাফা-শিকারি হতাম, তবে সেই রাতে নিশ্চিতভাবেই আমার কপাল খুলে যেত। সেই রাত্রে আমার কোনো ধারণাই ছিল না যে, আমার পাশের বিছানায় ঘুমন্ত লোকটি আধুনিক কালের সবচেয়ে আলোচিত ব্যক্তিত্বে পরিণত হবেন এবং তার মাথার মূল্য যখন আমি তার পাশে শুয়েছিলাম সে সময়কার এক মিলিয়ন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে পঁচিশ মিলিয়ন ডলার অবধি পৌঁছুবে।

বাইরে তখন সাইরেনের মতো তীক্ষ্ণ শব্দ করে সারারাত বাতাস বইছিল এবং রাত একটার দিকে একটি একচোখা মোরগ প্রবলভাবে ডাকতে শুরু করল। সেটা এমন শব্দ সৃষ্টি করছিল, যা আমি এর পূর্বে কখনো শুনিনি। আরও ভীতিপ্রদভাবে সেই ঘাঁটির মুজাহিদরা তাদের গাড়ির ইঞ্জিনগুলোকে একের পর এক চালু করছিল। এ ব্যাপারে সকালবেলা আমি জিজ্ঞেস করলে তারা বলেছিল যে, ইঞ্জিনের ডিজেলকে বরফ হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করার এটিই একমাত্র উপায়। ভোর চারটার সময়ই ঘাঁটিতে চলাফেরা আরম্ভ হয়ে গেল। মুয়াজ্জিন অতিশয় সুমধুর সুরে ফজরের আজান দিলো এবং সুউচ্চ পাহাড়ে এর প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে পড়ছিল।

বিন লাদেনের অনেক সাথিকেই ইসলামের প্রাথমিক যুগের বিজিত সমর সেনাপতিদের নামে ডাকা হতো; সুদূর অতীতে ফিরে যেয়ে আমি সেরূপই দেখতে পাই। সেখানে ছিল আবু উবায়দা, আবু মুয়াজ, আবু শুয়াইব, আবু দারদা, আবু ওয়ালিদ প্রমুখ। যেহেতু আমি সারারাত আমার চোখের পাতা এক করিনি, তাই

স্বাভাবিকভাবে আমাকে ঘুম থেকে জাগতেও হয়নি। কিন্তু অন্যান্যদের মতো অজু করার উদ্দেশ্যে আমার জন্যও এক বোল কুসুম গরম পানি আনা হলো। যেহেতু তখন আমি সেখানে খুবই ধার্মিক মানুষদের সহচর্যে ছিলাম; অতএব, অজু এবং নামাজ আমাকে তার সঠিক সময়ই আদায় করতে হলো; আমার সুবিধাজনক কোনো সময়ে নয়। তাই আমি আড়মোড়া দিয়ে উঠে গেলাম এবং তাদের জিজ্ঞাসা করলাম—'টয়লেটটি কোন দিকে?' তখন তারা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। তারা বলল, 'আপনি কি মনে করছেন আপনি হোটেল শেরাটনে আছেন?' তারপর তারা বাইরে কিছু বরফাবৃত জায়গা নির্দেশ করে বলল, 'আপনি চাইলে সেখানে আপনার প্রয়োজন পূরণ করতে পারেন এবং এখানে আপনি অজু করতে পারেন।' কম করে হলেও সেখানকার তাপমাত্রা ছিল মাইনাস বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং আমার মনে হয়েছিল আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঠান্ডায় জমে গেছে। আল্লাহই ভালো জানেন সেদিন আমার অজু পূর্ণাঙ্গ হয়েছিল কিনা, কিন্তু আমি আমার সর্বোচ্চ চেষ্টাটাই ব্যয় করেছিলাম।

গোলাবারুদ কামান এবং প্রকৃতি

আমার চারপাশ ধীরে ধীরে আলোকোজ্জ্বল হওয়ার সাথে সাথে সেই ইমারতটির অবয়ব আমার সামনে স্পষ্ট হতে লাগল। ত্রিশ বছরের ক্যারিয়ারের বেশির ভাগই আমি প্রকৃতির নৈস্বর্গিক জাঁকজমকতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কাটিয়েছি। কিন্তু সেসব ভয়ানক সুন্দর পর্বতগুলি উদ্ভাসিত হওয়ার পরে আমি খুবই ভাবাবেগপূর্ণ হয়ে গিয়েছিলাম। তুষারাবৃত পর্বতমালাকে আলিঙ্গন করে দাঁড়িয়েছিল পাইন গাছের দীর্ঘ সারি; বিশুদ্ধ বাতাস এসে বুক ভরিয়ে দিচ্ছিল এবং কোনো গোত্রপ্রধানের সুন্দরী মেয়ের বিয়ের শামিয়ানার মতো টকটকে লাল সূর্য দূরদিগন্তে উঁকি দিচ্ছিল।

তখন আমি দেখতে পেয়েছিলাম ঘাঁটিটি ছিল খুবই সুরক্ষিত। এন্টি-এয়ারক্রাফট গান, ট্যাংক এবং সাঁজোয়া যান সম্মুখের পথগুলোতে পাহারা দিচ্ছিল। সেখানে অনেক গুপ্ত অবস্থানও তৈরি করা হয়েছিল, যেখানে অ্যাম্বুশের জন্য মুজাহিদরা লুকিয়ে থাকতে পারত। আমি শুনেছিলাম সেখানে বিমান হামলা প্রতিরোধের জন্য রকেট লাঞ্চার এবং স্টিঙ্গার মিসাইলও বিদ্যমান আছে। আমি সেগুলো স্বচক্ষে দেখতে পাইনি এবং সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসাও করিনি; কারণ আমি আমার নিজের নিরাপত্তাকে বিপদগ্রস্ত না করার ব্যাপারে সতর্ক ছিলাম এবং চাচ্ছিলাম না যে, তারা আমাকে কোনো চর বলে সন্দেহ করুক।

ব্রেকফাস্টের ধরন সান্ধ্যভোজ থেকে সামান্যই ভিন্ন ছিল; সেখানে ছিল সেই একই ধরনের পনির, হয়তো-বা গতকালের বেঁচে যাওয়াগুলোই এবং আখের রস

ও দুধ চা। ব্রেকফাস্টের সাথে সাথে কুরআন তিলাওয়াতও চলছিল। আমি লক্ষ করেছিলাম, বিন লাদেন খুব অল্প আহার করেন এবং আমি তাকে কখনো পানি বাদে চা বা কফি ইত্যাদি পান করতে দেখিনি।

অত্যাধুনিক দুর্গ এবং তার শিক্ষিত অভিজাত সম্প্রদায়

যখন আমাকে নিচের ঘাঁটিটি ঘুরিয়ে দেখানো হলো, আমি আবিষ্কার করেছিলাম যে, সেকেলে বাসস্থানের বিপরীতে এটি পুরোপুরি হালনাগাদ টেকনোলজি দ্বারা সুসজ্জিত ছিল এবং বিদ্যুতের জন্য নিজস্ব একটি ছোট জেনারেটরের ব্যবস্থাও ছিল। সেখানে আপ-টু-ডেট নয় বরং আপ-টু-মিনিট কমিউনিকেশন ইকুইপমেন্ট ছিল। বিন লাদেন সেই সময়ই ইন্টারনেট ব্যবহার করতেন যা বর্তমানকালের মতো কিছুতেই এত সহজলভ্য ছিল না। তিনি তখনই মন্তব্য করেছিলেন, 'বর্তমান জামানায় সমগ্র পৃথিবী একটি ছোট গ্রামের সমতুল্য হয়ে গেছে'।

বিন লাদেনের কমিউনিকেশন নেটওয়ার্কের আধুনিকত্ব অন্যান্য ইসলামি মৌলবাদী চরমপন্থিদের থেকে এবং বিশেষত তাদের আশ্রয়দাতা তালেবানদের থেকে একেবারেই ভিন্ন ছিল। একবার তার এক সহযোগী এসব পর্যবেক্ষণের পর মজা করে বলেছিল যে, ঘাঁটিটি 'একটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে আরেকটি রাষ্ট্র' বা 'A republic within a republic'।

সেখানে কম্পিউটার ডিস্ক এবং হার্ড কপি ফর্মে তথ্য-উপাত্ত সমৃদ্ধ বিন লাদেনের বিশালাকায় আর্কাইভ ছিল। অন্যান্য বিদেশি পত্রিকার কাটিংও সেখানে অন্তর্ভুক্ত ছিল। তার আশেপাশের পরিস্থিতি এবং ঠিকঠিকানার ওপর ভিত্তি করে তিনি লন্ডন এবং অন্যান্য দেশের তার-বার্তা অথবা পত্রিকার মাধ্যমে সর্বশেষ খবরাখবর রাখতেন। যখন আমি বিন লাদেনের ডেস্কের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম তখন একটি সিলমোহরের ওপর আমার চোখ পড়েছিল। তবে আমি এর তলা দেখতে পারিনি এবং কোন সংগঠন এটি দিয়ে পৃষ্ঠাঙ্কিত করে তারও পাঠোদ্ধার করতে পারিনি। কিন্তু তখন এই ধারণা হচ্ছিল যে, সেটাতে হয়তো 'আল-কায়েদা' লিপিবদ্ধ ছিল।

বেশ কিছু বছর যাবৎ তোরাবোরা ঘাঁটিটি প্রশিক্ষণ শিবির হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছিল না। সেই সময় বিন লাদেনের চারপাশের মুজাহিদরা তাকে আক্রমণ বা আটক হওয়া থেকে প্রতিহত করার জন্য সেখানে ছিল। সেখানে বিভিন্ন বয়সের এবং প্রায় সব আরব দেশের লোকই ছিল, যাদের মধ্যে সৌদি আরব, মিশর এবং এর আশপাশের উপসাগরীয় দেশের লোকজনই সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল । তারা প্রত্যেকেই ইসলামি নাম ধারণ করেছিল; বিশেষ করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের সাহাবিদের এবং আরও নির্দিষ্ট করে বললে সেসব সাহাবিদের, যারা দুনিয়াতেই জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। আল্লাহ এবং ইসলামের প্রতি তাদের দৃঢ় আস্থা ঠিকরে ঠিকরে পড়ছিল। তারা অনেক পূর্বেই পার্থিব ভোগবিলাস থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল এবং পরবর্তী অনন্তকালব্যাপী দুনিয়ার উদ্দেশ্যে পা বাড়ানোর জন্য তারা ব্যতিব্যস্ত ছিল। তারা শাহাদাতের প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছিল এবং এজন্য খুবই আশাবাদী ছিল। আমি বিশেষভাবে খেয়াল করেছি, মুজাহিদদের মধ্যে অনেকেই ছিল উচ্চ একাডেমিক ডিগ্রিধারী; তাদের মধ্যে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক প্রমুখ ছিল, যারা তাদের পরিবার এবং ব্যবসা-বাণিজ্য পুরোপুরিভাবে ত্যাগ করে জিহাদের জন্য ছুটে এসেছিল।

আমি দেখেছি বিন লাদেন কখনোই কর্তৃত্বপূর্ণ, এমনকি নেতৃত্বসুলভ ব্যবহারও করতেন না; বরং তিনি এর থেকে একেবারেই ভিন্ন ছিলেন। কিন্তু মুজাহিদরা তার প্রতি যে সম্মান এবং শ্রদ্ধা পোষণ করে, সেটা তাৎক্ষণিকভাবেই দৃশ্যমান ছিল। তার প্রতিটি শব্দকে তারা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলে এবং তাকে সম্মানসূচক শব্দ 'শাইখ' উপাধিতে সম্বোধন করে। তারা প্রত্যেকেই আমাকে বলেছিল যে, তাকে রক্ষার জন্য তারা হাসিমুখে জীবন দিতে প্রস্তুত আছে এবং কোনো ব্যক্তি বা সংগঠন তার কোনো ক্ষতি করলে তারা এর যথাযথ প্রতিশোধ নিয়েই ছাড়বে। আমার এখনো ফয়সালকে স্মরণ আছে, যে দূত হিসেবে পেশোয়ারে আমার কাছে এসেছিল; সে আমাকে বলেছিল 'শাইখ'কে রক্ষার্থে সে বুলেটের সম্মুখে নিজের বুক পেতে দিতে তৈরি আছে।

বিন লাদেন ওরফে 'আবু আব্দুল্লাহ'—এভাবেই তার ভক্ত এবং অনুসারীরা তাকে সম্বোধন করে থাকে—আমাকে সাথে নিয়ে চারপাশের পাহাড়ি এলাকায় তার অতি প্রিয় কালাশনিকভটি নিয়ে হাঁটতে বের হয়েছিলেন। (তিনি আমাকে বলেছিলেন, বন্দুকটি এক সোভিয়েত জেনারেলের ছিল, যে আফগানিস্তানে একটি লড়াইয়ে মারা পড়েছিল।)

আমরা অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে, দুর্নীতিপরায়ণ আরব শাসনব্যবস্থা নিয়ে এবং মুসলিম দেশগুলোর ওপর আমেরিকার অত্যাচার নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। তিনি আমাকে তার সোমালিয়া এবং সুদানের দিনগুলির বর্ণনা, সৌদি সিক্রেট সার্ভিস কর্তৃক তাকে হত্যাচেষ্টার ঘটনা এবং তার মিশন এবং জিহাদ পরিত্যাগের বদলা স্বরুপ যে বিশাল অঙ্কের পুরস্কারের কথা বলা হয়েছিল—সেই সম্পর্কে বলেছিলেন। তিনি আমাকে বলেন, সৌদি আরব তাকে তার পাসপোর্ট ফিরিয়ে দেওয়ার অঙ্গীকার করেছিল এই শর্তে যে, তিনি জনসমক্ষে ঘোষণা দেবেন—বাদশা ফাহাদ একজন প্রকৃত মুসলিম; কিন্তু তিনি সেসব সুযোগ সাথে

সাথেই প্রত্যাখ্যান করেন। (এসব কিছু বিস্তারিতভাবে এই বইয়ের অন্যত্র ব্যাখ্যা করা হয়েছে)।

ভ্রমণ সমাপ্তি

পরের দিন সকালটি রৌদ্রোজ্জ্বল থাকলেও গা হিম করা ঠান্ডা ছিল। বিন লাদেন ক্যাম্পের চারপাশের পাহাড়ে আমাকে নিয়ে ঘুরতে বেরিয়েছিলেন। আমরা গাছপালার মধ্য দিয়ে হাঁটছিলাম। তিনি আমাকে বলছিলেন, তিনি এসব পর্বতসমূহকে কতটা ভালোবাসেন। তিনি জানান, এরূপ পরিবেশে তিনি তাঁর সমগ্র জীবন কাটিয়ে দিতে পারবেন এবং বলেন—'কোনো ইউরোপীয় দেশে বাস করার চাইতে আমি এখানে মৃত্যুকেই বেছে নেব'।

আমি সেখানে অনেকগুলো মাটির ইটের বাসা দেখতে পেয়েছিলাম; যেগুলোর চিমনি দিয়ে ধোঁয়া উঠেছিল এবং সাথে সাথে রুটি ভাজার গন্ধ আসছিল। বাচ্চাদের খেলাধুলার শব্দ ভেসে আসছিল। সেসব বাচ্চাদের অনেককেই আমি দেখতে পেয়েছিলাম এবং আপাদমস্তক বোরকাবৃত কিছু মহিলাও আমার নজরে পড়েছিল।

বিন লাদেন আমাকে একটি সুউচ্চ পর্বতের চূড়া দেখিয়ে বলেছিলেন, জিহাদের সময় সেখানে একটি সোভিয়েত ঘাঁটি ছিল যেটা এই সম্পূর্ণ এলাকাকে নিয়ন্ত্রণ করত এবং এটি মুজাহিদদের ব্যাপক দুর্দশার কারণ হয়েছিল। অতঃপর তিনি খুব গৌরবের সাথে বলেছিলেন—'তারপর আমরা সেটি বোমা মেরে উড়িয়ে দিয়েছি এবং সোভিয়েতদের তাড়িয়ে দিয়েছি'।

তিনি সোভিয়েত যোদ্ধাদের সম্পর্কে বেশ প্রশংসামূলক আলোচনা করেছিলেন এবং তাদের তিনি সাহসী এবং সহিষ্ণু অভিধায় অভিহিত করেন। সেই আলোচনায় বিন লাদেন আমাকে এমন কিছু তথ্য জানিয়েছিলেন, যেগুলো সম্পর্কে বিশ্ববাসী তখনও অবগত ছিল না। বিন লাদেন আমাকে বলেছিলেন যে, তার আরব আফগান যোদ্ধারা ১৯৯৩ সালে সোমালিয়ার মোগাদিশুতে আমেরিকান সৈন্যদের ওপর অ্যাম্বুশের সাথেও জড়িত ছিল। বিন লাদেন বলেন—'সেখানে অনেকগুলো সফল লড়াই হয়েছিল যেগুলোতে আমরা আমেরিকানদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করেছিলাম এবং মোগাদিশুতে আমরা তাদের নাস্তানাবুদ করছিলাম'। তিনি বলেছিলেন, তিনি মনে করেন এর সামান্য পরেই সোমালিয়া থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের মাধ্যমে আমেরিকা এক অভূতপূর্ব কাপুরুষতা প্রদর্শন করেছিল।

তখন বিন লাদেন নিশ্চিত করেন যে, সৌদি আরবে দাহরানের খোবার টাওয়ারের আমেরিকান ঘাঁটিতে ১৯৯৬ সালের জুন মাসের বোমা হামলার পেছনেও আল-কায়েদা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল। আমেরিকান সৈন্যদের একটি হাউজিং কমপ্লেক্সে ১৫০০ কেজি ডিনামাইটের বিস্ফোরণ ঘটানো হয়, যেটাতে ১৯

জন সৈন্য নিহত হয় এবং প্রায় ৫০০ জন আহত হয়। বিন লাদেন আক্ষেপ করে বলেন, কিন্তু সাথে সাথেই আমেরিকা তাদের ঘাঁটিকে আল-খারজ অর্থাৎ রিয়াদের দক্ষিণের মরুভূমিতে স্থানান্তর করে। তিনি বলেন—'এটা খুবই দূরবর্তী একটি জায়গা, খোবারে তাদেরকে ধরা খুবই সহজ ছিল, কিন্তু তারা দ্রুতই সেখান থেকে পালিয়ে যায়। তারা এক মাসের মধ্যেই পলায়নকর্ম সম্পন্ন করেছিল।' তিনি জানান, খোবার টাওয়ার কম্পাউন্ড নিয়ে আল-কায়েদার আরও অনেক পরিকল্পনা ছিল।

বিন লাদেন তখনই বলেছিলেন আরও অনেক হামলা পরিকল্পনা পর্যায়ে রয়েছে এবং জোর দিয়ে বলেন, এসব অপারেশনসমূহের প্রস্তুতিতে ব্যাপক সময় প্রয়োজন হয়। তিনি তখনই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, তিনি আমেরিকাকে তাদের মাটিতেই আক্রমণ করবেন; কিন্তু আমি স্বীকার করছি, আমি তখন তার সেই অবিস্মরণীয় বিবৃতি—যা তিনি ব্যক্ত করেছিলেন, তার বিশালতা উপলব্ধি করতে পারিনি এবং এমনকি লিপিবদ্ধও করিনি। তিনি এও বলেন—'আমরা আশা করছি নিকট ভবিষ্যতেই আমরা এই লক্ষ্যে পৌঁছুতে সক্ষম হব'। ১১ সেপ্টেম্বরের ভয়াবহ হামলার পর আমি প্রায়ই তোরাবোরার সেসব তরুণ মুজাহিদদের কথা কল্পনা করি। তখন আমি তাদের পাশেই বসে ছিলাম, যারা এই ভয়াবহ হামলার ছক আঁকছিল।

ওসামা বিন লাদেনের সাথে আমার বরাদ্দকৃত দুইদিন সমাপ্ত হলো এবং আমাকে জালালাবাদ ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য সেই একই লাল গাড়িটি এলো। সেই আরব আফগান ইমারতে আরও বেশ কিছুদিন থাকতে না পারার কারণে তখন আমার খুব দুঃখ লাগছিল। আমি সেই দলটি এবং তার নেতার মানসিক, রাজনৈতিক এবং সামরিক নৈপুণ্যের মাত্রা দেখে হতবাক হয়েছিলাম; কিন্তু সেই স্বল্প সময়ে তাদেরকে এমনকি বাহ্যিকভাবেও বিশ্লেষণ করে দেখতে পারিনি। বিন লাদেনের সাথে সাক্ষাতের পর আমি উপলব্ধি করেছিলাম যে, তিনি কোনো সাধারণ মানুষ নন এবং আমি প্রত্যাশিত ছিলাম যে তিনি অচিরেই তাঁর দেশ সৌদি আরব এবং সর্বোপরি মুসলিমবিশ্বের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ আসনে আসীন হবেন। কিন্তু আমি তখন এক মুহূর্তের জন্যও চিন্তা করিনি যে, এতটা বিনয়ী, নম্রভাষী, হাস্যোজ্জ্বল এবং বাহ্যত অমায়িক এই লোকটি বিশ্বের সবচেয়ে মারাত্মক ব্যক্তিত্বে পরিণত হবেন; পশ্চিমা দেশগুলোকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলবেন; আমেরিকার হাজার হাজার বিলিয়ন ডলার লোকসানের কারণ হবেন; তাদের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাকে হুমকির মুখে ফেলে দেবেন এবং তাদেরকে আফগানিস্তান ও ইরাকে পূর্ণমাত্রায় যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলবেন। এই লোকটির সাথে সাক্ষাৎ-অভিজ্ঞতা লাভের পরই আল-কায়েদা নিয়ে আমি আগ্রহী হয়ে উঠি এবং এই সম্পর্কিত বিষয়ে আমি গভীর মনোযোগ দিতে আরম্ভ করি। এই বইয়ে এরই পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ রয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

ওসামা বিন লাদেন

বিন লাদেনের ঐতিহাসিক অনিবার্যতা

বর্তমান মুসলিমবিশ্ব ওসামা বিন লাদেনকে নিয়ে বিমুগ্ধ। যখন কাতার ভিত্তিক আল-জাজিরা স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল তার কোনো ভিডিও বা অডিও বার্তা সম্প্রচার করে অথবা তার জীবনী নিয়ে কোনো প্রোগ্রাম করে, তখন সৌদি আরব, মিশর, ফিলিস্তিন, সিরিয়া, মরক্কো প্রভৃতি দেশসমূহের রাস্তাঘাট প্রায় শূন্য হয়ে যায়। কারণ প্রত্যেকেই এই লোকটিকে দেখার জন্য ঘরের দিকে রওনা হয়। তিনি ইতিমধ্যেই এই অঞ্চলে একটি আইকনের মর্যাদালাভে সমর্থ হয়েছেন।

একটি সাম্প্রতিক জরিপে উঠে আসে, বেশকিছু আরব দেশের প্রায় ৬০ শতাংশ লোকই তাকে সমর্থন করে। নভেম্বর ২০০৩ সালে যদিও সৌদি আরব সরাসরি আল-কায়েদার বিভিন্ন হামলার সম্মুখীন হচ্ছিল, তবুও প্রায় অর্ধেক সৌদিবাসীই জানায় তারা বিন লাদেনের বার্তাকে পছন্দ করে। মিশরের অর্থনীতির প্রধান উৎস হলো আমেরিকান সহায়তা, সেখানেও বিন লাদেন জর্জ ডব্লিউ বুশের চেয়ে বেশি জনপ্রিয়। বিন লাদেনের এরূপ উত্থানের পেছনে ঐতিহাসিক অনিবার্যতা বিদ্যমান ছিল। তিনি এখন অনেকের কাছেই পুনঃউদীয়মান মুসলিম জাতিসত্তার প্রধান ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠেছেন। পশ্চিমাদের বেশিরভাগ লোকের কাছেই এটি অচিন্তনীয়; কারণ সেখানে কেবল তাকে অসাধু গুন্ডা হিসেবেই উপস্থাপিত করা হয় এবং লোকজনও তাকে সেভাবেই গ্রহণ করে। তথাপি এটা জানা অত্যাবশ্যক যে, মুসলিমবিশ্বে তার ভক্তরা তাকে কীভাবে দেখে। বৈশ্বিক নিরাপত্তায় আল-কায়েদার ভাবাদর্শ যে ভীষণ হুমকি ধারণ করে, সেটাকে কীভাবে মোকাবিলা করা সম্ভব, যদি এর পরিচয় এবং প্রকৃতিই অন্ধকারাবৃত থাকে?

ব্যাপক সংখ্যক মুসলিম কর্তৃক ওসামা বিন লাদেন বর্তমানে বিদ্রোহ এবং বিপ্লবের বীর হিসেবে বিবেচিত হন। গোলিয়াথ যেমন ডেভিড কর্তৃক যুদ্ধে আহূত হয়েছিল, তিনিও এখন ঠিক সেইরূপ পৌরাণিক মাপকাঠিতে মাপিত হন। যেসব লোক তাকে বর্তমানে সমর্থন করছে, তাদের অনেকেই হয়তো-বা তার চরম কট্টরপন্থাকে বা যে ইসলামি শরিয়াহ-ভিত্তিক শাসনের অধীনে তাদের বসবাস করতে হবে, সেগুলো পছন্দ করে না; কিন্তু এই মুহূর্তে সেগুলো তাদের জন্য ক্ষুদ্র বিষয়। শতবর্ষ ধরে পতনকালের পর, তারা বিন লাদেনকে এমন একজন হিসেবে দেখে, যিনি অপমান এবং শোষণের মুঠো থেকে তাদের জন্য মর্যাদা এবং প্রত্যাশার সোনালি ভোর নিয়ে এসেছেন এবং পশ্চিমা বিশ্ব বিশেষ করে আমেরিকার নিপীড়ন

থেকে তাদের পক্ষ হয়ে প্রতিশোধ নিয়ে নিচ্ছেন—ঠিক এভাবেই লোকজন আমার কাছে তার সম্পর্কে অনুভূতি প্রকাশ করেছে।

কেউ কেউ তাকে ভারতের জনপ্রিয় নেতা জওহরলাল নেহেরুর সঙ্গে তুলনা দিয়েছেন। আবার অনেকে গৌতমবুদ্ধের সাথে তার সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন। যেহেতু তাদের মতো তিনিও ধনসম্পদ এবং আরাম-আয়েশের মোহ পরিত্যাগ করে পাষাণ পর্বতের গুহায় অনাড়ম্বর জীবনযাপন করছেন। তবে নেহেরু এবং বুদ্ধের সাথে তার ভিন্নতা হলো, তারা ছিলেন শান্তিবাদী এবং ন্যায়বিচার ও স্বাধীনতা অর্জনের জন্য শান্তিপূর্ণ উপায় ব্যবহারের প্রবক্তা, যেখানে বিন লাদেন সহিংসতার পথ বেছে নিয়েছেন। সম্ভবত ইরানি ইসলামি বিপ্লবের নেতা আয়াতুল্লাহ খোমেনির সঙ্গে বিন লাদেনের সবচেয়ে বেশি মিল স্থাপন করা সম্ভব। যখন তিনি সুদানে ছিলেন, তখন হয়তো-বা সামান্য হলেও খোমেনিকে বিন লাদেন অনুকরণ করেছেন। তার মতোই তিনিও ম্যাগাজিন প্রকাশ করেন, অডিও-ক্যাসেট বিলি করেন এবং দুর্নীতি নির্মূল এবং ইসলামি শরিয়াহর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের দাবি জানিয়ে লিখিত বার্তাও প্রকাশ করেন। যদিও ধর্মতত্ত্বের দিক থেকে তারা একে অপর থেকে পুরোপুরি ভিন্ন; কারণ খোমেনি শিয়া হলেও বিন লাদেন একজন পাক্কা সুন্নি মুসলিম।

শৈশবের দিনকাল

ওসামা বিন লাদেনের জন্ম সৌদি আরবের রিয়াদে ১৯৫৭ সালে। তার মা সিরিয়ান বংশোদ্ভূত ছিলেন এবং বাবা মুহাম্মাদ বিন আওয়াদ বিন লাদেন ছিলেন একজন সুপ্রতিষ্ঠিত নির্মাণ ঠিকাদার, যিনি ইয়েমেনের হাদ্রামাউত অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। সেখান থেকে তিনি সৌদি আরবে চলে এসেছিলেন। এখানে তিনি তার বিরল বুদ্ধিমত্তা, কূটনীতি, ধৈর্যশীলতা এবং স্বতন্ত্র ব্যবসায়িক প্রতিভার জন্য সুপরিচিত ছিলেন। মুহাম্মাদ বিন লাদেন একজন সাধারণ শ্রমিক হিসেবে কাজ শুরু করেন; কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি দ্রুত সফলতা এবং সমৃদ্ধির মই বেয়ে উঠতে থাকেন এবং পরিশেষে সৌদি আরবের সবচেয়ে বৃহৎ কনস্ট্রাকশন সাম্রাজ্যের সম্রাট হিসেবে আবির্ভূত হন।

একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, তিনি দেশীয় রাজনীতিতে পর্দার আড়ালের অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্বও হয়ে উঠেছিলেন এবং শাসক পরিবারের সাথে তার খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।

যখন ১৯৬০ এর মাঝামাঝি বাদশা সৌদ এবং তার ভাই ক্রাউন প্রিন্স ফয়সালের মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত হয়, তখন তিনি প্রিন্স ফয়সালের অনুকূলে থেকে বাদশাকে সিংহাসন এবং দেশত্যাগে রাজি করাতে একটি মুখ্য ভূমিকা পালন

করেছিলেন। সেই সময় দেশের কোষাগার ছিল একেবারে শূন্য এবং দেশ দেউলিয়ার দ্বারপ্রান্তে ছিল। তখন মুহাম্মদ বিন লাদেন সরকারি কর্মচারীদের বেতন পরিশোধের জন্য ছয় মাসের অধিক সময় সৌদি সরকারকে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ঋণ দেন এবং এর ফলস্বরূপ পরবর্তীকালে কৃতজ্ঞ শাসক পরিবার তাকে প্রচুর নির্মাণ প্রকল্পের ঠিকাদারি দিয়ে পুরস্কৃত করে। সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ছিল মক্কার হারাম শরিফ এবং মদিনার মসজিদে নববির সম্প্রসারণ কাজ।

ওসামা বিন লাদেন তার তিপ্পান্ন ভাইবোনের মধ্যে তেতাল্লিশতম ছিলেন এবং উনত্রিশ ভাইয়ের মধ্যে একুশতম ছিলেন। যখন তার বাবা বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান, তখন তার বয়স ছিল মাত্র দশ বছর।

যখন ওসামার বয়স ছয় মাস ছিল, তখন তার পরিবার রিয়াদ থেকে হেজাজে স্থানান্তরিত হয় এবং সেখানেই তিনি তার শৈশব এবং কৈশোরের দিনগুলো অতিবাহিত করেন। তিনি ঘন ঘন ইসলামের পবিত্রতম শহর মক্কা এবং মদিনায় ভ্রমণ করতেন; তার ওপর এগুলোর অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ছিল এবং বর্তমানে তিনি যে ধর্মীয় বিশ্বাস ধারণ করেন সেগুলোর পেছনেও এর ভূমিকা ছিল। ওসামা বিন লাদেনের এক ভাই আমাকে জানিয়েছেন, শিশুকাল থেকেই ওসামা খুব শান্ত এবং স্বল্পভাষী ছিল; সে অন্যান্য শিশুদের থেকে দূরে দূরে থাকত এবং তাদের সাথে বেশি খেলাধুলা এবং চিৎকার-চেঁচামেচিতে অংশগ্রহণ করত না। সে ছিল খুবই বুদ্ধিমান এবং অধিকাংশ সময় সে তার বাবার পাশে চুপচাপ বসে থাকতেই পছন্দ করত। অল্প বয়স থেকেই সে অনেক ধর্মীয় সভা, পাঠচক্র এবং কোরআনের আলোচনায় অংশগ্রহণ করত।

বিন লাদেন সর্বদাই তার মায়ের খুব ভক্ত ছিলেন। মা আলিয়া ঘানেমের জন্ম সিরিয়ার উত্তর-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চল লাতাকিয়ার একটি গ্রামীণ পরিবারে। যদিও সেখানে আলাভি শিয়ারা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল, কিন্তু ঘানেম পরিবার ছিল সুন্নি। ১৯৫৬ সালে একটি ব্যবসায়িক সফরে মুহাম্মাদ বিন লাদেনের সাথে অনিন্দ্যসুন্দরী আলিয়ার প্রথম সাক্ষাৎ হয় এবং তিনি তাকে চতুর্থ স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করে নেন।

ওসামা ছিল আলিয়া ঘানেমের একমাত্র ছেলে। বিন লাদেন খুবই সম্মান এবং শ্রদ্ধার সাথে তার মা সম্পর্কে আমার কাছে আলোচনা করেছিলেন। মায়ের প্রতি বিন লাদেনের ভালোবাসাকে ১৯৯৮ সালে সৌদি সরকার নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করার প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। এই লক্ষ্যে তারা তাকে প্রাইভেট জেটবিমানে করে আফগানিস্তানে পাঠিয়েছিল এই আশায় যে, তিনি ওসামার জিহাদ পরিত্যাগ করার জন্য তার সাথে আলোচনা করবেন এবং সৌদিতে ফিরে যাওয়ার কথা বলবেন; কিন্তু তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ধারণা করা হয়, মা এবং পুত্রের সর্বশেষ সাক্ষাৎ

হয়েছিল ২০০১ সালের জানুয়ারি মাসে আবু হাফসের মেয়ের সাথে বিন লাদেনের ছেলের বিয়ের অনুষ্ঠানে। আমরা জানতে পেরেছি, আলিয়া অত্যধিক কৌতূহলের সাথে ছেলের কার্যকলাপের খোঁজখবর রাখেন এবং তিনি এটা করেন পত্রিকার কাটিং, স্যাটেলাইট চ্যানেল এবং পুত্রের ইন্টারনেট বার্তা এবং বিবৃতির মাধ্যমে। ওসামা তার গ্রীষ্মের ছুটিগুলো লাতাকিয়ায় তার মামার সাথে কাটাতেন এবং সেখানেই ১৭ বছর বয়সে তার মামাতো বোন নাজওয়া ঘানেমের সাথে তার বিয়ে হয়। তখন নাজওয়া ঘানেমের বয়স ছিল ১৪ বছর এবং বিয়ের পর তারা সৌদি আরবে চলে এসেছিল। তাদের সর্বমোট এগারো জন সন্তান রয়েছে।

বিন লাদেন জেদ্দাতে তার প্রাইমারি, ইন্টারমিডিয়েট এবং সেকেন্ডারি শিক্ষা সমাপ্তির পর উচ্চতর শিক্ষার জন্য কিং আবদুল আজিজ ইউনিভার্সিটিতে অর্থনীতি ও ব্যবসায় শিক্ষা নিয়ে পড়াশোনা করেন এবং সেখান থেকে তিনি বি.এ. ডিগ্রি লাভ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বছরগুলোতে তিনি বিভিন্ন প্রভাবশালী ইসলামিক ভাবাদর্শ নিয়ে পড়াশোনা করেন এবং বহু প্রখ্যাত ইসলামিক স্কলার, যেমন ড. আব্দুল্লাহ আযযাম, মুহাম্মাদ কুতুব (সাইয়িদ কুতুবের ভাই) প্রমুখ থেকে শিক্ষা লাভ করেন। তার ওপর প্রায়ই কলুষতা আরোপ করা হয় যে তিনি যৌবনে লন্ডন, প্যারিস, জেনেভা, ম্যানিলা প্রভৃতি জায়গায় ভ্রমণে যেতেন; মাত্র ১৭ বছর বয়সেই ওসামা বিন লাদেনের বিবাহ সেসবের বিরুদ্ধে একটি স্পষ্ট প্রমাণ। ওসামার এক ভাই আমাকে জানিয়েছিল, তিনি ১৩ বছর বয়সে গ্রীষ্মকালীন একটি ইংরেজি কোর্সের জন্য লন্ডনের অক্সফোর্ড স্ট্রিটের একটি ল্যাঙ্গুয়েজ স্কুলে গিয়েছিলেন। এ ছাড়া লন্ডনের রিজেন্টস পার্ক ইসলামিক সেন্টারের সাবেক ডাইরেক্টর নিশ্চিত করেন যে, বিন লাদেন ১৯৮০র দশকের শুরুর দিকে সেই মসজিদে ভ্রমণ করেছিলেন এবং সেখানে বেশ কিছু বয়ান রেখেছিলেন।

তার বাবা মুহাম্মাদ বিন লাদেনের একটি অভ্যাস ছিল তিনি প্রতিবছর বহুসংখ্যক হাজিকে মেহমানদারি করাতেন এবং তার মৃত্যুর পর বিন লাদেনের দুই বড় ভাই সেটি চলমান রাখার সিদ্ধান্ত নেন। সেসব হাজিদের মাঝে প্রায়ই অনেক প্রখ্যাত ইসলামিক স্কলার এবং চিন্তাবিদরা থাকতেন এবং তাদের সাথে বিন লাদেন খুব আগ্রহ সহকারে সাক্ষাৎ করতেন ও কথা বলতেন। বিশেষ করে তিনি যে দুইজন ব্যক্তি দ্বারা খুবই প্রভাবিত ছিলেন তারা হলেন—প্রথমত, সাইয়েদ কুতুবের ভাই মুহাম্মাদ কুতুব (অনেক বিশ্লেষক তাকে ইসলামি চরমপন্থি দলগুলোর আধ্যাত্মিক নেতা বলে গণ্য করেন)। তাকে নিয়ে পরবর্তী সময়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হবে এবং অন্যজন হলেন শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম, যিনি ছিলেন আফগান জিহাদের ভাবপুরুষ। তিনি আশির দশকে মুসলিম যুবকদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। এই দুইজন ব্যক্তিই জেদ্দা ইউনিভার্সিটিতে

লেকচার দিতেন। তারা ইসলামি সংস্কৃতির পাঠ দিতেন, যেটি তখন সকল ছাত্রদের জন্য বাধ্যতামূলক বিষয় ছিল।

আফগানিস্তান : সম্মুখ সমরে বিন লাদেন

আব্দুল্লাহ আযযাম ক্রমশ বিন লাদেনের প্রধান পরামর্শদাতা হয়ে উঠেছিলেন এবং তাকে সামসময়িক মুসলিমবিশ্বের চলমান ঘটনাবলি সম্পর্কে উপদেশ দিতেন। তিনি আফগানিস্তানে সোভিয়েত দখলদারি সম্পর্কে তার সাথে আলোচনা করেন এবং বৈদেশিক কর্তৃত্ব থেকে মুসলিম দেশটিকে মুক্ত করার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। আযযাম তার নিজস্ব পরিচিতির মাধ্যমে বিন লাদেনের জন্য পাকিস্তানে একটি গোপন যাত্রার আয়োজন করেন এবং এর মাধ্যমেই যুবক ওসামা প্রথমবারের মতো পেশোয়ার এবং করাচি ভ্রমণ করেন। যেখানে তিনি বিভিন্ন আফগান ইসলামিস্ট গ্রুপের নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন যেমন 'ইত্তিহাদে ইসলামি বারায়ে আজাদিয়ে আফগানিস্তান' এর প্রধান আবদুল রাসুল সাইয়াফ, 'জামায়াতে ইসলামি'-এর প্রধান বুরহানউদ্দিন রাব্বানি প্রমুখ। প্রারম্ভিক এই ভ্রমণটি প্রায় এক মাস স্থায়ী হয়েছিল এবং তিনি এরূপ আরও অনেক ভ্রমণ করেন, যতদিন-না তিনি আফগানিস্তানে ১৯৮২ সালে কমবেশি পুরোপুরিভাবে চলে আসেন।

বিন লাদেন সৌদি আরবে তার পারিবারিক প্রতিষ্ঠান থেকে খননের যন্ত্রপাতি, ডিগার, বুলডোজার প্রভৃতি নিয়ে আসেন। সোভিয়েত দখলদারির বিরুদ্ধে মুজাহিদদের প্রতিরোধ যুদ্ধে এসব খুবই সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল। সেগুলো পর্বতের মধ্যে দিয়ে পথ তৈরি করা, রাস্তা সমান করা, গোলকধাঁধার মতো বিভিন্ন টানেল তৈরি করা প্রভৃতি কাজে ব্যবহার হয়েছিল। তোরাবোরাতে আমি এরূপই একটি গোলকধাঁধাময় টানেলে গিয়েছিলাম।

মুজাহিদদের তহবিল সংগ্রহের ক্ষেত্রেও বিন লাদেন একটি প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং প্রায় সময়ই তিনি সৌদি আরব গমন করে হাজার হাজার সৌদিকে জিহাদে যোগ দিতে উৎসাহিত করেছেন। তখন তিনি সৌদি আরবে বিভিন্ন বক্তৃতা এবং বয়ান পেশ করতেন এবং সে সময় তাকে একজন রোল মডেল হিসেবেই দেখা হতো। যদিও বিন লাদেন ব্যাপক দৌলতের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু তিনি পার্থিব ভোগ-বিলাসিতা এড়িয়ে চলতেন এবং তার পরিবারের সংখ্যাগরিষ্ঠদের বিপরীতে ব্যয়বহুল জীবনযাপন সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করেছিলেন এবং ইসলামি জীবনযাত্রা অনুসরণ করতেন। তিনি তখন আরবি ম্যাগাজিন এবং উপসাগরীয় দেশগুলোর পত্রিকার পেইজে একটি পরিচিত মুখ হয়ে ওঠেন এবং তখন তাকে দেখা হতো একজন বীর মুজাহিদ হিসেবে—যে তার আরাম-আয়েশ

বিসর্জন দিয়েছে এবং এমনকি তার জীবনকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিয়েছে। সৌদি সরকার তখন সোভিয়েত দখলদারির বিরুদ্ধে লড়াইরত আফগান এবং আরব মুজাহিদদের সমর্থন এবং সহায়তা দিয়ে যাচ্ছিল।

এ লক্ষ্যে সে সময়কার রিয়াদের গভর্নর প্রিন্স সুলতান বিন আবদুল আজিজের নেতৃত্বে তহবিল কমিটিসমূহ গঠন করা হয়েছিল। মসজিদের ইমামদের উৎসাহিত করা হয়েছিল আবেগময় বক্তৃতা দিয়ে সৌদি যুবকদের জিহাদের প্রতি উৎসাহিত করার জন্য। মুসল্লিদের কাছ থেকে অনুদান সংগ্রহের জন্য মসজিদের আঙিনায় বড় বড় বাক্স স্থাপন করা হয়েছিল। আমার স্মরণ আছে, এক শুক্রবার একটি মসজিদে আমি দেখেছিলাম, হাজার হাজার লোক উপস্থিত হয়ে সেই বাক্সে তাদের অনুদান প্রদানের জন্য চারপাশে ধাক্কাধাক্কি করছিল। এমনকি সৌদি সরকার নিজেও আফগান যুদ্ধের খরচ নিয়ে আমেরিকার সাথে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে গিয়েছিল। ধারণা করা হয় এই আর্থিক অনুদানের পরিমাণ ছিল দুই বিলিয়ন থেকে বিশ বিলিয়ন ডলার।[১]

১৯৮৪ সালে বিন লাদেন পেশোয়ারের বায়তুল আনসার গঠনের সাথে জড়িত ছিলেন। যার উদ্দেশ্য ছিল এমন একটি প্লাটফর্ম তৈরি করা যেখানে নতুন আগত স্বেচ্ছাসেবকদের রিসিভ করে ট্রেনিংয়ে পাঠানোর পূর্ব পর্যন্ত আপ্যায়ন করা হবে। সেই সময় বিন লাদেনের নিজস্ব প্রশিক্ষণ শিবির ছিল না। তাই নতুন আগত স্বেচ্ছাসেবকদের বিভিন্ন আফগান মুজাহিদ গ্রুপের নেতা যেমন সাইয়াফ, রাব্বানি অথবা হেকমতিয়ারের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। ১৯৮৬ সালের মধ্যে আফগানিস্তানের কয়েকটি অঞ্চলে বিন লাদেন নিজস্ব প্রশিক্ষণ শিবির স্থাপন করেন এবং ১৯৮৮ সালে তিনি একটি অফিস তৈরি করেন, যেখানে মুজাহিদদের নাম লিপিবদ্ধ রাখা হতো এবং কেউ শাহাদাত বরণ করলে তাদের পরিবারকে জানানো হতো। সেই অফিসটির নামই ছিল আল-কায়েদা (হেডকোয়ার্টার বা ভিত্তি) এবং এভাবেই সংগঠনটি এই নাম লাভ করেছিল। বেশিরভাগ ইসলামপন্থি সোর্স থেকে এটাই জানা যায় যে, সেই সময়ই আল-কায়েদার প্রাথমিক নেটওয়ার্ক গঠিত হয়েছিল।

১৯৮৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন তাদের সৈন্য প্রত্যাহার করে নেওয়ার প্রাক্কালে পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা ওসামাকে সতর্ক করে যে, তাকে এবং আব্দুল্লাহ আযযামকে সিআইএ গুপ্তহত্যার জন্য টার্গেট করেছে। এই সতর্কবাণীর পর বিন লাদেন সৌদি আরবে ফিরে আসেন। এর পরপরই আফগান জিহাদের ভাবপুরুষ আব্দুল্লাহ আযযামকে শহিদ করে দেওয়া হয়।

---

[১] Dilip Hiro, "The Cost of an Afghan "Victory", The Nation, 15 February 1999.

সৌদি আরব : বিন লাদেনের সংস্কার আন্দোলন

সৌদি সরকার ১৯৯০ সালের মাঝামাঝি সময়ে বিন লাদেনকে গৃহবন্দী করে এবং তার ভ্রমণের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। তারা সেই সময় তার একটি অফিসে হানা দেয় এবং সেটিকে পর্যবেক্ষণের আওতায় আনা হয়। বস্তুত একেবারে শুরু থেকেই সৌদি সরকার বিন লাদেনকে নিয়ে নিরাপত্তা ইস্যুতে ভুগছিল। তার তীব্র স্পষ্টভাষী বক্তৃতাসমূহ ক্যাসেটে রেকর্ড হতো এবং ব্যাপক আকারে সম্প্রচার হতো। সেগুলোতে তিনি এমনকি সৌদি জনগণকে ইরাকি বাথিস্ট শাসনব্যবস্থার হুমকি সম্পর্কেও সতর্ক করেছিলেন এবং তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ইরাক সমগ্র উপসাগরীয় অঞ্চলেই আগ্রাসনের পরিকল্পনা করছে। পরবর্তী কালে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রিন্স আহমাদ বিন আবদুল আজিজকে প্রেরিত একটি চিঠিতে বিন লাদেন কর্তৃক সকল ক্ষেত্রে ব্যাপক সংস্কার আনয়নের অনুরোধের বিষয়টি রয়্যাল ফ্যামিলির সদস্যরা মোটেই ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। সেই একই চিঠিতে বিন লাদেন পূর্বাভাস প্রদান করেন যে, সাদ্দাম হুসাইন কুয়েতে আগ্রাসন চালাতে পারে। প্রিন্স বিন আবদুল আজিজ উক্ত বিশ্লেষণে মনঃপূত হয়ে কেবল তাকে একটি সভায় আমন্ত্রণ করেছিল। শেষ পর্যন্ত কেউই তার সতর্কবার্তাতে কান দেয়নি। অবশেষে যখন ১৯৯০ সালের ২ আগস্ট সাদ্দাম হুসাইন কুয়েত আক্রমণ করেন, বিন লাদেন তাদের উদ্দেশে আরও একটি চিঠি লিখেছিলেন। সেখানে তিনি কুয়েতকে মুক্ত করার লক্ষ্যে নিজস্ব আরব-আফগান স্বেচ্ছাসেবীদেরসহ মুসলিমবিশ্বের বিভিন্ন জায়গা থেকে মুজাহিদদের আনয়ন করার পরামর্শ দেন এবং দাবি করেন, তিনি এক লক্ষ লোকবল সমৃদ্ধ একটি বাহিনী জড়ো করতে সক্ষম। কিন্তু এই চিঠিটিকেও উপেক্ষা করা হলো।

বিন লাদেন আমাকে বলেছিলেন, দেশকে প্রতিরক্ষার এবং কুয়েতকে মুক্ত করার লক্ষ্যে সৌদি সরকার কর্তৃক আমেরিকাকে আমন্ত্রণ জানানো ছিল তার জীবনের সবচেয়ে বড় ধাক্কা। তিনি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে, হাউজ অফ আল-সৌদ কীভাবে কুফফার সেনাদের পবিত্র স্থাপনার নিকটে ইসলামের সূচনালগ্নের পর এবং ইতিহাসে প্রথমবারের মতো আরব উপদ্বীপের মাটিতে স্বাগত জানাল।

বিন লাদেন তখনই আশঙ্কা করেছিলেন যে, আরব ভূখণ্ডে আমেরিকান সৈন্যদের স্বাগত জানানোর দ্বারা সৌদি সরকার আফগানিস্তানের ঘটনাসমূহের মতো অবিকলভাবে বিদেশি দখলদারিতে পতিত হবে ঠিক যেভাবে কাবুলের কমিউনিস্ট সরকার প্রথমে সোভিয়েতদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। বিন লাদেনও যেভাবে আফগানিস্তানে সোভিয়েত দখলদারির বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নিয়েছিলেন, সেভাবেই তিনি তখন আরব উপদ্বীপে আমেরিকান দখলদারির বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে

নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এবার তিনি সৌদি কর্মকর্তাদেরকে কিরূপ পদক্ষেপ তাদের নেওয়া উচিত বা উচিত নয়, এ বিষয়ে কোনো পরামর্শ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কারণ তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, তাদের সাথে যোগাযোগ করা পুরোপুরি অনর্থক।

বিন লাদেনের সামনে তখন প্রধান দুটি লক্ষ্য ছিল। প্রথমত প্রখ্যাত সৌদি আলেম শাইখ বিন উসাইমিনের একটি ফতোয়া। যাতে বিবৃত হয়েছিল—সকল মুসলিম, বিশেষ করে আরব উপদ্বীপের মুসলিমদের জন্য এটা বাধ্যতামূলক (ফরজ) যে, দখলদারির বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। বিন লাদেন সৌদি যুবকদের আফগানিস্তানে প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন এবং ব্যাপক সংখ্যক সৌদি যুবক তার সেই ডাকে সাড়া দিয়েছিল।

দ্বিতীয়ত বিন লাদেন আরও সিদ্ধান্ত নেন যে, 'অফিশিয়াল সিনিয়র স্কলারস অ্যাসোসিয়েশন'-এর পরিবর্তে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ সংখ্যক আলেমকে একটি স্বাধীন এবং স্ব-শাসিত ধর্মীয় সংগঠনে একত্রিত করতে হবে, যারা জনসাধারণের নিকট নির্ভরযোগ্য একটি রেফারেন্স হবে। কারণ উক্ত ওলামাদেরকে বিন লাদেন আর বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তিনি প্রত্যক্ষ করছিলেন, তাদের ধর্মীয় বিধিনির্দেশগুলো শরিয়াহর সঠিক ব্যাখ্যার ওপর ভিত্তি করে নয়, বরং সরকারের আদেশ মোতাবেক হচ্ছে। তিনি তখন বিদেশি কাফের সৈন্যদের সহায়তা চাওয়া সৌদি সরকারের জন্য বৈধ নাকি অবৈধ, তা জানতে চেয়ে একটি স্বাধীন ফতোয়া আহ্বান করেন।

অতঃপর, বিন লাদেন অনির্দিষ্টকালের জন্য মাতৃভূমি ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু সমস্যাটি হলো তার পাসপোর্ট ইতিমধ্যেই জব্দ করা হয়েছিল। রয়্যাল ফ্যামিলির সাথে তার পরিবারের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগকে কাজে লাগিয়ে এবং কিছু ব্যবসায়িক অজুহাত দাঁড় করিয়ে তিনি অবশেষে পাকিস্তান ভ্রমণের একটি অনুমতি জোগাড় করে ফেলেন। অনেক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর কেবল একটি একক ভ্রমণের অনুমতি দিয়ে তাকে পাসপোর্ট ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

সুদানে বিন লাদেনের রাজনৈতিক জিহাদ

পাকিস্তানে আগমনের পর প্রথমে বিন লাদেন আফগান সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলোতে ভ্রমণ করেন এবং দেখতে পান যে, যে সকল মুজাহিদ একসময় পরস্পর সহচর হিসেবে লড়াই করেছিল, তারা এখন প্রতিদ্বন্দ্বী আফগান সেনাপতিদের সাথে সাথে বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং হিংসাত্মক দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছে। প্রথমদিকে বিন লাদেন পরিস্থিতি শান্ত করার প্রচেষ্টা চালান। তিনি আরবদেরকে এসবের মধ্যে না জড়ানোর উপদেশ দেন এবং আফগান বিরোধী

নেতাদের মধ্যবর্তী বিরোধ মেটানোর আশায় মধ্যস্থতা করার চেষ্টা করেন। তার এ সকল প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ তিনি বিনিময় হিসেবে যা পেয়েছিলেন, সেটা ছিল প্রাণনাশের হুমকি। তিনি তখন সুদানে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নেন। সেখানে ১৯৮৯ সালে 'দ্য ইসলামিক স্যালভেশন রেভ্যুলেশন পার্টি' সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা গ্রহণ করেছিল। বিন লাদেন ভেবেছিলেন যে, তিনি সেখানে মুক্তভাবে কাজ করতে সক্ষম হবেন।

তার কয়েকজন সহচর সহকারে একটি প্রাইভেট জেটবিমানে করে তিনি পুরোপুরি গোপনীয়ভাবে সুদানের উদ্দেশে ১৯৯১ সালের ডিসেম্বর মাসে যাত্রা করেন। সেখানে পৌঁছেই তার কোম্পানি অনেকগুলো নির্মাণ এবং কৃষি প্রকল্পে হাত দেয় এবং তিনি তার নিজস্ব 'পলিটিকাল জিহাদ'-এর রাস্তাকেও সুগম করতে থাকেন। তিনি ইসলামিক বিপ্লবকে উদ্দীপিত করে সাক্ষাৎকার এবং সংবাদপত্রে বার্তা দেওয়া শুরু করেন। তিনি তার নিজস্ব টাকার বিশাল অংশ বিনিয়োগ করেছিলেন বিভিন্ন বৃহৎ মাপের নির্মাণ প্রকল্পে, যেমন পোর্ট সুদানের এয়ারপোর্ট নির্মাণ, খার্তুম এবং পোর্ট সুদানের মাঝের ৪০০ কিলোমিটার হাইওয়ে নির্মাণ ইত্যাদি ইত্যাদি। তিনি আল-জাজিরা জেলায় কৃষি প্রকল্পে ব্যাপক বিনিয়োগ করেছিলেন এবং হাজার হাজার একর জমিতে গম ও সূর্যমুখী চাষ করেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, সুদানে তার নিজস্ব বিনিয়োগই ছিল প্রায় ২০০ মিলিয়ন ডলারের মতো। তবে সেসব প্রজেক্টে সৌদি সরকারেরও বিনিয়োগ ছিল।

বিন লাদেন অনেক আরব-আফগানকে সেসব প্রজেক্টে নিয়োগ দিয়েছিলেন, যারা একদা তার সাথে সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে লড়েছিল। সুদানে তাদের ফ্যামিলিকেও নিয়ে আসার জন্য উৎসাহিত করতেন। তাদের অনেকেই ছিল মিশরীয় এবং 'জামায়াতে ইসলামিয়াহ', 'ইসলামিক জিহাদ' প্রভৃতি চরমপন্থি গ্রুপের সদস্য। মিশরীয় সরকারকে এই বিষয়টি খুবই উদ্বিগ্ন করে তোলে। তখন তারা সৌদি সরকারের বিরুদ্ধে একটি বিদ্বেষপূর্ণ মিডিয়া ক্যাম্পেইন পরিচালনা করে এবং সৌদিকে সন্ত্রাসবাদের বিনিয়োগকারী ও সহায়তাকারী হিসেবে অভিযুক্ত করে প্রোপাগান্ডা চালায়। এতে সৌদি সরকার খুব চাপের মধ্যে পড়ে যায় এবং তারা নতিস্বীকার করতে বাধ্য হয়। তারা বিন লাদেনের নাগরিকত্ব কেড়ে নেয় এবং তাকে ত্যাজ্য করে দেয়, সাথে সাথে সুদানে সৌদি কর্তৃক তার প্রজেক্টে সকল প্রকার বিনিয়োগও বন্ধ করে দেয়। সর্বশেষটির অজুহাত হিসেবে তারা কুয়েত আগ্রাসনে সাদ্দাম হুসাইনকে সুদান সরকার কর্তৃক সমর্থনকে দায়ী করেছিল।

বিন লাদেন আমার কাছে বর্ণনা করেছিলেন যে, সুদানে তিনি যে সময়টুকু অতিবাহিত করেন সেটা ছিল তার জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এবং ফলপ্রসূ সময়। তখন তিনি সমগ্র মুসলিমবিশ্ব থেকে আগত বিভিন্ন মুসলিম স্কলারদের সাথে

সাক্ষাৎ করতেন। সুদানের হাসান আল-তুরাবির সাথেও তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, যিনি তখন ধার্মিক ও সেক্যুলার উভয় ধরনের নেতাদেরকেই একত্রিত করার মাধ্যমে আমেরিকা-বিরোধী একটি নতুন রাজনৈতিক সংঘ গড়ে তোলার চেষ্টা করছিলেন। ১৯৯১ সালে 'দ্য আরব ইসলামিক পিপলস কংগ্রেস' এর প্রথম সম্মেলনটি সুদানেই প্রথম অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেখানে অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন পরিসরে মতামত এবং নিজস্ব দর্শন উপস্থাপন করেন। সেখানে বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন—গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার, আবদুর রাসুল সাইয়াফ, প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন-এর প্রধান ইয়াসির আরাফাত, হামাসের খালেদ মিশাল, হিজবুল্লাহর মুঘনিয়েহ, ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট ফর দ্য লিবারেশন অফ প্যালেস্টাইন-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং সেক্রেটারি জেনারেল নায়েফ হাওয়াতিমাহ, ইসলামিক জিহাদ মুভম্যান্ট ইন প্যালেস্টাইন-এর প্রধান ফাতহি শাক্কাকি প্রমুখ এবং সমগ্র মুসলিমবিশ্ব থেকে বিভিন্ন জিহাদি গোষ্ঠী এবং মুসলিম ব্রাদারহুডের আরও বহু প্রতিনিধি। অনেক পশ্চিমা মিডিয়াই এই ঘটনাটিকে বর্ণনা করেছিল 'সন্ত্রাসবাদের সম্মেলন (Terrorism Conference)' হিসেবে।

আমিও সেই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলাম। প্রকৃতপক্ষে এর লক্ষ্য ছিল আরব লীগের একটি বিকল্প তৈরি করা এবং যারা ১৯৯১ সালে ইরাকে আমেরিকার আগ্রাসনের বিরোধিতা করেছিল তাদের নিয়ে একটি প্লাটফর্ম তৈরি করা এবং বিদেশি শক্তি কর্তৃক এরূপ সামরিক আগ্রাসনকে যেসব আরব শাসনব্যবস্থা সমর্থন করেছিল তাদের বিরুদ্ধাচরণ করা। এই প্রসঙ্গের মাধ্যমে বিন লাদেন সুদানে তার অবস্থানকে আরও দৃঢ় করলেন। এ ছাড়াও আফগানিস্তান জিহাদের পর যেসব আরব মুজাহিদদের তাদের মাতৃভূমিতে ফিরে আসতে বাধা দেওয়া হচ্ছিল, তাদের নিয়ে এবং অন্যান্য জিহাদি আগ্রহীদের নিয়ে বিন লাদেন একটি নিরাপদ দুর্গ প্রতিষ্ঠা করতে লাগলেন।

বিন লাদেন এই বিষয়টি নিয়েও খুব গর্বিত ছিলেন যে, তিনি তার কৃষি প্রকল্পের মাধ্যমেও আমেরিকাকে পরাস্ত করে যাচ্ছিলেন। তিনি আমার কাছে গর্ব করে বলেছিলেন যে, তিনি তখন রেকর্ডভঙ্গকারী এত বিশাল আকারের সূর্যমুখী উৎপাদনে সক্ষম হয়েছিলেন যে, আমেরিকানরা তাদের এত উন্নত কৃষি-প্রযুক্তি থাকার পরও তার সাথে পাল্লা দিয়ে পারেনি।

ইতিমধ্যে সুদানের অভ্যন্তরে যদিও বিন লাদেনের কর্মকাণ্ড ছিল মূলত রাজনৈতিক, কিন্তু তিনি অন্যত্র দুটি অপারেশনের মাধ্যমে আমেরিকান সৈন্যদের ওপর হামলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। আল-কায়েদা তাদের প্রথম আক্রমণে ১৯৯২ সালে ইয়েমেনের এডেনে গোল্ডমৌর হোটেলে আমেরিকান সৈন্যদের ওপর তাদের যাত্রাপথে বোমা হামলা চালায়। এতে তিনজন মারা যায় এবং পাঁচজন

আহত হয়। এরপর তারা ১৯৯৩ সালে সোমালিয়ার মোগাদিশুতে দুটি ব্ল্যাকহক হেলিকপ্টার ভূপাতিত করে। মোগাদিশু হামলার মাস্টারমাইন্ড ছিলেন আল-কায়েদার তৎকালীন মিলিটারি কমান্ডার আবু উবায়দা আল-পানশিরি, যিনি ১৯৯৬ সালে লেক ভিক্টোরিয়ায় একটি ফেরি দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিলেন। এই হামলার পর আমেরিকা অতি দ্রুত তাদের সেনাদেরকে সোমালিয়া থেকে প্রত্যাহার করে নেয়। এটা নিয়ে বিন লাদেন পরবর্তী সময়ে আমাকে আক্ষেপ করে বলেছিলেন যে, তিনি সেখানে তাদের বিরুদ্ধে একটি ক্ষয়কারী যুদ্ধ চাপিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। (যেটা বর্তমানে ইরাকে খুব ভালোভাবেই সফল হচ্ছে।)

সুদান সরকার তখন মিশর, সৌদি আরব এবং আমেরিকার ক্রমবর্ধমান চাপের কারণে ১৯৯৪ সাল থেকেই বিপজ্জনক হয়ে ওঠা বিন লাদেন থেকে পরিত্রাণের উপায় খুঁজছিল। ইতিমধ্যেই তিনি বেশ কয়েকটি হত্যাচেষ্টার হাত থেকে বেঁচে যান। এর মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহটি হলো, একজন লিবিয়ানের নেতৃত্বাধীন তিন জনের একটি দল বিন লাদেন যে মসজিদে নামাজ পড়তেন, সেই মসজিদে ঝড়ের বেগে প্রবেশ করে এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে থাকে। কিন্তু যখন তারা সেখানকার জীবিত কিংবা মৃতদের মধ্যে তাকে খুঁজে পেল না, তখন তারা খার্তুমে তার কোম্পানির অফিসগুলোতে তাকে খুঁজতে লাগল এবং তারপর পূর্ব সুদানের আল-রিয়াদ জেলায় তার বাসভবনেও তল্লাশি চালিয়েছিল। জনশ্রুতি রয়েছে যে, সেই সময়কার বিন লাদেনের ওপর চালানো হত্যাচেষ্টাগুলোতে সুদান সরকারের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মদদ ছিল।

মুহাম্মাদ আতেফ ওরফে আবু হাফস আল-মাসরি আমাকে জানিয়েছিলেন, সেই সময় বিন লাদেন খুবই আড়ষ্টতা অনুভব করতে থাকেন। ১৯৯৪ সালেই সুদান স্পষ্টভাবে তার উপস্থিতি নিয়ে নাখোশ ছিল এবং সৌদি আরবও তার নাগরিকত্ব কেড়ে নিয়েছিল। বিন লাদেন অনুভব করলেন তাকে এখন দুটি অবস্থার যেকোনো একটিকে বেছে নিতে হবে।

তিনি হয়তো সৌদি আরবে ফিরে যেতে পারেন এবং তার বাকি জীবন সেখানে কারাবাস বা গৃহবন্দি হয়ে কাটাতে পারেন। অথবা তিনি তার শত্রুদের বিরুদ্ধে পুরোদস্তুর সামরিক অভিযান শুরু করতে পারেন যে পর্যন্ত না তিনি ধরা পড়েন, অথবা মৃত্যুবরণ করেন।

মুহাম্মাদ আতেফের তথ্যানুসারে, তখনই রাজনৈতিক কার্যকলাপ থেকে বিন লাদেন তার মনোযোগ স্থানান্তরিত করে একটি শক্তিশালী সামরিক সংগঠন গড়ে তোলার প্রতি মনোযোগী হন। যাতে করে তিনি আমেরিকার সামরিক, প্রশাসনিক এবং ব্যবসায়িক লক্ষ্যবস্তু, বিশেষ করে প্রথমত, এরাবিয়ান পেনিনসুলার টার্গেটগুলোতে হামলা চালাতে পারেন।

ইজিপশিয়ান ইসলামিক জিহাদ (ড. আইমান আল জাওয়াহিরির নেতৃত্বাধীন) এবং জামায়াতে ইসলামিয়াহ (রিফাই আহমাদ ত্বহার নেতৃত্বাধীন) এর নেতাদের সাথে অনেকগুলো ক্রমিক বৈঠকের পর বিন লাদেনের সহিংসতার পথে পদার্পণের সিদ্ধান্ত আরও দৃঢ় হয়।

বিন লাদেনের ওপর আল-জাওয়াহিরির বৃহত্তর প্রভাব বিদ্যমান ছিল। এই বইয়ে এটা নিয়ে পরবর্তী সময়ে আরও বিস্তারিত বিশ্লেষণ করা হবে। সেই সময় তাঁর ভাবাদর্শ ছিল অনন্য ধরনের, যেখানে সালাফি-জিহাদি দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্যান-অ্যারাবিক মৌলবাদের মিশ্রণ ছিল, যেটা বর্তমান ইরাক বিপ্লবের একটি প্রধান শক্তি হিসেবে উদীয়মান। আল-জাওয়াহিরি বিন লাদেনকে স্থানীয় ইসলামিক ইস্যু, যেমন বসনিয়া, চেচনিয়া, আলজেরিয়া, কসোভো, থাইল্যান্ড ইত্যাদি থেকে দৃষ্টি সরিয়ে আন্তর্জাতিক ইসলামি ইস্যু, যেমন ফিলিস্তিন, ইরাক ইত্যাদির ওপর মনোযোগ নিবদ্ধ করতে প্রণোদিত করেন। আল-জাওয়াহিরির সাথে বিন লাদেনের সম্পর্ক জোরদার হওয়ার সাথে সাথে, বিন লাদেনের স্ট্র্যাটেজিসমূহ ব্যাপক বিস্তৃত হতে থাকে এবং তিনি সকল পরিস্থিতিতে এবং সকল রণক্ষেত্রে আমেরিকা এবং এর স্বার্থসমূহকে ধ্বংস করার সামর্থ্য অর্জন করতে থাকেন। বৈশ্বিক জিহাদের ধারণা, যেটি বর্তমান আল-কায়েদার মূল স্ট্র্যাটেজি, এর উৎপত্তি ঘটেছিল সেসময়ই।

১৯৯৫ সালে রিয়াদে আল-কায়েদার বোমা হামলায় সৌদি ন্যাশনাল গার্ডের একটি গেস্ট হাউজে তিন জন আমেরিকান সামরিক বিশেষজ্ঞসহ মোট পাঁচ জন নিহত হয়। এই ঘটনা বিন লাদেনকে বহিস্কৃত করার জন্য সুদানের ওপর চাপকে আরও বৃদ্ধি করে তোলে। সেসময় যখন তিনি জানতে পেরেছিলেন যে, সৌদি এবং সুদানিস কর্মকর্তাদের মাঝে আলাপ-আলোচনার আয়োজন হচ্ছে, তখন তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, তাকে রিয়াদের কাছে হস্তান্তর করার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। অতএব, তিনি একটি টেকসই নির্গমন কৌশল খুঁজতে লাগলেন।

সেসময় বিন লাদেন ক্রমবর্ধমানভাবে তিক্ত এবং সন্দেহপ্রবণ হয়ে উঠতে লাগলেন। তিনি আর কাউকেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। ফলে বিন লাদেন সুদান সরকারকে নিয়ে খুব সতর্ক হয়ে গেলেন। তিনি আমার কাছে তাদের প্রতি কোনো প্রকারের অভিযোগ করতে অস্বীকৃতি জানান। এমনকি তিনি আমাকে তার সাথে সাক্ষাৎকারের একটি অংশকে প্রকাশ না করতে অনুরোধ জানান। যেখানে তিনি তার বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হওয়া এবং সুদান সরকার ও ওমর আল-বশির কর্তৃক তাকে পেছন থেকে ছুরি মারার ঘটনাকে তুলে ধরেছিলেন। ১৯৯৬ সালে আল-বশিরের সাথে বিন লাদেনের একটি ব্যক্তিগত মিটিং হয়েছিল, যেখানে আল-বশির তাঁকে আশ্বস্ত করেছিলেন যে, এখনও অবধি বিন লাদেন সুদানে

সমাদৃতই আছেন এবং তাকে কখনোই দেশ ত্যাগের আদেশ প্রদান করা হবে না। তবে সেই বৈঠকেই আল-বশির তাকে এটাও বলেছিলেন যে, সুদান সরকার তাঁকে হত্যাচেষ্টার আয়োজন থেকে রক্ষা করার শক্তি রাখে না। বিন লাদেন তার সেই সূক্ষ্ম বার্তার মর্ম উপলব্ধি করতে পারলেন এবং তিনি স্বেচ্ছায় দেশ ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি আফগান মুজাহিদদের মধ্য থেকে তার পুরোনো বন্ধু শাইখ ইউনুস খালিস, ব্রিগেডিয়ার জালালউদ্দিন হাক্কানি প্রমুখের সাথে যোগাযোগ করলেন—যারা সেই সময় জালালাবাদ অঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখতেন। এটা ছিল কান্দাহারের বাইরে তালেবানের প্রভাব বিস্তারের পূর্বের সময়কার কথা। এটা সেই সময়ের কথা, যখন বিভিন্ন আফগান অঞ্চল বিভিন্ন আফগান গ্রুপ কর্তৃক শাসিত হতো।

আফগানিস্তানে পুনর্গমন : বৈশ্বিক জিহাদের আহ্বান

অবশেষে বিন লাদেন ১৯৯৬ সালের মে মাসে একটি ব্যক্তি মালিকানাধীন বিমানে করে জালালাবাদের উদ্দেশ্যে সুদান ত্যাগ করেন। বিমানটি ছিল ১২ জন যাত্রী ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি চার্টার্ড প্লেন। এর পাইলট ছিল একজন রাশিয়ান, যে একটি আরবি শব্দও বলতে পারত না এবং সে কাদেরকে পরিবহন করছে সে সম্পর্কে আগে থেকে তাকে কোনো ইঙ্গিতও দেওয়া হয়নি। বিন লাদেনের সহযাত্রীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তার ব্যক্তিগত দেহরক্ষী হামুদ আল জুবাইর (২০০১ সালে আফগানিস্তানে মার্কিন হামলায় নিহত), সাইফ আল-আদল আল-মাসরি এবং বিন লাদেনের দুই পুত্র সা'দ এবং উমর।

পাইলটের ওপর সাইফ আল-আদলের তেমন কোনো ভরসা ছিল না। তিনি তাঁকে আগামভাবে তাদের গন্তব্য সম্পর্কেও জানাননি। আফগানিস্তানের আকাশসীমার একেবারে নিকটবর্তী হওয়ার পরই তাকে তাদের গন্তব্য সম্পর্কে অবহিত করেন। সমগ্র যাত্রাজুড়েই তিনি সামনের সিটে একেবারে পাইলটের পাশে বসেছিলেন এবং তাঁর রাইফেলটি তার কোলের ওপরে রেখে নেভিগেশন যন্ত্রপাতি চেক করছিলেন। প্লেনের অন্যান্য আল-কায়েদার সদস্যদের সকলেই সশস্ত্র ছিল। (বিন লাদেন আমাকে তোরাবোরা ভ্রমণের সময় এই ঘটনাটিকে কৌতুক-রসবোধ সহকারে বর্ণনা করেছিলেন; তবে আমি কেবল এটাই কল্পনা করতে পারছিলাম যে, সেই পাইলট কি পরিমাণ আতঙ্কিত হয়েছিল!)

উক্ত যাত্রাটি ছিল খুবই গোপনীয়। কেবল প্রেসিডেন্ট আল-বশির এবং গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান এয়ারপোর্ট থেকে তাদের প্রস্থানের সময় সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন। অপর পক্ষ থেকে সহায়তার দায়িত্ব ছিল ইসলামিস্ট আফগান গ্রুপ হিজবে ইসলামির ইঞ্জিনিয়ার মাহবুব এবং এই দলের প্রধান ইউনুস খালিসের ওপর।

উভয়জনই ব্যক্তিগতভাবে তাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য বিমানবন্দরে এসেছিলেন।

সুদান থেকে প্রস্থানের পরপরই বিন লাদেন তিনটি বৃহত্তর অর্থনৈতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হন। প্রথমত, তার সমস্ত সম্পত্তিকে সৌদি সরকার বাজেয়াপ্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়। যখন বিন লাদেন খোবার টাওয়ারে বোমা হামলার প্রশংসা করেন তখন থেকেই তারা বিন লাদেনের ওপর খুব চটে ছিল। তারা তখন জোর দিয়ে বলল যে, কেবল পরিপূর্ণভাবে ক্ষমা চেয়ে দেশের প্রত্যাবর্তন ছাড়া কোনো কিছুকেই তারা মেনে নেবে না। অনুমান করা হয়, সৌদি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তার জব্দকৃত সম্পত্তি—যেগুলো একটি অফিশিয়াল এজেন্সির আওতায় আনা হয়েছিল—এর পরিমাণ ছিল ২০০ থেকে ৩০০ মিলিয়ন ডলারের সমতুল্য। তবে সৌদি গোয়েন্দা সংস্থার সাবেক প্রধান প্রিন্স তুর্কি আল-ফয়সাল মনে করেন, এখনও বিন লাদেন গোপন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট কারেন্সির মাধ্যমে ৫০ মিলিয়ন ডলার সমতুল্যের ব্যবসার ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখেন।

বিন লাদেন আমাকে জানিয়েছিলেন যে, তিনি পরবর্তী সময়ে এমন একটি পত্র পান—যেটি তাকে কান্দাহারের ভ্রমণে আসা তার মা এবং চাচার মাধ্যমে দেওয়া হয়েছিল—যাতে সৌদি সরকার কিছু নির্দিষ্ট শর্তের আওতায় তার সকল সম্পত্তিকে সচল করা এবং সেগুলোর মূল্য বৃদ্ধি করে অর্ধ বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত করার প্রস্তাব দিয়েছিল। সেই ২০০ থেকে ৩০০ মিলিয়ন ডলার সম্পত্তির দখল ফিরে পাওয়ার শর্তসমূহ ছিল—তাকে সৌদিতে ফিরে যেতে হবে এবং আগমনের সাথে সাথে বিমানবন্দরেই ঘোষণা করতে হবে যে, সৌদি রয়্যাল ফ্যামিলি শরিয়াহর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করছে এবং সৌদি বাদশা একজন সত্যিকারের মুসলিম যিনি ইসলামের সকল অনুশাসন মেনে চলছেন। এরূপ শর্তের কারণ ছিল বিন লাদেন পুরোপুরি প্রকাশ্যে হাউজ অফ আল-সৌদকে ব্লাসফেমি এবং ইরতিদাদ (ধর্মদ্রোহীতা) এর জন্য অভিযুক্ত করেন, যেগুলোর একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। শরিয়াহ মোতাবেক এসব অভিযোগে অভিযুক্তদের রক্তপাত বৈধ। পাশাপাশি এর কারণে জনগণের জন্য বাদশাকে পদচ্যুত করা এবং রয়্যাল ফ্যামিলির পতন ঘটানো ধর্মীয়ভাবেই বাধ্যতামূলক (ফরজ) দায়িত্ব হয়ে পড়ে।

বিন লাদেন দ্বিতীয় যে অর্থনৈতিক আঘাতের শিকার হন সেটি ছিল, পোর্ট সুদান এবং খার্তুমের মধ্যবর্তী হাইওয়েসহ সুদানের অন্যান্য যেসকল প্রজেক্ট তিনি সম্পন্ন করেন, সুদান সরকার কর্তৃক সেগুলোর মূল্য পরিশোধে অক্ষমতা। বিন লাদেন আমাকে জানিয়েছিলেন, তিনি সেসব প্রজেক্টে প্রায় ১৬৫ মিলিয়ন ডলার ক্ষতির সম্মুখীন হন এবং তিনি তার বিনিয়োগসমূহ থেকে ১০ শতাংশের বেশি অর্থ পুনরুদ্ধার করতে পারেননি। তিনি আরও বলেছিলেন যে, যখন তিনি আল-

বশিরের সাথে তার পাওনা ফিরে পাওয়া নিয়ে আলোচনা করছিলেন, তাকে বলা হয়েছিল, সুদানের কোষাগার একেবারে শূন্য এবং তারা কেবল গম, ভুট্টা এবং গবাদিপশু ইত্যাদির মাধ্যমে তার পাওনা পূরণে সক্ষম, যেগুলো তিনি অন্যান্য দেশে বিক্রয় করে তার লোনকে তুলে নিতে পারবেন। (অতঃপর বিন লাদেন তোরাবোরায় আমার কাছে সেই কৌতুকময় মন্তব্য করেছিলেন যে, 'কেউ কি এমন আছে, যে কোনো কুখ্যাত পলাতক থেকে এরূপ কোনো পণ্য দ্রব্য ক্রয় করবে?' তবে ড. মুহাম্মাদ আল-মাসারি নামক লন্ডনে বসবাসরত একজন সৌদি সংস্কারবাদী ও আল-কায়েদা বিশেষজ্ঞ আমাকে বলেছিলেন, তার এখনও পরিষ্কার মনে আছে যে, ১৯৯৮ সালে বিন লাদেন প্রেরিত মিশনে একটি আল-কায়েদা প্রতিনিধিদল খাদ্যশস্য বিক্রয়ের জন্য লন্ডনে এসেছিল।)

সর্বশেষ, তৃতীয় ধাক্কাটি ছিল, তার অনেকগুলো ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়া হয় যখন সেগুলোর সাথে তার সম্পৃক্ততা সৌদি সরকারের কাছে ফাঁস হয়ে যায়। এর জন্য দায়ী ছিল বিন লাদেনের এক আত্মীয়ও। সে ছিল বিন লাদেনের এক ভাগ্নি-জামাতা এবং লন্ডনের এক সাবেক বাসিন্দা। সে সৌদি গোয়েন্দা সংস্থার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল এবং লন্ডন থেকে আরব আমিরাত হয়ে অতঃপর রিয়াদে গমন করেছিল। সেখানে সে কেবল তার ঘরে ফেরার পথকে কণ্টকমুক্ত করার জন্য আল-কায়েদার কিছু অর্থনৈতিক গোপন তথ্য ফাঁস করে দেয়।

তবে যে জিনিসটি বিন লাদেনকে সবচেয়ে বেশি দুঃখিত করেছিল সেটি হলো, সুদানের স্পষ্ট প্রতীয়মান অকৃতজ্ঞতা। এটি তাকে আরও বেশি ব্যথিত করেছিল এই কারণে যে, তারা কেবল সামান্য কিছু সুবিধা পাওয়ার আশ্বাসের বদলে একেবারে বিনা পয়সায়ই তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে।

খোবার টাওয়ারে বোমা হামলা আল-কায়েদার জন্য একটি বড় টার্নিং পয়েন্ট ছিল। বিন লাদেন তৎক্ষণাত সেটা স্বীকার করেননি এবং সৌদি সরকার এটি জাহির করতেই আগ্রহী ছিল যে, এটি শিয়া জঙ্গি সংগঠনগুলোর কাজ। সৌদি সরকার ঘটনা পরবর্তী আমেরিকান তদন্তকে সহায়তা করতেও অস্বীকৃতি জানায় এবং এই হামলার পরিকল্পনার অভিযুক্ত কিছু বন্দিকে জিজ্ঞাসাবাদ করার অনুমতিও দেয়নি। সেই সময় আল-কায়েদা এক ঘনিষ্ঠ সূত্র জানিয়েছিল যে, সৌদি ন্যাশনাল গার্ড কোয়ার্টারস হামলাটি একজন আল-কায়েদা নেতাকে নির্যাতন করার প্রতিশোধস্বরূপ ছিল।

অন্যদিকে সৌদি সরকার কর্তৃক রিয়াদে বোমা হামলায় অভিযুক্ত চারজনকে টেলিভিশনে অপরাধ স্বীকার করতে বাধ্য করা এবং তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার প্রতিশোধ নিতে খোবার টাওয়ারে হামলা করা হয়। কারণ, তারা সেই হামলার সাথে কোনোভাবেই জড়িত ছিল না।

খোবার হামলার কিছুদিন পর, ১৯৯৬ সালের আগস্ট মাসে বিন লাদেন আল-কুদস আল-আরাবিকে তার 'Declaration of Jihad Against the Americans Occupying the Land oh the Two Sacred Places' বার্তাটি ফ্যাক্সের মাধ্যমে প্রেরণ করেন। সেই বার্তাটিকে এ আর সি (ARC) এর নামে প্রকাশ করা হয়নি। অথচ সৌদি আরবের পরিস্থিতিসমূহের সমালোচনা করে সুদানে থাকাকালে তার বার্তাগুলোতে এ আর সি (ARC) এর সিল থাকত। সেই বারো পৃষ্ঠার ডকুমেন্টে বিন লাদেন ব্যক্তিগতভাবে স্বাক্ষর করেছিলেন।

এই ঘটনার পর বিন লাদেনকে তাদের কাছে হস্তান্তর করার জন্য ইসলামাবাদের সৌদি রাষ্ট্রদূত শাইখ ইউনুছ খালিস (তিনি সৌদি পাসপোর্টধারী ছিলেন এবং রয়্যাল ফ্যামিলির সাথেও তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল) এবং জালালউদ্দিন হাক্কানির ওপর ক্রমাগত চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। কিন্তু তারা সরাসরি অস্বীকৃতি জানান এবং এ ব্যাপারে একটি যৌথ বিবৃতি প্রদান করেন। তারা বলেন, 'যদি একটি চতুষ্পদ জন্তুও আমাদের আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে তাকে নিরাপত্তা দেওয়া ব্যতীত আমরা অন্য কোনো বিকল্প চিন্তা করি না। তাহলে কীভাবে আমরা এমন একজন ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করব, যিনি আল্লাহর জন্য এবং আফগান জিহাদের নিমিত্তে নিজেকে এবং তার সমুদয় সম্পত্তিকে উৎসর্গ করেছেন?'

প্রাথমিকভাবে বিন লাদেন তালেবানদের নিয়ে সতর্ক ছিলেন। কিন্তু ১৯৯৬ সালের গ্রীষ্মে তালেবান আমির মোল্লা ওমরের সাথে তার প্রথম সাক্ষাতের পর তিনি তাদের সাথে একটি ভালো সম্পর্ক গড়ে তুলতে শুরু করেন। মোল্লা ওমরও তার আরব অতিথির নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণ এবং মুজাহিদিনের দলাদলিতে পক্ষবলাম্বনের অস্বীকৃতিকে ব্যাপক প্রশংসা করেছিলেন। অতঃপর বিন লাদেন মোল্লা ওমরকে তার আনুগত্য (বাইয়াত) প্রদানের সিদ্ধান্ত নিলেন এবং তিনি তাঁর অনুসারীদেরকে আমিরের পতাকাতলে আসার নির্দেশ দেন। তালেবানবিরোধী উত্তরাঞ্চলীয় জোটের সাথে যুদ্ধ করার জন্য বিন লাদেন তার ৩০০ জন দক্ষ এবং কষ্টসহিষ্ণু মুজাহিদিনের একটি গ্রুপকে তাজিক অঞ্চলে প্রেরণ করেছিলেন। এই ঘটনাটি বিন লাদেন পরবর্তী সময়ে খুব বিষণ্নতা নিয়ে বর্ণনা করেছিলেন যে, উক্ত যাত্রাপথে সেসব যোদ্ধাদের অনেকেই সেই অঞ্চলের রূঢ় পরিবেশের সাথে টিকতে না পেরে ঠান্ডায় মারা যায়। যদিও বলা হয়ে থাকে, মোল্লা ওমর ও বিন লাদেনের মাঝে একটি পারিবারিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল মোল্লা ওমরের কন্যাকে বিন লাদেনের বিবাহ করার মাধ্যমে, কিন্তু সেসব কথা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

এদিকে সৌদি সরকার যখন দেখতে পেল যে, তালেবানরাই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, তখন তারা তাদের মন জয় করে নিতে চাইল। কাবুল পতনের পর সৌদি আরব তালেবানকে আফগানিস্তানের বৈধ শাসক হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। তারা

শুরার প্রত্যেক সদস্যকে হজের নিমন্ত্রণ জানায়। তালেবান প্রধানমন্ত্রী শেখ মুহাম্মাদ রাব্বানি সেটি কবুল করেন।

যখন মোল্লা ওমর এবং ওসামা বিন লাদেনের মধ্যকার সম্পর্ক যথেষ্ট দৃঢ় হলো এবং আফগানিস্তানে আল-কায়েদার নিরাপত্তা নিশ্চিত হলো, বিন লাদেন তখন আমেরিকার বিরুদ্ধে সুকঠিন পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। ১৯৯৮ সালের শুরুতে তিনি ১৯৯৬ সালের তার পূর্বের বার্তা—যেখানে তিনি আরব উপদ্বীপ থেকে আমেরিকান সৈন্যদের বিতাড়িত করার আহ্বান জানান—এর সমর্থনে চল্লিশ জন আফগান এবং পাকিস্তানি আলেমদের স্বাক্ষরিত একটি ফতোয়া জারি করেন। ১৯৯৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি এবং জাওয়াহিরি 'ওয়ার্ল্ড ইসলামিক ফ্রন্ট ফর জিহাদ অ্যাগেইনস্ট দ্য জিউস অ্যান্ড ক্রুসেডারস' গঠনের ঘোষণা দেন। প্রকৃতপক্ষে সেটি ছিল বিভিন্ন জিহাদি সংগঠন যেমন আল-জাওয়াহিরির 'ইজিপশিয়ান ইসলামিক জিহাদ', রিফাই ত্বহা পরিচালিত 'ইজিপশিয়ান জামায়াতে ইসলামিয়াহ' এবং পাকিস্তান ও অধিকৃত কাশ্মীরের বিভিন্ন গোষ্ঠীকে নিয়ে একটি জোট সংগঠন। অনুরূপ বিভিন্ন রাজনৈতিক এবং ভাবাদর্শিক নেটওয়ার্কসমূহকে একই পতাকাতলে নিয়ে আসার মাধ্যমে বিন লাদেন তার মনোযোগ আরও বিস্তৃত করেন যার উদ্দেশ্য ছিল বৈশ্বিকভাবে যেকোনো জায়গায় এবং যেকোনো সময়ে আমেরিকা ও এর স্বার্থসমূহের ওপর ব্যাপক হামলা পরিচালনার সক্ষমতা অর্জন করা।

সাদ্দাম হুসাইন কর্তৃক জাতিসংঘের অস্ত্র অনুসন্ধান টিমকে বের করে দেওয়ার পর ইরাকের বিরুদ্ধে আমেরিকার সামরিক হুমকির ক্রমশ তীব্রতা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং এসব ঘটনাসমূহ একই সাথে ঘটতে থাকে। যখন ইরাকে আমেরিকার আক্রমণ অনিবার্য হয়ে গেল, বিন লাদেন এই আরব এবং ইসলামিক অসন্তোষকে কাজে লাগাতে চাইলেন। আমেরিকার ওপর আক্রমণকে প্ররোচিত করে তার দুঃসাহসিক ফতোয়া তাকে সর্বাধিক জনপ্রিয় ইসলামিক হিরোর অবস্থানে বসিয়ে দেয় এবং তার এই অবস্থান আসন্ন যুদ্ধের জন্য যোদ্ধা সংগ্রহ করায় তাকে সমর্থ করে তোলে। শেষপর্যন্ত আমেরিকা উক্ত সংকটকে মোকাবিলা করতে সমর্থ হয় এবং সাদ্দাম হুসাইনও অস্ত্র পরিদর্শক দলকে পুনরায় ফিরিয়ে আনতে রাজি হয়।

বিস্ফোরকভরতি ট্রাক ব্যবহারের মাধ্যমে ১৯৯৮ সালের ৭ আগস্টের নাইরোবি এবং দারুস-সালামে আমেরিকান দূতাবাসে হামলাটি ছিল ওয়ার্ল্ড ইসলামিক ফ্রন্টের প্রথম আক্রমণ। আল-কায়েদা কর্তৃক প্রচারিত বার্তায় এই দুটি শহরকে নির্ধারিত করার কারণ ব্যাখ্যা করা হয় যে, 'এরা উভয়েই বিপুলসংখ্যক আমেরিকান সৈন্যকে আশ্রয় দিচ্ছে। উভয় সরকারই ইরাকের বিরুদ্ধে আমেরিকান আগ্রাসনকে উসকে দিচ্ছে এবং তারা ইসরাইলের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখে।'

আফগানিস্তানে আল-কায়েদার অবস্থানকে লক্ষ্য করে বোমা বর্ষণের মাধ্যমে আমেরিকা উক্ত হামলার জবাব দিয়েছিল। তাদের টার্গেটে কান্দাহারে বিন লাদেনের কোয়ার্টারও ছিল, যেটি মূলত একটি অব্যবহৃত বিমান ঘাঁটি ছিল কিন্তু অলৌকিক ধরনের 'ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়'র ক্ষমতাবলে—যা এরূপ পরিস্থিতিতে প্রায়ই তার থেকে প্রদর্শিত হয়েছে—তিনি এবং তার পরিবার বোমা হামলার দুইদিন পূর্বেই উক্ত স্থান ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন।

১৯৯৮ সালের ২১ আগস্ট আমেরিকার বোমাবর্ষণের পর মুহাম্মদ আতেফ (তৎকালীন আল-কায়েদা সামরিক প্রধান) নিম্নোক্ত বার্তা প্রকাশ করার জন্য আমার পত্রিকার অফিসে আমাকে ফোন করেন। তখন তিনি বলেন, আমেরিকার বোমাবর্ষণ এর উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। ওসামা বিন লাদেনসহ অন্যান্য আল-কায়েদা নেতারাও জীবিত রয়েছেন। হামলায় পাঁচজন যোদ্ধা শহিদ হয়েছেন, যাদের মধ্যে দুইজন ইয়েমেনি, দুইজন সৌদি এবং একজন মিশরি। তিনি ডাকযোগাযোগে উক্ত পাঁচজনের ছবি পাঠানোর আশ্বাস দেন এবং পরবর্তীকালে তিনি তাঁর কথা রেখেছিলেন। তারপর তিনি বলেন, ওসামা বিন লাদেন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনকে এই বার্তা পাঠাতে চান যে, তিনি অদৃষ্টপূর্বভাবে এই হামলার প্রতিশোধ নেবেন এবং আমেরিকার ওপর এমন আঘাত হানবেন, যা এর ভিত্তিকেই কাঁপিয়ে দেবে এবং যার অভিজ্ঞতা তারা পূর্বে কখনো লাভ করেনি। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ওয়াশিংটন এবং পেন্টাগনে হামলার মাধ্যমে উক্ত প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছিল এবং আরও ধারণা করা যায় যে, দুটি আমেরিকান অ্যাম্বাসিতে বোমা হামলার পরপরই এই হামলার প্রস্তুতি গ্রহণ করা শুরু হয়ে গিয়েছিল।

বিন লাদেনকে হস্তান্তরের জন্য আমেরিকা কর্তৃক প্রচণ্ড চাপের মুখে তৎকালীন সৌদি গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান প্রিন্স তুর্কি ১৯৯৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কান্দাহার আসেন। তিনি তৎকালীন সৌদি ধর্মমন্ত্রী আবদুল্লাহ আল তুর্কি এবং কাবুলের দায়িত্বপ্রাপ্ত সৌদি কর্মকর্তা সালমান আল ওমারিকে নিয়ে একটি ব্যক্তিগত জেট বিমানে আফগানিস্তানে অবতরণ করেন। সিরিয়ান চরমপন্থি ইসলামিস্ট আবু মুসআব আস-সুরি উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং পরবর্তী সময়ে টেলিফোনযোগে আমাকে এর বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছিলেন। বিন লাদেনকে 'সন্ত্রাসী' হিসেবে আখ্যায়িত করে সৌদি প্রতিনিধি দল আমেরিকার কাছে বিন লাদেনকে হস্তান্তরের জন্য মোল্লা ওমরের কাছে আবেদন করে। কিন্তু একটি মুসলিম সরকার কর্তৃক অপর একজন মুসলিম ব্যক্তিত্বকে একটি কাফের রাষ্ট্রের কাছে হস্তান্তরের এই আরজির দ্বারা মোল্লা ওমর প্রচণ্ড রকমের রুষ্ট হন। তিনি সৌদি প্রিন্সকে জানিয়ে দিয়েছিলেন, 'যদি আপনি আমেরিকার পক্ষে কথা বলতে

পারেন, তবে আমাকে বিন লাদেনের পক্ষে কথা বলার জন্য দোষারোপ করবেন না'। অথচ প্রিন্স তুর্কি দাবি করেছিলেন যে, মোল্লা ওমর বিন লাদেনকে হস্তান্তরের জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যদিও বাস্তব ঘটনা ছিল মোল্লা ওমর তার আবেদনকে সরাসরি অস্বীকার করেন। তিনি বরং প্রিন্স তুর্কিকে ধমক দিয়ে কথা বলছিলেন। কিন্তু সে সময় দোভাষী মোল্লা ওমরের সব কথা অনুবাদ করতে অস্বীকৃতি জানায়। মোল্লা ওমরও তার প্রতিটি শব্দকে অবিকলভাবে প্রিন্স তুর্কিকে শোনানোর জন্য জোর দিচ্ছিলেন। প্রিন্স তুর্কিও তখন রেগে যান এবং তালেবান সরকারকে দেওয়া সৌদি সরকারের স্বীকৃতিতে উঠিয়ে নেওয়ার হুমকি দেন। মোল্লা ওমর ভালোভাবেই জানতেন যে, কেবল তিনটি দেশ তাদের বৈধতার স্বীকৃতি দিয়েছিল; কিন্তু তারপরও এরূপ আচরণ একটি গুরুতর ব্যাপারই ছিল বটে। মোল্লা ওমর এরপর ক্রুদ্ধভাবে প্রিন্সকে তাদের কাবুলের সৌদি কর্মকর্তা সহকারে দেশত্যাগ করতে বলেন। এর কিছু পরেই সৌদি সরকার তালেবানের সাথে তাদের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে।

ওসামা বিন লাদেন : একটি সামগ্রিক প্রতিকৃতি

বিন লাদেন যাদের পার্শ্বে লড়াই করেছেন, তাদের মাঝে যোদ্ধা হিসেবে বিন লাদেনের খ্যাতি ছিল তুঙ্গে। এর কারণ হিসেবে তারা তার সাহসিকতা এবং মৃত্যুভীতিহীনতাকে বর্ণনা করে। আফগানিস্তানে তার অনেক সাথির মতো এখনও শাহাদাত লাভ করতে পারেননি বলে সর্বদাই তিনি দুঃখ প্রকাশ করতেন। আফগান জিহাদের সময় তিনি চল্লিশের অধিকবার ভারী বোমাবর্ষণের মধ্যে পতিত হন। এসব ঘটনাসমূহের মধ্যে কমপক্ষে তিনটিতে শত্রু কর্তৃক ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি এবং হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হয়েছিল। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, তখন মাংস এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বাতাসে উড়ছিল, কিন্তু বিন লাদেনের চোখে ভয়ের লেশমাত্রও দেখা যায়নি। আফগানিস্তানের লড়াইকৃত একজন মুজাহিদ আমাকে বলেছিল, একবার একটি স্কাড মিসাইল বিন লাদেনের প্রায় বিশ গজের মধ্যে বিস্ফোরিত হয়েছিল, কিন্তু তিনি পুরোপুরিভাবে অক্ষত ছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হয়ে তাকে বেশ কয়েকবার হাসপাতালেও যেতে হয়েছিল। আরেকবার একটি রাসায়নিক অস্ত্র হামলায় তিনি প্রায় মরতেই বসেছিলেন এবং আজও তিনি সেই কারণে গলায় ব্যথা অনুভব করেন।

ওসামা বিন লাদেন তার উনত্রিশজন ভাইয়ের মধ্য একুশতম ছিলেন, তথাপি তার পরিবারের মধ্যে সর্বদাই তার ব্যাপক প্রভাব এবং কর্তৃত্ব বিদ্যমান ছিল; বিশেষ করে আফগান জিহাদের একজন বীর হিসেবে স্বীকৃত পাবার পর থেকে। যেকোনো পারিবারিক বিবাদে তাকে সালিশি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হতো। তার ভাইয়েরা

তাকে ১১ সেপ্টেম্বরের হামলার পর বর্জন করেছে, এরূপ দাবি পুরোপুরিভাবে সঠিক নয়। যদিও তাকে বর্জনের ঘোষণা দিয়ে তাদের বিবৃতি সৌদি প্রেসে প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু আমি তখনই বলেছিলাম যে, বিভিন্ন পক্ষ থেকে প্রচণ্ড বল প্রয়োগের শিকার হয়েই তারা এরূপ করতে বাধ্য হয়েছিল। পরিবারের অনেক সদস্যই গোপনে সেই বিবৃতি থেকে নিজেদেরকে সরিয়ে নেয় এবং আমি নিজেও ব্যক্তিগতভাবে তার অনেক ভাইবোনের সাথে সাক্ষাৎ করেছি। তারা তাদের ভাইয়ের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছে। একজন ব্যক্তি হিসেবে এবং একজন মুসলিম হিসেবে আমি এটা মনে করি না যে, তারা তার এই সহিংস কর্মকাণ্ডগুলোকে অনুমোদন করে, যেগুলো তাদের পুরোপুরিভাবে হতবাক করে দিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষেই সেসব আক্রমণ থেকে নিজেদেরকে তফাত রাখার জন্য তাদেরকে খুব কষ্ট করতে হয়েছে।

এই বইয়ের অনুসন্ধানের সময় বিন লাদেনের অনেক ভাই এবং বোনদের সাথে সাক্ষাতের জন্য আমাকে বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশে যেতে হয়েছিল। তারা আমাকে ঝামেলা এড়ানোর জন্য তাদের নাম উল্লেখ না করার অনুরোধ করেছেন। বিন লাদেনের ছোট বোনদের মধ্যে দুইজন আমার সাথে সাক্ষাতে খুবই আগ্রহী ছিল। তারা তাদের ভাইকে অনেক বছর ধরে দেখতে পায়নি এবং তাই তার সাথে আমার সাক্ষাৎ থেকে প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে তারা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানতে চেয়েছিল– তার স্বাস্থ্য কেমন আছে, সে কি খায়, সে কি পান করে, এমনকি সে কীভাবে হাঁটে এবং আরও অন্যান্য অনেক কিছু।

বিপরীতে অনেকেই বিশ্বাস করে বা দাবি করে যে, সৌদি রাজপরিবারের সাথে বিন লাদেনের কোনো বিশেষ বা ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল না। বাস্তবিকপক্ষে তিনি যখন সৌদি আরবে থাকতেন, তখন রয়্যাল ফ্যামিলির সদস্যদের অনেকের সাথেই নিয়মিত তার সাক্ষাৎ হতো এবং তার ভাইদের মধ্যে অনেকেই তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ ছিল। কিন্তু যখন আমি তার সাথে সাক্ষাৎ করি, তিনি আল-সৌদের প্রতি তার তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি তাদের 'দুর্নীতিবাজ অবিশ্বাসী'দের একটি দল বলে অভিহিত করেন, যারা জাতির সম্পত্তিকে চুরি করছে এবং ইসলাম থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে।

বিন লাদেন নিশ্চিতভাবেই আমেরিকার প্রতি ঘৃণা পোষণ করেন। সম্ভবত এর সূত্রপাত হয়েছিল সোভিয়েত যুদ্ধের সময়ে আফগান এবং আরব মুজাহিদদের সাথে তাদের আচরণ থেকেই। যেমনটা তিনি বর্ণনা করেন—'তারা কেবল সেসব যোদ্ধাদেরকে নিজেদের লক্ষ্য অর্জনে ব্যবহার করেছে। তারা কাফেরদের দখলদারি থেকে মুসলিম ভূখণ্ডকে মুক্ত করার জন্য মুজাহিদদের ইসলামিক উৎসাহকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে এবং যখন সোভিয়েতরা পরাজিত হয়েছে, তখন

খুবই সাধারণভাবে তাদেরকে ব্যবহৃত টিস্যুর মতো ছুড়ে ফেলেছে। অতঃপর বিন লাদেন বলেন, 'আমেরিকা সেই অনুরূপ কাজই করেছে যেটা সোভিয়েতরা করেছিল। ১৯৯০ সালে আরব উপদ্বীপে সৈন্য পাঠানোর মাধ্যমে তারাও একটি মুসলিম দেশে তাদের দখলদারির বিস্তার করেছে।'

অনেক গুজব প্রচলিত আছে যে, বিন লাদেন সিআইএ এবং অন্যান্য বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থার সাথে সংযুক্ত। এর বিপরীতে আরব স্যাটেলাইট চ্যানেল এমবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে স্বয়ং প্রিন্স তুর্কিই বলেছিলেন যে, পাকিস্তান সরকার ব্যতীত অন্য কোনো সরকারি সংস্থার সাথে তার যোগাযোগের বিষয়ে তাদের কাছে কোনো তথ্য নেই। এবং সম্ভবত পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সাথে তার যোগাযোগ থাকার কারণেই যখন ২০০১ সালের নভেম্বর মাসে আমেরিকা তোরাবোরায় বোমা হামলা শুরু করে, তিনি পেছন দিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন।

বিন লাদেন ধর্মীয়, রাজনৈতিক এবং নৈতিক—সকল ক্ষেত্রেই সমস্ত শয়তানের মূল হিসেবে এবং মুসলিম উম্মাহর ওপর আপতিত সকল দুঃখ দুর্দশার উৎস হিসেবে আমেরিকাকে চিহ্নিত করেন। এর কারণ হিসেবে তিনি বলেছিলেন যে, তিনি আমেরিকাকে ঘৃণা করেন, কারণ তারা সৌদি আরবসহ অন্যান্য সকল দুর্নীতিবাজ এবং নিপীড়ক শাসনব্যবস্থার প্রধান সহায়ক এবং তারা ইসরাইলকে অকুণ্ঠ সহায়তাকারী। বিশ্বের ১.৩ বিলিয়ন মুসলিমদের অনেকের মাঝেই বিন লাদেন জনপ্রিয়তার একটি কারণ সম্ভবত এটিও যে, তিনি এসব হতাশা, বিচ্ছিন্নতা এবং অবহেলার বিপক্ষে আওয়াজ তুলেছেন। বিন লাদেনের পক্ষের মুসলিমরা অনুভব করে যে, তিনি তাদের পক্ষে একজন শক্তিশালী লড়াকু যোদ্ধা।

আমার অভিজ্ঞতা হলো, বিন লাদেন বিশেষভাবে এরাবিয়ান পেনিনসুলা এবং নির্দিষ্ট করে সৌদি আরব ও ইয়েমেনে খুবই জনপ্রিয়তা উপভোগ করেন। ইয়েমেন তার বাবার জন্মস্থান এবং সেখানকার লোকজন তাদের 'বিখ্যাত' স্বদেশবাসীকে নিয়ে খুবই গর্ববোধ করে এবং তার প্রতিকৃতি তাদের দেয়ালে দেয়ালে টানিয়ে রাখে। তার অনুসারীদের একটি বড় অংশ এবং সকল দেহরক্ষীই ইয়েমেনের, নয়তো দক্ষিণ সৌদি আরবের আছছির অঞ্চলের, যা ঐতিহাসিকভাবে ইয়েমেনেরই অংশ ছিল। বিন লাদেন কেবল তার বাবার সাথে তাদের সংশ্লিষ্টতার জন্যই তার ষোলোজন ব্যক্তিগত দেহরক্ষীর ওপর আস্থা রাখেন না, বরং নিশ্চিতভাবেই ইয়েমেনিরা তাদের অকুতোভয়, সাহসিকতা, আন্তরিকতা এবং বিস্বস্ততার জন্য সমগ্র আরবজুড়েই সুপরিচিত। বিন লাদেনকে মুসলিমবিশ্বের জনসাধারণের বীর করে তোলার পেছনে পশ্চিমা মিডিয়ারও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে; কারণ যেই আমেরিকার শত্রু হিসেবে চিহ্নিত হয়, সেই সুপ্রসিদ্ধ হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ,

মুসলিমবিশ্বে বিন লাদেনের প্রতি শ্রদ্ধার মাত্রার একটি পরিমাপ হলো 'ওসামা' নামটির হঠাৎ ব্যাপক জনপ্রিয়তাপ্রাপ্তি। উত্তর নাইজেরিয়ায় ১১ সেপ্টেম্বর হামলার পরের মাসে অর্থাৎ নভেম্বর মাসে সেখানে জন্মগ্রহণকৃত শতকরা ৭০ ভাগ শিশুর নামকরণ করা হয়েছিল তার নামানুসারে।[১] নামটি মালি, পাকিস্তান, সেনেগাল, ফিলিস্তিন, দক্ষিণ ফিলিপাইন এবং থাইল্যান্ডেও ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। যখন আমি তুরস্কে ছিলাম, আমি লক্ষ করেছিলাম, সেখানে তার চিত্রায়িত সিগারেট লাইটেরও ব্যাপক চাহিদা ছিল। সেখানকার একজন দোকানদার আমাকে বলেছিল, বিন লাদেন তার হিরো এবং সে তার ছবি বাসার দেয়ালে টানিয়ে রেখেছে। সম্ভবত, বিন লাদেনের ছবি সম্বলিত টি-শার্ট বর্তমানে কেবল মুসলিমবিশ্বেই জনপ্রিয় নয় বরং মধ্য আমেরিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকাতেও এটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

বিন লাদেন নিশ্চিতভাবেই অতিশয় বিনীত জীবনযাপন করেন। তিনি তার লোকজনের সাথে মিশে থাকেন এবং কখনোই তাদের থেকে দূরে দূরে বা তফাতে থাকেন না। তিনি অন্য সকলের মতোই পোশাক পরেন এবং বিশ্বের অন্যতম ধনী পরিবারের সন্তান হয়েও তিনি স্ত্রীবর্গ এবং সন্তানদেরকে তার মতোই সংগ্রামী জীবনযাপনে উৎসাহিত করেন। এটিও তার জনপ্রিয়তার পেছনে অন্যতম ভূমিকা রেখেছে। লন্ডনে বসবাসকৃত সৌদি সংস্কারবাদী সা'দ আল-ফকিহ আমাকে জানিয়েছেন, যখন বিন লাদেন সুদানে ছিলেন তখন তার কোয়ার্টারে এয়ার-কন্ডিশন ছিল। কিন্তু যখন তাপমাত্রা পঞ্চাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত উঠে যেত, তখনো তিনি তা চালু করতেন না। তিনি আরও জানান, শীত-গ্রীষ্ম সর্বদাই তিনি সপ্তাহে দুই দিন রোজা রাখতেন।[২]

আবু জান্দাল (প্রকৃত নাম নসর আল-বাহরি) বিন লাদেনের একজন দেহরক্ষী ছিলেন, আমরা আল-কুদস আল-আরাবির জন্য যার অনেক দীর্ঘ সময় সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম।[৩] তিনি তখন স্মরণ করছিলেন, বিন লাদেনকে হত্যার একটি পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে যাবার পর মোল্লা ওমর তাকে জালালাবাদ থেকে কান্দাহারে চলে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, যেখানে তিনি অধিকতর নিরাপদ থাকবেন। মোল্লা ওমর তাকে বসবাসের জন্য দুটি জায়গার যেকোনো একটি জায়গা বেছে নিতে বললেন, ইলেকট্রিসিটি কোম্পানির কম্পাউন্ড, যেখানে সকল সুযোগ সুবিধা বিদ্যমান ছিল অথবা একটি পরিত্যক্ত বিমানঘাঁটি, যেখানে এসবের কিছুই বিদ্যমান

---

[১] BBC. 3 January 2002.

[২] Interview with Sa'ad Al Faqih, April 2005, London.

[৩] আল কুদস আল আরাবিতে ৩ আগস্ট ২০০৪ সালে এই সাক্ষাৎকারটি প্রকাশিত হয়েছিল যে সাক্ষাৎকারটি আল-হাম্মাদি গ্রহণ করেছিল।

ছিল না। বিন লাদেন দ্বিতীয়টিকেই বেছে নিয়েছিলেন যেখানে তিনি এবং তার পরিবার প্রবহমান পানি, বিদ্যুৎ এমনকি টয়লেট সুবিধা ছাড়াই বসবাস করেছেন। তিনি সর্বদাই বলতেন, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবিদের মতো এবং প্রথম যুগের মুসলিমদের মতো জীবনযাপন করতে চান।

এই অনাড়ম্বরতার পেছনে যেমন ধর্মীয় কারণ ছিল, তেমনই স্ট্র্যাটেজিক কারণও ছিল। বিন লাদেন প্রায়ই সেসব সামরিক সংগঠনের আলোচনা করতেন, যারা কেবল তাদের নেতৃত্বের বিলাসিতা ও অমিতব্যয়িতার কারণে এবং তাদের যোদ্ধাদের কষ্টকে বরদাশত করতে না পারার কারণে ব্যর্থ হয়েছিল।

আবু জান্দাল বর্ণনা করেন, খার্তুমে থাকাকালে একবার তার বড় ছেলে আব্দুল্লাহর সাথে এই জীবনপ্রণালি নিয়ে বিন লাদেনের একটি তিক্ত তর্কাতর্কি হয়েছিল। আব্দুল্লাহর যুক্তি ছিল, আল্লাহ যেহেতু তাদের পরিবারকে সম্পত্তি দিয়ে আশীর্বাদপুষ্ট করেছেন, তাই তাদের উচিত সেসব সম্পত্তি উপভোগ করা। সে পরবর্তী কালে তার চাচাদের সহায়তায় এবং রয়্যাল ফ্যামিলির আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে সৌদি আরবে ফিরে তাদের পারিবারিক ব্যবসায় যোগদান করে এবং বিলাসবহুল জীবনযাপন শুরু করে। মজার ব্যাপার হলো, এই তর্কাতর্কিই বিন লাদেনকে একটি হত্যাচেষ্টা থেকে বাঁচিয়ে দেয়। এটি তাকে অফিসে যেতে কয়েক মিনিট দেরি করিয়ে দেয়। তাই যখন একটি গুপ্তঘাতক দল সেখানে অনুপ্রবেশ করে এবং সেখানকার সকলের ওপর গুলি চালায়, তখন তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না।

বিন লাদেন তার সিরিয়ান মামাতো বোন নাজওয়া ঘানেমের পর আরও চারটি বিয়ে করেন। তাদের মধ্যে তিনজন ছিলেন সৌদি আরবের এবং সর্বশেষ জন ছিলেন ইয়েমেনি। এর মধ্যে থেকে নাজওয়া এবং তার ছেলে আব্দুল্লাহ সুদান থেকে সৌদি আরবে ফিরে যায় এবং তারা বর্তমানে সেখানেই আছে। তার দ্বিতীয় স্ত্রী উম্মে আলি সুদানে তালাক নেন এবং তিনিও তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে সৌদি আরবে ফিরে আসেন। তিনি বর্তমানে জেদ্দায় বসবাস করছেন।

বিন লাদেন ২০০০ সালের জুলাই মাসে পঞ্চম বারের মতো আমাল আল-সাদাহ নামক সতেরো বছর বয়সী এক ইয়েমেনি যুবতীকে বিয়ে করেন। সেই বিয়ের মোহরানা ছিল পাঁচ হাজার ডলার। আবু জান্দাল কর্তৃক বিয়ের ওয়ালিমার আয়োজন করা হয়েছিল। তিনি জানান, আল-কায়েদা প্রধান এই উপলক্ষ্যে একটি জমকালো অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন এবং সেখানে তার অনুসারীদের অনেকেই উপস্থিত হয়েছিল। সকল পরিস্থিতিতে, অনেক বছর ধরে এবং একই ছাদের নিচে তার স্ত্রীরা খুশিমনেই সহাবস্থান করেছিল এবং বিন লাদেন কখনোই তাদের মধ্যে কোনো কলহকে বরদাশত করতেন না।

তার বড় ছেলে আব্দুল্লাহ এবং দ্বিতীয় স্ত্রী উম্মে আলির এক ছেলে এবং এক মেয়ে ব্যতীত বিন লাদেনের এগারো ছেলে-মেয়ের প্রত্যেকেই আফগানিস্তানে তার সাথে বসবাস করত। যখন আব্দুল্লাহ প্রাচুর্যপূর্ণ জীবনযাপনের জন্য সৌদি আরবে ফিরে যায়, এটি বিন লাদেনকে খুব মনঃপীড়া দিয়েছিল এবং উক্ত আচরণকে বিন লাদেন অসম্মানকর এবং অবাধ্যতা বলে বিবেচনা করেন। এই ঘটনার পর তিনি তার নাম আর কখনো উচ্চারণ করেননি।

উম্মে আলিও সুদানে থাকাকালে তার বিরোধিতা করেন এবং তালাক প্রার্থনা করেন। আব্দুল্লাহর মতো তিনিও উক্ত কঠোর অনাড়ম্বর জীবনকে মেনে নিতে পারেননি। তার স্ত্রীদের মধ্যে উম্মে হামজা এবং উম্মে খালিদ দুজনেই বিখ্যাত সৌদি পরিবারের সন্তান ছিলেন। উম্মে হামজা আরবি ভাষায় ডক্টরেট করেছিলেন এবং উম্মে খালিদ শরিয়াহ বিষয়ে ডক্টরেট করেছিলেন। উম্মে খালিদ ছিলেন সৌদি আরবের বিখ্যাত শরিফ পরিবারের সন্তান এবং তিনি ছিলেন আফগান জিহাদে তার একজন সহযোদ্ধার কন্যা। এই দুই স্ত্রী সম্ভবত এখনও বিন লাদেনের সাথেই আছেন। যদিও আল-কায়েদার একটি ঘনিষ্ঠ সূত্র আমাকে জানিয়েছে, তিনি বর্তমানে কেবল একজন দেহরক্ষী সাথে নিয়ে ভ্রমণ করেন এবং বর্তমানে তিনি ক্রমাগত স্থান পরিবর্তনের মধ্যে রয়েছেন।

১১ সেপ্টেম্বরের হামলার দুই মাস পর তার ইয়েমেনি স্ত্রীকে তার শিশুকন্যাসহ চোরাই পথে আফগানিস্তানের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পাকিস্তানে আত্মগোপন করে থাকার পর ২০০০ সালের শুরুর দিকে তিনি ইয়েমেনে ফিরে আসেন। তার বাবার কম্পাউন্ডে গৃহবন্দী করার পূর্বে তাকে আটক করা হয়েছিল এবং জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। এর পরের বছর উক্ত কম্পাউন্ডে একটি বন্দুক যুদ্ধের পর তাকে তার বাবা এবং তার ভাইসহ সেখানকার সকলকেই আটক করা হয়। তারা বর্তমানে কোথায় আছে, সেই বিষয়ে কেউই সুনিশ্চিত বলতে পারে না। যখন তিনি প্রথম ইয়েমেনে ফিরে আসেন, আমি একটি সাক্ষাৎকারের জন্য তার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু ইয়েমেন সরকার পুরো পরিবারকেই মিডিয়াতে কথা বলার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল।

বিন লাদেন গ্রামীণ জীবনকে খুবই উপভোগ করতেন এবং ঘোড়ায় চড়তে খুব পছন্দ করতেন। সৌদিতে থাকাকালে তিনি প্রায়ই তার পরিবারের সকলকে নিয়ে মরুভূমিতে বেড়ানোর আয়োজন করতেন এবং তার স্ত্রী ও বাচ্চাদেরকে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের ওপর প্রশিক্ষণ দিতেন। তিনি খেলাধুলা খুব পছন্দ করতেন; বিশেষ করে ভলিবল। তার ৬ ফুট ৩ ইঞ্চি উচ্চতার কারণে এই খেলায় তিনি প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আলাদা সুবিধা পেতেন। আফগানিস্তানে তিনি এক দলের অধিনায়ক থাকতেন এবং আবু হাফস আল-মাসরি অন্য দলের অধিনায়ক থাকতেন। সেই

সময় সেখানে যারা উপস্থিত ছিলেন তারা জানান, সেসব ক্রীড়াপ্রতিযোগিতা বহু আল-কায়েদা মুজাহিদ উপভোগ করত এবং সেগুলো খুবই প্রতিযোগিতামূলক এবং রোমাঞ্চকর ছিল।

আমি এরূপ অনেক পত্রিকা প্রতিবেদন দেখেছি যেখানে বলা হয়, বিন লাদেন এখন মারাত্মক রোগে ভুগছেন। কিছু কল্পনাপ্রসূত উদ্ভট রিপোর্টে দাবি করা হয়, কিডনির অসুখের কারণে তাকে ডায়ালাইসিসও করতে হচ্ছে। প্রায়শ সেই একই পৃষ্ঠায় আরেকটি গল্পও বলা হয় যে, আমেরিকান বোমাবর্ষণের তোড়ে তিনি পাহাড় থেকে পাহাড়ে 'ঘোড়ার পিঠে চড়ে' পালিয়ে বেড়াচ্ছেন! আমিও শুনেছিলাম যে, তিনি ডায়াবেটিসে ভুগছেন। কিন্তু যখন আমি তার সাথে তিন দিন কাটাই এবং তার সাথে একই রুমে পাশাপাশি বিছানায় শয়ন করি, তখন আমি তাকে কোনো ওষুধ গ্রহণ করতে দেখিনি এবং তার মাঝে কোনো অসুস্থতার লেশমাত্রও দেখিনি। আমরা তুষারাবৃত পাহাড়ে একটানা দুই ঘণ্টা হেঁটেছিলাম এবং তখন তাকে বেশ সুস্থ এবং ফিট মনে হয়েছিল।

আমি জানি ২০০১ সালে তোরাবোরা বোমাবর্ষণে তিনি তার বাম কাঁধে স্প্রিন্টারের আঘাত পেয়েছিলেন। এই আক্রমণের পর ২০০২ সালের জানুয়ারি মাসে তার প্রথম টেলিভিশন রেকর্ডিংয়েও এটা প্রতীয়মান হয়, যখন তিনি বিশ্ববাসীকে প্রমাণ দিতে চেয়েছিলেন যে তিনি এখনো জীবিতই আছেন। তখন এটা দেখা গিয়েছিল যে, তার বাম কাঁধ তার ডান কাঁধের চেয়ে বড় হয়ে আছে এবং বাম হাতকে পুরোপুরিভাবে প্যারালাইসড মনে হচ্ছিল। তিনি বাঁহাতি হওয়া সত্ত্বেও সেটাকে মোটেই নাড়াচাড়া করেননি। সেই একই বছরে পরবর্তী একটি টেলিভিশন রেকর্ডিংয়ে তিনি ইচ্ছাপূর্বকভাবে তার বা-কাঁধ এবং হাতকে নাড়াচ্ছিলেন এটা প্রমাণ করার জন্য যে, তিনি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে গেছেন। ধারণা করা হয়, আল-জাওয়াহিরিই—যিনি একজন সুপ্রশিক্ষিত সার্জন—সেই স্প্রিন্টার বের করার জন্য অস্ত্রোপচার করেছিলেন।

বিন লাদেন অনেকগুলো গুপ্তহত্যার টার্গেটও হয়েছিলেন। একবার সৌদি সরকার আঠারো বছর বয়সী এক তাজিককে এই মিশনে কান্দাহারে পাঠিয়েছিল। তাকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল সফল হলে তাকে সৌদি নাগরিকত্ব এবং এক মিলিয়ন রিয়াল দেওয়া হবে, যেটি ছিল তৎকালীন দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ডলার সমতুল্য। সেই যুবক তার মিশন শুরু করার পূর্বেই ধরা পড়ে যায়। সে তার দোষ স্বীকার করে এবং কান্নায় ভেঙে পড়ে। যখন তাকে বিন লাদেনের সম্মুখে আনা হয়, তিনি তাকে অনুমতি প্রদান করেন যে, যদি সে এই কাজকে উপযুক্ত মনে করে তবে সে তাকে হত্যা করতে পারে এবং হত্যাকাণ্ডের পর তাকে পলায়ন করার সুযোগ দেওয়া হবে। সেই যুবক এতটাই আতঙ্কিত ছিল যে, তার ফোঁপানির কারণে

সে একটি শব্দও উচ্চারণ করতে পারেনি। বিন লাদেন তাকে ক্ষমা করে দেন এবং দেহরক্ষীদের বলেন তাকে ছেড়ে দিতে।

আবু জান্দাল আরও তথ্য দেন যে, ১৯৯৮ সালের আগস্ট মাসে কান্দাহারে বোমা হামলার এক রাত পূর্বে বিন লাদেন তার প্রশিক্ষণ শিবিরগুলো পরিদর্শনের জন্য খোস্তের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেছিলেন। তখন সিআইএর জন্য কাজ করা একটি আফগান রাঁধুনি তার এজেন্টদের বিন লাদেনের গন্তব্যস্থল সম্পর্কে বলে দেয়। যেমনটি পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে, তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কিছু টের পেয়ে বিন লাদেন যাত্রাপথের অর্ধেক গিয়ে হঠাৎ তার মত পরিবর্তন করে ফেলেন এবং খোস্তের বদলে কাবুলে চলে যান। পরেরদিন খোস্তের আল-কায়েদার প্রশিক্ষণ শিবিরগুলোতে আমেরিকান যুদ্ধবিমান হানা দেয় এবং এই হামলায় পাঁচজন মারা যায়।

বিন লাদেন 'বেতন' শব্দটি ব্যবহার করা পছন্দ করতেন না। আল-কায়েদার সদস্যদেরকে দেওয়া মজুরিকে তিনি 'মাসিক বৃত্তি' বলতেন। এটি কেবল তাদেরই প্রদান করা হতো, যারা বিবাহিত। এর পরিমাণ ছিল মাসিক মাথাপিছু ৫০ থেকে ১২০ ডলার পর্যন্ত। এটা নির্ভর করত তার পরিবারের আকার এবং পরিবারে কর্মক্ষম সদস্যদের সংখ্যা অনুযায়ী। অবিবাহিত সদস্যরা কোনো মাসিক বৃত্তি পেতেন না। তারা সেসব শিবির বা ঘাঁটিতে কেবল তিনবেলা খাবার পেতেন।

১১ সেপ্টেম্বরের হামলা এবং এর প্রতিশোধস্বরূপ তোরাবোরায় বোমা হামলার পর থেকে বিন লাদেন বারংবার জায়গা পরিবর্তন করেছেন এবং তার প্রকৃত অবস্থান সম্পর্কে কারও জানা ছিল না। নভেম্বর ২০০১ এর পর তার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে খুব একটা জানতে পারা যায় না।

আমাকে সর্বদা জিজ্ঞেস করা হয়েছে, বিন লাদেন প্রকৃতপক্ষে কী চান? আমি মোটেও বিশ্বাস করি না যে, বিশ্বের সবচেয়ে বিপজ্জনক এই লোকটি কোনো ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা ধারণ করেন, যেটা তার সম্পর্কে প্রায়ই দাবি করা হয়। তিনি মুসলমানদের খলিফা হতেও ইচ্ছুক নন। সৌদি সংস্কারবাদী সা'দ আল-ফকিহ এর মতে, বিন লাদেন কোনোভাবেই খলিফা হতে পারবেন না। তিনি হাদ্রামাউত অঞ্চলের বাসিন্দা এবং কুরাইশ গোত্রের নন। ইসলামিক ভবিষ্যৎবাণী বলে যে, যিনি খেলাফতের পুনরুদ্ধার করবেন তিনি কুরাইশ গোত্রে জন্ম গ্রহণ করবেন এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধর হবেন। বিন লাদেনের মতে, তার জীবন একটি পরিক্ষাস্বরূপ, যায় মাধ্যমে আল্লাহ তার বিশ্বাস, দৃঢ়তা এবং আনুগত্যের পরীক্ষা নিতে চান। তিনি বলেছিলেন, তিনি কেবল জান্নাত কামনা করেন এবং সেই গন্তব্যের সবচেয়ে দ্রুততম রাস্তা হলো আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে শহিদ হওয়া।

বিন লাদেন ক্রমাগতভাবে তার ট্যাকটিকস এবং স্ট্র্যাটেজি বিবর্তিত করে চলছেন এবং বিস্ময়কর রকমের টেকসই সহনীয়তা প্রদর্শন করে যাচ্ছেন। মৃত্যুই তার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু, কিন্তু আমেরিকাকে ধ্বংসের লক্ষ্যে তিনি বেঁচে থাকার জন্য মতলব এঁটেই যাচ্ছেন। অপর দিকে আফগানিস্তান এবং ইরাকে তাকে ধ্বংসের লক্ষ্যে আরও ব্যাপকভাবে বললে, আল-কায়েদাকে ধ্বংসের নিমিত্তে করা যুদ্ধে বুশ প্রশাসন ইতিমধ্যেই ২৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার খুইয়ে ফেলেছে। অর্জনস্বরূপ তারা কেবল আরব বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে এই নেটওয়ার্কটির নিরাপদ আশ্রয়স্থলের জোগান দিতে সক্ষম হয়েছে। সেই সাথে আধুনিক যুগের সবচেয়ে আলোচিত মুসলিম যোদ্ধা হিসেবে লক্ষ লক্ষ মুসলিমের কাছে বিন লাদেনের খ্যাতিকে আরও দৃঢ় করেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ধর্মযোদ্ধা

ধর্মযোদ্ধা

'তোমরা যখন আমাদের ভূখণ্ডে অস্ত্র নিয়ে চলাফেরা করো, তখন তোমাদের ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলা আমাদের আইনত কর্তব্য এবং এই কর্তব্য পূরণে আমরা নৈতিকভাবেও বাধ্য... দখলিকৃত পবিত্র ভূখণ্ডগুলো মুক্ত করা এবং উম্মাহর মহিমাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে... আমাদের যুবকরা তোমাদের সেনাদের থেকে ভিন্ন। যেখানে তোমাদের সমস্যা হলো কীভাবে তাদের লড়াইয়ের জন্য রাজি করানো যায়, সেখানে আমাদের সমস্যা হলো কীভাবে তাদের নিবৃত্ত করা যায়...'

—'ডিক্লেয়ারেশন অফ জিহাদ অ্যাগেইনস্ট দ্য আমেরিকানস অকুপাইয়িং দ্য ল্যান্ড অফ টু স্যাক্রেড প্লেসেস', ওসামা বিন লাদেন, ১৯৯৬

ঠিক এভাবেই ওসামা বিন লাদেন তার নাটকীয় শৈলীতে আফগান পর্বতসমূহের কোনো এক গুহা থেকে বিশ্বের সবচেয়ে বৃহৎ পরাশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন।

যে ইসলামি পটভূমি এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে আল-কায়েদা উদ্ভূত হয়েছে, আল-কায়েদা সম্পর্কিত ঐকান্তিক কোনো গবেষণা সেটিকে উপেক্ষা করতে পারে না। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি যে, ধর্মীয় বিশ্বাসের একটি বিশেষ ব্যাখ্যা, শতাব্দীকাল যাবৎ যার পরিশীলন এবং রাজনীতিকরণ হয়ে আসছে, এটিই আমাদের বিন লাদেন ও আল-কায়েদার পরিচয় বুঝতে সাহায্য করবে এবং এটিই মুসলিমবিশ্বে তাদের সুদৃঢ় অবস্থানকে তৈরি করেছে। তাই বলা যায়, ইসলাম ব্যতীত আল-কায়েদার কোনো অস্তিত্বই কল্পনা করা যায় না।

অনেক পশ্চিমা ভাষ্যকারই বিন লাদেনের ফতোয়াকে পুরোপুরিভাবে না বুঝেই, এমনকি উপহাসের লক্ষ্যবস্তু বানিয়েও প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল। পশ্চিমা বিশ্বের জনগণ পুরোপুরিভাবে এই বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারে না যে, কতটা গভীরভাবে বহুসংখ্যক মুসলিম তাদের অতীতকে উপলব্ধ করে এবং কতটা তিক্তভাবে তারা তাদের হারানো ঐতিহ্য নিয়ে পরিতাপ করে। আর এই হারানো ঐতিহ্যের পীড়াদায়ক অনুভূতির সাথে সামসময়িক অভিজ্ঞতাও সংযুক্ত থাকে, যেটাকে সংজ্ঞায়িত করা হয় 'অপমান' এবং 'হতাশা' হিসেবে।

কয়েক শতাব্দী ধরে মুসলিম সভ্যতাই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তি ছিল। তাদের সেনারা ইউরোপ, আফ্রিকা, ভারতবর্ষ এবং চায়নাতেও অভিযান পরিচালনা করেছিল। তারাই একসময় বিশ্বকে অর্থনীতি, বিজ্ঞান এবং শিল্পে নেতৃত্ব দিয়েছিল। বিন লাদেনের বাক্যালংকারশাস্ত্র পূর্ববর্তী সেই সময়ের স্মরণ করে এবং গুণকীর্তন করে সেই সময়কে, যখন উম্মাহর অবস্থান ছিল উন্নতির সর্বোচ্চ শৃঙ্গে। এর সাথে থাকে তার মারমুখী বক্তব্য যে, ইসলামি খেলাফতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা অবশ্যই সম্ভব—এ সবকিছু অনস্বীকার্যভাবেই মুসলিমবিশ্বের ওপর প্রয়োগকৃত তার ক্যারিশম্যাটিক আবেদন এবং প্রভাবেরই অংশ। তিনি বিপ্লবী মুসলিম জাতিসত্তার একটি প্রতীক হয়ে উঠেছেন, যা একইসঙ্গে রাজনৈতিক এবং সালাফি ঘরানার ইসলামের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অতি অবশ্যই সকল মুসলিম বা এমনকি তার অনুসারী মুসলিমদের মধ্যেও সকলে সালাফি নয়। কিন্তু বিশ্বের বেশিরভাগ মুসলিমের দৈনন্দিন জীবনে 'ইসলাম'ই একমাত্র ডিফাইনিং ফিচার বা সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য। এই ভক্তির তাৎপর্যকে পশ্চিমাদের অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে।

ইসলাম মুসলিমদের প্রতিটি বিষয় নিয়ন্ত্রণ করে—আচরণ-উচ্চারণ, শিক্ষা-দীক্ষা, পোশাক-পরিচ্ছদ, পানাহার-বিধি, ব্যক্তিগত সম্পর্কসহ সকল কিছু। এই কারণেই জিহাদের ঘোষণাটিকে পশ্চিমাদের মোটেই তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা উচিত নয়। নির্দিষ্ট কিছু পরিস্থিতিতে জিহাদ মুসলিমদের অলঙ্ঘনীয় দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায়, যেটাকে কখনোই হালকাভাবে ছুড়ে ফেলে দেওয়া যায় না।

শতাব্দীকাল যাবৎ মুসলিম স্কলাররা জিহাদ সম্পর্কিত বহুসংখ্যক ধর্মতাত্ত্বিক এবং ভাবাদর্শগত যুক্তি বিকশিত করেছেন। আমাদের সময়ে চলমান এই জিহাদ-বিতর্ক সমগ্র বিশ্বের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তাকে প্রভাবিত করবে। মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া এবং আফ্রিকায় আমেরিকা-বিরোধী জিহাদি যুক্তিসমূহ—যেটা সবচেয়ে অখণ্ডনীয়ভাবে আল-কায়েদার ভাবাদর্শের সাথে অঙ্গীভূত বা তর্কসাপেক্ষে ওসামা বিন লাদেনের ব্যক্তিত্বের মধ্যেও বিদ্যমান—খুব দ্রুতই যে সেটি শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করছে, সেটা স্পষ্ট-প্রতীয়মান।

জিহাদ ইসলামের একটি অপরিহার্য বিধান, যা ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার মতো কোনো বিষয় নয়। একজন মুজাহিদের মডেল হিসেবে স্বয়ং মহানবী হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেই উপস্থাপন করা হয়। তবে জিহাদের বিভিন্ন প্রায়োগিক দিক রয়েছে। যেমন, সংযম চর্চা (নৈতিকভাবে এবং সহিংসতা থেকেও) থেকে কোনো মহৎ কাজে জীবন উৎসর্গ করা অবধি।

মহানবি (সা.) : ইসলামি জিহাদের পথিকৃৎ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মিশনের প্রথম তেরো বছর নিপীড়ণের জবাব কোনো রকমের সহিংস পদ্ধতিতে না দেওয়ার জন্য তার অনুসারীদেরকে আদেশ করেছিলেন। তিনি তাদের বলতেন, এই ধৈর্যের বদৌলতে আখিরাতের জীবনে তাদেরকে জান্নাত প্রদান করা হবে। এক যুগেরও বেশি সময় অধ্যবসায়ের পর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর অনুসারীদেরকে ঘরছাড়া করা হয় এবং মক্কা থেকে বের করে দেওয়া হয়। কুরাইশ গোত্রের অত্যাচারী নেতৃবর্গ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যারও পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু তিনি মধ্যরাতে বেরিয়ে যেতে সক্ষম হন এবং মদিনায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানকার স্থানীয় গোত্র আউস এবং খাজরাজের সকলেই মুসলিম হয়ে গিয়েছিল। যদিও মদিনায় তখন তিনটি ইহুদি গোত্র তাদের ধর্মে অনড় থাকে। একটি রাজনৈতিক মুসলিম সম্প্রদায় সৃজনের কারণে এই সময়টি ইসলামের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। প্রকৃতপক্ষে, নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মক্কা থেকে মদিনায় যাত্রা (হিজরত) করার দিন থেকেই ইসলামিক ক্যালেন্ডার (হিজরি ক্যালেন্ডার) এর সূত্রপাত হয়।

তার আগমনের কিছুকাল পরেই তিনি মদিনার নতুন ও মিশ্র সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক নেতা হিসেবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ করেন। সেই মিশ্র সম্প্রদায়ের আরব অধিবাসীরা ইসলামকে ধর্ম এবং জীবনব্যবস্থা হিসেবে আলিঙ্গন করে নেয় আর ইহুদি বাসিন্দারা ইসলামকে রাজনৈতিক সিস্টেম হিসেবে মেনে নেয়। এর কিছু পরই জিহাদের ধারণাটি একটি নতুন মাত্রা লাভ করে। যেমনটি বিশ্বাস করা হয় যে, আল্লাহ মুসলিমদের লড়াই করার অধিকার দিয়েছেন। এটা আমাদের সাম্প্রতিক সময়েও এই অর্থ সূচিত করে যে, নিজেকে বিজয় অথবা শাহাদাতের প্রত্যাশায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করতে হবে। (জিহাদের ব্যাপারে ইসলামি শরিয়াহ একদম সুস্পষ্ট। এটা কেবলমাত্র ধর্মযুদ্ধকেই বোঝায় না। যুদ্ধের আরবি প্রতিশব্দ 'আল-হারব', 'আল-কিতাল, 'আন-নিদাল', 'আল-কিফাহ' 'আল-মুবাসারাহ' এমনকি 'আল-আমাল' পর্যন্ত রয়েছে। শরিয়াহ অনুযায়ী জিহাদের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে—সংগ্রাম করা, প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করা, চেষ্টা করা, পরিশ্রম করা ইত্যাদি। পাপ এবং প্রলোভনের বিরুদ্ধে কোনো ব্যক্তির নৈতিক সংগ্রামও জিহাদের অন্তর্ভুক্ত।)

হিজরতের পর মুসলিমদের একতা এটাই প্রকাশ করে যে, ইসলাম রক্ত বা সামাজিক বন্ধনের চাইতেও বেশি শক্তিশালী একটি বন্ধন। এর কারণে আল-কায়েদার রিক্রুটমেন্ট স্ট্র্যাটেজিতে 'হিজরত' একটি প্রধান শব্দ, যা যুবক

মুসলিমদের তাদের ঘর এবং পরিবার ত্যাগ করে জিহাদে যোগদান করার জন্য উদ্দীপিত করে, সেই জিহাদ পৃথিবীর যে প্রান্তেই চলুক না কেন।

ইসলামের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বড় যুদ্ধ সংঘটিত হয় ৬২৪ সালে। মুশরিক মক্কাবাসী বদর প্রান্তরে মুসলিমদের ওপর আক্রমণ করার জন্য প্রায় আটশ সদস্যের একটি বাহিনী প্রেরণ করে। অন্যদিকে প্রায় তিনশ লোকবল নিয়ে খুবই সামান্য হতাহতের বিনিময়ে মুসলিমরা এই যুদ্ধে জয়লাভ করে। এই বিজয়টি মুসলিম যুবকদের এখনোও উজ্জীবিত করে এবং প্রতি বছর রমজান মাসে এই বিজয়কে স্মরণ করা হয়।

অবশেষে ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ওয়াসাল্লাম প্রায় ১০,০০০ সদস্যের একটি মুসলিম বাহিনী নিয়ে বিজয়ী বেশে মক্কায় প্রবেশ করেন। মক্কার অধিবাসীরা সাথে সাথেই আত্মসমর্পণ করেছিল এবং সেখানকার সিংহভাগ বাসিন্দাই স্বেচ্ছায় ইসলাম কবুল করে নিয়েছিল। এরপর থেকে শহরের পর শহর এবং প্রদেশের পর প্রদেশ মুসলিমদের হস্তগত হতে থাকে এবং আরব জাতি তাদের হাজারো ধর্মমত থেকে একটি ধর্মকে আলিঙ্গন করে নেয়। তখন যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালানোর চেষ্টা করেছে, কেবল তাদের সাথেই যুদ্ধ করা হয়েছে এবং আত্মসমর্পণে বাধ্য করা হয়েছে। ইসলামকে মানুষের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে বা ইসলাম তরবারির মাধ্যমে বিস্তার লাভ করেছে, এরূপ দাবি পুরোপুরি ভিত্তিহীন।

এরপর কয়েক প্রজন্ম ধরে মুসলিম জাতি জনসংখ্যায় এবং ভৌগোলিকভাবে বিস্তার লাভ করে। মুসলিমদের এই প্রথম দিককার প্রজন্মরাই 'সালাফ' নামে পরিচিত। সমগ্র আরব উপদ্বীপে এবং তার বাইরেও অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ার কারণ এটাই ছিল যে, মুসলিমদের নৈতিক মূল্যবোধ এবং মানবতার প্রতি সম্মানের ক্ষেত্রে তাদের আদর্শ, যা সে সময়কার অন্য সকল স্থানে বিদ্যমান সকল আদর্শের চাইতে শ্রেষ্ঠ ছিল।

এটা কোনো আশ্চর্যজনক বিষয় নয় যে, স্বর্ণযুগের সময়ে বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করা মুসলিমদের অব্যাহত পতনের কারণ হিসেবে শাসক এবং জনগণ কর্তৃক আল্লাহপ্রদত্ত সঠিক রাস্তা থেকে বিচ্যুত হয়ে যাওয়াকেই দোষারোপ করা হয়। তাই সঠিক পথে ফিরে আসার আহ্বান—যেমনটি রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর পরবর্তী যুগে পালন করা হয়েছে—মুসলিমবিশ্বের ইতিহাসে বারংবার পুনরাবৃত্তি হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ সালাফিদের কথা বলা যেতে পারে, (সালাফি বলতে কোনো নির্দিষ্ট চিন্তাধারা লালন করে, এরূপ কোনো গোষ্ঠীকে বুঝায় না। সালাফি শব্দটি একটি জাতিবাচক নাম থেকেও অনেক বেশি কিছু, যারা একটি

বিস্তৃত বর্ণালির বিশ্বাস ধারণ করে এবং তাদের মধ্যে একেবারে নরমপন্থি থেকে মডারেট হয়ে চরমপন্থি এবং সহিংস সকল ধরনের শ্রেণিই বিদ্যমান।)

জিহাদ

বলতে গেলে মুসলিমরা তাদের জীবনকে আক্ষরিক অর্থে ধর্মগ্রন্থ কোরআন অনুযায়ী পরিচালিত করার জন্য এক প্রকার সংগ্রাম করে থাকে। জিহাদ বা ধর্মীয়ভাবে উৎসাহিত সংগ্রামের ধারণাটিকে বুঝতে চাইলে আমাদের সেই ধর্মগ্রন্থ বা এর ব্যাখ্যামূলক বইসমূহের দিকেই ফিরে যেতে হবে। এই ক্ষেত্রে আমরা ব্যক্তিগত পর্যায়ের জিহাদ, যেখানে বিশ্বাসী ব্যক্তি আত্মিকভাবে সংগ্রাম করে; এসব নিয়ে আলোচনা করব না বরং সামরিক অর্থেই জিহাদ নিয়ে কথা বলব।

ইসলামের প্রধান দুটি উৎস রয়েছে—প্রথমত কুরআন, যাকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর অবতীর্ণ আল্লাহর চিরসত্য এবং নির্ভরযোগ্য বাণী বলে বিশ্বাস করা হয় এবং দ্বিতীয়ত হাদিস। হাদিস হলো আরবি ভাষায় লেখা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী অথবা সাহাবিদের কর্তৃক তার কোনো কাজের বর্ণনা। এগুলোর বেশির ভাগ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর লিখা হয়েছে; কারণ তিনি চাইতেন না যে, লোকেরা আল্লাহর বাণী এবং তার কথার মধ্যে গোলমাল পাকিয়ে ফেলুক। মুসলিমদের জন্য হাদিসের বাণী অবশ্যপালনীয় এবং সেগুলো কুরআনের ব্যাখ্যা বা পরিপূরক।

দুর্ভাগ্যবশত নিজেদের স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে কিছু বিবেকবর্জিত রাজনৈতিক এবং আদর্শিক দলগুলোর মধ্যে হাদিস জাল করার প্রবণতা শুরু হয়েছিল। মুসলিম স্কলাররা, বিশেষভাবে ইসলামের দ্বিতীয় শতকের শুরুতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিপুলসংখ্যক বাণী থেকে প্রকৃত সত্য উপাদানকে পৃথক করে দেওয়ার জন্য এক ছিদ্রান্বেষী পদ্ধতি চালু করে (যাকে উসুলুল হাদিস বলা হয়)।

বর্তমানে ছয়টি প্রধান হাদিস গ্রন্থ বিদ্যমান যেগুলোর নির্ভরযোগ্যতার মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। সুন্নি মুসলিমদের সিংহভাগ এগুলোর দুটি গ্রন্থকে শতভাগ নির্ভরযোগ্য বলে গ্রহণ করে থাকে যথা ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারি এবং মুসলিম ইবনুল-হাজ্জাজ সংকলিত গ্রন্থদ্বয়।

ইসলামে যাজক বা ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ ধরনের কিছুর অস্তিত্ব নেই। কিন্তু কুরআন এবং হাদিসের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর দায়িত্ব বিধায় ইসলামিক স্কলারদের দ্বারা এটি পূরণ করা হয়, যারা 'উলামা' বলে পরিচিত।

শরিয়াহ বলতে বোঝায় কুরআন এবং হাদিস থেকে আহরিত নির্দেশাবলির সমষ্টি। ১৯৯৬-২০০১ সাল অবধি তালেবান কর্তৃক সংস্থাপিত 'ইসলামিক এমিরেটস অফ আফগানিস্তান' বা 'ইমারতে ইসলামিয়াহ আফগানিস্তান' শরিয়াহ অনুযায়ী শাসিত হতো। আবার লন্ডনভিত্তিক 'ইনস্টিটিউট অফ ইসলামিক পলিটিকাল থট' এর পরিচালক ড. আযযাম তামিমি এর মতো অনেকে আল-কায়েদা এবং তালেবানের মতো গোষ্ঠীগুলো শরিয়াহর রক্ষক এবং পুরোপুরিভাবে এর প্রয়োগকারী—এরূপ ধারণাকে মানতে অস্বীকার করেন। তিনি মত প্রকাশ করেন যে, আল-কায়েদার বক্তব্যগুলো 'জিহাদ', 'শরিয়াহ' প্রভৃতি শব্দে ভরপুর থাকে, কারণ এগুলো মুসলমানদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি যুক্তি দেন যে, আল-কায়েদা সেসব শব্দই ব্যবহার করে, যেগুলো ইতিমধ্যে মুসলিমদের হৃদয়ে গেঁথে আছে এবং এই কারণেই তাদের বার্তাগুলো এতটা মর্মস্পর্শী হয়।

পশ্চিমের অনেকের নিকট এই পুরোপুরি বহির্জাগতিক সাংস্কৃতিক ধারণাটি বিদ্যমান যে, ইসলাম কেবল হত্যাকাণ্ডকেই অনুমোদন দেয়নি বরং এর অনুসারীদের ওপর হত্যাকে একটি ধর্মীয় দায়িত্ব হিসেবে চাপিয়ে দিয়েছে। বাস্তবতা হলো, নির্দিষ্ট কিছু পরিস্থিতিতেই কেবল ইসলাম এরূপ হুকুম দেয়।

কুরআন অনুসারে হিজরতের দ্বিতীয় বর্ষে আল্লাহ মুসলিমদের নিজেদের প্রতিরক্ষার জন্য এবং তাদের ওপর আক্রমণ করা থেকে শত্রুকে নিবৃত রাখতে জিহাদের অনুমতি দান করেন। কুরআন স্পষ্টভাবে বিবৃত করে—

> 'তোমরা তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করো যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে; কিন্তু সীমালঙ্ঘন করো না, নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।' (২:১৯০)

তবে যারা যুদ্ধ-বিগ্রহ পরিত্যাগ করে তাদের সাথে শান্তি স্থাপন করা যাবে—

> 'আর তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো যে পর্যন্ত না 'ফিতনা' দূরীভূত হয় এবং দ্বীন আল্লাহর জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, সুতরাং...।' (২:১৯৩)

জিহাদ পরিচালনার প্রতি কিছু মানুষের অনাগ্রহকে কুরআন নিজেই স্বীকার করে। কুরআনের ভাষায়—

> 'তোমাদের ওপর যুদ্ধকে ফরজ করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয় এবং হতে পারে কোনো বিষয় তোমরা অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং হতে পারে কোনো বিষয় তোমরা পছন্দ করো কিন্তু তা তোমাদের জন্যে অকল্যাণকর।' (২:২১৬)

সম্ভবত এসব উদ্ধৃতি আমাদের উপলব্ধি করতে সাহায্য করবে, কীভাবে একজন নিরীহ স্বভাববিশিষ্ট, বিনয়ী ও নম্রভাষী ওসামা বিন লাদেন পশ্চিমা বিশ্বের জন্য আতঙ্ক হয়ে ওঠেন।

সামগ্রিক অর্থে জিহাদের দুটি ধরন গ্রহণ করা হয়। আক্রমণাত্মক জিহাদ (ইকদামি জিহাদ) এবং প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ (দিফায়ি জিহাদ)। আক্রমণাত্মক জিহাদের উদ্দেশ্য হলো নিপীড়িতদের নিপীড়ন থেকে উদ্ধার করা এবং সেসব শত্রুদের নিবৃত্ত করা, যারা মুসলিমদের আক্রমণ করার পাঁয়তারা করে। এ ধরনের জিহাদকে ফরজে কিফায়া হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, যার অর্থ—যদি কতিপয় সক্ষম মুসলিম এই মিশন সম্পন্ন করার জন্য নিমগ্ন হয়, তবে বাকিরা এই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেয়ে যায়। প্রতিরক্ষামূলক জিহাদকে ফরজে আইন হিসেবে গণ্য করা হয়, যার অর্থ—সেই জায়গার এবং সেই সময়ের সকল মুসলিমদের জন্য এটি বাধ্যতামূলক।

প্রায় সকল মুসলিম স্কলার একমত যে, ঔপনিবেশিক বা দখলদার সৈন্য হিসেবে উক্ত আক্রমণকারীরা প্রতিরক্ষামূলক জিহাদের একটি মৌলিক কারণ। কেউ কেউ মনে করেন (অবশ্যই বিন লাদেন এবং আল-জাওয়াহিরিও) কোনো নিপীড়ক শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামও প্রতিরক্ষামূলক জিহাদের একটি ধারা। এখানে এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ যে কেবল শারীরিক লড়াইয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ তা নয়; ইসলাম অনুসারে একজন ধর্মপ্রাণ মুসলিম তিনটি উপায়ে এতে ভূমিকা রাখতে পারেন। প্রথমত, যোদ্ধা হিসেবে—যেখানে শাহাদাত বরণ করলে সাথে সাথেই জান্নাত লাভের প্রতিশ্রুতি বিদ্যমান। দ্বিতীয়ত, জিহাদে অর্থনৈতিকভাবে সহায়তা করা (বিন লাদেন এটাও বহুলভাবে সম্পন্ন করেছেন)। তৃতীয়ত, একে নৈতিকভাবে সমর্থন দেওয়া, সঠিক যুক্তিতে বিশ্বাসী হওয়া এবং যদি প্রয়োজন হয় তবে এমন কোনো ব্যক্তির পরিবারের দেখাশোনা করা যে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে গমন করেছে।

প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ প্রত্যেক সক্ষম মুসলিম ব্যক্তির জন্য একটি অলঙ্ঘনীয় ধর্মীয় দায়িত্ব (ফরজে আইন)। যদি কোনো ন্যায়বান এবং ধার্মিক নেতা এতে অংশগ্রহণের আহ্বান জানায়, তবে তা প্রত্যাখ্যান করার কোনো সুযোগই নেই। এখানে নেতৃত্বের ধীশক্তির ওপর জোর দেওয়াটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং এটি আমাদের এ কথা বুঝতে সাহায্য করে যে, কেন বিন লাদেন তার ভাবমূর্তির ব্যাপারে এতটা সচেতন। ইতিমধ্যে মুসলিমবিশ্বে তার ধার্মিকতা এবং অনাড়ম্বরতা কিংবদন্তীতুল্য হয়ে উঠেছে।

অন্যদিকে কেবল খলিফা অর্থাৎ মুসলিম উম্মাহর প্রধানই আক্রমণাত্মক জিহাদের আহ্বান করতে পারেন। কিন্তু সমস্যা হলো, কোনো মুসলিম কর্তৃপক্ষ

কর্তৃক কোনো আক্রমণাত্মক এবং প্রতিরক্ষামূলক জিহাদের আহ্বান জানানো বিশেষ করে তরা মার্চ ১৯২৪ সালের পর থেকে একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ কামাল আতাতুর্ক এইদিনে খিলাফতকে লুপ্ত ঘোষণা করে, যেটাকে অটোমান সুলতানরা ১৫১৭ সাল থেকে পরিচালনা করে আসছিলেন। এরপর সেই অটোমান সাম্রাজ্যটি জাতি, গোষ্ঠী, ভাষা, রাজনৈতিক আদর্শ, ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক ভিন্নতা অনুযায়ী প্রায় পঞ্চাশটি জাতিরাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে যায়।

কিছু মুসলিমের নিকট খলিফার অনুপস্থিতি শরিয়াহর একটি মারাত্মক লঙ্ঘন বলে বিবেচিত হয় এবং খিলাফতের পুনর্বহাল উম্মাহর অদৃষ্টকে পরিবর্তনের অন্যতম একটি প্রধান ধাপ বলে পরিগণিত হয়। আল-কায়েদার ঘোষিত লক্ষ্যসমূহের মধ্যে একটি হলো—খিলাফতের পুনর্বহাল করা এবং এর মাধ্যমে মুসলিমদের হারানো ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনা।

রাজনৈতিক ইসলামের উত্থান

এই পুরো বইটি কেবল এই প্রসঙ্গেই উৎসর্গীত করা যাবে। এখানে আমি আমার পর্যবেক্ষণকে সেসব স্কলার এবং ভাবাদর্শের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে ইচ্ছুক, যারা বিন লাদেন এবং আল-জাওয়াহিরির নিজস্ব জিহাদি মতবাদের ক্রমবিকাশে সবচেয়ে প্রত্যক্ষভাবে ভূমিকা রেখেছেন। বিন লাদেন বিভিন্ন বৈচিত্র্যের ইসলামিক স্কুল অফ থট (মাযহাব) সম্পর্কে অবহিত এবং প্রভাবিত, যেগুলোকে সামগ্রিকভাবে সালাফি বলে চিহ্নিত করা যায়। তিনি ব্যক্তিগতভাবে অনেক বিশিষ্ট সামসময়িক ইসলামিক স্কলার এবং ভাবাদর্শীদের অনেকের সাথে উঠাবসা করেছেন, কিন্তু মনে করা হয়, তিনি সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়েছেন প্রথমত আব্দুল্লাহ আযযাম এবং দ্বিতীয়ত আল-কায়েদার সহকারী প্রধান আল-জাওয়াহিরি কর্তৃক।

সালাফিরা মনে করে—কেবল মুসলিমদের প্রথম তিন প্রজন্মই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী মোতাবেক সঠিক পথ অনুসরণ করেছে। যেমনটি হাদিসে উল্লেখ আছে—'সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ আমার সময়ের মানুষ, তারপর তাদের পরবর্তীরা, তারপর তাদের পরবর্তীরা'।

তাকিউদ্দিন ইবনে তাইমিয়া (১২৬৩-১৩২৮ খ্রি.) সম্ভবত ছিলেন প্রথম সালাফি আলেম। তিনি খুব অল্প বয়সেই তার বুদ্ধিবৃত্তিক ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন এবং তিনি এ যাবৎকালের শ্রেষ্ঠ ইসলামিক স্কলারদের মধ্যে অন্যতম বলে বিবেচিত হন। তিনি শুরুতে দামেশকে বসবাস করতেন। সেইসময় মুসলিমবিশ্ব ব্যাপক রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় গন্ডগোলের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। ১২৫৮ সালে অচিন্তনীয় এক ঘটনা সংঘটিত হয়। আগ্রাসী মোঙ্গলরা আব্বাসীয় সাম্রাজ্য

এবং খিলাফতকে পরাজিত করে এবং রাজধানী বাগদাদকে লন্ডভন্ড করে দেয়। ইবনে তাইমিয়া এই দুর্দশার কারণকে অন্বেষণ করতে থাকেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, মুসলিমরা এখন আর সঠিক দীনের ওপর নেই এবং তাদের ধর্মীয় দায়িত্বে অবহেলা করছে। তিনি তার সামসময়িকদের স্মরণ করিয়ে দিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ওফাতের কিছু পূর্বের প্রতিশ্রুতির কথা—

> 'আমি তোমাদের নিকট দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি; যতদিন তোমরা এই দুটিকে আঁকড়ে ধরে থাকবে ততদিন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না; আল্লাহর কিতাব এবং আমার সুন্নাহ (সুন্নাহ বলতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচার-আচরণকে বোঝায়)।'

বিশেষ করে ইবনে তাইমিয়া মুসলিম নেতাদের সঠিক ইসলামি বিশ্বাস এবং শরিয়াহ অনুসরণ ও শরিয়াহ-ভিত্তিক আইনপ্রণয়ন ও প্রতিষ্ঠা না করা বিষয়ে তাদের নিন্দা করতেন স্পষ্ট ভাষায়। স্বাভাবিকভাবেই এটা তার অসংখ্য ক্ষমতাসীন শত্রু তৈরি করে এবং তাকে তার দেশ সিরিয়া এবং মিশরে বেশ কয়েকবার বন্দিও করা হয়। জনসাধারণের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তা সমগ্র জীবনব্যাপীই বাড়তে থাকে এবং যখন তিনি মারা যান, তখন প্রায় দুই লক্ষ মানুষ তার জন্য রাস্তায় বিলাপ করেছিল।

যারা তাকে ভাবাদর্শিক গুরু এবং আদর্শ পথিকৃৎ হিসেবে মনে করেন, তাদের মধ্যে বিন লাদেন এবং আল-জাওয়াহিরিই একা নন । অকুতোভয় মনোবলের একজন যোদ্ধা হিসেবে বিখ্যাত হবার পাশাপাশি তিনি তার ধার্মিকতা এবং ন্যায়পরায়ণ অনুভূতির জন্যও সুপরিচিত ছিলেন। বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তিধারী এবং জ্ঞানের সকল শাখায় পারদর্শী একজন উজ্জ্বল বুদ্ধিমত্তার অধিকারী ছাড়াও তিনি বড় মাপের একজন বাগ্মীও ছিলেন। তিনি সেসব ধর্মান্তরিত মুসলিমদের, বিশেষভাবে মোঙ্গলদের তীব্রভাবে বিরোধিতা করেছিলেন, যারা তাদের পূর্ববর্তী বিশ্বাসের অংশকে তাদের নতুন কবুলকৃত ইসলামি ধর্মমতের সাথে সংমিশ্রণ ঘটাচ্ছিল। সেই সময়ে মোঙ্গলরা ইসলামকে কবুল করলেও তারা শরিয়তকে পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয় এবং এর বদলে তারা চেঙ্গিস খান কর্তৃক প্রণীত 'ইয়াসা'কে সংবিধান হিসেবে ধারণ করে। ইবনে তাইমিয়া মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের একটি ফতোয়া জারি করলেন এবং এর মাধ্যমে কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদের আরেকটি নিদর্শন প্রতিষ্ঠা করলেন, যদিও সেটা শাসকদের বিরুদ্ধেই যাচ্ছে।

বিন লাদেন ১৯৯৬ সালে '*ডিক্লারেশন অফ জিহাদ*' বার্তাটিতেও ইবনে তাইমিয়ার উল্লেখ করে বলেন, সঠিক বিশ্বাসীরা উম্মাহকে তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে উদ্দীপ্ত করবে, যেমনটা ইবনে তাইমিয়ার মতো পূর্বপুরুষরা করেছিলেন।

ওয়াহাবিজম হচ্ছে সৌদিদের নিজস্ব ইসলামিক ভাবাদর্শিক শাখা, যা অষ্টাদশ শতাব্দীতে উৎপত্তি লাভ করে, এটা নিয়ে পরবর্তী অংশে কিছুটা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে। এখানে আমি কেবল ওয়াহাবিজম প্রতিষ্ঠায় জিহাদের ভূমিকা নিয়ে আলোকপাত করতে চাই, যেটা এই অঞ্চলে সেই সময়ে সঠিক বিশ্বাস বলে বিবেচিত ছিল। ১৮১১ সালের দিকে সাহসী যোদ্ধা ইবনে সাউদের সাথে একটি জোট গঠনের মাধ্যমে ওয়াহাবিরা আরব উপদ্বীপের বেশিরভাগ অঞ্চলকে তাদের পতাকার নিচে একতাবদ্ধ করতে সক্ষম হয়। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে ইবনে আবদুল ওয়াহাবের অনুসারীদের একটি গোষ্ঠী, যারা 'ইখওয়ান' নামে পরিচিত ছিল—তারা মূলত বেদুইনদের মধ্য থেকে উদীত হয়েছিল। সেখানে প্রায় এক লক্ষের অধিক ভয়ংকর মুজাহিদরা 'হিজরাহ' নামক একটি শিবিরে সন্নিবেশিত হয়েছিল। সেই শিবিরটির নাম 'হিজরাহ' রাখা হয়েছিল মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের সম্মানার্থে। সেই সম্মিলনে তাদের লক্ষ্য ছিল অমুসলিম এবং সত্যচ্যুত মুসলিমদের সাথে লড়াই করে আরব উপদ্বীপকে সেই পথে ফিরিয়ে আনা, যাকে তারা সঠিক পথ বলে গণ্য করত।

এটি একটি মজার ব্যাপার যে, সৌদি কর্তৃপক্ষ আল-কায়েদাকে একটি 'বিপথগামী গোষ্ঠী' বলে উল্লেখ করে সেই রেফারেন্সের মাধ্যমে, যেটা তাদের নিজেদেরই পূর্ববর্তী ইতিহাসের সাথেই মিলে যায়।

ওয়াহাবিজম হলো প্রধান দুটি চিন্তাধারার একটি, যা আল-কায়েদা নেতাদের চিন্তাভাবনাকে প্রভাবিত করে। অন্যটি হলো কুতুবিজম, যার ভিত্তি হলো মিশরীয় সাইয়েদ কুতুবের (১৯০৬-১৯৬৬) চিন্তাভাবনা এবং তার রচনাবলি। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫০, এই দুই বছর আমেরিকায় শিক্ষালাভ কুতুবকে পশ্চিমা উদারনীতির বিরোধী করে তোলে এবং মিশরে ফিরে এসেই তিনি তার দেশবাসীকে পশ্চিমা চিন্তাধারার ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক করা শুরু করেন। তিনি মুসলিম ব্রাদারহুডে যোগদান করেন এবং এর অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠেন। মুসলিম ব্রাদারহুড ১৯২৮ সালে মিশরীয় হাসান আল-বান্না কর্তৃক নিম্নোক্ত নীতির ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়—'আমাদের অভিষ্ঠ লক্ষ্য আল্লাহ, আমাদের নেতা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমাদের সংবিধান কুরআন, আমাদের পথ জিহাদ এবং আমাদের সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা আল্লাহর রাহে শাহাদাত।'

১৯৩০ এর দশকজুড়ে বিস্ময়কর গতিতে মুসলিম ব্রাদারহুড বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং বর্তমানে বিশ্বের প্রায় সত্তরটি দেশে এর শাখা রয়েছে। আধুনিক যুগের অধিকাংশ ইসলামিক অভ্যুত্থান সামান্য হলেও এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। বর্তমানে বিদেশি শক্তি কর্তৃক দখলদারির ক্ষেত্র ব্যতীত (যেমন ফিলিস্তিন এবং ইরাক) অন্যত্র তারা শসস্ত্র সংগ্রামকে অনুমোদন করে না। বর্তমানে মুসলিম

ব্রাদারহুডের এজেন্ডা হলো সংস্কার প্রক্রিয়া বিস্তারের জন্য কোন শান্তিপূর্ণ উপায় অনুসরণ করা এবং যেখানে সম্ভব রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায়ও অংশগ্রহণ করা। আল-কায়েদাসহ অনেক চরমপন্থি সংগঠনের অনেকেই একে আপসকামিতা বলে চিহ্নিত করে এবং এর সমালোচনা করে।

শাসন পরিচালনাসংক্রান্ত নির্দিষ্ট কিছু রীতি প্রতিপাদন এবং প্রবর্তন করা নিয়ে কুতুবের লেখালেখিগুলো আল-কায়েদার মতো গোষ্ঠীগুলো কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো মানব রচিত আইন পরিত্যাগ করে আল্লাহর একত্ববাদের সর্বজনীন ক্ষমতাকে অধিষ্ঠিত করা এবং যদি প্রয়োজন হয় তবে সহিংস পদ্ধতির মাধ্যমে হলেও মানব রচিত আইনের বিনাশ ঘটানো। এ ছাড়াও মুসলিমদের জন্য একমাত্র অনুমোদিত শাসনব্যবস্থা হলো খলিফা নিয়ন্ত্রিত ইসলামি রাষ্ট্র। ভারতীয় বংশোদ্ভূত স্কলার আবুল আলা মওদুদী থেকে কুতুব 'জাহিলিয়াহ' শব্দটির অনুকরণ করেন, যার উদ্দেশ্য বলতে বোঝানো হয় এমন পশুতুল্য অজ্ঞতা—এ যাবৎকাল পর্যন্ত মানুষ যার নিচে নামেনি এবং এটি ইসলামের আগমনের পূর্ববস্থায় আরবে বিদ্যমান ছিল। বিন লাদেনও প্রায়ই এই শব্দের উল্লেখ করেন।

১৯৫৪ সালে নাসেরকে হত্যাচেষ্টার অভিযোগ দায়ের করে কুতুবকে আটক করে জেলে বন্দি করা হয় এবং বাকি জীবনের বেশিরভাগ সময় তিনি জেলেই কাটান। সেখানে তিনি আধুনিক যুগের সবচেয়ে প্রভাবশালী কিছু ইসলামি গ্রন্থ রচনা করেন। এর মধ্যে রয়েছে '*ইন দ্য শেইড অফ দ্য কুরআন*' এবং রাজনৈতিক ইসলামের ম্যানিফেস্টো—'*মাইলস্টোন*'। তার রচনাবলিতে উদ্ধৃত হয়েছে তার নিজস্ব মৌলবাদীতা, কারাগারের বর্বরতা ও নৃশংসতা, নিপীড়নের সাক্ষী হওয়া, সেসবের নিজস্ব অভিজ্ঞতা এবং তার কর্তৃক নাসেরের শাসনব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান, যেটাকে তিনি পুরোপুরি অবৈধ বলে গণ্য করতেন। তাকে আটক করার পর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল যে, তিনি যদি নাসেরের কাছে ক্ষমা চান তবে তাকে মুক্তির সুযোগ দেওয়া হবে; তখন তিনি এই বিখ্যাত বাণী উচ্চারণ করেছিলেন—'যে শাহাদাত আঙুল প্রত্যেক সালাতে আল্লাহর একত্ববাদের স্বীকৃতি দেয় সেটা কখনোই কোনো জালেমের কাছে ক্ষমা চাইতে পারে না।' ১৯৬৬ সালে তাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

আল-কায়েদার উৎপত্তির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত আরেকজন স্কলার হলেন শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় জীবন থেকেই বিন লাদেনের পরামর্শদাতা ছিলেন। তার জন্ম ফিলিস্তিনের ওয়েস্ট বাঙ্কে। তিনি ছয়দিনের যুদ্ধের সময় জর্ডানে চলে আসেন। আযযাম নিজেও কুতুবের শিক্ষা দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন।

১৯৮৪ সালে আফগানিস্তানে সোভিয়েত আগ্রাসনের পাঁচ বছর পর শাইখ আযযাম 'মুসলিম ভূমির প্রতিরক্ষা : ঈমানের পর প্রথম ফরজ' নামে একটি ফতোয়া জারি করেন। সেখানে বিবৃত করা হয় যে, আফগানিস্তান এবং ফিলিস্তিনের জিহাদ প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজে আইন বা বাধ্যতামূলক কর্তব্য। এই ফতোয়াটি সৌদি গ্র্যান্ড মুফতি শাইখ আবদুল আজিজ বিন বায কর্তৃক সমর্থিত হয়েছিল। কিন্তু আমেরিকান সৈন্যদের সৌদির মাটিতে পদার্পণের অনুমোদন দিয়ে ১৯৯০ সালে তার ফতোয়াটি তার পুরোপুরি ভিন্ন একটি চেহারা প্রকাশ করেছিল।

আযযাম ১৯৮০ সালে পেশোয়ারে আগমন করেছিলেন এবং আফগান-আরবদের মবিলাইজ করতে তিনি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করতেন; আগত স্বেচ্ছাসেবকদের থাকার বন্দোবস্ত করতেন এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতেন। এগুলোর বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিন লাদেন তাকে সাহায্য করতেন এবং এর মাধ্যমে এই দুজন ব্যক্তি আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। তারা 'মাকতাব আল-খিদমাহ' নামক একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আযযাম নিজেও ফ্রন্ট লাইনে যুদ্ধে যোগদান করেন এবং নিয়মিতভাবেই বিভিন্ন আফগান এবং আরবদের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতেন। এভাবে তিনি বিশ্বব্যাপী মুসলিমদের নিকট একজন অনুপ্রেরণীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। অন্যান্য মুসলিমদের উদ্দীপিত করাকে আযযাম একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় দায়িত্ব হিসেবে চিহ্নিত করেন। এটা শুনতে পাওয়া আজকাল অস্বাভাবিক না যে, মুসলিম আলেমরা ফিলিস্তিন, ইরাক বা অন্যান্য মুসলিম দেশে দখলদারির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে এবং মুসলিমদের জিহাদে যোগদানের জন্য উৎসাহিত করছে।

ইসলামিক আন্দোলনগুলো সচরাচর স্থানীয় বা দেশীয় সংগ্রাম হিসেবে কেন্দ্রীভূত ছিল। কিন্তু আযযাম সতর্ক করেন যে, সেসব তথাকথিত জাতীয় সীমানার বেশিরভাগই ইউরোপিয়ান ঔপনিবেশিকদের দ্বারা আরোপিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন—'দুর্ভাগ্যবশত আমরা যখন ইসলাম নিয়ে চিন্তা করি, আমরা সেটা জাতিগতভাবেই করি। আমরা সেসব ভৌগোলিক দেয়াল অতিক্রম করে দৃষ্টিপাত করতে ব্যর্থ হই, যেগুলো কাফেরদের দ্বারা আমাদের মাঝে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে।' বৈশ্বিক জিহাদের অভিমুখে এটাই প্রথম আদর্শিক পদক্ষেপ যেটা আল-কায়েদাকে সংজ্ঞায়িত করে। আযযাম এবং তার দুই ছেলেকে ১৯৮৯ সালে গুপ্তহত্যার মাধ্যমে শহিদ করা হয়।

সেই সময়ে আযযাম এবং বিন লাদেনের সম্পর্কের মাঝে একটি ফাটলের সৃষ্টি হয়েছিল এবং বিন লাদেন ও আল-জাওয়াহিরির সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হচ্ছিল। আল-জাওয়াহিরি ১৯৮০র দশকের মাঝামাঝি সময়ে পেশোয়ারে আগমন করেন এবং

এমন একটি শিবিরে অবস্থান করতে থাকেন, যেখানে 'ইজিপশিয়ান ইসলামিক জিহাদ'-এর সদস্যরা একত্রিত হয়েছিল। এই দলটি মুসলিম ব্রাদারহুডের বিরোধিতা করত। আল-জাওয়াহিরি এবং তার সাথিদের অনেকেই আযযামকে প্রায়ই 'আপসকামিতা'র জন্য অভিযুক্ত করত; কারণ তিনি তাদের তাকফিরি ভাবাদর্শ (কোনো মুসলিমকে কাফির বলে অভিযুক্ত করা) এবং সহিংসতা প্রয়োগের মাধ্যমে বিদ্যমান শাসনব্যবস্থাসমূহ উপড়ে ফেলার স্ট্র্যাটেজিক লক্ষ্যের বিপক্ষে ছিলেন।

যদিও গুজব রয়েছে যে, বিন লাদেন আযযাম হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিলেন, কিন্তু এর কোনো শক্তিশালী ভিত্তি নেই। অন্যান্য সন্দেহভাজনদের মতে আইএসআই, সিআইএ এবং মোসাদকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তারা আযযামের নিয়মিত ঘোষণা করা এই অভিরুচি নিয়ে ভীত ছিল যে, যখনই আফগান জিহাদ সমাপ্ত হবে, তিনি তার এবং মুজাহিদদের মনোযোগকে ফিলিস্তিনকে মুক্ত করার দিকে মনোনিবেশ করবেন।

১৯৭৯ সালে আযযাম প্রচণ্ড বিস্ফোরক একটি ফতোয়া জারি করেন এই ঘোষণার মাধ্যমে যে, যদি মুসলিমরা আল্লাহর হুকুম পালনে রত হয় এবং জেনারেল মার্চ[১] সম্পর্কিত শরয়ি আইনসমূহ ফিলিস্তিনে কেবল এক সপ্তাহ বাস্তবায়ন করে, তবে ইহুদিরা ফিলিস্তিন থেকে বিতাড়িত হতে বাধ্য হবে।

একসাথে পথচলা : বিন লাদেন ও জাওয়াহিরি

বিন লাদেন এবং আল-কায়েদা ভাবাদর্শের বিকাশ, যাকে সবচেয়ে উপযুক্তভাবে সম্ভবত 'সালাফি-জিহাদি' হিসেবে চিত্রিত করা যায়, সেটি আল-জাওয়াহিরির মতাদর্শের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যদিও এই দুজন ব্যক্তি তখনও তাদের বাহিনীকে আনুষ্ঠানিকভাবে আল-কায়েদার পতাকাতলে মিলিত করেননি, কিন্তু নিশ্চিতভাবেই তারা বিগত দশক ধরেই পরস্পরের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন এবং একে অন্যের দ্বারা ক্রমবর্ধমানভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। বিশেষভাবে ধারণা করা হয়, আল-জাওয়াহিরি বিন লাদেনকে আরও সহিংস পদ্ধতি অবলম্বনে প্ররোচিত করতে প্রধান সহায়ক ভূমিকা পালন করেছেন।

---

[১] ইবনে তাইমিয়াহর মতে জেনারেল মার্চ (নফিরে আম) হলো এমন একটি মূলনীতি, যার মাধ্যমে সমগ্র উম্মাহকে জিহাদের উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় এবং মুসলিম ভূখণ্ডে কোনো বহিরাগত হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে জিহাদের অভিযান পরিচালনা করা হয়। (এমন ক্ষেত্রে খলিফা বা সুলতান দেশের সবাইকে জিহাদের জন্য আহ্বান করেন এবং তখন উক্ত জিহাদ ফরজে কিফায়া থেকে ফরজে আইন হয়ে যায়।)

বিন লাদেন যে কোনো জন্মগত লড়াকু ছিলেন না, সেটা সম্ভবত তার পূর্ববর্তী বছরগুলো থেকেই স্পষ্ট হয়। যেখানে তিনি ছিলেন একজন কোমল আচরণের অধিকারী। যখন ১৯৮০-এর দশকের শুরুর দিকে প্রথমবারের মতো তিনি আফগানিস্তানে আগমন করেন, তখন তার প্রাথমিক ভূমিকা ছিল মুজাহিদদের অর্থনৈতিকভাবে এবং প্রশাসনিকভাবে সাহায্য করা। তিনি সেখানে যুদ্ধের সমগ্র সময়টি জুড়েই অবস্থান করেননি বরং তিনি সৌদি আরবে বারবার আসা-যাওয়া করেছেন। সেখানে তিনি তার পারিবারিক ঠিকাদারি কোম্পানিতে সক্রিয় ছিলেন এবং সৌদি রাজ পরিবারের সাথে যোগাযোগ রাখতেন। সেগুলো মুজাহিদদের তহবিল সরবরাহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। তখন আমেরিকাও উক্ত সোভিয়েত বিরোধী অভিযানে টাকাকড়ির জোগান দিয়েছিল এবং সেসব মুজাহিদদের সমর্থন, প্রশিক্ষণ এবং অস্ত্র দিয়েছিল যাদের চিহ্নিত করলে মূলত দেখা যাবে, সেই একই ব্যক্তিরা আজ বিশ্বব্যাপী জঙ্গি কার্যকলাপ বিস্তার করছে।

আল-জাওয়াহিরি বয়সে বিন লাদেনের ছয় বছরের বড় (তার জন্ম ১৯৫১ সালে, মিশরে)। তিনি মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে মুসলিম ব্রাদারহুডে যোগদান করেন এবং সাইয়িদ কুতুবের শিক্ষাদীক্ষার সাথে এঁটে থাকেন। তিনি প্রায়ই সাইয়িদ কুতুবের উদ্ধৃতি উল্লেখ করেন—'ভাই, এগোতে থাকো। কারণ তোমার পথ তো রক্তসিক্ত। তোমার ঘাড়কে ডানে-বামে ঘুরিয়ো না। তোমার দৃষ্টি কেবল জান্নাতের দিকেই নিবদ্ধ রাখো।' আল-জাওয়াহিরির অনেক প্যারাডক্সের মধ্যে একটি হলো চিকিৎসাবিজ্ঞানকে তার পেশা হিসেবে মনোনীত করে একজন বিশেষজ্ঞ সার্জন হয়ে ওঠা। ১৯৭৯ সালের দিকে তিনি আরও চরমপন্থি ইসলামিক গ্রুপ 'ইজিপশিয়ান ইসলামিক জিহাদ' এ যোগদান করেন, যার চূড়ান্ত এজেন্ডা ছিল মিশরীয় সরকারব্যবস্থার পতন ঘটানো।

'ইজিপশিয়ান ইসলামিক জিহাদ' গ্রুপটিই ইসরাইলের সাথে প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতের শান্তিচুক্তির জবাব দিয়েছিল ১৯৮১ সালে তাকে গুপ্তহত্যার মাধ্যমে। আল-জাওয়াহিরিও এই হত্যার সাথে জড়িত ছিলেন। তাকে জেলে পাঠানো হয় এবং তার বিরুদ্ধে কোনো সুনির্দিষ্ট প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও ব্যাপক নির্যাতন চালানো হয়। কারাগারে থাকাকালীনই ধারণা করা হয়েছিল, তিনিই এরপর 'ইজিপশিয়ান ইসলামিক জিহাদ'-এর প্রধান হবেন। অতঃপর ১৯৮৪ সালে মুক্ত হওয়ার পর তিনি পুনরায় এটি চালু করেন। ১৯৮৫ সালে তিনি সোভিয়েত বিরোধী জিহাদে মুজাহিদদের সহায়তা করার জন্য আফগানিস্তান এবং পাকিস্তান ভ্রমণ করেন।

১৯৮৬ সালে বিন লাদেন আল-জাওয়াহিরি এবং আবু হাফস আল-মাসরি-সহ অন্যান্য মিশরীয় চরমপন্থিদের সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়া শুরু করেন। সেসময়

মুজাহিদরা প্রচণ্ড চাপের মধ্যে ছিল এবং তখনই বিন লাদেন একজন কমান্ডার হিসেবে রণক্ষেত্রে তার আবির্ভাব ঘটালেন। সংঘাতের বাকি তিন বছর তিনি অনেক লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

এই সময় থেকেই বহু (হয়তো অপ্রমাণিক) কাহিনির উদয় হয়। প্রচলিত আছে বিন লাদেনের সৈন্যরা কান্নাকাটি করত এই কারণে যে, তারা লড়াইয়ে শাহাদত বরণ করতে পারেনি এবং এখনও জীবিত আছে। আরেকটি ঘটনায় যখন সোভিয়েতরা প্রবল গোলাবর্ষণ করছিল তখন বিন লাদেনের ওপর সকিনা—এক ধরনের আধ্যাত্মিক প্রশান্তি—অবতীর্ণ হওয়ার কারণে তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিলেন এবং পুরোপুরি অক্ষত অবস্থায় ফিরে আসেন। (এই ঘটনাটি তিনি ব্রিটিশ সাংবাদিক রবার্ট ফিস্ক এবং আমার কাছেও বর্ণনা করেছেন।)

প্রাথমিকভাবে আল-কায়েদার প্রথম উদ্ভব ঘটে ১৯৮৮ সালে। এর গঠন-উপাদানে ছিল একটি ইনার সার্কেল, যারা আমির বা নেতা হিসেবে বিন লাদেনের হাতে বাইয়াত (আনুগত্যের শপথ) প্রদান করেছিল এবং অপরটি ছিল আউটার সার্কেল, যাদের বাইয়াত এবং সংখ্যা পরিবর্তিত হতো। সেসময় বিন লাদেনের সহকারী ছিলেন আবু হাফস আল-মাসরি, যিনি 'ইজিপশিয়ান ইসলামিক জিহাদ'-এর সাথেও যুক্ত ছিলেন এবং আল-জাওয়াহিরির সাথে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এটা স্পষ্ট যে, সেই সময়েই বিন লাদেন এবং আল-জাওয়াহিরির পথ সম্পূর্ণভাবে মিলিত হয়ে এক হয়ে যায়; যদিও তারা এক বছর পরে আফগান যুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে নিজ নিজ দেশে চলে গিয়েছিলেন।

এর কিছুকাল পরই ১৯৯০ সালে বিন লাদেনের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া ঘটনাটি ঘটার পর—অর্থাৎ যখন সৌদি কর্তৃপক্ষ ইরাকের বিরুদ্ধে বিন লাদেনের মুজাহিদ ফোর্স ব্যবহারের প্রস্তাবকে উপেক্ষা করে এবং এর বদলে আমেরিকার দ্বারস্থ হয়—বিন লাদেন সুদানে বসতি স্থাপন করেন। রাস্তা নির্মাণ এবং কৃষি প্রকল্প পরবর্তী কয়েক বছর তাকে ব্যস্ত রাখলেও, এই পরিচয়ের আড়ালে তিনি জিহাদি ভাবাদর্শ এবং কলাকৌশলের সাথে জড়িত ছিলেন। আযযামের মতোই, তার জিহাদি ধ্যান-ধারণা ছিল স্থানীয় নয়; বরং বৈশ্বিক। অবশেষে ১৯৯২ সালেই তিনি আমেরিকাকে আঘাত করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। এডেন বন্দরে আল-কায়েদা কুশলীরা সোমালিয়ায় গমনকালে মার্কিন কর্মকর্তাদের লক্ষ্য করে বোমা হামলা ঘটায়। এর এক বছর পর পুনরায় তারা আঘাত হানে এবং মোগাদিশুতে তিনটি আমেরিকান হেলিকপ্টার ভূপাতিত করে।

ইত্যবসরে, আল-জাওয়াহিরি মিশরে ফিরে গিয়েছিলেন এবং ইজিপশিয়ান ইসলামিক জিহাদের মাধ্যমে পূর্বের চেয়ে আরও বেশি বেপরোয়া এবং হিংস্র ক্রিয়াকলাপ পরিচালনা করছিলেন। বিন লাদেনের বিপরীতে সেই সময় তাঁর লক্ষ্য

ছিল পুরোপুরিভাবে স্থানীয় এবং সেটি ছিল মিশরীয় শাসনব্যবস্থা। ১৯৯০ দশকের শুরুতে তিনি দুইবার আমেরিকাতে ভ্রমণে করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এর পেছনে তার কি উদ্দেশ্য ছিল, সেটা স্পষ্ট না হলেও কেউ কেউ বলেন যে, তিনি ইজিপশিয়ান ইসলামিক জিহাদের জন্য চাঁদা তোলার কাজে গিয়েছিলেন। তবে অনেক রেফারেন্সই নির্দেশ করে যে, সেই সময় ইজিপশিয়ান ইসলামিক জিহাদের জন্য আল-কায়েদা থেকেও তহবিল অব্যাহত ছিল। একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র মতে, ১৯৯৫ সালে মিশরের প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারকের ব্যর্থ হত্যাচেষ্টাটি আবু হাফস আল-মাসরি এবং আল-জাওয়াহিরির মাধ্যমে আল-কায়েদার অর্থায়নেই করা হয়েছিল। বিন লাদেন তার আরেক বৃহত্তম শত্রু সৌদি শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে তার প্রথম আক্রমণ পরিচালনা করেন ১৯৯৫ সালে। তখন সে দেশের একটি আল-কায়েদা ইউনিট রিয়াদে বিদেশি কর্মকর্তাদের একটি হাউজিং কমপ্লেক্সে বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়। এরপর ১৯৯৬ সালে আমেরিকান সৈন্যদের ওপর হামলা করা হয়। বিন লাদেন তার '*ডিক্লারেশন অফ জিহাদ অ্যাগেইনস্ট দ্য আমেরিকানস অকুপায়িং দ্য ল্যান্ড অফ টু স্যাক্রেড প্লেসেস*' ঘোষণা করেন এবং মুসলিম উম্মাহর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান এই লড়াইয়ে তার সাথে যোগদান করার জন্য।

১৯৯৭ সালে আল-জাওয়াহিরি লুক্সরে আটান্ন জন টুরিস্ট এবং চারজন মিশরির লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিলেন, যেটাকে তিনি পরবর্তী কালে ঘোষণা করেন 'ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে পরিচালিত আক্রমণসমূহের মধ্যে একটি বৃহত্তর ঘটনা' হিসেবে। তবে মিশরীয় জনগণ তার এই মূল্যায়নের সাথে সম্মত হয়নি এবং সেখানে জিহাদি গ্রুপগুলো যৎসামান্য যেটুকু জনপ্রিয়তা উপভোগ করত, সেগুলো দ্রুতই হারিয়ে যেতে থাকে। ১৯৯৮ সালে কয়েকটি চরমপন্থি সংগঠনের নেতারা সরকারের সাথে অস্ত্রবিরতি ঘোষণা করে। আল-জাওয়াহিরি তীব্রভাবে এই 'শান্তি আলোচনা' প্রত্যাখ্যান করেন এবং আফগানিস্তানে রওনা হন। সেখানে তিনি বিন লাদেনের সাথে একটি সুস্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ সখ্যতা গড়ে তোলেন এবং তার ডান হাত ও সিদ্ধান্তগ্রহণকারী হয়ে ওঠেন। ১৯৯৯ সালে মিশরীয় সরকার আল-জাওয়াহিরির অনুপস্থিতিতে তার মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণা করে।

ওয়ার্ল্ড ইসলামিক ফ্রন্ট

বিন লাদেনের কাছের লোকদের দাবি মোতাবেক বিন লাদেন এবং আল-জাওয়াহিরি একে অন্যকে সমান পরিমাণে কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে প্রভাবিত করেন। আল-কায়েদার কর্মকাণ্ডের মাঝে বেপরোয়া এবং সহিংসতা বৃদ্ধির সাথে সাথে মিডিয়ার দক্ষ ব্যবহার এবং মনস্তাত্ত্বিক স্ট্র্যাটেজির বিকাশ—এসব আল-

জাওয়াহিরি থেকে উৎসারিত হয়েছে। ১৯৯৬ সালের আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণাপত্র নিয়ে আল-জাওয়াহিরি সন্তুষ্ট ছিলেন না। সা'দ আল-ফকিহ এর মতে, জাওয়াহিরি বিন লাদেনকে বুঝিয়েছিলেন যে, যতদিন পর্যন্ত তার নালিশগুলো যৌক্তিক থাকবে ততদিন পর্যন্ত আমেরিকা তাকে নিয়ে মাথা ঘামাবে না। সৌদি আরব থেকে আমেরিকান সৈন্য প্রত্যাহারের বিষয়টি একজন গড়পড়তা আমেরিকান নাগরিকও বুঝতে পারে এবং হয়তো সহানুভূতিও প্রকাশ করতে পারে। তাই এটি কোনো হেডলাইন হওয়া উচিত নয় এবং এটি রিক্রুটমেন্টেও সহায়তা করবে না। এত দীর্ঘ একটি ডকুমেন্ট কপি করা এবং প্রচার করার অসুবিধাসমূহকেও তিনি তুলে ধরেন। এটি ইন্টারনেট পূর্বের যুগ ছিল যখন ফটোকপি করাও কঠিন এবং ব্যয়বহুল ছিল।

এর বদলে আল-জাওয়াহিরি বিন লাদেনকে বলেন, আপনি আমেরিকান জনগণকেই আপনার ব্যক্তিগত এজেন্ট বানিয়ে ফেলুন। সমগ্র বিশ্বে তারাই সবচেয়ে বড় জনসংযোগের হাতিয়ার। তিনি বিন লাদেনকে পরামর্শ দেন দেশের এবং বিদেশের সকল আমেরিকান এবং সকল ইহুদিকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত এবং স্পষ্ট ঘোষণা প্রচার করতে এবং তারপর সেটাকে কর্মে রূপান্তরিত করতে। সা'দ আল-ফাকিহের মতে, বিন লাদেন প্রাথমিকভাবে এই পরামর্শ নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি এটা মানতে পারছিলেন না যে, সকল আমেরিকান তার শত্রু। জাওয়াহিরি তাকে বোঝান যে, এর উদ্দেশ্য আমেরিকান জনগণকে হত্যা করা নয় বরং তাদেরকে উন্মত্ত করে দেওয়া। এতে তারা কাউবয়ের মতো এবং কোনো চিন্তাভাবনা না করেই প্রতিক্রিয়া জানাবে।

১৯৯৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি বিন লাদেন এবং আল-জাওয়াহিরি 'ওয়ার্ল্ড ইসলামিক ফ্রন্ট' গঠনের ঘোষণা দেন এবং ইহুদি খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন। উক্ত ফ্রন্টটি ইসলামিক জিহাদ, ইজিপশিয়ান ইসলামিক গ্রুপ এবং পাকিস্তান ও বাংলাদেশি বিভিন্ন চরমপন্থি দলগুলোকে প্রথমবারের মতো একই ছাতার নিচে নিয়ে আসে। ভিন্ন ভিন্ন দলগুলোকে এই একত্রিতকরণ ছিল অধিকাংশেই আল-জাওয়াহিরির দর্শন এবং এভাবেই জিহাদের বিশ্বায়ন বা গ্লোবাল মানহাজের ধারণাটি আল-কায়েদা ভাবাদর্শের একেবারে সম্মুখে চলে আসে।

তাদের বিবৃতিতে—যেটা তিনি আল-কুদস আল-আরাবিতে আমাকে ফ্যাক্স করে পাঠিয়েছিলেন—তারা আহ্বান জানান, 'প্রত্যেক মুসলিম, যারা আল্লাহর ওপর বিশ্বাস রাখে, তাদের উচিত যেখানে-সেখানে এবং যখন-যেভাবেই সম্ভব আমেরিকানদের হত্যা করা এবং তাদের সম্পত্তি লুট করে নেওয়া।'

আমেরিকান প্রতিক্রিয়া ঠিক তেমনই হয়েছিল, যেমনটা আল-জাওয়াহিরি প্রত্যাশা করেছিলেন। প্রথমে স্যান্ডি বারগার (আমেরিকান ন্যাশনাল সিকিউরিটি

কাউন্সিলের তৎকালীন প্রধান) ঘোষণা করেন, তিনি মনে করেন যে, বিন লাদেন আমেরিকান নাগরিকদের ওপর হামলা করার এই আকাঙ্ক্ষা এবং সক্ষমতা উভয়ই ধারণ করেন। আবশেষে, ১৯৯৮ সালে নাইরোবি এবং দারুস-সালামের আমেরিকান অ্যাম্বাসিতে যুগপৎ বোমা হামলায় যথাক্রমে ২১৩ জন এবং ১১ জন নিহত হয় এবং এভাবেই ঘোষণাটি প্রতিফলিত হয়।

বিন লাদেন বর্তমানে আনুষ্ঠানিকভাবে পশ্চিমা বিশ্বের পাবলিক এনিমি নাম্বার ওয়ান। আল-জাওয়াহিরির স্ট্র্যাটেজিক প্রচারণার একটি মাস্টার স্ট্রোক হিসেবে বিন লাদেনের চেহারা বিশ্বময় বিচ্ছুরিত হয়ে যায় এবং সেকেন্ডেই তিনি বিশ্ব বিখ্যাত বনে যান। এর মাধ্যমে মুসলিমবিশ্বে তার জনপ্রিয়তা আরও বৃদ্ধি পায়; কারণ তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে, তিনি একজন প্রত্যয়জনক আমেরিকা-বিরোধী এবং সাদ্দাম হোসাইন এর বিপরীতে (তিনিও তখন এই পরাশক্তিটির বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করেছিলেন) তিনি কোনো নিপীড়ক নন, যিনি কিনা একাই ষাটটি প্রাসাদের মালিক। এখন এমন একজন ব্যক্তির অভ্যুদয় ঘটেছে যাকে বহু মুসলিম 'আপন উদ্দেশ্যে অটল এবং ব্যক্তিগত জীবনে কঠোর সংযমী' হিসেবে হৃদয়ে স্থান দেন। আমেরিকা উক্ত হামলার জবাব দেয় আফগানিস্তান এবং সুদানের সাতটি লক্ষ্যবস্তুতে সিরিজ অ্যাটাকের মাধ্যমে এবং এর ফলস্বরূপ দেশ এবং বিদেশে কেবল সাধারণ সম্পদের ক্ষতি সাধিত হয়। ৫,৬২,৫০,০০০ ডলার ব্যয়ের বিনিময়ে (কেবল পঁচাত্তরটি টমাহক মিসাইলের দামই ৭,৫০,০০০ মার্কিন ডলার) আমেরিকা অন্যান্য টার্গেটের পাশাপাশি সুদানের আল-শিফা ফার্মাসিউটিক্যাল প্লান্টেও আঘাত হানে। এটিকে গণ্য করা হয়েছিল বিন লাদেনের মালিকানাধীন একটি নার্ভ-গ্যাস ফ্যাক্টরি হিসেবে। অথচ বাস্তবিকপক্ষে এই ফ্যাক্টরিটি দরিদ্র দেশটির শতকরা পঞ্চাশ ভাগ ওষুধ উৎপাদন করত। এই হামলা সমগ্র বিশ্বে মুসলিমদের উত্তেজিত করে এবং বহুসংখ্যক মুসলিমকে আল-কায়েদায় যোগদানে অনুপ্রাণিত করে। ফলে তারা হিন্দুকুশের আল-কায়েদার ঘাঁটিতে গিয়ে আস্তানা গাড়ে।

এরপর ২০০০ সালের দুইজন আত্মঘাতী কর্তৃক একটি ছোট নৌকায় করে মার্কিন ডেস্ট্রয়ার 'ইউএসএস কোল'-এ বোমা বিস্ফোরণ আল-কায়েদার সাথে ডেভিড বনাম গোলিয়াথ (দাউদ বনাম জালুত) লেবেলটি যুক্ত করে দেয়। যেসব মুসলিমরা পশ্চিমের অতিকায় সামরিক সক্ষমতা এবং অর্থনৈতিক সম্পত্তি নিয়ে হতাশাকাতর ছিল, তারা এই হামলায় নতুন করে আশাবাদী হয়।

তালেবান আন্দোলন

বৈশ্বিক জিহাদের প্রেক্ষাপটে তালেবানদের বৃহত্তর প্রভাব বিদ্যমান। তারা সেসব আফগান মুজাহিদদের থেকেই উদ্ভূত হয়েছে, যাদের বীরত্ব নিয়ে আমেরিকা ১৯৮০ এর দশকজুড়ে গুণকীর্তন করেছিল। কিন্তু যখন আমেরিকা অবশেষে বুঝতে পারে যে, কিরূপ জিনিস তৈরিতে তারা সাহায্য করেছে; তখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল।

তালেবান এই ইসলামিক নীতিতে স্বতন্ত্রভাবে সফল ছিল যে, তারা প্রকৃতপক্ষেই কঠোর, আচারনিষ্ঠ শরিয়াহ-ভিত্তিক শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল; যেটা আল-কায়েদা এবং অন্যান্য সালাফি-জিহাদি গ্রুপগুলোর পরম আকাঙ্ক্ষা। তবে এটি কেবল তিনটি দেশ যথা : পাকিস্তান, সৌদি আরব এবং আরব আমিরাত কর্তৃক বৈধ রাষ্ট্রীয় সত্তা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিল। ১৯৯৭ সালে এসব দেশগুলো তালেবান রাষ্ট্রদূতদের পরিচয়পত্র গ্রহণ করে এবং তারা মোল্লা ওমরের নেতৃত্বাধীন এই মিনি-খিলাফতকে ১৯৯৬-২০০১ সাল অবধি এই পাঁচ বছর কোনোভাবে ত্যক্ত করেনি।

তালেবান প্রকৃতপক্ষেই আল-কায়েদাকে নিরাপদ দুর্গের জোগান দিয়েছিল এবং তারা তাদের প্রশিক্ষণ শিবিরগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা করত। সেসব শিবিরগুলোতে আসন্ন গ্লোবাল জিহাদের মুজাহিদদের তৈরি করা হতো, যাদেরকে মুসলিমবিশ্বের নতুন শত্রু আমেরিকার বিরুদ্ধে আসন্ন যুদ্ধে ব্যবহার করা হবে। অন্যান্য জিহাদি এবং গেরিলা গ্রুপগুলোও সেখানে শিবির স্থাপন করেছিল, কিন্তু আল-কায়েদার মার্কিন বিরোধী এজেন্ডা এবং ইস্তিশহাদি হামলায় অগ্রাধিকারের ব্যাপক প্রচারণা প্রবল আগ্রহদীপ্ত রিক্রুটদের আকর্ষিত করত।

বিন লাদেন আমাকে বলেছিলেন যে, যখন তিনি সুদান থেকে ১৯৯৬ সালের ১৮ মে জালালাবাদ অবতরণ করেন, তখন তিনি ইউনুছ খালিসের আশ্রয়ে ছিলেন। তিনিও একজন মুজাহিদ নেতা ছিলেন; তবে তালেবানদের সাথে প্রাথমিকভাবে তার মতবিরোধ ছিল। প্রথমদিকে তালেবানদের নিয়ে নিজেই সতর্ক থাকলেও বিন লাদেন দ্রুতই উপলব্ধি করতে পারেন যে, যদি তালেবানরা সমগ্র দেশের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় এবং যেটা মনে হচ্ছিল দ্রুতই ঘটবে এবং যদি তিনি তাদের সাথে সম্পর্ক তৈরি না করেন, তবে তার জন্য সেখানে অবস্থান করা কঠিন হয়ে যেতে পারে।

তালেবানের প্রথম উদয় ঘটে কান্দাহারে, যেটা যুদ্ধরত গোত্র প্রধানদেরর কারণে ছিন্নভিন্ন হচ্ছিল। প্রথম দিকে এটি ছিল একটি ক্ষীণ এবং স্থানীয় ঘরোয়া ছাত্র আন্দোলন (তালেবান অর্থ ছাত্র); তবে তারা শুরু থেকেই আইএসআইয়ের

পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিল। যখন ১৯৯৪ সালে একটি যুদ্ধবাজ নেতা স্থানীয় এক মেয়েকে অপহরণ করে এবং ধর্ষণ করে; তখন তালেবানরা গর্জে ওঠে এবং গোত্রীয় নেতাদের বিরুদ্ধে একটি সফল বিদ্রোহ সৃষ্টি করলে সেখানকার স্থানীয় জনগণ খুব দ্রুতই তাদের সাথে যোগদান করে। তালেবান তৎক্ষণাৎ কান্দাহারে শরিয়াহ আইনের প্রচলন করে এবং চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলাকে শৃঙ্খলায় রূপান্তরিত করে ফেলে। তখন অন্যান্য শহর এবং গ্রামও এর অনুসরণে যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা শুরু করে এবং তারা তালেবানদের নিকট সাহায্যের আবেদন করতে থাকে। সেই মুহূর্তে আইএসআই কাবুলের প্রধানমন্ত্রী বোরহানউদ্দিন রব্বানীর সরকারের বিরুদ্ধে চলে যায় এবং তালেবানদের সমর্থন দেওয়া শুরু করে এবং তাদের সশস্ত্র করে তোলে।

১৯৯৬ সালের মে মাসে যখন বিন লাদেন আগমন করেন, তখন দেশের অনেক অঞ্চলেই তালেবানের শক্তিশালী দুর্গ ছিল। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, তিনি পরিস্থিতিকে বোঝার জন্য কিছু সময় নেন এবং অবশেষে তালেবানদের কবুল করে নেন। তিনি বলেন—'তারা দুর্নীতিমুক্ত বলেই প্রতীয়মান হয় এবং তারা নিখুঁতভাবে শরিয়াহ আইন বাস্তবায়ন করছিল।' সে অনুযায়ী তিনি ১৯৯৬ সালের জুন মাসে তাদের সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করেন এবং ধীরে ধীরে তাদের সাথে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলেন। যখন ১৯৯৬ সালের ১১ সেপ্টেম্বর তালেবান জালালাবাদ দখল করে নেয়, বিন লাদেন ইতিমধ্যে তাদের পক্ষের লোক হয়ে গিয়েছিলেন। ইউনুছ খালিস অনিচ্ছাকৃতভাবেই তাদের শাসনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন এবং তাকে তার পদেই বহাল রাখা হয়। বিন লাদেন আমাকে বলেছিলেন, ১৯৯৬ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর কাবুলে তালেবানের চূড়ান্ত বিজয়ে তিনিও ভূমিকা পালন করেন। তিনি বোরহানউদ্দিন রব্বানীর মন্ত্রীদেরকে নিরপেক্ষ থাকতে প্ররোচিত করেন এবং জালালউদ্দিন হাক্কানি, যিনি তখন বেশ সামরিক প্রতিপত্তি সম্পন্ন ছিলেন, তিনি বেশকিছু কমান্ডার এবং মিলিটারি ইউনিট সাথে নিয়ে তালেবানের সাথে যুক্ত হয়ে যান। তালেবান তখনও সামরিক বিশেষজ্ঞতার ক্ষেত্রে অনেকটাই অজ্ঞ ছিল। বিশেষ করে দূরপাল্লার অস্ত্রপাতি যেমন মিসাইল এবং যুদ্ধবিমান তাদের আয়ত্তে থাকা সত্ত্বেও কীভাবে মোতায়েন করতে হয় বা কীভাবে চালনা করতে হয়, সে সম্পর্কে তাদের কোনো জ্ঞানই ছিল না। এগুলোর কিছু আফগান সরকার থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল এবং কিছু পাকিস্তান ও সৌদি আরব প্রদান করেছিল। তখন হাক্কানি এবং তার লোকেরা তাদের সেগুলোতে প্রশিক্ষণ দেওয়ার দায়িত্ব তুলে নেয়।

বিন লাদেন আমাকে আরও বলেন, কাবুলের পতন ঘটানোর পর তালেবান যখন নিজ অবস্থানকে দৃঢ় করছিল এবং প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল—যার পেছনে মূল

অভিপ্রায় এবং উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র আফগানিস্তানে একটি খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা, তখন তিনি মোল্লা ওমরকে তার বাইয়াত প্রদান করেন। আজ অবধি মোল্লা ওমরই একমাত্র ব্যক্তি, যাকে তিনি এই আনুগত্যের শপথ দিয়েছেন।

আল-কায়েদা তালেবানের কিরূপ ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে তার একটি প্রমাণ হলো আবু মুসআব আল-সুরির আল-কায়েদা থেকে তালেবান সদস্যে রূপান্তরিত হওয়া। তিনি মোল্লা ওমরের মিডিয়া উপদেষ্টা হয়ে ওঠেন এবং তাদের প্রচারণার জন্য আরবিভাষী রেডিও স্টেশন স্থাপন করেন।

২০০১ সালের এপ্রিল মাসে কান্দাহারে আল-কায়েদার একটি ঘনিষ্ঠ সূত্র আমার সাথে যোগাযোগ করে এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করে, আমি মোল্লা ওমরের সাক্ষাৎকার নিতে আগ্রহী কি না? তারা তখন আরবি মিডিয়া কভারেজ পেতে আগ্রহী ছিল। কারণ তারা উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে, পাকিস্তানের মতো সৌদি আরব এবং আরব আমিরাত তাদের স্বীকৃতি দিলেও সেখানে তাদেরকে বাজেভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছিল। আমি আফগানিস্তানে আরও একটি ভ্রমণের জন্য খুবই অনুরাগী ছিলাম এবং এমনকি বিন লাদেনের সাথে দ্বিতীয়বাত সাক্ষাতেরও আশায় ছিলাম। আমি পাকিস্তান সরকার কর্তৃক একটি ভিসাও পেয়েছিলাম। কিন্তু একদম শেষ মুহূর্তে আমি আমার মত পরিবর্তন করি। কারণ আমি অনুভব করেছিলাম, এটা প্রায় নিশ্চিত যে অনেক গোয়েন্দা এজেন্সিই আমাকে ফলো করতে পারে যেটা বিন লাদেনের জন্য, মোল্লা ওমরের জন্য এবং আমার জন্যও ১৯৯৬ সালে আমার পূর্বের আফগানিস্তান ভ্রমণ অপেক্ষা অনেক বেশি বিপজ্জনক হবে। তাই আমি আমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করি।

আন্ডার দ্য প্রফেট'স ব্যানার

২০০১ সালের ডিসেম্বর মাসে বর্তমান আল-কায়েদা সহকারী প্রধান আল-জাওয়াহিরি '*নাইটস আন্ডার দ্য প্রফেট'স ব্যানার*' শিরোনামে একটি বই প্রকাশ করেন (এই নামটি সুচিন্তিতভাবে '*নাইটস অফ দ্য হলি টোম্ব*' থেকে উদ্ভূত এবং এটি তাদেরকে বোঝায় যারা মধ্যযুগে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে লড়েছিল)। সেই সময়ই আল-জাওয়াহিরি আল-কায়েদার প্রধান সিদ্ধান্তগ্রহণকারী এবং স্ট্র্যাটেজিস্ট হিসেবে অবিসংবাদিত ছিলেন। এটা মনে করা হয় যে, বইটির বেশিরভাগই নাইন ইলেভেনের পূর্বে লেখা হয়েছিল। এটি ধারণা করতে কোনো অসুবিধা নেই যে, এই প্রচণ্ড রিভিলিং ডকুমেন্টটির কনটেন্টগুলো কেবল আল-জাওয়াহিরি নয় বরং এতে বিন লাদেনেরও নব্য জিহাদি আইডিয়া এবং ট্যাকটিকসগুলো উপস্থাপিত হয়েছিল। এটি একটি সম্যগদর্শনও প্রদান করে যে, কীভাবে আল-কায়েদা সামগ্রিকভাবে জিহাদি আন্দোলনকে আরও অধিকতর দ্রুততার সাথে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

আল-জাওয়াহিরি বিভিন্ন জিহাদি গ্রুপগুলোকে একত্রিত হওয়ার জন্য আহ্বান জানান এবং আনুগত্যের (বাইয়াত) ধারণার পুনঃপ্রবর্তন করেন। এটিকে সৌদির ভিন্ন মতাবলম্বী বিশেষজ্ঞ মুহাম্মাদ আল-মাসারি এই জিহাদি মুভমেন্টটির ভবিষ্যতের প্রধান লক্ষ্য হিসেবে শনাক্ত করেন। মাসারি বিশ্বাস করেন, সাম্প্রতিক সময়ে আল-কায়েদা এবং তালেবান তাদের মধ্যে এক সময় যেসব ভাবাদর্শিক ভিন্নতা ছিল, সেগুলোকে অতিক্রম করে ফেলেছে। তাই এখন তাদেরকে একই সত্তা বলে গণ্য করা যায়।

ইসলামের শত্রুদের বিশ্বায়নের দিকে ইঙ্গিত করে আল-জাওয়াহিরি এই ডকুমেন্টে দৃঢ়রূপে বার্তা প্রদান করেছিলেন যে, 'জিহাদি মুভমেন্টগুলোকে অতি অবশ্যই জোটবদ্ধ হতে হবে। যেসব পশ্চিমা শক্তি ইসলামের প্রতি শত্রুতাপরায়ণ, তারা তাদের শত্রুকে নির্দিষ্ট করেছে; যাকে তারা 'ইসলামি মৌলবাদ' বলে উল্লেখ করে। এমনকি তারা তাদের প্রাচীন শত্রু বিশেষভাবে রাশিয়ার সাথেও এই বিষয়ে জোটবদ্ধ। জিহাদি আন্দোলনগুলোর অবশ্যই এটা উপলব্ধি করতে হবে যে, বিজয়ের অর্ধেক পথই অর্জিত হয় ঐক্যের মাধ্যমে।'

আল-কায়েদার সুদূর প্রসারী লক্ষ্যের রূপরেখা সুস্পষ্ট এবং সেটি হচ্ছে শরিয়াহ ভিত্তিক একটি ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, যেটি একটি ঘাঁটি হিসেবে কাজ করবে এবং সেখান থেকে খিলাফত এবং উম্মাহর হারানো ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধার করা হবে। আল-জাওয়াহিরি সালাহউদ্দিন আইয়ুবির দিনগুলোর কথা উল্লেখ করেন। কীভাবে এই আইয়ুবি সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা দ্বাদশ শতাব্দীতে এক এক করে মুসলিম ভূখণ্ডগুলোর পুনরুদ্ধার করেন। যখন এই তালিকায় জেরুজালেম যুক্ত হয় কেবল তখনই ইতিহাসের চাকা ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে ঘুরতে শুরু করে। যদিও আল-কায়েদা তখনও অবধি ফিলিস্তিনে সক্রিয় হয়নি, কিন্তু এর নেতৃবর্গ খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার একটি পূর্বশর্ত হিসেবে ঘন ঘন জেরুজালেম এবং আল-আকসা মসজিদকে মুক্ত করার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করতেন।

বইটিতে শত্রু হিসেবে সুস্পষ্টভাবে সুনির্দিষ্ট করা হয় আমেরিকা এবং ইহুদিদেরকে এবং তাদেরকে ক্রুসেডার হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। শত্রুদেরকে তাদের মাটিতে লক্ষ্যবস্তু বানানোর আলোচনা প্রথমবারের মতো এই ডকুমেন্টেই আলোচিত হয় যেটা ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনাকে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করে। যেটা আমরা এখন জানতে পেরেছি যে, উক্ত পরিকল্পনা ১৯৯৮ সাল থেকেই প্রক্রিয়াধীন ছিল। তিনি বলেন—'এই লড়াইকে আমাদের অবশ্যই শত্রুর মাটিতে নিয়ে যেতে হবে তাদের হাতসমূহকে জ্বালিয়ে দিতে, যারা আমাদের দেশকে প্রজ্বলিত করছে।' আল-জাওয়াহিরি ভীতিপ্রদভাবে ঘোষণা করেন, 'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলই আমেরিকানদের জন্য ভয়ানক আতঙ্ক বহন করতে পারে।'

অতীত রেকর্ডের সাথে মিল রেখে, আল-জাওয়াহিরি চরম সহিংসতা ব্যবহারে তার আস্থার কথা অকপটে স্বীকার করেন। তার অবস্থানকে বৈধতা দেওয়ার জন্য তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, অন্যান্য সকল পদ্ধতিগুলো ইতিমধ্যে ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, বিন লাদেন আমেরিকান পণ্য বয়কটের আহ্বান জানিয়েছেন এবং আলজেরিয়ায় ইসলামিক স্যালভেশন ফ্রন্ট গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে থেকে কাজ করার চেষ্টা করেছে। এ প্রসঙ্গে আল-জাওয়াহিরি বলেন—'তারা ভেবেছিল তাদের জন্য রাজত্বের দরজা খোলা হয়েছে, কিন্তু এর বদলে তাদেরকে বন্দী শিবির ও জেলখানার দরজার দিকে এবং নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার এর প্রকোষ্ঠের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে।'

কর্মপন্থার আলোচনা করতে গিয়ে আল-জাওয়াহিরি বিবৃত করেন—'আমেরিকান নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা শক্তি, যারা প্রকৃতপক্ষে ইহুদিদের কর্তৃত্বাধীন; তারা ন্যায়পরায়ণ ও আইনসংগত অধিকার এবং নীতিশাস্ত্রের ভাষা জানে না। তারা কেবল জানে বর্বর সামরিক বলের মাধ্যমে স্বার্থরক্ষার ভাষা। অতএব, যদি আমরা তাদের সাথে সমঝোতার আশা রাখি এবং তাদেরকে আমাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করাতে চাই, তবে তাদের সাথে আমাদেরকে সেই ভাষাতেই কথা বলতে হবে, যে ভাষা তারা বুঝতে সক্ষম।'

মুজাহিদদের হতাহতের দিক থেকে সবচেয়ে কম ব্যয়ে শত্রুদের ওপর সর্বোচ্চ ক্ষয়ক্ষতি আরোপ করার জন্য তিনি আদমবোমা ব্যবহারে সমর্থন জানান। সম্ভবত এই ব্যাপারে ১৯৯৮ সালে বিন লাদেন প্রাথমিকভাবে যে দ্বিধা পোষণ করেছিলেন সেটাকে সামনে রেখে তিনি আমেরিকান জনগণকে লক্ষ্যবস্তু বানানোর যুক্তি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'আমেরিকান নাগরিকরা স্বাধীনভাবে বিকল্প বেছে নেয়। এটা সত্য যে, মিডিয়ার পক্ষপাতিত্ব এবং বিবৃতির মাধ্যমে বিশালভাবে প্রভাবিত হবার সম্ভাবনা থাকলেও, দিনশেষে তাদের পছন্দসই সরকারকে বেছে নেওয়ার জন্য নির্বাচনে তারা তাদের মত প্রদান করে এবং এসব ব্যক্তিরাই সাগ্রহে ইসরাইল রাষ্ট্রের সংস্থাপন এবং টিকে থাকাকে পৃষ্ঠপোষকতা, সহায়তা এবং সমর্থন করে।'

২০০৪ সালের নভেম্বরে মার্কিন প্রেসিডেনশিয়াল নির্বাচনের চার দিন পূর্বে, বিন লাদেন আমেরিকান জনগণের উদ্দেশ্যে এক ভিডিও বার্তায় বলেন যে, 'জন কেরি বা বুশ, অথবা আল-কায়েদার হাতে আপনাদের নিরাপত্তা নিহিত নয়। আপনাদের নিরাপত্তা আপনাদের নিজেদের হাতেই। যেসব জাতি আমাদের হামলা করবে না, তারাও আমাদের হামলার শিকার হবে না।'

আল-কায়েদার দীর্ঘমেয়াদি কৌশল হলো পশ্চিমা জনগণকে তাদের নেতৃত্বপ্রদানকারীদের বিরোধী করে দেওয়া। কৌশলস্বরূপ তাদের মাটিতে আক্রমণের দ্বারা তারা এটি প্রতিনিয়ত প্রতিষ্ঠা করে এবং একে চিত্রিত করা হয়

মধ্যপ্রাচ্যে তাদের নীতিভ্রষ্ট রাজনীতির অনিবার্য ফলাফল হিসেবে। লন্ডনে ২০০৫ সালের ৪ জুলাইয়ের বোমা হামলার পর ৪ আগস্ট আল-জাজিরায় সম্প্রচারিত একটি ভিডিও বার্তায় আল-জাওয়াহিরি ব্রিটিশ জনগণের উদ্দেশ্যে বলেন—'ব্লেয়ার আপনাদের জন্য লন্ডনের কেন্দ্রস্থলে ধ্বংস ডেকে এনেছে এবং আল্লাহ চাহে তো আরও ধ্বংস ডেকে আনবে।' যদি এই যুক্তির মাধ্যমে লোকদের বিদ্রোহে উসকে দেওয়া যায় তবে পশ্চিমা সমাজব্যবস্থায় অন্তঃবিস্ফোরণ ঘটবে এবং তারা পতনের দিকে এগিয়ে যাবে।

আল-জাওয়াহিরির ডকুমেন্টের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো, উক্ত ডকুমেন্টটিতে তিনি স্পষ্টভাবে সামগ্রিক মুসলিম জনসাধারণের অংশগ্রহণ এবং অনুমোদনকে অর্জন করে নেওয়ার জন্য একটি মনস্তাত্ত্বিক স্ট্র্যাটেজি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, 'জিহাদি মুভমেন্টের শাখাসমূহের মধ্য থেকে একটিকে সকল সম্ভাব্য পন্থায় অনুদান এবং শিক্ষা ও সামাজিক কাজের মাধ্যমে জনসাধারণের সাথে সম্পৃক্ত থাকার জন্য একান্তভাবে নিয়োগ করা হয়েছে। আমাদেরকে অবশ্যই জনসাধারণের আস্থা, অনুরাগ এবং সম্মানকে অর্জন করে নিতে হবে। জনসাধারণ আমাদের ততক্ষণ পর্যন্ত ভালোবাসবে না, যতক্ষণ না তারা অনুভব করবে যে, আমরা তাদের ভালোবাসি, তাদের যত্ন করি এবং তাদের প্রতিরক্ষায় নিজেদের উৎসর্গ করি।' হয়তো ১৯৯৭ সালের লুক্সর হত্যাকাণ্ডের পর মিশরে জিহাদি গ্রুপগুলোর প্রতি মানুষের চূড়ান্ত অনাস্থা এবং সাথে সাথে তাদের সমর্থন হারানোকে মাথায় রেখে আল-জাওয়াহিরি উপলব্ধি করেন, আল-কায়েদা উম্মাহকে তখনই জয়ী করে নেবে, যখন তারা এমন একটি লক্ষ্যবস্তুকে নির্দিষ্ট করবে, যেটাতে জনসাধারণ সমর্থন দেবে এবং এমন জায়গায় আঘাত হানতে হবে, যাতে আঘাতকারীদের প্রতি তাদের সহানুভূতি প্রকাশ পায়। আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদের ডাক দিয়ে তারা এই অনুকূল প্রতিক্রিয়াই লাভ করেছে।

আল-জাওয়াহিরির মতে জনপ্রিয় ইস্যু, যেমন বহিরাগত শত্রুদের হাত থেকে উম্মাহকে রক্ষা করা; ফিলিস্তিনিদের প্রতিরক্ষা করা—এসবের আবেদন আরও বৃদ্ধি লাভ করবে যখন এগুলোকে কাফের মুরতাদদের বিরুদ্ধে ইসলামের লড়াই হিসেবে অভিহিত করা হবে। ব্যাপক জনসংযোগ তৈরি করা এবং উদ্দীপনা ও রিক্রুটমেন্টের জন্য মনস্তাত্ত্বিক স্ট্র্যাটেজি আল-কায়েদার দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনারই অংশ। জনসাধারণকে আন্দোলিত করার জন্য তাদের এমন একটি নেতৃত্বের প্রয়োজন পড়ে, যাকে তারা উপলব্ধি করতে পারবে, যার ওপর আস্থা রাখতে পারবে এবং যাকে অনুসরণ করতে পারবে। তাদের প্রয়োজন একটি সুস্পষ্ট শত্রু যেটাকে তারা আঘাত হানতে পারে এবং এজন্য অবশ্যই ভয়ের শিকল এবং আত্মিক দুর্বলতার ব্যাঘাতকে ভাঙতে হবে।

যদি কোনো লড়াই প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ বলে গণ্য হয়, এটা প্রতিটি মুসলমানের জন্য ফরজে আইন হয়ে যায় এবং যদি কোনো ন্যায়পরায়ণ এবং ধার্মিক নেতা এতে আহ্বান জানান তবে তা প্রত্যাখ্যান করার কোনো সুযোগ নেই। এ কারণে নেতৃত্বের মান ব্যাপক সামরিক তাৎপর্য ধারণ করে। আল-জাওয়াহিরি জোর দিয়ে বলেন, 'নেতৃত্বের কোনো খুঁত সামগ্রিকভাবে উম্মাহর জন্য ঐতিহাসিক বিপর্যয়কারী ঘটনায় পর্যবসিত হতে পারে।' অতএব, যতদিন বিন লাদেন এবং আল-জাওয়াহিরি ন্যায়বান এবং ধার্মিক নেতা হিসেবে বিবেচিত হবেন, যুক্তি এটাই বলে যে, কোনো প্রকৃত মুসলিম তাদের জিহাদের ডাককে প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না।

নাইন ইলেভেন

নাইন ইলেভেনের ঘটনাগুলো বিশ্বে একটি অবমোচনীয় দাগের সৃষ্টি করেছে। গেরিলা-যুদ্ধের ইতিহাসে অন্যান্যদের চেয়ে আল-কায়েদা স্বতন্ত্রভাবে বিপজ্জনক এবং এটিই প্রথম গোষ্ঠী যারা স্পষ্টভাবে বেসামরিকদের হত্যাকে সমর্থন এবং উৎসাহিত করে এবং ভয়াবহ নৃশংসতার মাধ্যমে এই ব্যবস্থাপনাকে অনুসরণ করা অব্যাহত রেখেছে; উদাহরণস্বরূপ বলা যায় বালি, মাদ্রিদ এবং লন্ডনের ঘটনা।

নাইন ইলেভেন জিহাদি মুভমেন্টের জন্য একটি অচিন্তনীয় বিজয়ের দিন। এটি সেই দিন যেটি আল-কায়েদাকে একটি প্রতাপশালী বৈশ্বিক সামরিক বাহিনী হিসেবে এবং বিন লাদেনকে মুসলিম জাতির পুনরুত্থানের নেতা হিসেবে চিহ্নিত করে দেয়। তারা তাদের শত্রুর একেবারে হৃদয়ে—যেগুলো তাদের মহার্ঘ্য ছিল—আঘাত হেনেছিল। অর্থনৈতিক শক্তির প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার, সামরিক প্রতাপের প্রতীক পেন্টাগন এবং যদি তৃতীয় প্লেনটি এর অভীষ্ট লক্ষ্য হোয়াইট হাউসে পৌঁছুতে পারত তবে আমেরিকান ডেমোক্রেসির পাদপীঠও মাটির সাথে মিশে যেত।

পশ্চিমা দর্শকরা বিন লাদেনের একটি ভিডিও নিয়ে চরম রুষ্ট হয়, যেখানে বিন লাদেন হাসতে হাসতে টুইন টাওয়ারের ধসে পড়াকে বর্ণনা করছিলেন এবং তার বিজয়কে উদযাপন করছিলেন। কিন্তু বাস্তবেই, জিহাদি পরিপ্রেক্ষিত থেকে সেটি ছিল একটি অসামান্য সামরিক বিজয়।

তাদের নিজেদেরকে ছাড়াও ব্যাপক সংখ্যক সাধারণ মুসলিম সেই সময় নিজেদের মধ্যে একটি বিজয়ের অনুভূতি অনুভব করছিল এই কারণে যে, আমেরিকার ওপর একটি দুর্দশা আঘাত হেনেছে। রাহমা হুজাইরা নামক একজন তরুণী ইয়েমেনি মহিলা সাংবাদিক নাইন ইলেভেনের কিছু পরে আমেরিকান টেলিভিশন নেটওয়ার্ক সিবিএস-কে তার দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন—

'আমি কখনও চিন্তাও করতে পারিনি যে, আমি কোনো ধরনের সহিংসতাকে সমর্থন করতে পারব। কিন্তু যখন আমি ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার এবং পেন্টাগনকে জ্বলতে দেখেছিলাম তখন আমি আনন্দে কেঁদে দিই; আমি আনন্দের আতিশয্যে অবচেতন হয়ে যাই এবং আমি প্রার্থনা করছিলাম যে, আল্লাহ আল-কায়েদার ওপর অনুগ্রহ করুক। যদি আমার প্রদান করার মতো কিছু নাও থাকে, তবে আমার ইচ্ছা আমার শেষ অবলম্বন দুই বা তিনটি সন্তান এমনভাবে গড়ে তোলা, যাতে তারা শাইখ ওসামা বিন লাদেনের হয়ে যায়। আমরা ওসামা বিন লাদেনের মধ্যে যা দেখতে পাই, তা হলো—তিনি এমন একজন ব্যক্তি যিনি আমাদের পক্ষ থেকে প্রতিশোধ নিতে পেরেছেন; আমাদের সেসব অশ্রু মুছে দিতে সক্ষম হয়েছেন, যেটা দীর্ঘকালব্যাপী আমাদের ইরাক এবং ফিলিস্তিনের ভাইদের চোখ থেকে ঝরছিল। যখন আমেরিকা ১১ সেপ্টেম্বরের দিন ডুবছিল, তার মাধ্যমেই এসবের ঐশ্বরিক প্রতিশোধ সাধন হয়েছিল।'

আল-কায়েদার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে এর রিক্রুটমেন্টও বৃদ্ধি পায়। লক্ষ লক্ষ মুসলিমের নিকট বিন-লাদেন তখন এমন একজন অবিসংবাদিত নেতার ভূমিকায় আবির্ভূত হন, যিনি তাদেরকে উদ্ধারের সামর্থ্য রাখেন।

নাইন ইলেভেনের ঘটনাসমূহ আল-কায়েদা এবং পশ্চিমা দেশের সাধারণ জনগণের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি ব্যাপক পরিবর্তন আনে। এই নৃশংস গণহত্যার সাথে সম্পৃক্ত থাকার মাধ্যমে, আল-কায়েদা তাদের সরকারের বদলে তাদের সাথেই সংলাপ শুরু করে।

নাইন ইলেভেন থেকেই আল-কায়েদা কিছু পশ্চিমা দেশের অভ্যন্তরীণ ঘটনাবলিতে ব্যাপক প্রভাব রেখে আসছে। উদাহরণসরূপ, ২০০৪ সালের ১১ মার্চ মাদ্রিদ সাবওয়ে ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমে বোমা হামলায় ২০০ জন মানুষের মৃত্যু সেখানে জোরপূর্বক সরকারের পরিবর্তন আনে। পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনের ভোটাররা সোশিয়ালিস্ট পার্টির প্রধান জোসে লুইস রড্রিগেজ যাপাতেরোকে বেছে নেয়, যিনি ইরাক থেকে স্পেনের সৈন্যদের প্রত্যাহার করে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। স্পেনের জনগণ স্পষ্টরূপেই তাদের ওপর এই আক্রমণকে ইরাকে তাদের দেশ কর্তৃক আগ্রাসনের সহায়তা করাকে কারণ হিসেবে বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু এর বিপরীতে লন্ডনে বোমা হামলার পরে টনি ব্লেয়ার এরূপ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। বিন লাদেনের এর সাড়া দিয়েছিলেন স্পেনের জনগণকে একটি সাময়িক যুদ্ধবিরতি উপহার প্রদান করার মাধ্যমে।

এ ছাড়াও ব্রিটেনে এবং আমেরিকাতে আল-কায়েদার কর্মকাণ্ডের ফলাফলস্বরূপ কঠোর আইনের প্রনয়ণ ঘটে। জনগণকে সন্ত্রাস থেকে নিরাপদ রাখার কথা বলে বুশ এবং ব্লেয়ার সরকার তাদের নাগরিক স্বাধীনতাকে পুরোপুরি ধ্বংস করতে থাকে। পরিহাস্যকরভাবে, এটিও আল-কায়েদার স্ট্র্যাটেজিকেই সফল করছিল; যারা স্পষ্টভাবেই কামনা করে ক্রমাগত নিপীড়িত এবং অসন্তুষ্ট পশ্চিমা জনগণের মধ্যে বিদ্রোহ তৈরি হোক।

ধর্ম যোদ্ধাদের শাইখ

'আল-কায়েদা ইন দ্য ল্যান্ড অফ টু রিভার্স' (আল-কায়েদা ইন ইরাক) এর ভয়ংকর আমির আবু মুসআব আল-জারকাভির উত্থানের পর থেকে আল-কায়েদা সামরিকভাবে ক্রমবর্ধমান কঠিনতর আগ্রাসন প্রদর্শন করে যাচ্ছে। সংগঠনটি সুস্পষ্ট ঢিলেঢালা একটি ফ্র্যাঞ্চাইজি নেটওয়ার্কে রূপান্তরিত হওয়ার কারণে আল-কায়েদার বৈশ্বিক উপস্থিতি এবং প্রভাব নাটকীয়ভাবে প্রসারিত হচ্ছে। এসব ফ্র্যাঞ্চাইজি কমবেশি স্বাধীনভাবে স্থানীয় নেতৃত্বের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। অধিকন্তু, আল-কায়েদার ভাবাদর্শ, দীর্ঘকালীন স্ট্র্যাটেজি, প্রশিক্ষণ উপকরণ এবং জিহাদের ন্যায্যতা প্রভৃতি ইন্টারনেটে সহজলভ্য কোনো স্বাধীন ব্যক্তি বা গ্রুপকে এর কাঠামোর মধ্যে থাকতে সমর্থ করছে। এখন আর কোনো কেন্দ্রীভূত ঘাঁটির প্রয়োজন নেই, যেটা তারা আফগানিস্তানে পেয়েছিল। তাই বর্তমানে নেতৃত্বের কেন্দ্রস্থলের সাথে অল্পসংখ্যক মুজাহিদদেরই খুবই সামান্য ব্যক্তিগত যোগাযোগ বিদ্যমান। এর মানে এই না যে, কিছু মুসলিমের কাছেও বিন লাদেনের তাৎপর্য সামান্যতম কমেছে।

ইতিহাসজুড়েই মুসলিম জনগণ আইকনিক নেতাদের অন্বেষণ করে গেছে; তারা সালাহুদ্দিন থেকে জামাল আবদুন নাসের অবধি বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব থেকে অনুপ্রেরণা খুঁজে ফিরেছে। এমনকি তুলনামূলক অজ্ঞাত-পরিচয় পির-দরবেশদের কবর এবং মাজারে তীর্থযাত্রীদের আত্মিক প্রশান্তি এবং রুহানি খোরাকের জন্য ভিড় জমানো থেকেও এটা প্রকাশিত হয়। যারা মুসলিম ঐতিহ্যের সাথে পরিচিত, তাদের অনেকের কাছেই, ওসামা বিন লাদেন এই ব্যক্তিত্বদের মধ্যকার সর্বশেষ সংযোজন।

আল-জারকাভি তাকে সম্বোধন করার সময় বলেন 'ধর্মযোদ্ধাদের শাইখ' এবং এটিই বিন লাদেনের আইকনিক পদমর্যাদা, যেটি কেবল আল-কায়েদার পরিচয়কেই নিশ্চিত করে না বরং এর অব্যাহত স্থিতি এবং বিকাশকেও সুনিশ্চিত করে। এমনকি যদি তাকে মেরেও ফেলা হয়, (তিনি শপথ করেছেন তিনি কখনই জীবিত ধরা দেবেন না) বিন লাদেনের প্রতিকৃতি তখনও সমগ্র মুসলিমবিশ্বজুড়ে

ছবি, পোস্টার, ব্যানার, টি-শার্ট এবং মগ অলংকৃত করবে। তিনি তখনও বিশ্বব্যাপী জিহাদি আন্দোলনের সম্মুখেই থাকবেন এবং মুসলিমজাতির একটি ব্যাপক অংশের ওপর রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা উদ্দীপিত করে যাবেন এবং সেসব উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতিকৃতি হিসেবে থাকবেন যেগুলো তাদের বিশ্বাসের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

২০০১ সালে আল-জাওয়াহিরি লিখিতভাবে এই বিষয়ে একটি সতর্কীকরণ জারি করেন এবং কোনো ব্যক্তির অবস্থানকে অতিশয় উচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়াকে সাবধান করে বলেন—

> ‘যদি নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য একে সম্পূর্ণ খুঁতমুক্ত বা এইরূপ কিছু মনে করার কাছাকাছি চলে যায়, তবে এই আন্দোলন পদ্ধতিগত আঁধারে তলিয়ে যাবে।’

তৃতীয় অধ্যায়

আদমবোমা এবং শাহাদাত

আদমবোমা এবং শাহাদাত

‘যেটা পশ্চিমারা সাধারণভাবে উপলব্ধি করতে পারে না, তা হলো— তারা জীবনকে যতটা ভালোবাসে, আমরা মৃত্যুকে তার চাইতেও অনেক বেশি ভালোবাসি। এটা আমার জীবনের সবচেয়ে বড় দুঃখ যে, আমি এখনও শাহাদাত লাভ করতে পারিনি অথচ আমার জীবন অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে।’

—ওসামা বিন লাদেন, নভেম্বর ১৯৯৬

যখন আমি বিন লাদেনের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলাম, তখন তিনি আবেগপ্রবণভাবে তার সহযোগী মুজাহিদদের কথা আলোচনা করেছিলেন যারা ইতিমধ্যেই লড়াইয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। আমি দ্রুতই উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম যে, তার চোখ থেকে এই কারণে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল না যে, তিনি তাদের জন্য বিলাপ করছেন; বরং তিনি তাদেরকে জান্নাতে কল্পনা করে আবেগপ্রবণ হয়ে গিয়েছিলেন।

আমরা গড়পড়তা জীবনকালব্যাপী মৃত্যুকে অপছন্দ করি, অথচ সেটাকে তারা তাদের জীবনকালব্যাপী আকাঙ্ক্ষা করে। অধিকাংশ সৈন্যই কোনো ঝুঁকি নেওয়ার পূর্বে চিন্তা করে এবং প্রাণপণে নিজেকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করে যাতে করে তারা সেই বিজয়কে উদযাপন করতে পারে, যেটার আকাঙ্ক্ষা তারা করে থাকে।

কিন্তু বিন লাদেনসহ অনেক মুজাহিদই বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুকে বেশি প্রাধান্য দেয় এবং তারা মৃত্যু পরবর্তী জীবনে অকাট্য এবং দৃঢ়বিশ্বাস লালন করে। তারা বিশ্বাস করে, শাহাদাত তাদের সর্বজনীন উদ্দেশ্যকে আরও নিকটতর করে এবং সাথে সাথেই জান্নাতে দাখিল হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়।

নাইন ইলেভেনের হামলা, ইরাকে ক্রমবর্ধমানভাবে বেড়ে চলা বিদ্রোহ, ২০০৫ সালের ৭ জুলাই লন্ডনে বোমা বিস্ফোরণ—এগুলো ‘আত্মঘাতী মিশন’ হবার কারণে বিশ্বের মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে। নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করলে, শত্রুদের বিধ্বস্ত এবং আতঙ্কিত করে তোলার জন্য বর্তমানে জিহাদিদের অস্ত্রাগারের সবচেয়ে কার্যকরী এবং সহজলভ্য অস্ত্রটি হচ্ছে আদমবোমা।

সুইসাইড মিশন কেবল কোনো শরীরী ঘটনা নয়; বরং এর ব্যাপক মনস্তাত্ত্বিক এবং মতাদর্শিক প্রভাব বিদ্যমান। আত্মঘাতী হামলাকারী যেমন নিজেকে একটি

কার্যকরী অস্ত্রে পরিণত করে, তেমনই এটি কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার আকাঙ্ক্ষাকেও প্রদর্শিত করে। সামাজিক মনোবিজ্ঞানের যুক্তি এই সিদ্ধান্ত দেয় যে, এরূপ কোনো লক্ষ্যে ক্ষুদ্রতম পরিমাণে হলেও ন্যায্যতা থাকে। যে শব্দটি এজন্য মুসলিমরা ব্যবহার করে সেটি হলো 'ইস্তিশহাদি', যাকে পশ্চিমারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে আত্মঘাতী হামলা বলে উল্লেখ করে। তবে ফ্রেঞ্চ মিডিয়া এর জন্য 'কামিকাযি' শব্দটি ব্যবহার করে। 'ইস্তিশহাদি' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে কুরআনিক শব্দ 'শহিদ' থেকে।

ইতিহাস আমাদের শত শত বছরের অনেক শহিদদের কথাই বলে; যারা তাদের বিশ্বাসের জন্য বা অন্যকে বাঁচানোর জন্য মৃত্যুবরণ করেছে। খ্রিষ্টধর্মে তাদের সাধারণত সেইন্ট বলা হয়। তবে 'ইস্তিশহাদি' নামক এই আধুনিক ব্যাপারটি এই কারণে অন্যদের থেকে ভিন্ন যে, এখানে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় তার জীবন দিয়ে দেয়; কিন্তু এর মাধ্যমে সে অন্যদের ওপর মরণ এবং দুর্দশা আরোপ করে।

অর্থাৎ মুজাহিদরা তাদের লক্ষ্য সাধনে তাদের জীবন দিয়ে দিতে প্রস্তুত এবং এটি তাদের প্রধান শত্রু মার্কিন মিলিটারির 'লাইফ সেভিং অ্যাপ্রোচ' থেকে পুরোপুরি ভিন্ন। বিন লাদেন প্রায়ই পরিহাস করে আমেরিকান সৈন্যদের কাপুরুষতার কথা বলেন এবং আফগানিস্তানে যেসব সোভিয়েত সেনাদের সাথে তিনি যুদ্ধ করেছেন, তাদের সাথে আমেরিকানদের ব্যাঙ্গাত্মকভাবে তুলনা করেন। আমেরিকান সামরিক সদস্যদের তাদের নিজেদের অথবা তাদের ঊর্ধ্বতনদের নির্দেশেও মৃত্যুকে বরণ করে নেওয়ার অনিচ্ছার ব্যাপারটা জিহাদিদের মধ্যে আমেরিকানদের একটি নৈতিক এবং সামরিক দুর্বলতা বলে গৃহীত হয়।

এরূপ আত্মঘাতী হওয়া তাদের ব্যতীত অন্য কারও পক্ষে হওয়া সম্ভব না, যারা কেবল মৃত্যুর আশাই রাখে না বরং মৃত্যুকে গভীরভাবে কামনা করে। এটি একটি প্রচণ্ড অবুঝ আচরণ, যাকে কোনো ধরনের শাস্তির হুমকি নিবৃত্ত করতে পারে না এবং কোনো হস্তক্ষেপ একে ব্যাহত করতে পারে না।

ইতিহাসের পাতায় শহিদি হামলা

প্রচলিত ধারণার বিপরীতে, প্রকৃতপক্ষে আত্মঘাতী হামলার ধারণাটি কোনো সাম্প্রতিক ঘটনা নয়। 'কাউন্সিল অফ ইমামস এন্ড মস্কস্'-এর প্রধান ড. যাকি বাদাভি—যে সংগঠনকে তিনি বৃটেনের মূল ধারার মুসলিমদের সংগঠন হিসেবে বর্ণনা করেন—খুঁজে বের করেন যে, সম্ভবত এই ধরনের হামলার প্রথম উদাহরণ হলো, ফিলিস্তিনিদের মন্দিরকে স্যামসন কর্তৃক ধ্বংস করে দেওয়ার বাইবেলীয় ঘটনা; যা তাদের এবং নিজেদেরও মরণ ডেকে আনে। সিকারাই এবং জিওলোটস নামক দুটি ইহুদি গোষ্ঠী ৬৬ খ্রিষ্টাব্দে জুদিয়াকে মুক্ত করার জন্য তাদের প্রচেষ্টার

মাধ্যমে রোমানদের ভীত-স্বতন্ত্র করে তুলেছিল। কারণ, তারা প্রায় সর্বদাই ধরা পড়ত এবং সাথে সাথে তাদের জীবন্ত পোড়ানো হতো বা শূলিতে চড়ানো হতো, অর্থাৎ মৃত্যু সেই মিশনের একটি অনস্বীকার্য অংশই ছিল।

সম্ভবত ইতিহাসের প্রথম দিককার আত্মঘাতী হামলাকারীদের মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত ছিল ইসমাইলি গুপ্তঘাতক দল যারা 'শাইখুল জাবাল' বা 'পাহাড়ি বৃদ্ধ' নামে পরিচিত হাসান ইবনে সাবাহ কর্তৃক প্রবর্তিত একটি চরমপন্থি শিয়াগোষ্ঠী ছিল। পারস্যের উত্তর-পশ্চিমস্থ জনশূন্য এলবুর্জ পর্বতমালায় ঘাঁটি গেড়ে এই গোষ্ঠীটি দুই শতক ধরে স্থানীয় সুলতান (প্রধানত সুন্নি) এবং খ্রিষ্টান ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে নিয়মানুগ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বজায় রেখেছিল। কেবল ছোড়ার মাধ্যমে অস্ত্রসজ্জিত হয়ে সুরক্ষিত লক্ষ্যবস্তুতে তাদের প্রচণ্ড এবং নির্ভীক অকস্মাৎ আক্রমণ অনিবার্যভাবেই শেষ হতো তাদের নিজেদের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। এটি একটি অত্যন্ত সফল যুদ্ধকৌশল ছিল এবং ১০৩৪-১২৫৫ সাল অবধি অত্যধিক ভয়ানক এই গুপ্তঘাতকরা প্রচুর ভিকটিম শিকার করে। অবশেষে এই অঞ্চলের প্রাসাদগুলোকে দখল করে নিজস্ব স্থানীয় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে।

বিভিন্ন বিশ্বাস এবং আচার অনুসরণের মাধ্যমে এই গোষ্ঠীটি ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। তাদের ধর্মানুষ্ঠান এবং উৎসবগুলোতে তারা একে অন্যকে এবং নেতাদেরকে আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দিত। বিচক্ষণতার সঙ্গে তাদের হামলাগুলোর সর্বোচ্চ প্রচার নিশ্চিত করতে তারা মূলত কোনো জনলোকারণ্য জায়গা বেছে নিত এবং ছুটির দিনগুলোতে তাদের কার্য সম্পাদনকে পছন্দ করত।

সুইসাইড কিলার হিসেবে তাদের ব্যাপক পরিচিতি তাদের সংখ্যা এবং অস্ত্রশস্ত্রের অনুপাতকে ছাড়িয়ে তাদেরকে অনন্যমাত্রার সফলতা এনে দেয়। সামরিকভাবে শক্তিশালী প্রতিপক্ষকে তাদের বিরুদ্ধে অভিযান ক্ষান্ত দিতে বাধ্য করে এবং একাধিকবার দীর্ঘকালের শান্তিচুক্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের দ্বারস্থ হতে বাধ্য করে।

আধুনিককালের আত্মঘাতী হামলাকারীদের মতো তারাও মৃত্যুকে মনেপ্রাণে কামনা করত। তাদের প্রথম সফল গুপ্তঘাতক যখন পারস্য সাম্রাজ্যের উজিরকে ১০৯২ সালে মারাত্মকভাবে জখম করছিল তখন সে চিৎকার করে এই ঘোষণা করেছিল—'এই শয়তানকে হত্যার মাঝেই সৌভাগ্যের সূচনা নিহিত রয়েছে।' তবে সুন্নি ঐতিহাসিকদের মতে সেসব শহিদি হামলাগুলোর ধর্মীয় অনুভূতির বদলে বরং অত্যধিক নেশাজাতীয় দ্রব্য হাশিশ সেবন দ্বারা চালিত ছিল এবং এই শব্দটি থেকেই অ্যাসাসিন (হাশাশিন) শব্দের উৎপত্তি ঘটে।

অসামঞ্জস্যপূর্ণ হলেও তাদের সাথে আল-কায়েদার সুস্পষ্ট উপমা দেওয়া যায়; বিশেষত আনুগত্যের প্রতিপত্তি এবং এর প্রতি জোরদান; মৃত্যুকে কামনা এবং শাহাদাতকে একটি কার্যকরী অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে। ঐতিহাসিকভাবে আত্মঘাতী হামলা কেবল স্বতন্ত্রভাবে মুসলিম যুদ্ধকৌশল নয়। কিন্তু পশ্চিমা শক্তির সাথে সংঘাতে মুসলিমদের এই কৌশলটি ব্যবহার করার দীর্ঘতম এবং টেকসই রেকর্ড বিদ্যমান। স্টিফেন ডেলের মতে অষ্টাদশ, ঊনবিংশ এবং বিশ শতকের প্রথমদিকে সম্পূর্ণ সময়জুড়েই ইউরোপিয়ান উপনিবেশবাদী শক্তির বিরুদ্ধে মুসলিমরা সুইসাইড অ্যাটাকে রত ছিল; বিশেষ করে এশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম ভারত, উত্তর সুমাত্রা এবং দক্ষিণ ফিলিপাইনে। প্রথাগত যুদ্ধে শত্রুকে কার্যকরীভাবে পরাস্ত করার সামরিক সক্ষমতার কমতির কারণেই সেখানকার আত্মঘাতী হামলাকারীরা শত্রু সেনাদের কেন্দ্রস্থলে নিবেদিতপ্রাণ উন্মত্ততা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত এবং অবশ্যম্ভাবীভাবেই তারা নিজেরা হত্যার শিকার হওয়ার পূর্বে তাদের হাতে থাকা অস্ত্রটি দিয়েই যত বেশি সংখ্যক শত্রুকে সম্ভব হত্যা করত।

১৮৭০ সাল থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পূর্ব অবধি পুরোটা সময়জুড়েই ইউরোপিয়ান নৈরাজ্যবাদীরা অনেক বেপরোয়া আক্রমণ এবং হাইপ্রোফাইল গুপ্তহত্যা পরিচালনা করেছিল। প্রথমবারের মতো এই সমীকরণে ডিনামাইটের আগমন ঘটানোর কারণে তাদেরকেই ইতিহাসের প্রথম সুইসাইড বোম্বার বলে বর্ণনা করা হয়। তবে এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হলো তারা প্রত্যেকেই পলায়নের চেষ্টা করত এবং বিচার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তাদের জীবননাশ হতো।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে (১৯৪৩-১৯৪৫) জাপানি কামিকাযি পাইলটরা তিন হাজারেরও বেশি আত্মঘাতী হামলা পরিচালনা করে ইতিহাসে কম সময়ে সর্বাধিক আত্মঘাতী হামলার রেকর্ড করে। জাপানিরা নিজেদেরকে কেবল এরোপ্লেনেই সীমাবদ্ধ রাখেনি; বরং তাদেরকে সুইসাইড গ্লাইডার, সুইসাইড সাবমেরিন এবং সুইসাইড মোটরবোটেরও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। এই বিভিন্ন উপায়ে জাপানিদের সুইসাইড অ্যাটাকের কারণে প্রায় ৫০০০ আমেরিকান নেভি সদস্যকে মৃত্যুর শিকার হতে হয়।

উচ্চ প্রযুক্তির এক্সপ্লোসিভ ডিভাইসের ক্রমবিকাশের সাথে সাথে কোনো জায়গায় বোমা মোতায়েন করে এবং নিরাপদ জায়গায় সরে যেয়ে বিস্ফোরণ করার সুবিধার কারণে আত্মঘাতী হামলার ঘটনা মামুলি হয়ে পড়ে। তবে ১৯৬০,৭০ এবং ৮০র দশকজুড়ে বিমান হাইজ্যাকের খুব প্রচলন ছিল এবং এই তিন দশকে এরূপ ঘটনা ঘটে দুইশরও অধিক বার এবং এর সর্বোচ্চ হার ছিল ১৯৬৮-৭২ সালসমূহে; যার গড় হলো প্রতি সপ্তাহে একটি বিমান হাইজ্যাক। এরপর নিরাপত্তা ব্যবস্থাদি জোরদার করা হলে জঙ্গি সংগঠনগুলো আবার ভাবনায় পড়ে যায়।

তারপর তাদের গৃহীত স্ট্র্যাটেজিগুলোর মধ্যে সুইসাইড অ্যাটাকের পুনঃপ্রবর্তন অন্যতম একটি।

সুইসাইড অ্যাটাকের উক্ত স্তিমিত সময়ে লক্ষণীয়ভাবে ব্যতিক্রম ছিল ভিয়েত কং; ভিয়েতনাম যুদ্ধজুড়েই তারা নিয়মিতভাবে আত্মঘাতী হামলা পরিচালনা করেছিল। তারা মোটরসাইকেলে চড়ে অথবা চুরিকৃত জিপ চালিয়ে সরাসরি তাদের টার্গেটকে লক্ষ্য করে ঢুকে যেত এবং তাদের শরীরে বেঁধে রাখা এক্সপ্লোসিভগুলোর বিস্ফোরণ ঘটাত। এরূপ একটি সিরিজ হামলা (টেট হামলা হিসেবে পরিচিত) সাইগনকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। সেই ঘটনায় অন্যান্য ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি ২৩২ জন আমেরিকান সেনাকে মৃত্যুবরণ করতে হয়। তখন উনিশ জন সুইসাইড হামলাকারীদের একটি স্কোয়াড মার্কিন দূতাবাসের ভেতরে ঢুকে নিজেদেরসহ দূতাবাসটি উড়িয়ে দেয়। সেদিনকার অন্যান্য হাইপ্রোফাইল টার্গেটগুলোর মধ্যে আত্মঘাতী হামলাকারীরা বিয়েন হোয়াতে একটি আমেরিকান বিমানঘাঁটি, থু দুয়েতে একটি পাওয়ার হাউজ, এবং আমেরিকান সামরিক কর্মকর্তাদের একটি বড়সড় জটলায় হামলা চালিয়েছিল।

আত্মঘাতী হামলা পরিচালনার উদ্দেশ্যে ভিয়েত কংয়ের বেশ কয়েকটি স্পেশাল ফোর্স ছিল। সেগুলোর মধ্যে নারী-পুরুষ উভয়ই থাকত। তাদের অনেকের হাতেই চাইনিজ অক্ষরে 'উত্তরে জন্ম হয়েছে দক্ষিণে মরার জন্য' ট্যাটু করা থাকত।

মধ্যপ্রাচ্যের আশির দশকের শুরু থেকে প্রবলভাবে সুইসাইড মিশনের পুনঃপ্রবর্তন হতে থাকে। ১৯৮১ সালের ১৫ ডিসেম্বর বৈরুতে ইরাকি দূতাবাসে একটি গাড়িবোমা বিস্ফোরণে ৬১ জন মারা যায়। পরবর্তী সময়ে এর দায় আমাল (সিরিয়া সমর্থিত শিয়া সংগঠন) স্বীকার করে।

১৯৮০র দশকের শুরুতে ইরাক-ইরান যুদ্ধের সময় ইরান তথাকথিত তরুণ শহিদদের 'হিউম্যান ওয়েভ' মোতায়েন করেছিল। তারা মাইন বিস্ফোরণ ঘটানোর জন্য সেগুলোর ওপর দিয়ে ইচ্ছাপূর্বকভাবে হেঁটে যেত এবং সেই বিস্ফোরণের ধাক্কা নিজেরাই নিত, যাতে করে সেনারা অক্ষতভাবে সামনে এগোতে পারে।

লেবাননে দখলদার সেনাদের বিরুদ্ধে হিজবুল্লাহ কর্তৃক আত্মঘাতী হামলার ব্যবহার ১৯৮৩ সালে আমেরিকান ও ফ্রেঞ্চ সৈন্যদের পূর্ণাঙ্গ প্রত্যাহার এবং ১৯৮৫ সালে ইসরায়েলের সৈন্যদের আংশিক প্রত্যাহারে বাধ্য করে। এই বিষয়ে প্রশিক্ষিত করে তোলার জন্য বিশেষভাবে তেহরান কর্তৃক ইরানিয়ান রেভ্যুলেশনারি গার্ডকে পাঠানো হয়েছিল।

দ্য লিবারেশন টাইগার অফ তামিল ইলাম (তামিল টাইগারস) শ্রীলঙ্কায় ১৯৮৭ সালে তাদের প্রথম আত্মঘাতী হামলা সম্পন্ন করে। তারা জাপানি

কামিকাযিদের মতোই সুইসাইড অ্যাটাকের জন্য ধ্বংসাত্মক এবং উদ্ভাবনী হাইব্রিড তৈরি করেছিল—যেমন সুইসাইড সাইক্লিস্ট এবং এমনকি সুইসাইড স্কুবা ডাইভারও।

১৯৯০ এর দশকের শুরু থেকে যেসব সংগঠন সুইসাইড মিশনের দিকে ঝুঁকে পড়ে তাদের মধ্যে আল-কায়েদাও একটি। বিস্ফোরকভরতি তাদের ট্রেডমার্ক ট্রাক, যেটি নাইরোবি এবং দারুস-সালামে আমেরিকান দূতাবাস হামলায় ব্যবহৃত হয়েছিল, সেগুলোই ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর চারটি প্যাসেঞ্জার বিমান দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। সেদিন ১৯ জন আত্মঘাতী হামলাকারী প্রায় ৩০০০ মানুষকে হত্যা করেছিল।

ফিলিস্তিনি সংগঠনগুলোর মধ্যে হামাস প্রথম ১৯৯৪ সালে আদমবোমা ব্যবহার করা শুরু করে। বর্তমানে দখলকৃত ভূখণ্ডগুলোতে আত্মঘাতী হামলা একটি নিত্যঘটনা। আবদুল আজিজ আল-রানতিশির মতে (একজন হামাস নেতা যিনি ইসরায়েল কর্তৃক ২০০৪ সালে গুপ্তহত্যার শিকার হন) প্যালেস্টাইন মুভমেন্টের এই যুদ্ধকৌশল অবলম্বনের নেপথ্য কারণ ছিল, পা থেকে মাথা অবধি সশস্ত্র ইসরাইলি হানাদার এবং উপনিবেশবাদী মিলিশিয়াদের বিপরীতে দুর্বলতা এবং অনন্যোপায় অবস্থা। ১৯৯৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি হেবরন'স আলি ইবরাহিমি মসজিদে ফিলিস্তিনি মুসল্লিদের ওপর গণহত্যা ফিলিস্তিনি ইসলামিস্টদের সুইসাইড বোম্বার নিয়োগ করতে প্ররোচিত করে এবং এর মাধ্যমে ইসরায়েলকে সাময়িক যুদ্ধ বিরতিতে বাধ্য করে।

আমেরিকা নেতৃত্বাধীন ইরাক আগ্রাসন একটি নজিরবিহীন আত্মঘাতী হামলার তরঙ্গ ছড়িয়ে দিয়েছে। ২০০৩ সালের মার্চ থেকে আমার এই লেখা পর্যন্ত সেখানে কমপক্ষে ৫০০টি সুইসাইড অ্যাটাক হয়েছে।

আত্মহনন এবং শাহাদাত

আত্মহত্যা করা ইসলামে যেমন পাপ বলে গণ্য হয় তেমনই খ্রিষ্টান এবং ইহুদি ধর্মেও। পশ্চিমের চাইতে মুসলিম সংস্কৃতিতে আত্মহননকে অধিকতর ঘৃণা করা হয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিশ্বব্যাপী গড় আত্মহত্যার হার ছিল প্রতি লাখে এগারো থেকে পনেরো জন। এর সর্বোচ্চ হার রাশিয়া এবং লিথুনিয়ায়, যেখানে প্রতি লাখে সত্তর জন। বিশ্বে উচ্চ আত্মহননের দেশগুলোর মধ্যে একমাত্র মুসলিম দেশ ফিলিস্তিন এবং সেখানে এর হার প্রতি লাখে উনত্রিশ জন। জরিপ অনুসারে চিকিৎসা আবশ্যক এরূপ ধরনের মানসিক আঘাতে ফিলিস্তিনের পঞ্চাশ শতাংশ মানুষই জর্জরিত। অপরদিকে জর্ডান, মিশর, ইরান এবং সিরিয়াতে আত্মহননের

হার প্রতি লাখে এক জনেরও কম। কুয়েত, তুর্কি, আজারবাইজান, আলবেনিয়া এবং বাহরাইনে এর হার প্রতি লাখে পাঁচজনেরও কম।

মোদ্দাকথা হলো, আত্মহননের কোনো ধরনের সাংস্কৃতিক প্রবণতা মুসলিমদের মধ্যে অনুপস্থিত। কেবল ফিলিস্তিন ব্যতিত আত্মহত্যার হার এবং আদমবোমার সংখ্যার মধ্যেও কোনো পারস্পরিক সম্পর্ক নেই।

সামাজিক মনস্তত্ত্ববিদরা প্রচলিত আত্মহননের ধারণাটিকে 'আত্মবাদী-আত্মহনন' (egoistic-suiside) হিসেবে আখ্যায়িত করেন। সচরাচর কোনো অসুখী বা মানসিক আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি; যারা সমাজ থেকে ব্যাপক বিচ্ছিন্ন থাকে এবং জীবনকে সচল রাখার জন্য কোনো উদ্দেশ্য খুঁজে পায় না, তাদের দ্বারাই এরূপ ঘটনা ঘটে। আপন ধ্বংসের এই চূড়ান্ত কর্মানুষ্ঠান সচরাচর নির্জনে এবং একাকী করা হয়। এর ভিন্ন ঘটনা একেবারেই বিরল, যেটা সকল আত্মহননের সর্বোচ্চ এক শতাংশেরও কম।

অন্যদিকে আত্মঘাতী হামলা সচরাচর একসাথে কাজ করা কোনো দলের কিছুসংখ্যক লোকের মাধ্যমে করা হয়। ইরাকের অভ্যন্তরের অপারেশনসমূহ ব্যতীত আল-কায়েদা ৮৯ শতাংশ আত্মঘাতী হামলায় দুই বা ততোধিক সদস্যের স্কোয়াড ব্যবহার করেছে এবং যদিও এটি কোনো একক ব্যক্তি কর্তৃকও সম্পাদিত হয়, তবুও সেখানে অনেক ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত থাকে, যারা বিবিধ প্রস্তুতিমূলক এবং লজিস্টিক কাজে যুক্ত থাকে; তারা দল হিসেবে একসাথে কাজ করে এবং তাদের মধ্যে ব্যাপক সামাজিক মিথস্ক্রিয়া ঘটে।

আত্মবাদী আত্মহননকে বেশিরভাগ সমাজেই নিচু কর্ম বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু এর বিপরীতে, আত্মঘাতী হামলাগুলো ব্যাপক প্রশংসিত হয় এবং সেই গোষ্ঠীর ব্যাপক তারিফ করা হয়, যারা উক্ত হামলাকারীকে তৈরি করেছে। যদিও এই তথ্যটি অনেকের পক্ষেই হজম করা কষ্টকর হতে পারে। এই প্রশংসাও একজন শহিদ ইচ্ছুকের অন্যতম প্রেরণার উপাদান হিসেবে কাজ করে। কিছু কিছু দেশে উদাহরণস্বরূপ, ফিলিস্তিনে বাচ্চারা এভাবে শাহাদাতকে আকুলভাবে আকাঙ্ক্ষা করে, যেভাবে পশ্চিমের বাচ্চারা কোনো ফুটবলার বা পপ-স্টার হওয়ার জন্য আকাঙ্ক্ষা করে। এই অনুমোদন এই অর্থও প্রকাশ করে যে, কাজটি তাদের সমাজের জন্য উপকারী এবং দরকারিও বটে। শাহাদাত এবং আত্মহননের মধ্যে মূল পার্থক্য হলো, একজন তার নিজস্ব উদ্বেগের দ্বারা প্রণোদিত হয় এবং অন্যটি মূলত পরহিতব্রত। (এর সংঘটনকারী দ্বারা এরূপই অনুভূত হয়)। সর্বোপরি, আত্মহননের বিপরীতে শাহাদাত একটি ধর্মীয় এবং সর্বদাই নিগূঢ়ভাবে একটি রাজনৈতিক ক্রিয়া।

একজন শহিদি হামলাকারীর স্বীকারোক্তি থেকে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি 'ফ্রি আরব ভয়েস' ওয়েবসাইটে হুয়ায়রা আল-আরাবি ছদ্মনামের এক ফিলিস্তিনি নারী কর্তৃক পোস্ট করা হয়েছিল, যিনি তখন ইসরাইলিদের বিরুদ্ধে একটি আত্মঘাতী হামলা পরিচালনার প্রস্তুতি পর্যায়ে ছিলেন।

> 'আদমবোমা নিঃস্বার্থ আত্মোৎসর্গের এই প্রোজ্জ্বল দৃষ্টান্তকে দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রকাশ করে যে, একজন মানুষের জীবন আমাদের জনগণের সামগ্রিক ভবিষ্যতের চেয়ে অধিক মূল্যবান কোনো কিছু হতে পারে না। যে ব্যক্তি নিজেকে আদমবোমায় রূপান্তরিত করে, সে নিজের স্বার্থে নয় বরং সবার হয়ে কাজ করে। তার অভিব্যক্তি থাকে এমন যে, তোমাদের প্রত্যাশা বাস্তবায়নের জন্য আমার নিজেকে একটি অস্ত্রে রূপান্তরিত হতে দাও। আমার জনগণের ভবিষ্যতের স্বার্থে আমাকে আমার জীবন উৎসর্গ করতে দাও।
>
> বলা বাহুল্য যে, এটি কোনো সাধারণ আত্মহত্যাকারীর চরিত্র ও অভিব্যক্তি নয়। সাধারণ আত্মহত্যা একটি স্বার্থবাদী কর্ম। এটা এমনসব ব্যক্তির কাজ, যারা ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধানের একটি পন্থা হিসেবে জীবনকে ছুড়ে ফেলে মৃত্যুকে বরণ করে নেয়। অন্যদিকে আত্মঘাতী হামলা কোনোভাবেই জীবনকে প্রত্যাখ্যানের উদ্দেশ্যে করা হয় না। এখানে মৃত্যুকে বরণ করে নেওয়া হয় নিজেকে একটি অস্ত্রে রূপান্তরের মাধ্যমে, যে অস্ত্র আগ্রাসন থেকে স্বাধীনতা এবং ন্যায় আনয়ন করে।'

শাহাদাত এবং ইসলাম

কিছু কিছু বিশিষ্ট মুসলিম স্কলার বিবৃত করেছেন যে, শহিদি হামলাসমূহ প্রকৃতপক্ষে আত্মহনন এবং তাই এটি নিষিদ্ধ (হারাম)। ২০০৫ সালের আগস্ট মাসে সিরিয়ান থিওরিস্ট আবু নাসির আল-তারতুসি একটি ফতোয়া জারি করেন, যাতে বলা হয়েছে শহিদি হামলাগুলো এই অর্থই প্রকাশ করে যে, একজন লোক আত্মঘাতী হচ্ছে। এটি নৈতিকতা বিবর্জিত এবং ধর্মীয় আদেশের সঠিক ব্যাখ্যার পরিপন্থি; যেখানে বলা হয়েছে আত্মহনন হারাম, তার উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

> 'আর ব্যয় করো আল্লাহর পথে, তবে নিজের জীবনকে ধ্বংসের সম্মুখীন করো না।' (২:১৯৫)

নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সহিহ হাদিসে বর্ণনা করেন—

'কোনো ব্যক্তি যে জিনিসের সাহায্যে আত্মহনন করবে, কিয়ামতের দিন তাকে সেই জিনিস দিয়েই শাস্তি দেওয়া হবে।'

তবে আযযাম তামিমি এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করে বলেন—আত্মহনন মুসলিম সমাজে পুরোপুরি অগ্রহণীয় একটি বিষয়। তাই শহিদ হতে ইচ্ছুক প্রত্যেক ব্যক্তিকে আত্মহনন ছাড়া অন্য পন্থায় এটি অর্জন করতে হবে। আর এটি হচ্ছে বৈধ জিহাদের মাধ্যমে একটি উঁচু লক্ষ্যের জন্য আত্মবিসর্জন। তিনি উল্লেখ করেন, নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর অনুসারীরা ইসলামের পথে জীবন উৎসর্গ করার সাগ্রহ ইচ্ছা প্রদর্শন করতেন। তিনি বলেন, শহিদি হামলাকে উপলব্ধি করতে হলে ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতি সাপেক্ষে জিহাদকে পূর্ণ করার জন্য কুরআনিক আদেশগুলো উপলব্ধি করা প্রয়োজনীয়।

জিহাদি মতাদর্শ মোতাবেক জিহাদের সর্বোচ্চ অভিব্যক্তি হচ্ছে শাহাদাত, সেটা কোনো শহিদি হামলার মাধ্যমে অর্জন হোক বা শত্রুরা তাকে হত্যা করুক। কুরআনে এসেছে—

> 'আর যারা আল্লাহর রাহে নিহত হয়, তাদেরকে তুমি কখনো মৃত মনে করো না। বরং তারা নিজেদের পালনকর্তার নিকট জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত।' (৩:১৬৯)

প্রতিফলের অধঃক্রম অনুসারে জিহাদের অন্যান্য রূপসমূহ হচ্ছে, মুজাহিদদের আর্থিকভাবে সহায়তা করা, তাদের জন্য সমর্থন এবং যোদ্ধার জোগান দেওয়া (যা মূলত মসজিদে এবং মিডিয়ার মাধ্যমে করা হয়) অথবা সরাসরি আর্থিকভাবে কিংবা যোদ্ধা হিসেবে অবদান রাখার পরিবর্তে অন্তত পক্ষে জিহাদকে সমর্থন দেওয়া এবং আস্থা পোষণ করা।

আল-জাওয়াহিরির মতে, উম্মাহ একইসঙ্গে বিভিন্ন দিক থেকে হামলার শিকার। তিনি তার '*নাইটস আন্ডার দ্য প্রফেট'স ব্যানার*' বইটিতে (সম্ভবত বিন লাদেনও) যাদেরকে শত্রুর বিভিন্ন বহিঃপ্রকাশ বলে মনে করেন তাদেরকে লিপিবদ্ধ করেন। তিনি বলেন—'পশ্চিমা শক্তি ইসলামের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বেশ কিছু টুলস ব্যবহার করছে। যেমন :

-জাতিসংঘ

-তাদের বন্ধুভাবাপন্ন মুসলিম শাসকগোষ্ঠী

-মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশনসমূহ

-আন্তর্জাতিক যোগাযোগ এবং তথ্য বিনিময় সিস্টেমসমূহ

-আন্তর্জাতিক নিউজ এজেন্সিসমূহ

-আন্তর্জাতিক ত্রাণসংস্থাসমূহ; যেগুলো তারা ব্যবহার করে গুপ্তচরবৃত্তি, ধর্মান্তকরণ, অভ্যুত্থান পরিকল্পনা এবং অস্ত্র সরবরাহের জন্য।'

বর্তমানে—উক্ত লেখার চার বছরের কিছু বেশি সময়ের মধ্যেই এবং আমেরিকা নেতৃত্বাধীন ইরাক আগ্রাসন থেকে প্রদত্ত সুযোগ সুবিধার বলে, আল-জাওয়াহিরি এই ভীতিপূর্ণ 'উইশ লিস্ট'-এর প্রতিটি পয়েন্টে টিক চিহ্ন দিতে সক্ষম হয়েছেন।

আল-জাওয়াহিরি বলেন, নব্য ক্রুসেডারদের রুখে দেওয়ার জন্য অন্যান্য সকল পদ্ধতিতেই চেষ্টা করা হয়েছে। ১৯৮৭ সালে বিন লাদেন কর্তৃক ইসরাইলি পণ্য বয়কটের আহ্বান থেকে শুরু করে, শান্তিপূর্ণ আলোচনা প্রচেষ্টা এবং ন্যায় বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক আদালতে বিচার প্রার্থনা ইত্যাদির সবই করা হয়েছে এবং এর সবগুলোই চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়েছে। অতএব, বর্তমানে জিহাদ ব্যতীত সমাধানের আর কোনো পথ খোলা নেই। সিংহভাগ চরমপন্থি আলেমদের মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তই গৃহীত হয়েছে; এমনকি বৃটেনের অনেক আলেম এই সিদ্ধান্তের পক্ষে। এ সবকিছুর সবচেয়ে সুস্পষ্ট রূপরেখা বিদ্যমান বিন লাদেনের ১৯৯৮ সালের ফতোয়া 'অ্যাগেইনস্ট দ্য জিউস অ্যান্ড ক্রুসেডারস'-এর মধ্যে যেখানে সকল ক্রুসেডারদের বৈধ টার্গেট বলে গণ্য করা হয়েছে।

জিহাদের ধর্মতাত্ত্বিক আলোচনায় সুন্নি কমিউনিটি ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করে। বৃটেনের মূলধারার (তিনি এটাকে এভাবেই দাবি করেন) মুসলিমদের আনঅফিসিয়াল নেতা জাকি বাদাভির মতে—আল-কায়েদা কর্তৃক সমর্থিত ইসলামের রীতিগুলো মূলত বাতিল। বেসামরিকদের হত্যা করা শরিয়াহ বিরোধী। ওসামা বিন লাদেন কোনো ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ নন। কোনো ফতোয়া জারি করা বা আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করার কোনো অধিকার তার নেই।[১]

যখন রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে শহিদি হামলার আলোচনা আসে তখন চরমপন্থি এবং রক্ষণশীলদের মধ্যকার বৈসাদৃশ্য উল্লেখযোগ্যভাবে মিইয়ে যায়। বাদাভিই বলেন, যুদ্ধে নিজেকে বিসর্জন দেওয়া কোনো অদ্ভুত ঘটনা নয়। ফিলিস্তিন এবং ইরাকে তারা চরম কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে লড়াই করে যাচ্ছে। সেখানে বিশাল বাহিনী তাদের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়েছে এবং তাদের নিপীড়ন করে যাচ্ছে। তারা যে অসামান্য ত্যাগ স্বীকার করে যাচ্ছে সেজন্য অবশ্যই তাদেরকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতে হবে।

এমনকি মডারেট মুসলিমদের মধ্যেও এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি বিরল নয়। অনেক মুসলিম দেশের জনসাধারণের একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ আন্তরিকভাবে শহিদি হামলাকে সমর্থন এবং শ্রদ্ধা করে; কারণ তারা মনে করে ব্যাপক সামরিক শক্তির

---

[১] Interview with Dr Zaki Badawi. London, 11 April 2005.

সামনে এটিই একমাত্র সহজলভ্য অস্ত্র। উদাহরণস্বরূপ, অনেকের মতে ফিলিস্তিনের প্রথম ইন্তিফাদা ছিল পাথরের ইন্তিফাদা এবং দ্বিতীয় ইন্তিফাদা ছিল শহিদদের ইন্তিফাদা।

মুসলিম স্কলার শাইখ ইউসুফ কারযাভি; যাকে চরমপন্থি বলে গণ্য করে ব্রিটেনে প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তিনিও এই একই ধরনের ধারণা পোষণ করেন। তিনি বলেন—আল্লাহ ন্যায়পরায়ণ, তার অসীম জ্ঞানের সাহায্যে তিনি দুর্বলদের এমন জিনিস দান করেছেন যেটা শক্তিশালীদের দেননি। তা হলো তাদের নিজ দেহকেই বোমায় রূপান্তরিত করার ক্ষমতা, যেমনটি ফিলিস্তিনিরা করছে।

আত্মঘাতী হামলার সামরিক প্রভাব

১৯৮৩ সালে লেবাননে হিজবুল্লাহ কর্তৃক ক্রমাগত আত্মঘাতী মিশন পরিচালনা করার কারণে আমেরিকা এবং ফ্রান্স সেখান থেকে তাদের সৈন্যদের পুরোপুরি প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়। ১৯৮৫ সালে ইসরাইলের ক্ষেত্রেও সেই একই দৃশ্য দেখা যায়। আমেরিকা কর্তৃক প্রচণ্ডভাবে সাপোর্টেড হওয়ার পরও তারা লেবাননের বেশিরভাগ জায়গা থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়। হামাস কর্তৃক ১৯৯৪ এবং ১৯৯৫ সালে ব্যাপক আত্মঘাতী আক্রমণ পরিচালনা গাজা থেকে পুরোপুরি এবং ওয়েস্ট বাঙ্ক থেকে আংশিকভাবে ইসরাইলি সৈন্যদের প্রত্যাহার নিশ্চিত করে।

আত্মঘাতী মিশন স্পষ্টতই একটি সফল এবং জবরদস্ত যুদ্ধ কৌশল; এটি এমন এক পন্থা, যাকে প্রতিহত করা প্রায় অসম্ভব। যে যুদ্ধে এক পক্ষ সামরিকভাবে অপর পক্ষ থেকে অনেক শক্তিশালী, সেখানে দুর্বলতর পক্ষের জন্য এটি একটি কার্যকরী কৌশল হিসেবে বিবেচিত। বিন লাদেন তার '*ডিক্লারেশন অফ জিহাদ*'-এই সতর্কবার্তা উল্লেখ করেন যে, 'আমাদের সশস্ত্র বাহিনী এবং শত্রুপক্ষের সামরিক শক্তিতে ভারসাম্যহীনতার কারণে, লড়াইয়ের জন্য আমাদের একটি উপযুক্ত যন্ত্র বেছে নিতে হবে... (আমাদের) যুবকদের একমাত্র অভিলাষ হলো তোমাদের হত্যা করে জান্নাতে প্রবেশ করা।'

আত্মঘাতী হামলার বহুবিধ স্বতন্ত্র সামরিক সুবিধা বিদ্যমান। প্রথম সুবিধা হলো, এটি পুরোপুরিভাবে অপ্রত্যাশিত একটি ঘটনা। আমরা যত ঘনঘনই আত্মঘাতী হামলার রিপোর্ট পাই না কেন, অধিকাংশ মানুষের জন্যই সেগুলো বোধগম্যতার বাইরে রয়ে যায়, যারা বেঁচে থাকার একটি তীব্র প্রবৃত্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাই আমরা কোনো আত্মঘাতী হামলার পূর্বানুমান করতে একেবারেই অনিচ্ছুক। একজন আত্মঘাতী হামলাকারী খুব সহজেই বেসামরিক হিসেবে নিরাপত্তা বাহিনীকে ধোঁকা

দিতে পারে এবং তার লক্ষ্যবস্তুতে অনুপ্রবেশ করতে পারে; হোক সেটা কোনো শিয়া মসজিদ, ইরাকি আর্মি রিক্রুটমেন্ট সেন্টার অথবা ইসরাইলি চেকপয়েন্ট। আত্মঘাতী হামলা অতিশয় নির্ভুল হয়; কারণ এখানে হামলাকারী তার অভীষ্ট লক্ষ্যের একেবারে নিকটে গিয়েই বিস্ফোরিত হতে পারে।

সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক সুবিধাটি আল-জাওয়াহিরি চিহ্নিত করেন। তিনি কঠোর বাস্তববাদিতা প্রয়োগ করে শহিদি হামলার সাপেক্ষে বলেন—হতাহতের দিক থেকে মুজাহিদদের পক্ষে সবচেয়ে কম ব্যয়বহুলভাবে এবং শত্রুর ওপর সর্বাধিক ক্ষয়ক্ষতি আরোপ করার সবচেয়ে সফল পদ্ধতি এটি। সাধারণ হিসেবে প্রচলিত বোমা হামলা এবং অ্যামবুশের বিপরীতে আত্মঘাতী হামলার মাধ্যমে দশ থেকে পনেরো গুণ বেশি ক্ষয়ক্ষতি আরোপ করা যায়। এভাবেই আল-কায়েদা ধারাবাহিকভাবে নিজেদের সর্বনিম্ন ক্ষয়ক্ষতির বিপরীতে শত্রুর ওপর সর্বাধিক ক্ষয়ক্ষতি আরোপ করে যাচ্ছে। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের হামলাটির আত্মঘাতী বনাম হতাহতের অনুপাত সর্বোচ্চ; সেখানে ১৯ জন আত্মঘাতী আমেরিকার দাবি মোতাবেক ২৯৯৫ জনকে হত্যা করে অর্থাৎ গড়ে ১ জন আত্মঘাতী কর্তৃক ১৫৫.৫ জন নিহত হয়েছে।

ইরাকের হালনাগাদ জরিপসমূহ হাতে পাওয়া কষ্টকর। কিন্তু ‘বোস্টন গ্লোব’ এ ২০০৫ সালের ১০ জুলাই একটি প্রতিবেদনে কিছু পেন্টাগন কর্মকর্তাদের (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছিল। তাদের বিবৃতি মোতাবেক দৈনিক গড়ে বিদ্রোহীদের দ্বারা সত্তরটি হামলা সাধিত হয়, যেগুলোর অর্ধেকই হয় আত্মঘাতী হামলার মাধ্যমে। এর মাধ্যমে হতাহতের পরিমাণে ব্যাপক ভিন্নতা থাকে। তবে গড়ে প্রতি আত্মঘাতী হামলায় প্রায় ১২জনের মতো নিহত হয়েছে। তবে কিছু ব্যতিক্রমী হামলা এসব পরিসংখ্যানের ধার ধারে না। উদাহরণস্বরূপ ২০০৫ সালের জুলাই মাসে একজন আত্মঘাতী হামলাকারী নিজেকে তেলভরতি ট্যাংকারের নিচে বিস্ফোরিত করলে একটি ভয়াবহ বিস্ফোরণে সৃষ্টি হয় এবং এতে শতাধিক মানুষ নিহত হয়।

যুদ্ধবিদ্যার ক্ষেত্রে, আত্মঘাতী হামলাকারী সচরাচর কোনো গাড়িতে করে অথবা নিজের দেহেই বিস্ফোরক বহন করে টার্গেটে গিয়ে বিস্ফোরণ ঘটায়। কখনো আবার সুটকেস অথবা ব্যাকপ্যাকে (লন্ডন বোমা হামলা) কিংবা সাধারণভাবে কোনো সুইসাইড জামা অথবা সুইসাইড বেল্টের মাধ্যমে কার্য সাধন করে। সুইসাইড বেল্ট সহজেই তৈরি করা যায় এবং বিভিন্ন ওয়েবসাইটে এসবের স্টেপ-বাই-স্টেপ নির্দেশনাও পাওয়া যায়।

আত্মঘাতী হামলাকারী সাধারণ পোশাকের ভেতরে এসব পরিধানের কারণে এগুলো শনাক্ত করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য। ১৯৯১ সালে তামিল টাইগারস এই

সুইসাইড বেল্টের প্রথম প্রবর্তন করেছিল। ধানু নামের একটি যুবতী মেয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীকে এর মাধ্যমেই হত্যা করে। মেয়েটি তার দিকে একটি ফুলের মালা নিয়ে এগিয়ে এসেছিল, কিন্তু সেটি তার গলায় পরিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে রাজীব গান্ধীসহ নিজেকে বিস্ফোরণের মাধ্যমে উড়িয়ে দেয়। এর বারো বছর পর আল-জারকাভির নেতৃত্বাধীন 'আল-কায়েদা ইন দ্য ল্যান্ড অফ টু রিভার্স' তামিল টাইগার্সদের মতো একইভাবে হামলা শুরু করে এবং সেগুলোকে ফিল্মবন্দী করে তাদের রিক্রুটমেন্ট এবং রিভিউর কাজে লাগায়।

ইরাকের আত্মঘাতী হামলাগুলো 'আল-কায়েদা ইন দ্য ল্যান্ড অফ টু রিভার্স' এর দ্বারাই সর্বাধিক সংঘটিত হয়। এসব হামলাগুলোর বেশিরভাগই ইরাকিদের পরিবর্তে সেসব আগ্রহদীপ্ত রিক্রুটরা করে, যারা সমগ্র বিশ্ব থেকে শতকে শতকে প্লাবনের পানির মতো ভেসে এসেছে মনের অভ্যন্তরে কেবল একটিমাত্র আশা নিয়ে—এবং সেটি হলো শাহাদাত। প্রায়শ সেসব যুবকদের কোনো সামরিক প্রশিক্ষণও থাকে না এবং তারা কোনো রাইফেল চালাতেও জানে না।

সালাফি-জিহাদিদের মিত্র সংগঠন আনসার আস-সুন্নাহও কতিপয় আত্মঘাতী হামলা পরিচালনা করেছে এবং শিয়া স্কলার মুকতাদা আল-সদরের মাহদি আর্মিও মাঝেমধ্যে আত্মঘাতী হামলা চালায় বলে জানা গেছে। কিন্তু তারা কেবল কোনো চরম কঠিন পরিস্থিতিতে অথবা প্রচলিত উপায়ে যদি সেই একই ফলাফল অর্জন করা না যায়, তখনই এরূপ করে। বিদ্রোহীদের মধ্যে যারা আত্মঘাতী হামলার বিরোধিতা করে, তাদের মধ্যে বেশিরভাগই সাবেক বাথিস্ট অথবা আর্মি সদস্য। তারা প্রচলিত উপায় প্রাধান্য দেয়; যেমন স্নাইপার ব্যবহার, আরপিজি থেকে রকেট নিক্ষেপ, অ্যাম্বুশ ইত্যাদি।

মনে করা হয় ২০০৫ সালের ৯ নভেম্বর জর্ডানের আম্মানে তিনটি হোটেলে বোমা হামলার জন্য ইরাকি আল-কায়েদা থেকেই তিনজন আত্মঘাতীকে প্রেরণ করা হয়েছিল। হামলাকারীদের মধ্যে দুজনের বয়স ছিল কেবল ২৩ বছর। এটি একটি নতুন টার্মের প্রতি ইঙ্গিত করে, যেমন 'অবরোধ প্রজন্ম' এবং 'ঘরে গড়ে ওঠা ইরাকি আত্মঘাতী' ইত্যাদি। এরা হচ্ছে সেইসব যুবক, যারা প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় মার্কিনীদের অবরোধের মধ্যে প্রচণ্ড দুর্দশায় বেড়ে উঠেছিল। তারা তাদের পিতামাতা অপেক্ষা ইসলামের সাথে বেশি পরিচিত ছিল। এর পেছনের কারণ হলো, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের অনুশাসন প্রয়োগ করার ১৯৯০ এর দশকে সাদ্দাম হোসেনের নীতি। বর্তমানে লন্ডন প্রবাসী ইরাকি গ্রাজুয়েটেড স্কলার ড. হাইসাম জুবাইদি ব্যাখ্যা করেন—এই প্রজন্ম জিহাদি মতাদর্শের সাথে অধিক পরিচিত ছিল। তারা মার্কিনীদের নিপীড়ন এবং অবমাননার স্বাদ পেয়েছে এবং মসজিদে ঘোষণাকৃত প্রতিশোধের আহ্বানকে শ্রবণ করেছে।

বর্তমানে ফিলিস্তিনের বেশিরভাগ প্রতিরোধ সংগঠনগুলোর সুইসাইড উইং বিদ্যমান। দ্বিতীয় ইন্তিফাদা আরম্ভ হওয়ার পর থেকে সবচেয়ে সক্রিয় রয়েছে হামাস, আল-আকসা মার্টার্স ব্রিগেড (ফাতাহ এর অংশ) এবং প্যালেস্টাইনিয়ান ইসলামিক জিহাদ (PIJ)। এমনকি যদি কোনো সংগঠন সেক্যুলারও হয়, তবুও এর সুইসাইড উইংয়ের বুনিয়াদই হলো শাহাদাতের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি।

এসব উইং এ ভিন্ন ভিন্ন সেল বিদ্যমান। যেমন কারও কাজ অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবী থেকে উপযুক্ত রিক্রুট মনোনীত করা, কারও কাজ 'জীবন্ত শহিদ'দের (living martyr—আত্মঘাতী হামলায় নির্বাচিতদের এই নামেই ডাকা হয়) প্রশিক্ষণ এবং প্রস্তুতি, কারও কাজ টার্গেট নির্দিষ্ট করা ইত্যাদি ইত্যাদি।

আল-কায়েদা, ইরাক এবং ফিলিস্তিনে তাদের সাংগঠনিক কাঠামো প্রায় একই রকমের। প্রতিটি সেলে সাধারণত একজন কমান্ডার থাকেন, যিনি সচরাচর নিজে আত্মঘাতী হামলা করেন না বরং তিনি রিক্রুটদের উক্ত কাজের জন্য উপযোগী করে তোলেন। তার বিশেষজ্ঞসুলভ জ্ঞান এবং পরিপক্কতাকে তার মৃত্যু অপেক্ষা অধিক উপকারী বলে বিবেচিত হয়। এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম হলো মুহাম্মাদ আতা, যিনি ১১ সেপ্টেম্বর হামলার দলনেতা ছিলেন এবং তিনিই প্রথম প্লেনটি দিয়ে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে আঘাত হানেন।

কারা এই আত্মঘাতী?

যেসব তরুণ যোদ্ধারা ইরাকে পাড়ি জমিয়েছে, তারা মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের 'সন্ত্রাসবাদের সহায়ক' রাষ্ট্রসমূহের বাসিন্দা নয়; বরং তাদের সিংহভাগই মুসলিমবিশ্বে আমেরিকার ঘনিষ্ঠতম মিত্রদেশগুলোর নাগরিক। আল-কায়েদার সদস্যদের সিংহভাগ সদস্য পূর্বেও যেমন সৌদি বংশোদ্ভূত ছিল এখনও তেমনই রয়েছে; যে দেশটি মধ্যপ্রাচ্যে সম্ভবত তাদের সর্বাধিক ঘনিষ্ঠ মিত্র। অথচ সেখানে আমেরিকাকে দেখা হয় হানাদার এবং দখলদার হিসেবে এবং একটি প্রচ্ছন্ন ঔপনিবেশিক হিসেবে; এটা হয়তো-বা তাদের খ্রিষ্টান হবার কারণেও। যারা আল-কায়েদার কোমল আহ্বানে সাড়া দেয় তাদেরও বুনিয়াদ এটিই এবং তাদের উদ্দেশ্য হলো বিদেশি কাফেরদের প্রতিরোধ করা।

এককভাবে কোনো মুসলিম রাষ্ট্র আমেরিকান সামরিক বাহিনীকে প্রতিহত করার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী না হওয়ায় দখলদারদের তাড়ানোর জন্য উম্মাহর জোটবদ্ধ হওয়ার আহ্বান তাদের নিকট খুবই উদ্দীপনামূলক বলে প্রতিপন্ন হয়, যারা তাদের ইতিহাস নিয়ে অপমানিত এবং নিপীড়িত হওয়ার কারণে হতাশাগ্রস্ত। আত্মঘাতী হামলা এবং এর সাথে সাথে ধর্মীয় ঐক্যবদ্ধতা তাদের এটাই অনুভূত করায় যে, এই ভারসাম্যহীন যুদ্ধে যাই হোক না কেনো, বিজয় অর্জিত হবেই।

ওয়েবসাইটে দেওয়া শহিদদের তালিকায় যেসব দেশ থেকে তারা এসেছে সেগুলোর প্রশস্ত পরিসরও এর সাক্ষী দেয়। যাদের মধ্যে রয়েছে ইয়েমেন, আলজেরিয়া, সিরিয়া, জর্ডান, পাকিস্তান এবং সৌদি আরব। নির্ভরযোগ্য রেফারেন্সসমূহ বলে যে, সেখানে বিপুলসংখ্যক নীল চোখ এবং বাদামি চুলধারী রিক্রুটও বিদ্যমান। একজন আমেরিকান সন্ত্রাসবাদ বিশেষজ্ঞ[১], যখন মার্কিন হস্তক্ষেপের কারণে ইরাক শিথিল নিরাপত্তাব্যবস্থা সম্বলিত এক দুর্বল রাষ্ট্রে পরিণত হয়, তখন সেটিকে 'সন্ত্রাসীদের জন্য মক্কা' বলে উল্লেখ করেন। আগ্রাসনের পর থেকেই দেশটির পশ্চিমের মরুভূমি এবং উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলে প্রশিক্ষণ শিবিরের সংখ্যা বেড়েই চলছে।

আত্মঘাতী হামলাকারীও স্বাভাবিক মানুষ হতে পারে এবং তারা কোনো মানসিক বিকারগ্রস্ত নয়, যেমনভাবে সাধারণ চিন্তাধারা এবং মিডিয়া চিত্রাঙ্কন করে থাকে; তবে অনেকের জন্যই সেটা মেনে নেওয়া কষ্টকর। ১৯৮০ এবং ১৯৯০ এর দশকে দুইজন আত্মঘাতীসংক্রান্ত মনস্তত্ত্ব বিশেষজ্ঞের কিছু তমসাচ্ছন্ন প্রতিবেদনকে প্রায়শ এর জন্য রেফারেন্স হিসেবে উল্লেখ করা হয়। অ্যারিয়েল মেরারি নামক একজন ইসরাইলি সাইকোলোজিস্ট এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, সন্ত্রাসবাদী আত্মহনন মূলত কোনো দলীয় কর্ম নয় বরং একটি একক কর্ম এবং এটা তারাই করে যারা কোনো ব্যক্তিগত সমস্যার কারণে মৃত্যু কামনা করে। জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটির প্রফেসর জেরল্ড পোস্ট এর গবেষণায় উঠে আসে, এটি এক ধরনের 'মস্তিষ্কবিকৃতি'।[২] উভয়জনই সাধারণ আত্মঘাতীদের চিত্রাঙ্কন করেছিলেন অশিক্ষিত, বেকার, সমাজবিচ্ছিন্ন এবং অবিবাহিত হিসেবে। অন্যভাবে বলতে গেলে তারা তাদের আউটসাইডার, দুর্ভাগ্যপীড়িত, লোকসংমিশ্রণহীন প্রভৃতি শব্দ দ্বারা চিহ্নিত করেন, যেগুলো সচরাচর পশ্চিমা দেশগুলোতে সিরিয়াল কিলারদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। এসব চিত্রাঙ্কন আত্মঘাতী হামলাসমূহকে 'অসংগত অসুস্থতা' হিসেবে তুলে ধরার জন্য তাদের প্রয়োজনীয়তাই প্রদর্শিত করে।

---

[১] Ashley Tellis quoted in the San Francisco Chronicle, 20 March 2005. ('Iraq Desert Becomes Chief Training Ground for Killing Americans').

[২] Merari. A.. The readiness to kill and die: Suicidal terrorism in the Middle East. in W. Reich (ed.), Origins of Terrorism: Psychologies, Ideologies, Theologies, States of Mind (Washington. DC: Woodrow Wilson Center Press, 1990, pp. 192-210) and Robert S. Robins and Jerrold Post Political Paranoia: The Psychopolitics of Hatred (New Haven: Yale University Press, 1997).

আত্মঘাতী হামলাকারীদের প্ররোচিত করার উপাদান হিসেবে প্রায়শ হামলাকারীকে যৌন হতাশাগ্রস্ত হিসেবে দাবি করা হয়। সেখানে চিত্রাঙ্কন করা হয়, সেসব ব্যক্তিরা ৭২ জন কুমারী হুর নিয়ে আবেশের মধ্যে থাকে, যা প্রত্যেক পুরুষ শহিদদের জান্নাতে প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। অতি অবশ্যই কুরআন জান্নাতের অনেক অপরূপ জিনিসের প্রতিশ্রুতির কথা বলে; যেমন,

'তাতে রয়েছে পানির নহর, নির্মল দুধের নহর যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, পানকারীদের নিকট সুস্বাদু শরাবের নহর এবং পরিশোধিত মধুর নহর।'

(৪৭ : ১৫)

তবে অন্যান্য ধর্মগ্রন্থগুলোতেও এসব বলা হয়। জান্নাতের বর্ণনার সকল আলোচনাতেই হুরের কথা আসেনি, কিন্তু যেখানে এসেছে সেখানে বলা হয়েছে,

'তাদের কাছে থাকবে আয়তলোচনা তরুণীগণ।' (৩৭:৪৮)

এবং তারাই হবে প্রেমময়ী সঙ্গিনী এবং আদর্শ স্ত্রী।

কুরআনে এটা উল্লেখ করা হয়নি যে, জান্নাতে কত হুর বিদ্যমান আছে অথবা তাদেরকে কীভাবে বণ্টন করে দেওয়া হবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কীভাবে এই পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি ইরাক এবং ফিলিস্তিনে নারী আত্মঘাতীদের ক্রমশ প্ররোচিত করছে?

'প্যালেস্টাইনিয়ান ইসলামিক জিহাদ'-এর প্রধান রামাদান আব্দুল্লাহ্ সাল্লাহ উল্লেখ করেন, হাদিসে ৭২ জন হুর প্রদানের কথা উল্লেখ আছে, কিন্তু কথা হলো এটা সেই ব্যক্তির জন্যই পুরস্কারস্বরূপ হবে, যে তার জীবনকে সত্যের এবং ন্যায়ের প্রতিরক্ষায় উৎসর্গ করেছে। তবে এটি বোধগম্যতার অভাব অথবা ভন্ডামি যে, এটিই কেবল আত্মঘাতীদের প্ররোচিত করে বা আকর্ষণ করে।

একটি সাইকোলোজিকাল ফ্যাক্ট যেটা অনেকেরই উপলব্ধি করতে কষ্ট হয়, সেটা হলো, যেখানে হত্যাযজ্ঞ কোনো মামুলি ঘটনা, সেখানে জীবন এবং মৃত্যুর একটি ভিন্ন আপেক্ষিক সংজ্ঞা বিদ্যমান। ফিলিস্তিন এবং ইরাকে ইউরোপের বিপরীতে হত্যাযজ্ঞ কোনো বিরল ঘটনা নয় বরং সেটা সর্বত্র বিরাজমান এবং অত্যন্ত দৃশ্যমান। গাজা উপত্যকায় এমন কোনো ফিলিস্তিনি (একইভাবে জেরুজালেমে এমন কোনো ইসরাইলি) খুঁজে পাওয়া দুঃসাধ্য যে, সে তার ঘনিষ্ঠ কারও নিহত হওয়ার সাক্ষী হয়নি। এরূপ চরম পরিস্থিতিতে, এটা কোনো অদ্ভুত ঘটনা নয়, যদি কিছু যুবক মনে করে যে, কোনো ব্যক্তির জীবন যত্ন করে আগলে রাখার মতো কিছু নয় বরং তাদের চারপাশে বিদ্যমান বিশৃঙ্খল সুবিশাল যুদ্ধে একটি নিষ্পত্তিযোগ্য এবং মূল্যহীন কোনো একটা কিছু।

আত্মঘাতী হামলাকারীরা কখনোই কেবল এক ধরনের সামাজিক প্রেক্ষাপট থেকে উঠে আসে না। তারা যেমন সৌদি আরবের সুশিক্ষিত অভিজাত শ্রেণি থেকে উঠে আসে তেমনই পাকিস্তানের অশিক্ষিত দারিদ্র্যপীড়িত বস্তিবাসী থেকেও উঠে আসে। নসরা হাসসান নামক গাজা উপত্যকার একজন জাতিসংঘের ত্রাণকর্মী ব্যাকুলভাবে আত্মঘাতী হওয়ার কামনাকারী ২৫০ জন ফিলিস্তিনির সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন এবং তিনি দেখতে পান যে—তাদের কেউই অশিক্ষিত, নিদারুণ দারিদ্র্যপীড়িত, স্থূলবুদ্ধি অথবা হতাশাগ্রস্ত ছিল না।[১] মনস্তাত্ত্বিক জরিপ এটাই বলে যে, মানুষের মাঝে যেমন বিভিন্ন প্রকারের বৈচিত্র্য থাকে তেমনই আত্মঘাতীদের মাঝেও অনুরূপ বৈচিত্র্য দেখা যায়। রবার্ট এ. পেপে সুইসাইড টেরোরিজম নিয়ে তার '*ডাইং টু উইন*' গ্রন্থে আত্মঘাতীদের নিয়ে তার ব্যাপক গবেষণা তুলে ধরেন। অতঃপর তিনি রায় দেন যে, মনস্তাত্ত্বিকভাবে তারা সম্ভবত পুরোপুরি স্বাভাবিক, যদিও সামান্য কেউ কেউ মানসিক আঘাতের ভুক্তভোগী হয়েছিল (বিশেষ করে ফিলিস্তিনিরা)।

তিনি দেখতে পান, আত্মঘাতীদের গড় বয়স বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভিন্ন রকমের। গবেষণা এটাই প্রতিপন্ন করে যে, আত্মঘাতীদের কোনো সাধারণ বৈশিষ্ট্য এটা নয় যে, তারা সকালেই কিশোর বা তরুণ (যাদেরকে সহজেই স্ব-কার্যে ব্যবহার করা সম্ভবপর)। হিজবুল্লাহর শহিদরা সবচেয়ে তরুণ যাদের গড় বয়স ২১.১ বছর, ফিলিস্তিনিদের ২২.৫ বছর; আল-কায়েদার কুশলীরা দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বয়সের, যেটি হলো ২৬.৭ বছর এবং চেচেন শহিদদের গড় বয়স ২৯.৮ বছর। সচরাচর নারী আত্মঘাতীদের গড় বয়স তাদের পুরুষ আত্মঘাতী সহযোগীদের অপেক্ষা বেশি থাকার প্রবণতা দেখা যায়; সাধারণত তাদের বয়স থাকে ২০ থেকে ৩০ এর মাঝামাঝি বা আরও বেশি।

রবার্ট এ. পেপে দেখতে পান, আত্মঘাতী হামলাকারীরা বেশিরভাগই সুশিক্ষিত হয় এবং তাদের দেশের গড়পড়তা দরিদ্র মানুষ অপেক্ষা সচ্ছল থাকে। তাদের অর্ধেকের বেশির মাধ্যমিক পরবর্তী শিক্ষা বিদ্যমান ছিল এবং আশি শতাংশের কাছাকাছি ছিল কর্মী ও মধ্যবিত্ত। বিশ শতাংশের কম ছিল নিম্নবিত্ত অথবা বেকার। তুলনামূলকভাবে সাধারণ ফিলিস্তিনি জনগণের অর্ধেকেরও কম কর্মী মধ্যবিত্ত, এবং ত্রিশ শতাংশই নিম্নআয়ের।

এইসব আদমবোমা কেবল কোনো স্বতন্ত্র ধরনের বেসামরিকদের থেকেই উঠে আসে না। সম্প্রতি সৌদি আরব এবং পাকিস্তানের কতিপয় ঘটনায় দেখা গেছে,

---

[১] Nasra Hassan, www.electronicintifada.net/v2/article2637 shtml, 7 May 2004.

নিরাপত্তা বাহিনী থেকেও আদমবোমার অভ্যুদয় ঘটেছে। যেখানে পাকিস্তানের তিন জন পুলিশ সদস্য করাচি (৭ মে, ২০০৪) এবং কোয়েটায় (৪ জুলাই, ২০০৪) শিয়া মসজিদে নিজেদেরকে বিস্ফোরিত করে। ২০০৪ সালে একজন ফিলিস্তিনি পুলিশ সদস্যও আত্মঘাতী হামলা পরিচালনা করেছিলেন।

সুইসাইড মিশনে নির্বাচন করার ক্ষেত্রে বেশিরভাগ সংগঠনেরই নির্দিষ্ট নিয়ম-নীতি দেখা যায়। আফগানিস্তানের ক্ষেত্রে, আল-কায়েদা প্রশিক্ষণ শিবিরে কমান্ডারের সুপারিশ মোতাবেক সবচেয়ে উপযুক্ত প্রার্থীকে নির্বাচন করা হয়ে থাকে। হামাস নেতৃবর্গ এবং 'প্যালেস্টাইনি ইসলামিক জিহাদ'-এর প্রধান সাল্লাহ এর সাথে বিভিন্ন কথোপকথনে যেসব বৈশিষ্ট্যাবলি তারা নির্বাচন করেন সেগুলো উঠে আসে। তা হলো—

১. ধর্মীয় উদ্দীপনা

২. সাহসিকতা

৩. মানসিক স্থিতি

৪. নির্মল চরিত্র

৫. সর্বনিম্ন বয়স ১৮ বছর

৬. অবিবাহিত (অবিবাহিতদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়ার পাশাপাশি ফিলিস্তিনে ভাইবোনবিহীন এবং পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারীদেরকেও এই সুযোগ দেওয়া হয় না)।

সেখানে সকল সংগঠন জানাচ্ছে যে, শত শত যুবক এবং ক্রমবর্ধমানভাবে যুবতীরাও শহিদি হামলার জন্য স্বেচ্ছাসেবী হচ্ছে। আর ফিলিস্তিনে সক্রিয় রিক্রুটমেন্টের কোনো প্রয়োজনই পড়ে না। সেখানকার কমান্ডারদের মতে, প্রতিটি ইসরাইলি অনুপ্রবেশিক আক্রমণ বা গুপ্তহত্যার পর পরই শত শত যুবক নিজেদেরকে শহিদ হওয়ার জন্য পেশ করে।

বাসিম আবদুল খালেক নামক গাজার একজন সেকেন্ডারি স্কুল শিক্ষকের লেখায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলো ফুটে ওঠে—

> 'কিশোররা তাদের বেডরুমের দেয়ালে অ্যানিমেশন কার্টুনের বদলে লেটেস্ট শহিদদের পোস্টার টানিয়ে রাখে এবং আরও ছোট বাচ্চারা কলম দিয়ে সেই যুবক বা যুবতীর নাম তাদের হাতে লিখে রাখে। যখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয় বড় হয়ে সে কি হতে চায়, যেসব শিশুরা অতীতে ডাক্তার কিংবা শিক্ষক হওয়ার আশা করত, তারা এখন উত্তর দেয় আমি একজন শহিদ হতে চাই। খেলার মাঠে গেম বয়েজ অথবা

লেটেস্ট কোনো আকর্ষিত বস্তু নিয়ে মাতামাতি করার বিপরীতে, প্রাইমারি স্কুলের বাচ্চারা সেসব শহিদদের সম্মানে শহিদি হামলার পুনঃঅভিনয় করে এবং কে প্রধান ভূমিকা পালন করবে এই নিয়ে তারা তুমুল হইচই বাধিয়ে দেয়।'[১]

যারা ইরাক অথবা আল-কায়েদার বিভিন্ন ঘাঁটিতে দল বেঁধে পাড়ি জমিয়েছে, তাদের বেশিরভাগই উচ্চশিক্ষিত; কিন্তু তারা তাদের পরিবার এবং ক্যারিয়ারকে পরিত্যক্ত করে দিয়েছে। অধিকন্তু আফগানিস্তানের প্রশিক্ষণ শিবিরে আল-কায়েদা গ্রাজুয়েটরা বিশেষ করে যারা পাকিস্তানি এবং আলজেরীয়, মনে করা হয় তারা তাদের নিজ দেশ থেকে সক্রিয়ভাবে যুবক মুজাহিদদের রিক্রুটের সাথে জড়িত।[২] ইউরোপেও ক্রমবর্ধমানভাবে জিহাদিদের রিক্রুটমেন্ট প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। ২০০৩ সালে ইতালিতে তিউনিসিয়ান ইমাম মুরাদ তারাবলিসি সেখানকার উত্তর আফ্রিকান এবং কুর্দি অধিবাসীদেরকে উত্তর ইরাকের আনসার আল-ইসলামে প্রেরণের জন্য নাম লিপিবদ্ধ করে সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করেছিলেন। আলজেরিয়ান আব্দুর রাজ্জাক; যিনি বর্তমানে বিচারাধীন রয়েছেন, তিনিও ইতালিতে থাকতেন এবং ইউরোপ থেকে প্রায় ২০০ জন জিহাদিকে আল-জারকাভির কাছে প্রেরণে সহায়তা করেছিলেন। আল-জারকাভি এবং আবু মুসআব আল-সুরি (যাকে একজন আল-কায়েদা রিক্রুটার মনে করা হয়) এই উভয় ব্যক্তিই অতি সূক্ষ্মভাবে ইউরোপের সাথে যোগাযোগ বজায় রাখার জন্য অভিযুক্ত, যারা মাদ্রিদ এবং লন্ডনের হামলার সাথে জড়িত ছিল, তাদের সাথেও তাদের যোগাযোগ ছিল বলে মনে করা হয়। এসব আন্তর্জাতিক রিক্রুটরা এই অর্থই প্রকাশ করে যে, তাদের ওপর বিন লাদেনের প্রভাব কতটা ব্যাপক; মূলত তার উদ্ধৃতিই তাদের জিহাদে উদ্যোগী হওয়ার জন্য চূড়ান্ত অনুপ্রেরণার উৎসাহ। লেবানিজ জার্নালিস্ট হালা জাবের আল-জারকাভির সাথে যোগদানের জন্য ইরাকে আগত সাম্প্রতিক এক যুবকের উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন, যে নিজের মধ্যে পরিবর্তনের একটি অনুভূতি প্রকাশ করেছিল। বড় অদ্ভুত এবং ভীতিকরভাবে খ্রিষ্টধর্মীয় অন্ধবিশ্বাসীদের শব্দতালিকা ব্যবহার করছিল এবং তার নিজেকে বিন লাদেনের সম্পত্তি হয়ে যাবার কথা বলেছিল। প্রারম্ভিক পর্যায়ে ওসামা বিন লাদেনের একটি টেপরেকর্ড বার্তা তাকে নাড়িয়ে দেয় এবং তারপর সে ইন্টারনেট থেকে শাইখের নিজস্ব এবং শাইখ সম্পর্কিত যা কিছু সম্ভব খুঁজে বের করে। তারপর নিজেকে একজন শহিদ হওয়ার জন্য উৎসর্গকৃত করে দেয়।

---

[১] Interview conducted by the author, December 2001.
[২] AFP news agency, 7 April 2002.

কেন তারা আত্মঘাতী?

'হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কি হলো, যখন আল্লাহর পথে বের হবার জন্যে তোমাদের বলা হয়, তখন মাটি জড়িয়ে ধরো, তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের উপকরণ অতি অল্প। যদি বের না হও, তবে আল্লাহ তোমাদের মর্মন্তুদ শাস্তি দেবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তোমরা তাঁর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।' (৯:৩৮-৯)

কুরআনের সুরা তাওবার উক্ত আয়াতগুলো বিন লাদেন এবং আল-জারকাভির জিহাদের আহ্বানে প্রেরণাদানের প্রতীকস্বরূপ। সম্মানের প্রতি এই জোরদান, ধর্মীয় দায়িত্ব, মৃত্যুর প্রত্যাশা, পরকালে জান্নাত লাভ, এসবের কারণে সৃষ্টি হওয়া ক্ষমতাকে কখনোই অগ্রাহ্য করা উচিত নয়।

ড. আইয়াদ সেররাজ নামক গাজার একজন সাইকোলোজিস্ট উল্লেখ করেন—

> 'আত্মঘাতী হামলাকারী এটা মনে করে না যে, তারা মৃত্যুবরণ করতে যাচ্ছে, বরং তারা মনে করে, তারা একটি নতুন জীবনে প্রবেশ করতে যাচ্ছে যেটা অধিকতর উত্তম জীবন। তবে এটা এই অর্থ প্রকাশ করে না যে, আত্মঘাতী হামলাকারী ব্যক্তিগত হতাশায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকে।'

সেররাজ আরও উল্লেখ করেন যে,

> 'এসব হামলাকারীরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের পরিবারের সবচেয়ে ডিটারমাইন্ড সদস্য হয়ে থাকে, বরং তারা তাদের এই কর্মকাণ্ডকে একটি ইতিবাচক কাজ বলে মনে করে। যার উদ্দেশ্য থাকে ভিন্নভাবে হতাশাকর কোনো পরিস্থিতির পরিবর্তনকে বাধ্য করা। সাথে সাথে এটি এমন একটি কাজ যেটা তাকে ব্যক্তিগতভাবে জান্নাতের পুরস্কারে পুরস্কৃত করবে।'

কিন্তু ধর্মীয় প্রেরণাই এই গল্পের শেষ নয়। রাজনৈতিক উদ্দীপনাও এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ঐতিহাসিক প্রসঙ্গও এখানে বৃহত্তর থেকে ক্ষুদ্রতর ভূমিকা রাখে। বিন লাদেন তার '*ডিক্লারেশন অফ জিহাদ*' এ লিখেছিলেন—

> 'যখন তোমরা সশস্ত্র অবস্থায় আমাদের ভূখণ্ডে ঘোরাফেরা কর, তখন তোমাদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলা আমাদের আইনগত এবং নৈতিক দায়িত্ব।'

ফিলিস্তিন এবং ইরাক এই উভয় ক্ষেত্রেই সুইসাইড বোম্বাররা একটি দখলদার বাহিনীকে প্রতিহত করছে; যেমনটা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। বিন লাদেন এই চমৎকার ব্যাপারটি খুঁজে বের করেন যে, আরব উপদ্বীপে মার্কিন সৈন্যদের উপস্থিতি সকলের নিকটই চূড়ান্ত আপত্তিকর। অধিকন্তু মাদ্রিদ এবং লন্ডনে বোমা হামলার উদ্দেশ্য ছিল ইরাক থেকে জোট-সেনাদের তাড়িয়ে দেওয়া এবং এ ক্ষেত্রে মাদ্রিদ হামলাটি সফলও হয়েছিল।

মনে করা হয়, বর্তমান সময়ে আত্মঘাতী হামলাসমূহের উদয়ের পেছনে দুটি পরিস্থিতি দায়ী : প্রথমত কোনো দখলদার সৈন্যদের উপস্থিতি এবং দ্বিতীয়ত মৌলবাদী ইসলাম। তবে প্রথমটিই মূল উপাদান, কারণ সর্বোপরি তামিল টাইগারসরা যেমন মুসলিম না তেমনই ভিয়েত কংও মুসলিম নয়। সম্ভবত দখলদারিই এই আদমবোমা ধারণার উৎপত্তি ঘটায়। বেশির ভাগ মুসলিম ভূখণ্ডগুলোর আমেরিকার প্রতি ঘৃণার কারণ কেবল ধর্মীয় অনুপ্রেরণা নয় বরং সেসব ভূখণ্ডগুলোতে মার্কিন এজেন্ডার সুস্পষ্ট উপস্থিতি।

নিম্নোক্ত তিনজন আদমবোমার অছিয়তনামায় ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক প্রভাবের মধ্যবর্তী ভারসাম্য খুবই কৌতূহলউদ্দীপক। প্রথমটি তরুণ ফিলিস্তিনি আদমবোমা হুজাইরা আল-আরাবির সর্বশেষ অছিয়তনামা—

> 'আমি কখনোই মরতে চাইনি। আমি মৃত্যু প্রেমিকও নই। আমি জনৈক ইংরেজি কবির উক্তির মতো 'সুখকর মৃত্যু প্রেমের অর্ধেক' এর সাথেও একমত নই। আমিও বাঁচতে চেয়েছিলাম। আমি এমন একটি ঘরের স্বপ্ন দেখতাম যেটা বাচ্চাদের দিয়ে পরিপূর্ণ থাকবে এবং আমি এখনও একজন ডাক্তারই হতে চাই। প্রায় ছয় বছর বয়স থেকেই আমার স্বপ্ন ছিল আমি একজন ডাক্তার হব, যেন আমি অন্যদের জীবনকে বাঁচাতে পারি। আমি প্রকৃতই এমন কিছু করতে চেয়েছিলাম যেটা আমার মানুষদের জীবন রক্ষা করবে। আমি এখন দেখতে পেয়েছি, মানুষের জীবন বাঁচানোর অনেক উপায় রয়েছে এবং কখনো কখনো অন্য কারও জীবন হরণ করাও জীবনসমূহ রক্ষার্থে একটি অবদান হতে পারে। এখন আমার ধ্যান এরূপই এবং আমি আমার লোকদের জীবন রক্ষার্থে অন্যদের জীবন হরণের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছি।'

নিম্নোক্ত অছিয়তনামাটি নাইন ইলেভেনের একজন আদমবোমার; এটি সৌদি নাগরিক আহমাদ আল হাযানাভি এর সর্বশেষ অছিয়তনামা থেকে নেওয়া যেটা সে উক্ত হামলার পাঁচ মাস পূর্বে তৈরি করে রেখেছিল—

'অবমাননা এবং দাসত্বের সমাপ্তি টানার সময় চলে এসেছে। আমেরিকান মিলিটারি ও গোয়েন্দা সার্ভিসের চোখের সামনেই সেসব আমেরিকান এবং তাদের সন্তানদেরকে তাদের নিজ ভূমিতেই হত্যা করার সময় এসেছে।... হে আল্লাহ, আমি নিজেকে আপনার কাছে সোপর্দ করলাম। সুতরাং আমাকে একজন শহিদ হিসেবে কবুল করে নিন; আমাকে জান্নাতের বাগানের জন্য কবুল করে নিন।... আমরা আশা রাখি সেখানে আমরা নবী, শহিদ, ধার্মিক ব্যক্তিবর্গ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষদের সাথে যোগদান করতে পারব এবং তারাই হলো সর্বোত্তম সঙ্গী।'

এই চিঠির ধর্মীয় উপাদান এবং অলংকারিক ভাষা সবগুলোই বিন লাদেন এবং আল-কায়েদার হলমার্ক। এই স্টাইল এবং বিষয়বস্তু আরও অধিক পরিমাণ এবং পরিশীলিত হয় যখন বারওয়া আল কুরদি নামক একজন সুইসাইড বোম্বার তার ২০০৪ সালের হামলার পূর্বে ভিডিও বার্তায় বিবৃতি প্রদান করেছিল। সে মার্কিন সৈন্যদের একটি কনভয়ের ওপর হামলা করেছিল যাতে ত্রিশের অধিক সেনা নিহত হয় এবং বেশ কিছু ট্যাংক ও যুদ্ধযান ধ্বংস হয়। সে তার সর্বশেষ বার্তায় লিখেছে—

'আমি এই শহিদি হামলাটি পরিচালনা করছি এবং সকল মুসলিমদের এটা জানা প্রয়োজন যে, ক্রুসেডারদের মোকাবিলায় এগিয়ে না আসার জন্য তাদের কোনো অজুহাত থাকতে পারে না। কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি, এসব ক্রুসেডাররা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে মুসলিমদের অপমানিত এবং অপদস্থ করে যাচ্ছে এবং তাদের হাত হাজার হাজার মুসলিমদের রক্তে রঞ্জিত হচ্ছে। বর্তমানে আল্লাহর শরিয়াহ আইনের পুনঃপ্রবর্তনের জন্য জিহাদ প্রতিটি মুসলিমের জন্য বাধ্যতামূলক হয়ে পড়েছে। মুসলিমদেরকে জানানো হোক যে, তারা যেমনটা ভাবে তার থেকে কুফফাররা অধিক থেকে অধিকতর দুর্বল এবং আমি আশা রাখি আল্লাহ আমার এই ত্যাগকে কবুল করে নেবেন।'

বেশিরভাগ আল-কায়েদা সদস্যই তাদের একটি দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য সহকারে নিজেদেরকে উম্মাহর সদস্য বলে হৃদয়াঙ্গম করে এবং তাদের সেই চূড়ান্ত লক্ষ্যটি হলো খিলাফাতের পুনঃপ্রবর্তন। ইরাক থেকে মার্কিনিদের উৎখাত করা এই ভাবাদর্শিক সফরের কেবল একটি ধাপ মাত্র। যেসব যোদ্ধারা ইরাকে দলে দলে পাড়ি জমিয়েছে তারা কেবল লড়াইয়েরই খোঁজ করে; অন্যদিকে ফিলিস্তিনিরা তাদের সেখানে এর ভিন্ন অন্য কোনো উপায় দেখতে পায় না।

শহিদি হামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে উক্ত শহিদের জন্য বিপুল সম্মাননার ব্যাপারটিরও নিজস্ব একটি বশীকরণ ক্ষমতা রয়েছে; কারণ এটি সাধারণ কোনো বালককে এক ধরনের সুপারহিরোর মর্যাদা এনে দেয়। অনিবার্যভাবে ইসরাইলি প্রতিশোধের নিশ্চয়তা সত্ত্বেও, যেখানে ইসরাইলি ট্যাংক ক্ষিপ্রগতিতে ঘরবাড়িকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়, সেখানে কোনো মানুষ আছে কি নেই, এসবের পরোয়া না করেই—ফিলিস্তিনে শাহাদাতকে ঘিরে একটি পুরোদস্তুর আচার-অনুষ্ঠানের সংস্কৃতির উদয় হয়েছে। সেখানে লেটেস্ট শহিদ বা সর্বশেষ শাহাদাত বরণকারীদের পোস্টার দেয়ালে দেয়ালে শোভা পায়। সেই পরিবারের বাড়ির সামনে একটি শহিদি তাঁবু স্থাপন করা হয় এবং সেখানে উক্ত শহিদের ছবি, তার অছিয়তনামা প্রভৃতি প্রদর্শন করা হয়। সেখানে বিলাপ করার পরিবর্তে তার পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং সংগঠনের সহকর্মীরা উৎসব উদযাপন করার জন্য জড়ো হয়। সেই আয়োজন এবং খাবারের মূল্য উক্ত শহিদ যে সংগঠনের অংশ ছিল সাধারণত তাদের থেকেই পরিশোধ করা হয়।

ইরাকের সুইসাইড মিশনসমূহের ভিডিও দিয়ে ইন্টারনেট ভরতি। এগুলো উক্ত কর্মকে মহিমান্বিতভাবে তুলে ধরার জন্যই নকশাকৃত। এসবকিছু শহিদদের প্রতি এক ধরনের সম্মান প্রদর্শনের কাজ করে এবং দেখায় যে, এই লড়াইয়ে জয়লাভ অতি নিকটেই এবং সাথে সাথে অন্যান্যদেরকেও প্রভাবিত করে অনুরূপ কর্ম করার জন্য। আল-জারকাভি এসবকে এতই গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করেন যে, হামলাকে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে ধারণ করার জন্য ইরাকে আত্মঘাতীর সাথে কমপক্ষে তিনটি ক্যামেরা পাঠানো হয়। এসব ভিডিওগুলো সর্বদা হাই-রেজুলেটেড, উত্তমভাবে ধারণকৃত এবং এডিটকৃত থাকে। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো, এগুলোকে ধারণ করার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

ইরাকে ক্যামেরায় ধারণকৃত হামলাসমূহের বেশিরভাগই গাড়িবোমা অথবা ট্রাকবোমা হামলা। সচরাচর দেখা যায়, যখন আত্মঘাতী হামলাকারী গাড়ি চালিয়ে টার্গেট লক্ষ করে ছুটে যেতে থাকে, তখন এর সাথে সংগতিপূর্ণ বাদ্যযন্ত্র ব্যতিত জিহাদি উদ্দীপক গান বা নাশিদ বাজতে থাকে (মিউজিক্যাল বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার সালাফিদের কর্তৃক অসমর্থিত) এবং ক্যামেরা ক্রুদের তাকবির ধ্বনির সাথে সাথে হামলাকারী তার লক্ষ্যে কোনোরূপ দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়াই ছুটে চলে।

১১ সেপ্টেম্বরের শহিদদের প্রতি বিন লাদেনের শ্রদ্ধার স্বীকৃতির সম্প্রচারটিতে[১] তিনি উক্ত ১৯ জন আত্মঘাতী হামলাকারীকে বর্ণনা করেন যে—তারা নিউইয়র্ক এবং ওয়াশিংটনকে বিজিত করার মাধ্যমে উম্মাহর ইতিহাসকে

[১] al-Jazeera, 12 September 2002.

বলেন, তাদের আত্মবিসর্জনই কুফফারদের পরিশুদ্ধ করেছে। বিন লাদেন দৃঢ়ভাবে বলেন, তাদের আত্মবিসর্জনই কুফফারদের উৎপীড়নকে সমাপ্ত করার একমাত্র পন্থা। ইসলামের অতীত ইতিহাসে যখন উম্মাহ সবকিছুর তুঙ্গে ছিল, তার উল্লেখ করে তিনি এর উছিলা হিসেবে একে শতবর্ষের জিহাদের ফলস্বরূপ বলে বর্ণনা করেন। বিন লাদেন এর মাধ্যমে একটি মহাকাব্যিক ঐতিহাসিক অপরিহার্যতা এবং একটি ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক অভিন্নতার সমষ্টিগত অনুভূতির সৃষ্টি করেন।

সেই একই সম্প্রচারে বিন লাদেন সংক্ষিপ্তভাবে ও কাব্যিক ভঙ্গিমায় সেসব শহিদদের ব্যক্তিগত গুণাবলিসমূহের গুণকীর্তন করেন এবং সাথে সাথে নৈতিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক দিক থেকে তাদের শ্রেষ্ঠত্বকে তুলে ধরেন। তিনি বলেন—

> 'মুহাম্মাদ আতা, প্রথম ভবনটির ধ্বংসকারী—একজন ঐকান্তিক এবং সৃজনশীল ব্যক্তি ছিলেন এবং তিনি উম্মাহর ব্যথাকে নিজের মধ্যে ধারণ করতেন। আমরা দুআ করি, আল্লাহ তাকে একজন শহিদ হিসেবে কবুল করে নেবেন।...
>
> মারওয়ান আল-সিহহি, দ্বিতীয় ভবনটির ধ্বংসকারী—জীবন তাকে চাইত কিন্তু তিনি এর থেকে ছুটে গিয়ে আল্লাহ তার জন্য যা রেখেছেন, তার দিকে ধাবিত হয়েছেন।...'

এভাবে অন্যান্যদেরকেও বর্ণনা করা হয় নিষ্কলুষ, সংকল্পবদ্ধ, স্থিরবুদ্ধি, নির্ভীক ও বিরোচিত, বিনীত এবং ধৈর্যশীল ও জিহাদ-প্রেমিক হিসেবে।

আধুনিক বিশ্বের সাথে সংগতিপূর্ণ একটি বিরল ভঙ্গি ব্যবহার করে বিন লাদেন আরেকজন শহিদ, যিনি একজন সাইন্টিস্ট ছিলেন, তার দিকে ইঙ্গিত করে বিবৃত করেন—'এখন তারা তাদের স্যালারির নিকট জিম্মিতা থেকে মুক্ত হয়ে গেছেন' ধর্মীয় দায়িত্ব এবং সর্বোচ্চ ত্যাগ শাহাদাতের জন্য এসব শহিদদের চরিত্র বিন লাদেনের নিকট নিখুঁত পরিশীলিত। এটি একটি দোধারী তলোয়ারের মতো, যা ব্যক্তিক পরিত্রাণকেও নিশ্চিত করবে এবং একইসঙ্গে শত্রুর ওপর নৈতিক লোকসান চাপিয়ে দেবে।

আল-কায়েদার অভ্যন্তরে এমনকি বিধ্বংসী সামরিক হামলার সাথেও অতীন্দ্রবাদকে যুক্ত করতে দেখা যায়। বিন লাদেন কর্তৃক স্বপ্নের সততা এবং তার অনুসারীদের মধ্যে এসব নিয়ে নিয়মিত আলোচনা সম্পর্কিত অনেক সংবাদ পাওয়া যায়। ১১ সেপ্টেম্বর হামলার অন্যতম প্রবক্তা রামযি বিন আল-শাইবা, তিনি এটাও দাবি করেছেন যে, 'এই হামলার তারিখ মুহাম্মাদ আতার একটি স্বপ্ন থেকে নির্ধারিত হয়েছে। তিনি দেখতে পেয়েছিলেন দুটি কাঠি, তার মাঝে একটি লাইন

এবং অতঃপর মাথায় কেক যুক্ত এবং হেলানো একটি কাঠি। নিরূপণ করা হয়েছিল এটি ১১ এবং ৯ এর প্রতিনিধিত্ব করে এবং এই সংবাদটি ভাই আবু আব্দুল্লাহ (বিন লাদেন) এর নিকট প্রেরণ করা হয়। তিনি এটাকে একটি অত্যন্ত ভালো সংবাদ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।[১]

ফিলিস্তিনে এই অভিগমন আরও বেশি বৈষয়িক এবং এর লক্ষ্য আরও সুনির্দিষ্ট ও স্থানীয়। এই অভিজ্ঞতা অধিকতর প্রত্যক্ষরূপে ব্যক্তিক। সচরাচর দখলকৃত ভূখণ্ডগুলোতে ইসরিইলিদের অধীনে চরম দুর্দশাগ্রস্ত জীবন থেকে উদ্ভূত আক্রোশ এবং অবিচার দিয়ে ফিলিস্তিনি আত্মঘাতীরা উৎসাহিত হয়। সেখানে তারা চেকপয়েন্ট দ্বারা অবরুদ্ধ এবং সেখানে এমনকি উচ্চতর যোগ্যতাসম্পন্ন গ্রাজুয়েটদের চাকরির সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয়। অনেক শহিদই তাদের ভূখণ্ড এবং মানুষদেরকে ইসরাইলি উৎপীড়কদের হাত থেকে মুক্ত করার কথা বলে। তারপরেই আসে প্রতিশোধ।

উনিশ বছর বয়সী রায়েদ জাকারনেহ-এর বাবা বর্ণনা করেছিলেন, কীভাবে তার ছেলেকে ইসরাইলি ডিফেন্স ফোর্স (IDF) কারাগারে অত্যাচার করেছিল এবং ধর্ষণের হুমকি দিয়েছিল। তারপর যখন সে বের হয়ে আসে তখন সে আগাগোড়া পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং এর কিছুদিন পরেই সে একটি বিস্ফোরকভরতি গাড়ি নিয়ে ইসরাইলি বাসস্টপে ঢুকে পড়ে। সন্তান, পত্নী বা বন্ধুর হত্যাকাণ্ডের শিকার হওয়া—সেসব শহিদদের অভ্যন্তরে কোনো মোলোটভ ককটেল তৈরি হওয়ার জন্য একটি সাধারণ উপকরণ। প্রতিটি ইসরাইলি আগ্রাসন এবং গুপ্তহত্যাই অপরিবর্তনীয়ভাবে প্রতিশোধমূলক আত্মঘাতী হামলায় রূপান্তরিত হয়। পশ্চিমা মিডিয়া এগুলোর জন্য আত্মঘাতীর পরিবারকে প্রদানকৃত আর্থিক ক্ষতিপূরণের ওপর ব্যাপক দায় চাপানোর চেষ্টা করে। একসময় সাদ্দাম হুসাইন এরূপ প্রতিটি হামলার জন্য আত্মঘাতীর পরিবারকে ২০,০০০ ডলার প্রদান করতেন। কিন্তু এরূপ কোনো অর্থনৈতিক ক্ষতিপূরণের সম্ভাবনা বর্তমানে একেবারে নেই বললেই চলে। যেন এরূপ পেমেন্ট করা সম্ভব না হয় সেজন্য ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের পর থেকেই মার্কিনীরা আরব ব্যাংকগুলোতে প্রেরিত এবং প্রাপিত সব ধরনের লেনদেন এবং স্থানান্তরের ওপর নজরদারি করছে। তাদের এই কার্যকলাপ আবার অন্যান্য অনিচ্ছাকৃত খারাপ পরিণতির কারণ হচ্ছে। কারণ এর দ্বারা বেশির ভাগ মুসলিম দেশগুলোতে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকছে না; যেখানে দানশীলতা তাদের সংস্কৃতিতে প্রোথিত। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো ব্যক্তি কোনো দরিদ্র ছাত্রকে দাতব্য কোনো সহযোগিতা করে, যে পরবর্তীকালে আত্মঘাতী হামলা

[১] Interview with al-Jazeera, 15 September 2002.

করে বসে, তবে উক্ত দাতার সন্ত্রাসবাদের সমর্থন এবং অর্থায়নের অভিযোগে আটক হওয়ার ঝুঁকি থাকে। যদিও প্রকৃতপক্ষে সে ব্যক্তি উক্ত ছাত্রের অভিসন্ধি সম্পর্কে কিছুই জানত না। (এর অবিকল ঘটনা ঘটেছিল ওয়াশিংটনের রাষ্ট্রদূত প্রিন্স বানদারের স্ত্রী সৌদি আরবের প্রিন্সেস হাইফার ক্ষেত্রে। তিনি অপরিচিত একজন ছাত্রের আবেদনের প্রেক্ষিতে একটি তহবিলের জোগান দিয়েছিলেন, যে পরবর্তী কালে আল-কায়েদার সদস্যে পরিণত হয়।)

যেকোনো ক্ষেত্রেই যদি কোনো আত্মঘাতী হতে ইচ্ছুক ব্যক্তি আর্থিক লাভের দ্বারা উৎসাহিত হওয়া সম্ভব হতোও, তবে নিরাপত্তা বাহিনীকে সহযোগিতার মাধ্যমে সে একই আর্থিক সুবিধা অর্জন করতে পারত এবং এজন্য তাকে আত্মহননও করতে হতো না।

কিন্তু সত্য এর চাইতে অনেক জটিল। যেসব যুবক-যুবতীরা আদমবোমা হয়ে ওঠে, তারা স্পষ্টতই অনুভব করে যে, এসব শহিদি হামলা পরিচালনার মাধ্যমেই তারা শত্রুকে রুখে দিতে পারবে এবং হারানো সম্মানকে ফিরিয়ে আনতে পারবে। যেমনটা এক ফিলিস্তিনি আত্মঘাতীর বাবা বলেন—'আমার ছেলে উগ্রবাদী কেউ ছিল না। সে আক্রোশের দ্বারা, অবমাননার দ্বারা উগ্রবাদী হয়েছে। আমরা এখানে বর্তমানে একটি জেলে বসবাস করছি।'[১]

ইশতিশহাদিয়্যা : নারী আত্মঘাতীদের ভেতর-বাহির

কেবল কৌশলগত দিক থেকেই নয় (কারণ সে আরও সহজভাবে অলক্ষিতভাবে লক্ষ্যবস্তুতে পৌঁছুতে সক্ষম) বরং প্রোপাগান্ডার দিক থেকেও নারী আত্মঘাতী একটি আরও অতিশয় ক্ষমতাবান অস্ত্র। সচরাচর এটাকেই স্বাভাবিক মনে করা হয় যে, নারীরা সাধারণত যুদ্ধে গমন করবে না। এর দ্বারা যুক্তি সমাধান দেয় যে, নিশ্চিতভাবেই এটি কোনো ন্যায্য কারণ হবে, নইলে কোনো নারী এভাবে নিজেকে বলিদান করত না।

বাস্তবিকপক্ষে নারীদের কর্তৃক আত্মঘাতী হামলা বিরল নয়। তামিল টাইগারসদের কর্তৃক দায় স্বীকারকৃত আত্মঘাতী হামলাসমূহের ৩০ থেকে ৪০ ভাগ নারী কর্তৃক পরিচালিত হয়েছে। চেচেন বিদ্রোহীদের কর্তৃকও নারী আত্মঘাতীদের ব্যবহারের উচ্চহার দেখা যায়; যারা 'ব্ল্যাক উইডো' নামক ভয়ংকর এই অভিধায় অধিক পরিচিত। সাম্প্রতিক এক রিপোর্টে একজন উজবেক বিধবা কর্তৃক উপজাতীয় এলাকায় একটি বিশেষায়িত নারী শিবিরে পাকিস্তানি মহিলাদের

[১] Robert A. Pape, Dying to Win, p. 233.

প্রশিক্ষণের ঘটনা উঠে এসেছিল।[১] সাম্প্রতিক সময়েও ফিলিস্তিনি সংগঠনসমূহ থেকে স্বল্প সংখ্যক নারী শহিদ উঠে এসেছে (এখন পর্যন্ত প্রতিটি ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ সংগঠনই ইসরাইলি লক্ষ্যবস্তুতে নারী আত্মঘাতী কর্তৃক হামলা করেছে)।

ধর্মতাত্ত্বিক ভিত্তিতে আল-কায়েদা নেতৃবর্গ কর্তৃক এখনও নারী আত্মঘাতীদের ব্যবহার অসমর্থিত। ২০০৫ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর এই নীতিতে একটি দৃশ্যমান পরিবর্তন লক্ষ করা গেছে। তখন একজন মহিলা পুরুষদের আলখেল্লা পরিধান করে ছদ্মবেশ নিয়ে বাগদাদের আর্মি রিক্রুটদের একটি লাইনে দাঁড়িয়ে তার শরীরের সাথে পেঁচিয়ে রাখা বিস্ফোরকের বিস্ফোরণ ঘটায়; উক্ত ঘটনায় কমপক্ষে ৬ জন নিহত হয় এবং ৩৫ জন আহত হয়। আল-জারকাভিকে জানানো হয়েছিল, এরূপ মিশনের জন্য মহিলা স্বেচ্ছাসেবীদের একটি অটল প্রবাহ বিদ্যমান এবং তার সংগঠন দ্রুতই সেই হামলার দায় স্বীকার করে নিয়েছিল। উক্ত ঘোষণায় সেই মহিলা হামলাকারীকে 'একজন শ্রদ্ধেয়া বোন' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এই ব্যাপারটি নিয়ে বিন লাদেন অথবা আল-জাওয়াহিরি কেউই কোনো মন্তব্য করেননি।

নারী আত্মঘাতী হামলাকারী মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু বিতর্কের সৃষ্টি করেছে, যারা আশা করে এবং আদেশ করে নারীরা কেবল পোষাকের ভূমিকা পালন করবে। ধর্মতাত্ত্বিকভাবেও এই ব্যাপারটি অত্যন্ত বিতর্কিত। আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে বলা হয়, একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রী আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, নারীদের জন্য কোনো জিহাদ রয়েছে কি না। তিনি উত্তরে বলেছিলেন, 'তাদের জন্য জিহাদ রয়েছে কিন্তু সেখানে কোনো লড়াই নেই।'

সালাফি-জিহাদি গোষ্ঠীসমূহ বিশেষত আল-কায়েদা এই অবস্থানকে বজায় রেখেছে যে, মহিলাদের উচিত জিহাদে তাদের পুরুষদের উৎসাহিত করা এবং সাহস জোগানো, কিন্তু নিজেরা সশরীরে লড়াইয়ে যোগ না দেওয়া।

২০০১ সালের আগস্টে সৌদি উচ্চ আদালত ঘোষণা করেছিল যে, একজন নারী জিহাদে যোগ দিতে পারবে এবং তার এরূপ করা উচিতও। ইসরাইলের ইসলামিক মুভমেন্ট এর প্রতিষ্ঠাতা শাইখ আব্দুল্লাহ নিমর দারবিশও একে সমর্থন করেছিলেন এবং ২০০২ সালে বলেছিলেন—'ইসরাইল ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে একটি মৃত্যু পরোয়ানা জারি করে রেখেছে; তাই এই সংগ্রামে নারীদের অংশ নেওয়া যৌক্তিক।'

তারপরেও প্যালেস্টাইনিয়ান ইসলামিক জিহাদ এবং হামাস যথাক্রমে ২০০৩ এবং ২০০৪ সাল অবধি এটা নিয়ে সংকোচে ছিল। PIJ এটা নিয়ে বিভক্ত হয়ে

[১] Press Trust of India, 18 May 2004.

গিয়েছিল যে, একজন নারী আত্মঘাতীর সতীত্ব রক্ষার্থে তার ভাই অথবা বাবা কর্তৃক তার অনুসঙ্গী হওয়া উচিত কি না। কারণ কিছু ইসরাইলি ভাষ্যকার তৎক্ষণাৎভাবেই প্রথম নারী আত্মঘাতী হামলাকারীর সতীত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিল। তারা দাবি করেছিল এই কর্মকাণ্ডের পেছনে অন্য কোনো ব্যাপার রয়েছে যেমন অনৈতিক গর্ভধারণ বা অন্য কোনো পাপ। প্রথম নারী আত্মঘাতী হামলাকারী ছিল মুহাইদি সানা নামক ১৬ বছরের এক কিশোরী। সে ১৯৮৫ সালে IDF কনভয়ের ওপর দিয়ে একটি ট্রাক চালিয়ে দিয়েছিল এবং এতে দুজন সেনা নিহত হয়েছিল। সে সেক্যুলার সিরিয়ান সোশিয়ালিস্ট ন্যাশনস পার্টির সদস্য ছিল এবং সে ছিল খ্রিষ্টান।

২০০২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ওয়াফা ইদরিস নামক আল-আকসা মার্টার্স ব্রিগেডের একজন প্যারামেডিকেল প্রথম ফিলিস্তিনি নারী আত্মঘাতীরূপে উঠে আসে। সে একাশি বছর বয়সী একজন ইসরাইলিকে হত্যা করতে সক্ষম হয় এবং আরও শতাধিক মানুষকে আহত করে। জেরুজালেমে ২০০৩ সালে প্রথম PIJ ইস্তিশহাদিয়্যাহ হিবা দারাঘমেহ ইসরাইলি একটি শপিং মলে তিনজনকে হত্যা করে। সম্ভবত সবচেয়ে বিখ্যাত ফিলিস্তিনি নারী আত্মঘাতী হচ্ছে জেরিনের হানাদি জারাদাত। তার বয়স ছিল উনত্রিশ বছর এবং সে একজন আইনজীবী ও PIJ সদস্য ছিল। সে ২০০৩ সালের অক্টোবরে নিজেকে হাইফা ম্যাক্সিম রেস্টুরেন্টে বিস্ফোরিত করে বিস্ফোরণ ঘটায় এবং এতে ২১ জন নিহত হয়। ১৪ জানুয়ারি ২০০৪ সালের পূর্বে হামাস কোনো নারী আত্মঘাতীকে নিয়োজিত করেনি এবং অবশেষে সেই দিন রিম আল-রেয়াশি একটি ইসরাইলি চেকপয়েন্টে ৪ জন সেনাকে হত্যা করে। সে দুটি সন্তানের জননী ছিল, যাদের বয়স ছিল যথাক্রমে তিন এবং এক বছর।[১]

স্বাভাবিকভাবেই কেবল সেসব আত্মঘাতী হামলাকারীদেরই সাক্ষাৎকার নেওয়া সম্ভব হয়েছে যারা প্রস্তুতি পর্যায়ে ছিল অথবা কোনো-না-কোনো কারণে ব্যর্থ হয়েছিল। তাদের মোটিভ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তাদের একটি বড় অংশই 'প্রতিশোধ' এর কথা উল্লেখ করেছিল। চেচেন 'ব্ল্যাক উইডো'তে অনেক প্রকৃত বিধবা যেমন অন্তর্ভুক্ত আছে, তেমনই তারাও আছে যারা তাদের প্রিয় কাউকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে স্বাধীনতা অর্জনের যুদ্ধে হারিয়েছিল।

অস্ট্রেলিয়ান টেলিভিশন ২০০৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ইসরাইলের হাশারোন প্রিজন সেলে উবাইদা খলিল নামক একজন ফিলিস্তিনি নারী আত্মঘাতী ইচ্ছুকের সাক্ষাৎকার নিয়েছিল। সে সেখানে আরও পঁচাত্তর জন নারী বন্দীদের সাথে ছিল,

---

[১] Strategic Studies Institute, US Army, June 2004.

যাদেরকে কোনো আত্মঘাতী মিশনের সময় আটক করা হয়েছিল অথবা তাদের বিরুদ্ধে অন্য কাউকে টার্গেটে পৌঁছুতে সাহায্য করার অভিযোগ ছিল। সে তার ব্যর্থ হওয়া আত্মঘাতী মিশনের হেতু সম্পর্কে বর্ণনা করে—

> ‘প্রথম ইন্তিফাদার সময় আমি ছোট ছিলাম; কিন্তু আমি দেখেছিলাম কীভাবে ইসরাইলিরা আমাদের ছোট ছোট শিশুদের হত্যা করেছে এবং আমাদের ঘরবাড়িগুলোকে ধ্বংস করেছে। চলমান ইন্তিফাদার সময়ে আমার বাগদান হয়েছিল। কিন্তু আমাদের বিবাহের চার দিন পূর্বে ইসরাইলিরা আমার হবু স্বামীকে মেরে ফেলে। আমার আপন ভাই এবং অন্যান্য মেয়ে কাজিনরাও এর পূর্বে ইশতিহাদিয়্যা হয়েছিল।’

হানাদি জারাদাত নামক একজন নারী আত্মঘাতির নিজেকে উড়িয়ে দেওয়ার চার মাস পূর্বে আল-আরব আল-ইয়াউম পত্রিকা তার সাক্ষাৎকার নিয়েছিল। সে বর্ণনা করেছিল কীভাবে একটি ইসরাইলি আন্ডার কভার ইউনিট তার ছোটভাই ফেদিকে সমগ্র পরিবারের চোখের সামনেই হত্যা করেছিল; মাত্র তিন দিন পরেই যার বিয়ে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। তারা তার কাজিন সালেহকে হত্যা করার জন্য এসেছিল এবং সেই ওই সময়ে উপস্থিত ছিল। জারাদাত ফেদিকে বাঁচানোর চেষ্টা করলে ইসরাইলিরা তাকে বেদম মারপিট করেছিল এবং তারপর তারা ফেদি এবং সালেহ উভয়কেই বুলেট দিয়ে ঝাঁঝরা করে দেয়। জারাদাত বলেছিল—‘আমি আমার ভাইয়ের রক্ত দেখার দিন থেকেই ফিলিস্তিনকে মুক্ত করার জন্য কোনো ভূমিকা রাখতে সংকল্পবদ্ধ হয়েছি। আমার ব্যক্তিগত পরিকল্পনা থেকে সেই লক্ষ্যটি আরও বৃহত্তর।’

২০০৩ সালের ডিসেম্বর মাসের হালা জাবের নয়জন শিক্ষানবিশ নারী আদমবোমার সাক্ষাৎকার নিয়েছিল। তারা তাদের আসল নাম পরিবর্তন করে অন্যান্যদের মতো মৃত্যুর প্রস্তুতি হিসেবে সাউরা (বিদ্রোহ), জিহাদ, তাহিরির (মুক্তি), নুর (আলো) প্রভৃতি নাম রেখেছিল। তাদের কেউ কেউ সন্তানের মাও ছিল। একজনের পাঁচ সন্তান ছিল এবং বাকিরা ছিল কিশোরী। ডেটোনেটরের সুইচ টিপে দেওয়ার চিন্তা নিয়ে তাদের কোনো ভয় ছিল না; বরং তারা ভীত ছিল—না-জানি তাদের পরিবার জেনে ফেলে তারা কীসের প্রশিক্ষণ নিচ্ছে এবং না-জানি উক্ত মিশন পরিচালনায় তাদেরকে তাদের পরিবার বাধা দেয়।[১]

---

[১] Hala Jaber, 'The Avengers', The Sunday Times, 7 December 2003.

সমগ্র মুসলিমবিশ্বে নারী আত্মঘাতীরা ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। তাদেরকে 'জোয়ান অব আর্ক'[১]-এর মুসলিম ভার্শন হিসেবে প্রশংসিত করা হয় এবং কবিতায় তাদের গুণকীর্তন করা হয়। তৎকালীন লন্ডনের সৌদি রাষ্ট্রদূত গাজি আল-কুসাইবি ২০০১ সালের আগস্ট মাসে আল-হায়াত পত্রিকায় ফিলিস্তিনি নারী আত্মঘাতী আয়াত আল-আহরাছ এর গুণকীর্তণ করে একটি কবিতা প্রকাশ করলে বৃটেনের অনেকেই ক্ষুব্ধ হয়েছিল। এরপরেই তাকে তার উক্ত দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। যদিও পরবর্তীকালে রিয়াদে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি বেয়ে বেয়ে সাফল্যের চূড়ায় উঠতে থাকেন এবং তাকে একটি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রিত্ব দেওয়া হয়—যে মন্ত্রণালয়টি বিশেষভাবে তার জন্যই প্রবর্তন করা হয়েছিল এবং সেটি ছিল 'মিনিস্ট্রি অফ ওয়াটার'।

নিচে সেটির কিছু অভিযুক্ত লাইন তুলে ধরা হলো—

জান্নাতের পরী আয়াতকে বলে দাও,
তোমার চোখের সমস্ত সৌন্দর্যের জন্য আমরা উৎসর্গীত।
পরী আয়াত মৃত্যুকে চুম্বন করেছে,
সুসংবাদ শ্রবণ করতে করতে স্মিত বদনে!

প্রস্তুতি

ধারাবাহিক অসংখ্য আলোচনা এবং সাক্ষাৎকারের পর আমি নিম্নোক্ত প্রধান ফ্যাক্টরগুলো প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছি, যেগুলো আল-কায়েদা এবং ফিলিস্তিনি গ্রুপসমূহ উভয় কর্তৃকই আত্মঘাতী হামলার প্রস্তুতির জন্য বিবেচনায় রাখা হয়। যারা সুইসাইড মিশনের জন্য কমান্ডারদের কর্তৃক নির্বাচিত হয় তাদেরকে যেমন উক্ত মিশনের ব্যাবহারিক প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে যেতে হয়, তেমনই সাথে সাথে তাদেরকে নিজের এবং অন্যের জীবন নাশ করার জন্য মনস্তাত্ত্বিক ও ধর্মতাত্ত্বিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

এটা স্পষ্ট যে, যেকোনো যুদ্ধের ক্ষেত্রেই শৃঙ্খলা এবং দায়িত্ববোধ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় এবং কোথাও লড়াইয়ে মৃত্যুর প্রতি কোনো সমবেদনা ও সহমর্মিতার কোনো জায়গা নেই। সমষ্টিগত মানহানীকারক 'কাফির' (অবিশ্বাসী) শব্দটি কার্যকরীভাবে শত্রুকে আরও হীন করে তোলে এবং সেই যুবক-যুবতীর

---

[১] জোয়ান অফ আর্ক (জানুয়ারি ৬, ১৪১২ – মে ৩০, ১৪৩১) পরাধীন ফ্রান্সের মুক্তিদাত্রী বীরকন্যা এবং কিংবদন্তিতুল্য এক নেত্রী। জান দার্ক (Jeanne d' Arc) ইংরেজিতে Joan Of Arc নামে পরিচিত। ইংরেজদের সঙ্গে শতবর্ষ ব্যাপী যুদ্ধের সময় (১৩৩৭-১৪৫৩) তিনি ফ্রান্সের সেনাবাহিনীকে নেতৃত্ব দেন।-অনুবাদক

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে আরও বাড়িয়ে দেয় এবং এটা সম্ভবত শিকার নিয়ে একটি আবেগপ্রবণ প্রবৃত্তিকে উন্নীত করে। এসব মিশনের জন্য প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রত্যহ অনমনীয় শৃঙ্খলা এবং কাঠামো বজায় রাখা হয়; যার শুরু হয় ফজরের নামাজ এবং তারপর চাহিদামাফিক শারীরিক প্রশিক্ষণের দ্বারা। কীভাবে বন্দুক, আরপিজি এবং অন্যান্য হালকা অস্ত্রশস্ত্র খুলতে এবং জোড়া লাগাতে হয়, পরিষ্কার করতে হয় এবং গুলি বা রকেট নিক্ষেপ করতে হয় প্রভৃতি শিক্ষাদানে বিকালকে ব্যয় করা হয়।

ইসরাইলি নিরাপত্তা বাহিনী ক্রমবর্ধমানভাবে সম্ভাব্য আদমবোমাদের ওপর সতর্ক প্রহরা বাড়িয়েই চলেছে এবং এ কারণে ফিলিস্তিনি আক্রমণকারীদের প্রায়শ উচ্চ নিরাপত্তাব্যবস্থা সম্বলিত টার্গেটে পৌঁছার জন্য বন্দুকযুদ্ধের প্রয়োজন হয়। যদি তাদের বোমা কোনো কারণে বিস্ফোরিত না হয় তখন উক্ত যুবক-যুবতীর লক্ষ্য থাকে নিজেকেই গুলি করে দেওয়া যাতে তাকে বন্দী বা জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হতে না হয়।

সম্প্রতি আল-কায়েদা প্রশিক্ষণ ওয়েবসাইট 'আল-বাত্তার' এবং অন্যান্য অনলাইন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো রিক্রুটদের জন্য তাদের কর্মপরিধিকে আরও বিস্তৃত করেছে। এখন আর যুবকদের জন্য শারীরিকভাবে প্রশিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত হওয়ার প্রয়োজন পড়ছে না। এভাবেই দিন দিন একটি প্যাটার্নের উদয়ন ঘটছে, যেখানে সমমনা যুবকরা স্থানীয়ভাবে কোনো সেল গঠন করে এবং আল-কায়েদা ম্যানুয়াল ব্যবহার করে নিজেদের প্রশিক্ষিত করে এবং অস্ত্র ও বিস্ফোরক সংগ্রহ করে। রিক্রুটরা ২০ থেকে ৩০ কেজি বিস্ফোরক বহনের প্রশিক্ষণ নেয় যেটা হয়তো তারা নিজেদের দেহে সুইসাইড বেল্ট অথবা সুইসাইড পোশাকে বহন করবে। কেননা এরূপ কিছু বহন করলে হাঁটার ধরনের পরিবর্তন আসতে পারে এবং এটা টার্গেটকে সতর্ক করে দিতে পারে। তারা শিখে কীভাবে বিস্ফোরক নড়াচড়া করতে হয় এবং যেই মুহূর্তে তারা ডেটোনেটর এর বাটনে চাপ দিয়ে নিজেদেরকে বিস্ফোরণের মাধ্যমে ছিন্নভিন্ন করে ফেলবে তখন কীভাবে তাদের মধ্যে সংযোগ ঘটাতে হয়। সচরাচর সেখানে দুটি বাটন থাকে। যদি কোনো একটি বাটন কাজ না করে। পূর্ববর্তী অপারেশনসমূহ এবং সেগুলোর ভিডিওগুলো নির্দেশাবলি ও অনুপ্রেরণার জোগান দেয়। প্রকৃত এবং সম্ভাব্য বাধাসমূহ বিবেচনায় রেখে হামলার বিদ্যাসমূহ চিত্রাঙ্কিত করা হয়, বিশ্লেষণ করা হয় এবং সেগুলো তত্ত্বের ভিত্তিতে মোকাবিলা করা হয়।

সচরাচর রিক্রুটদের সামান্য কয়েক দিন পূর্ব ব্যতীত অন্য কোনো সময় বলা হয় না যে, তাদেরকে কোন মিশনের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে। এটা এই সম্ভাবনাকে পরিহার করার জন্য যে, জীবন্ত শহিদ (আত্মঘাতী হামলা প্রস্তুতির শিক্ষানবিশদের

এই নামেই ডাকা হয়) হয়তো ভয় পেতে পারে অথবা তাদের পরিবারকে বলে দিতে পারে, যারা হয়তো তাকে উক্ত কাজ থেকে বিরত করবে। জানা ঘটনাসমূহের মধ্যে একমাত্র জীবন্ত শহিদ উনিশ বছর বয়সী মুহাম্মাদ ফরহাত তার মাকে জানিয়েছিল যে, সে শহিদি হামলা করতে যাচ্ছে। তখন তিনি তাকে আশীর্বাদ করেন এবং কিছু চূড়ান্ত উপদেশ দেন—'হে আমার ছেলে, কোনো সময়ই দ্বিধান্বিত হবে না। মনে রাখবে, আল্লাহ তোমার প্রতি পদক্ষেপের সাথেই রয়েছেন। শত্রুর বিরুদ্ধে তুমি যত বেশি সম্ভব তীব্রভাবে আঘাত হানবে।' উম্মে নিদাল নামের এই মহিলা ইতিমধ্যে তার আরও দুই ছেলেকে আদমবোমা হিসেবে মারা যেতে দেখেছিল। ইরাকে নিরলস আত্মঘাতী হামলাকারীদের হিউম্যান টাইডাল ওয়েভ ধারণা দেয় যে, প্রস্তুতির জন্য সেখানে অল্প সময় দেওয়া হয় এবং রিক্রুটরাও কম-বেশি মৃত্যুর প্রস্তুতি নিয়েই আসে। ফিলিস্তিনে জীবন্ত শহিদ কোনো একজন কমান্ডারের সাথে একক আলোচনা এবং কুরআন তেলাওয়াতে ব্যাপক সময় ব্যয় করে। রিক্রুটকে বারংবার আশ্বস্ত করা হয় যে, ইসলামে যদিও আত্মহত্যা একটি মহাপাপ; কিন্তু তাদের মিশন আত্মহত্যার নয় বরং শাহাদাতের। যেখানে দেহকে একটি অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ব্যাপক আলোচনা এবং শহিদদের প্রতিদানসংক্রান্ত অধ্যয়নের কারণে জীবন্ত শহিদ নিজেকে জান্নাতে প্রত্যাশা করতে থাকে।

প্রস্তুতির কোনো একপর্যায়ে জীবন্ত শহিদকে তার অছিয়তনামার ভিডিওটি তৈরি করতে বলা হয়। তাদেরকে নিয়ে শোকার্ত না হওয়ার জন্য পরিবার এবং বন্ধুবান্ধবদের অনুরোধ করা ছাড়াও এসব ভিডিও আরও উদ্যমী রিক্রুট সরবরাহ নিশ্চিত করে এবং এটা জীবন্ত শহিদের পিছিয়ে যাওয়াকে প্রায় অসম্ভব করে তোলে। যখন জীবন্ত শহিদকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, অবিচলিত এবং প্রস্তুত সাব্যস্ত করা হয়; তখন তারা প্রস্তুতির পূর্ণাঙ্গ পর্যায়ে প্রবেশ করে, যেটা কয়েক ঘণ্টা থেকে কয়েক দিন অবধি হতে পারে। বলা হয়ে থাকে, এসময় রিক্রুট সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক বিশ্বাস এবং প্রত্যয়ের এমন চূড়ায় পৌঁছে যায়, যেখান থেকে তাকে কখনো নড়বড়ে করা সম্ভব নয় এবং যেটা তাদের কোনও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছাড়াই বহনকৃত বিস্ফোরক বা তার চালিত বিস্ফোরকভরতি গাড়ির ডেটোনেটরের বাটন টিপে দিতে সমর্থ করে।

প্রস্তুতির এসব টেকনিক ১৯৮০র দশকের শুরু থেকেই হিজবুল্লাহর অনুশীলন থেকে চলে আসছে। তখন তারাই প্রতিষ্ঠা করেছিল যে, ধর্মের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক এবং মনস্তাত্ত্বিক প্রস্তুতিই এসবের বুনিয়াদ।

সুইসাইড উইংয়ের একটি আলাদা সেল থাকে যাদের দায়িত্ব থাকে রেকি করা। কমান্ডাররাও টার্গেটের একটি লিস্ট রাখে এবং কখনও কখনও রিক্রুটদের নিজস্ব

ভাবনাও থাকে। উদাহরণস্বরূপ, এমন একটি লক্ষ্যবস্তু যেখানে তাদের পরিবারের কেউ বা তারা নিজেরাই অবমাননা বা ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল।

সচরাচর লক্ষ্যবস্তুর কোনো রাজনৈতিক তাৎপর্য বা এমন কোনো ঘটনা থাকে, যার সাথে প্রতিশোধ সম্পৃক্ত থাকে। যখন জীবন্ত শহিদ পুরোপুরি প্রস্তুত হয় তখন সেই যুবক বা যুবতীকে লক্ষ্যবস্তুর অবস্থান সম্পর্কে জানানো হয়। এটাতে সচরাচর ক্যামেরায় ধারণ করা ছবি, অঙ্কন বা ডায়াগ্রাম ব্যবহার করা হয় এবং যখন এর অভ্যন্তরে প্রবেশ করা হয় তখন এটা হামলাকারীর নির্ধারণ করতে হয় কখন এবং কোথায় ডেটোনেটর সক্রিয় করলে সর্বাধিক ক্ষয়ক্ষতি হাসিল হবে।

এসব হামলার সফলতা পরিমাপ করা হয় কত সংখ্যক নিহত হয়েছে এর ওপর ভিত্তি করে এবং কখনোই তাদেরকে পুরুষ, নারী অথবা শিশু প্রভৃতি শ্রেণিকরণ করা হয় না; কারণ এটা বিবেকের দংশনের কারণ হতে পারে। আত্মঘাতীর মৃত্যু একেবারে তাৎক্ষণিক এবং ভীতিপ্রদ হয় এবং সচরাচর হামলাকারীর মস্তক উড়ে যেতে দেখা যায়।

কখনো কখনো এমন ঘটনাও ঘটে যেখানে আত্মঘাতী হামলা ব্যর্থ হয়। যদি এটা অন্য কোনো উপাদান অথবা নিরাপত্তা বাহিনীর কাছে ধরা পড়ার কারণে হয়, তবে উক্ত ব্যর্থ আত্মঘাতী হামলাকারীকে ততটাই সম্মান এবং কদর করা হয় যতটা করা হয় কোনো শহিদের ক্ষেত্রে। তবে যদি ইচ্ছুক আত্মঘাতী শেষ সময়ে এসে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে যায় বা তার কর্মশক্তি লোপ পায়, তবে সে ক্ষেত্রে ভিন্ন ব্যাপার ঘটে। যেসব বিরল ক্ষেত্রে এরূপ ঘটনা ঘটে—সেখানে ব্যর্থ হামলাকারীকে নিজস্ব শহর, গ্রাম অথবা শরণার্থী শিবিরে নিয়ে আসা হয়। তার সম্প্রদায় কর্তৃক তখন তাকে এড়িয়ে চলার কারণে তার ব্যর্থতা সমগ্র পরিবারেরই লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

আত্মঘাতী হামলা ব্যাপারটি দিনদিন প্রচলিত হয়ে উঠছে। তথাপি এটা হতবুদ্ধিকর, গোলমেলে এবং সর্বোপরি ভীতিপ্রদই রয়ে গেছে। আমাদের সংস্কৃতি ও ইতিহাস যেরূপই হোক-না কেন, আদমবোমা ব্যাপারটি আমাদের পার্থিব হিসাবের সকল নিয়ম-কানুনকে উল্টে দিয়েছে। জীবনের প্রতি ভালোবাসা এবং একে জিইয়ে রাখার প্রবণতা একটি চিরাচরিত বিষয়, কিন্তু এর বিপরীতে আত্মঘাতী হামলাকারী মৃত্যুকে ভালোবাসে এবং একে সাদরে বরণ করে নেয়। তাই এই অপার্থিব প্রকৃতি শত্রুদের অভ্যন্তরীণ ভীতিকে পুঞ্জীভূত করতে অবদান রাখে।

এটা ইতিমধ্যে পরিলক্ষিত হয়েছে যে, কোনো দখলদারি প্রসঙ্গে সামরিক সক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা থেকেই আত্মঘাতী হামলার উৎপত্তি ঘটে। মাদ্রিদ এবং লন্ডনের সাম্প্রতিক ঘটনা—যা ইরাকে দখলদারির প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ছিল—

আত্মঘাতী হামলার ভৌগোলিক বিস্তারকেই ইঙ্গিত করে। রূঢ় বাস্তবতা হলো, মার্কিন এবং তার মিত্ররা যতদিন এরূপ কোনো বৈদেশিক নীতি বজায় রাখবে যেটাতে সামরিক দখলদারিকে অন্তর্ভুক্ত রাখা হবে এবং সুপারিশ করা হবে, ততদিন পর্যন্ত আত্মঘাতী হামলাসমূহের ক্রমবর্ধমান তীব্রতাবৃদ্ধি হ্রাস পাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই।

চতুর্থ অধ্যায়

সাইবার জিহাদ

রণাঙ্গণে অবতরণ

২০০৪ সালের ১১ মার্চ দিনটি আল-কুদস আল-আরাবি অফিসে অন্যান্য সাধারণ দিনগুলোর মতোই একটি দিন ছিল। বরাবরের মতোই বিষয়সূচির একেবারে শীর্ষে ছিল অর্থনৈতিক সমস্যাবলি। হঠাৎ করেই খবর এলো মাদ্রিদে একটি ভয়ানক বোমা হামলার ঘটনা ঘটেছে সেখানে দুইশর অধিক মানুষ নিহত হয়েছে এবং প্রায় ১,৫০০ জনের মতো আহত হয়েছে। আমি তৎক্ষণাৎ বুঝতে পেরেছিলাম যে, নিঃসন্দেহে এটি আল-কায়েদারই কাজ এবং ১৪ মার্চের আসন্ন স্প্যানিশ সাধারণ নির্বাচনের সাথে এর সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। স্প্যানিশ সরকার ইরাক আগ্রাসনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সহায়তা করেছিল। তাই স্প্যানিশ জনগণের প্রতি এটি একটি সুস্পষ্ট বার্তা ছিল যে, তাদের উচিত তাদের সৈন্যদের দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য ভোট দেওয়া। স্প্যানিশ, ব্রিটিশ এবং আমেরিকান সরকার একটি বিকল্প আসামি খুঁজতে আরম্ভ করল এবং বাস্ক (স্পেন ও ফ্রান্সের পিরেনিজ পর্বতাঞ্চলের অধিবাসী) বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন ETA এর প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করল।[১] এই সংবাদটি সকল মূলধারার মিডিয়া লুফে নিলো; অন্যদিকে প্রকৃত ঘটনা সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল ইন্টারনেটে, যেটা দিনদিন স্বাধীন তথ্যের জন্য সর্বোত্তম উৎস হয়ে উঠছে। হামলার দায় স্বীকার করে আমাদের পত্রিকায় কোনো ই-মেইল পাঠানো সেই সময়কার আল-কায়েদার সাধারণ রীতি ছিল। আজকাল তারা সাদামাটাভাবে জিহাদি ওয়েবসাইটগুলোর যেকোনো একটিতে বার্তা প্রদান করে এবং এটি সেকেন্ডের মধ্যেই বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মানুষ কর্তৃক পঠিত হওয়া নিশ্চিত করে।

আমরা ২০০২ সালের অক্টোবর মাসে প্রথমবারের মতো আল-কায়েদার একটি ই-মেইল পেয়েছিলাম। ইয়েমেনে একটি ছোট বোট একটি ফ্রেঞ্চ ট্যাংকার পাশে বিস্ফোরিত হলে একটি বিশাল জ্বালামুখ তৈরি হয় এবং ট্যাঙ্কারে একটি বৃহৎ গর্তের সৃষ্টি হয়। এরপর ইস্তাম্বুলের লন্ডনভিত্তিক ব্যাংক HSBC এবং ব্রিটিশ কনস্যুলেটে হামলার দায় স্বীকার করে ২০০৩ সালের নভেম্বর মাসে আল-কায়েদা আমাদের আরেকটি ই-মেইল পাঠিয়েছিল।

অতএব, ১১ মার্চেও আমি আল-কায়েদা থেকে কিছু সংবাদ পাওয়ার আশা করছিলাম। আমি আমার কর্মীদেরকে খুব সতর্কভাবে সকল যোগাযোগ ব্যবস্থার

[১] ETA হলো Euskadi Ta Askatasuna (বাস্ক রাষ্ট্র ও স্বাধীনতা) এর সংক্ষিপ্তরূপ।

দিকে লক্ষ রাখতে বলেছিলাম। সন্ধ্যার সূচনালগ্নেই আমি একটি রহস্যময় কল পাই, যেটা গালফ অঞ্চলের কোনও এক জায়গা থেকে করা হয়েছিল। আমাকে বলা হলো ৭:৩০ মিনিটে একটি বিশেষ ই-মেইল এর জন্য প্রস্তুত থাকতে; যে সময়ের ঠিক ৩০ মিনিট পরই আমরা আমাদের পত্রিকাকে ছাপাখানায় পাঠাই। তাই আমি ফ্রন্টপেইজ খালি রাখার সিদ্ধান্ত নিলাম। একদম কাঁটায় কাঁটায় প্রতিশ্রুত সময়েই একটি ই-মেইল এলো এবং আমি দেখতে পেলাম যে, সেটি ছিল বাস্তবিকই আল-কায়েদার একটি বার্তা। অলংকারিক রীতি এবং তথ্য কাঠামোর দিক দিয়েও এটি সুস্পষ্ট ছিল। মাদ্রিদ বোমা হামলার জন্য এটিতে দায় স্বীকার করা হয়েছিল এবং এটি আবু হাফস আল-মাসরি ব্রিগেড কর্তৃক স্বাক্ষরিত ছিল। স্পেনকে ক্রুসেডার জোটের একটি স্তম্ভ হিসেবে বর্ণনা করে পাঁচ পৃষ্ঠার ই-মেইলটিতে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, উক্ত হামলাটি ছিল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমেরিকান মিত্র ক্রুসেডার স্পেনের সাথে একটি পুরোনো বোঝাপড়া। এটিই আমাদের প্রচ্ছদের বিবরণী হয়েছিল এবং আমি তৎক্ষণাৎভাবে উক্ত ই-মেইলটি সকল পত্রিকা এবং টিভি অফিসে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। আল-কুদস আল-আরাবির সম্পাদক হিসেবে আমার এবং স্পেন, ব্রিটেন, ও আমেরিকান সরকারের স্পিন ডক্টরদের[১] মধ্যে একটি দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হলো; কারণ তারা তখনও সেই ঘটনাটিকে ETA এর ওপর চাপিয়ে দিতে ইচ্ছুক ছিল। টেলিভিশন এবং পত্রিকায় আমাদেরকে ভুয়া খবর প্রচারক বলে অভিযুক্ত করা হয় এবং এভাবেই লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে আমাদের ন্যায়পরায়ণতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয় এবং ই-মেইলটিকে থেকে বানোয়াট বলে খারিজ করে দেওয়া হয়।

শুধু তাই নয়, ই-মেইলটি অন্যান্যদের পাঠানোর আধ ঘণ্টার মধ্যেই ব্রিটিশ সিকিউরিটি সার্ভিস এবং পুলিশ আমাদের অফিসে অভিযান শুরু করে। আমাদের সমুদয় জিনিসপত্র তল্লাশির জন্য তাদের কাছে একটি ওয়ারেন্ট ছিল। যে কম্পিউটারটিতে আল-কায়েদার ই-মেইল এসেছিল তারা সেটির হার্ডড্রাইভ নিয়ে নেয়। সারারাত আমাদের অফিসের চারপাশে সশস্ত্র পুলিশি পাহারা ছিল এবং সেই একই সময়ে অফিসাররা আমাদের সকল কম্পিউটারের তথ্যসমূহ ডিস্কে কপি করে নিচ্ছিল। স্পষ্টরূপেই সিকিউরিটি ফোর্স আশা করছিল ই-মেইলটিতে তারা আল-কায়েদার পদচিহ্ন খুঁজে পাবে; আবার একই সাথে তারা হন্বিতন্বি করছিল যে, সমগ্র ব্যাপারটি একটি ধাপ্পাবাজি।

অনেক কারণেই সেটি একটি ঐতিহাসিক ই-মেইল ছিল। এটি সফলভাবে জোসে মারিয়া আযনার সরকারের পতন ঘটিয়েছিল, যাকে নির্বাচনে পরাজিত হয়ে

[১] জনসংযোগ উপদেষ্টা কিংবা প্রচারমাধ্যম কর্মী, যারা প্রতারণামূলক বা বিভ্রান্তিকর বার্তার বিকাশ ঘটায় তাদের সচরাচর 'স্পিন ডক্টর' হিসেবে অবিহিত করা হয়।-অনুবাদক

ক্ষমতাত্যাগ করতে হয়। একই সাথে এটি ইরাক থেকে স্প্যানিশ সৈন্য প্রত্যাহার নিশ্চিত করে, যেমনটা সোশিয়ালিস্ট পার্টির বিজেতা জোসে লুইস রড্রিগেজ যাপাতেরো প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এটাতে কোনো ক্রুসেডার মিত্রের প্রতি সামরিক যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

পরিশেষে এভাবেই, ইসলামিস্ট-আমেরিকান দ্বন্দ্বের নতুন থিয়েটার 'ইন্টারনেট' এ আমার পত্রিকা অজ্ঞাতসারেই জড়িত হয়ে গেল।

ইসলামিজম এবং ইন্টারনেট

বিন লাদেনের বায়োগ্রাফার এবং পাকিস্তানি সাংবাদিক হামিদ মীর বর্ণনা করেছিলেন কীভাবে ২০০১ সালের নভেম্বরে মার্কিন বোমাবর্ষণের কারণে আল-কায়েদার সদস্যরা তাদের প্রশিক্ষণ শিবিরগুলো ত্যাগ করেছিল। তিনি বলেন—'প্রতি সেকেন্ডে কোনো-না-কোনো আল-কায়েদা সদস্য তাদের ঘাঁটি ছেড়ে চলে যাচ্ছিল এবং তারা ব্যক্তিগত কালাশনিকভের সাথে সাথে একটি করে ল্যাপটপ কম্পিউটার বহন করছিল।' প্রথম দর্শনে এটা অতি মাত্রায় আপাতবিরোধী (প্যারাডক্সিকাল) মনে হতে পারে যে, আল-কায়েদার মতো একটি সংগঠন, যারা আধুনিক পৃথিবীর বিপরীতে নিজেদেরকে গর্তের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখে, তারা কীভাবে ক্রমবর্ধমানভাবে ইন্টারনেট চালিত আল্ট্রা হাই-টেক ইলেকট্রনিক্সের ওপর নির্ভর করে নিজেদেরকে পরিচালনা করছে, বিস্তৃত করছে, উন্নীত করছে এবং টিকিয়েও রাখছে?

আশির দশকে এই ব্যাপারটি নিয়ে চরমপন্থি ইসলামি সংগঠনগুলোর মধ্যে বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছিল এবং আফগানিস্তানের কিছু ওয়াহাবি গ্রুপ মূলত পশ্চিমা উদ্ভূত বা পশ্চিমা প্রবর্তিত যেকোনো টেকনোলজি ব্যবহারের বিরোধী ছিল। শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম—যুবক ওসামার ওপর যার ব্যাপক প্রভাব ছিল—তৎক্ষণাৎই এর অপার সম্ভাবনাকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ১৯৮০ দশকের মাঝামাঝি তিনি মুজাহিদ গ্রুপগুলোকে বিবর্ধিত ইলেকট্রনিক টেকনোলজিসমূহের ক্ষমতাকে কাজে লাগানোর জন্য উৎসাহিত করতে থাকেন। ইন্টারনেট আল-কায়েদার প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা এবং লজিস্টিকসের ক্ষেত্রে একটি বুনিয়াদি উপাদান হয়ে উঠেছে। কিছু ভাষ্যকার এরূপও ঘোষণা করেছে যে, আল-কায়েদা বিশ্বের প্রথম ইন্টারনেট চালিত গেরিলা নেটওয়ার্ক।

২০০৩ সালে আল-সালেম ছদ্মনামের একজন লেখক 'আল-ফারুক' ওয়েবসাইটে (একটি পরিচিত সৌদি ভিত্তিক আল-কায়েদা ওয়েবসাইট) 'আল-কায়েদা : জিহাদের ৩৯ টি তত্ত্ব' নামক একটি ডকুমেন্ট প্রকাশ করে। এর ৩৪ নাম্বারটিতে পবিত্র দায়িত্ব হিসেবে 'ইলেকট্রনিক জিহাদ' পরিচালনার গুণকীর্তন

করা হয়। বলা হয়—'বিশ্বাসীদেরকে আহ্বান জানানো হচ্ছে, ইসলামের প্রতিরক্ষার জন্য এবং জিহাদের প্রতি সকল মুসলিমদের কর্তব্য ব্যাখ্যা করা এবং জিহাদে যোগদান করার পন্থা হিসেবে ইন্টারনেট ফোরামসমূহে অংশগ্রহণ করা উচিত।' আল-সালেম আরও যোগ করেন—

> 'ইন্টারনেট যেকোনো মিথ্যা অভিযোগ তৎক্ষণাৎভাবে খণ্ডন করার সুযোগ প্রদান করে এবং এর মাধ্যমে সেকেন্ডেই লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছানো যায়। ইন্টারনেট ব্যবহারের দক্ষতাসম্পন্নদের আহ্বান জানানো হচ্ছে শত্রুদের (আমেরিকান এবং ইসরাইলি) ওয়েবসাইট এবং সাথে সাথে নৈতিকভাবে দূষিত সাইটগুলোকেও (যেমন অশ্লীল সাইট) হ্যাক এবং ধ্বংস করার মাধ্যমে জিহাদে সহায়তা করার জন্য।'

চরমপন্থি ইসলামিক গোষ্ঠী আল-মুহাজিরিনের প্রতিষ্ঠাতা শাইখ ওমর বাখার মুহাম্মাদ উল্লেখ করেন—

> 'জিহাদে পৃষ্ঠপোষকতার একটি পন্থাস্বরূপ হাজার হাজার বিন লাদেন সমর্থক বর্তমানে কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, ইন্টারনেটসহ সকল ধরনের প্রযুক্তিগত যন্ত্রপাতি নিয়ে, পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধে প্রয়োগের জন্য দিবালোকেই গবেষণা চলছে। অধুনা জিহাদি গোষ্ঠীগুলোর চারটি অপরিহার্য উপাদানের দরকার পড়ে: সদস্য, একজন নেতা, একজন ধর্মীয় পথপ্রদর্শক এবং ইনফরমেশন টেকনোলজি (IT) বিশেষজ্ঞদল।'

সম্ভবত, চরমপন্থি ইসলাম এবং হাই-টেক বিশেষজ্ঞতা—এই আপাতবিরোধী সমাহার আমাদের নিকট আরেকটু কম অদ্ভুত বলে মনে হতে পারে, যদি আমরা ইন্টারনেটের ইলেকট্রনিক আকৃতির দিকে পেছন ফিরে তাকাই এবং মহাকাশের স্যাটেলাইটগুলিকে ভুলে না যাই, যা তাদেরকে উক্ত যোগাযোগে সমর্থ করে তুলছে। তারপর আমাদের সামনে দুটি ক্ষেত্র চলে আসে, যে দুটিতে আরববিশ্ব শ্রেষ্ঠতম হিসেবে প্রমাণিত, যথা : ক্রিপ্টোগ্রাফি (সংকেতলিপি) এবং গোপনীয়তা। এই দুটি জিনিস যেকোনো যুদ্ধবিগ্রহের ক্ষেত্রেই অতীব গুরুত্বপূর্ণ, যেমনটা চতুর্থ শতকের চীনা সমর-দার্শনিক সান জু'র নিরীক্ষণে উঠে আসে—'ছলচাতুরীই হলো সকল যুদ্ধবিগ্রহের ভিত্তি।'[১] আল-কায়েদা কর্তৃক এই আন-সেন্সরড এবং আন-মেডিয়েটেড কমিউনিকেশন পারফর্মটির ব্যাপক গুরুত্বপ্রদানকে কখনোই উপেক্ষা

---

[১] এমন একটি উক্তি ইসলামের নবী সা. থেকেও প্রচলিত রয়েছে যে, 'নবী সা. বলেছেন—যুদ্ধ হচ্ছে কৌশল বা ছলচাতুরির নাম'। সুপ্রসিদ্ধ হাদিসগ্রন্থ বুখারি ও মুসলিমে এই বর্ণনাটি পাওয়া যায়।- সম্পাদক

করা উচিত নয়। ইতিহাসে প্রথমবারের মতো যেসব লোক এই সিস্টেমের বিরোধী ছিল, তারাই এখন তাদের খবরাখবর এবং মতামতকে সমগ্র বিশ্বব্যাপী তাদের শ্রোতাদের নিকটে এর মাধ্যমেই স্বাধীনভাবে সম্প্রচার করছে। এটা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, ইন্টারনেটই এককভাবে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর, যেটা স্থানীয় জিহাদি প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডকে যথার্থরূপে বৈশ্বিক নেটওয়ার্কে রূপান্তরিত করছে। যেমনটি ঘটেছে বর্তমান আল-কায়েদার ক্ষেত্রেও।

এই ব্যাপারটি বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক আবু মুসআব আল-জারকাভির ক্ষেত্রে। আল-কায়েদায় তার বর্তমান পদমর্যাদা প্রায় বিন লাদেনের সমকক্ষ পর্যায়ে পৌঁছেছে; যেটা প্রায় পুরোপুরিভাবেই তার কর্তৃক ইন্টারনেটের কর্তৃত্বপরায়ণ ব্যবহারের কারণে হয়েছে। এ পর্যন্ত 'আল-কায়েদা ইন দ্য ল্যান্ড অফ টু রিভার্স' প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৯টি বার্তা প্রচার করেছে এবং ২০০৫ সালের জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে কমপক্ষে ১৮০টি বিবৃতি প্রদান করেছে। ক্যামেরায় ধারণ করা ব্যতীত ইরাকি আল-কায়েদার কোনো অভিযানই পরিচালিত হয় না এবং সেসব ভিডিও তাৎক্ষণিকভাবে আপলোড করা হয়। এরূপ বিশ্বব্যাপী প্রকাশনার কারণে আল-জারকাভির নাম এখন সকলের মুখে মুখে। ২০০৫ সালের ২৯ জুন কোনো গেরিলা যুদ্ধে প্রথমবারের মতো আল-জারকাভি 'অল রিলিজিয়ন উইল বি ফর আল্লাহ' নামে ৪৬ মিনিটের উচ্চতর পেশাদারিসম্পন্ন (Highly professional) একটি শর্ট ফিল্ম ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রকাশ করেন। এই বাকপটুতাপূর্ণ নির্মাণটিতে অনেক অভিযান, অ্যাম্বুশ, আত্মঘাতী হামলা এবং রক্তাক্ত উদযাপন ভরতি ছিল। একটি বিশেষায়িত ওয়েব পেইজ এবং ডজন ডজন ভিডিও লিংকের মাধ্যমে এর বিতরণও এর নির্মাণের মতো করেই পেশাদারির সাথে সম্পন্ন করা হয়েছিল। আল-জারকাভির ইনফরমেশন উইং ভিডিওটির বেশকিছু ফরম্যাট প্রকাশ করেছিল। যারা ব্রডব্যান্ড ব্যবহার করতেন তাদের জন্য হাই-রেজুলেটেড, আবার যারা ডায়াল-আপ কানেকশন ব্যবহার করতেন তাদের জন্য ক্ষুদ্রতর ফাইল আকারে এবং এমনকি সেটা কোনো মোবাইলেও ডাউনলোড করা সম্ভবপর ছিল।

আল-জারকাভির ক্ষেত্রে সত্যিকারের যুদ্ধ এবং সাইবার জিহাদ; দুটোই ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কারণ তিনি বাস্তব ভূমিতে অভিযানসমূহকে কৌশলগতভাবে যতটা গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন, সাইবার স্পেসকেও ঠিক ততটাই গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। আল-জারকাভি এই ক্ষেত্রে আল-কায়েদার একটি নতুন মুখ এবং অধুনা প্রযুক্তি-নির্ভরশীল যুবকদের প্রতি তার বিশেষ মনোযোগকে ব্যাখ্যা করেন।

ইন্টারনেট একটি বহুমুখী যন্ত্র এবং একইসাথে একটি বহুমুখী অস্ত্রও। এর মাধ্যমে যেমন ওয়ান-টু-ওয়ান যোগাযোগ স্থাপন করা যায়, তেমনই ওয়ান-টু-

মিলিয়ন যোগাযোগও করা যায়। গোপন তথ্য, নির্দেশাবলি এবং পরিকল্পনাসমূহ বহনেও এটি ব্যবহার করা হয়। যেহেতু উন্নত বিশ্বের অবকাঠামোর বেশিরভাগই কম্পিউটার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তাই এটি পশ্চিমাদের বড় একটি ফাটল যার মধ্য দিয়ে নিবেদিতপ্রাণ হ্যাকাররা খুব সহজেই অনুপ্রবেশ করতে সক্ষম। জিহাদিদের কর্তৃক স্বল্প ব্যয়েই কোনো সাইবার অ্যাটাক তাদের ওপর বৃহত্তর ক্ষয়ক্ষতি আরোপ করতে পারে। এটি এমন একটি নীতি, যেটাকে তারা খুব কদর করে এবং এই নীতির ব্যবহারই আমরা দেখি সশস্ত্র যুদ্ধের বিপরীতে আত্মঘাতী মিশনসমূহকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রেও। আল-কায়েদা ইন্টারনেটের মাধ্যমে বহুবিধ এবং বহু রকমের কর্মসম্পাদন করছে। ব্যাপক নজরদারি হয়তো সম্প্রতি এর অনলাইন কর্মকাণ্ডের পরিসরকে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে; কিন্তু সাইবার জিহাদের অতীত এবং সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ দিকগুলো বিবেচনায় রাখা অতীব জরুরি।

সিক্রেসি অ্যান্ড স্পাই

ক্যামব্রিজ এনসাইক্লোপিডিয়াতে ক্রিপ্টোগ্রাফিকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এভাবে 'কোনো বার্তার অর্থকে লুক্কায়িত রাখার জন্য কোড (সংকেত বা প্রতীক) এবং চিপার (অঙ্ক) এর মাধ্যমে বার্তার রূপকে পরিবর্তন করে দেওয়া'। এই ক্রিপ্টো-সিস্টেমই সাইবার-লড়াইয়ের প্রধান অংশ। এখানে বার্তাসমূহ গুপ্ত, অনুবিদ্ধ বা সাংকেতিক থাকে, যেটার অর্থ শত্রুর কাছে অপ্রকাশিত থাকে কিন্তু মিত্ররা খুব সহজেই ধরতে পারে। কিন্তু ক্রিপ্টোগ্রাফি নতুন কোনো আবিষ্কার নয়। মুসলিমরা ইসলামি স্বর্ণযুগের দশম শতাব্দীর আব্বাসি খিলাফতকাল থেকেই এটি ব্যবহার করে আসছে। সেসময় আব্বাসি খলিফারা রাষ্ট্রীয় সিক্রেট নিরাপদে আদান-প্রদানের জন্য এনক্রিপশন করে নিত। এই সময়কালের বইসমূহ যেমন 'আদাবুল কুত্তাব' ক্রিপ্টোগ্রাফি নিয়েই লিখা। প্রযুক্তির উৎকর্ষতার দিক থেকে যতটা মনে করা হয়, আরবরা পশ্চিমাদের থেকে ততটা অনুন্নত নয়। আইবিএম (IBM) ১৯৮১ সালে প্রথম পার্সোনাল কম্পিউটার প্রবর্তন করে। এর কেবল একবছর পরেই 'শাখার' নামে কুয়েতে একটি আইটি কোম্পানি চালু করা হয় এবং তারা নিজস্ব অপারেটর ইন্টারফেসের মাধ্যমে একটি পার্সোনাল কম্পিউটার নির্মাণ করে। কিন্তু মাইক্রোসফট কর্তৃক দ্রুতগতিতে বাজারকে কুক্ষিগত করে নেওয়ায় শাখারের অবস্থান দীর্ঘকাল ধরে রাখা সম্ভবপর হয়নি। (তবে বর্তমানে এটি এখনও সর্ববৃহৎ আরব আইটি কোম্পানি)।

এই থিয়েটারে শক্তিশালীভাবে চাতুর্য এবং উদ্যমের একটি সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট থাকা সম্ভাব্য বিষয়। এটাকে মুসলিমরা সাইবার স্পেসে নিয়ে গেছে; বিশেষ করে ইসলামিস্টদের সাইবার জিহাদের ক্ষেত্রে এটা সত্য। গোপনীয়তা এবং

গোপনীয়তার অপরিহার্যতা অথবা কমপক্ষে টিকে থাকার জন্য বিচক্ষণতা প্রভৃতি যেমন ঐতিহাসিকভাবেই আরব পারদর্শিতার একটি অংশ তেমনই ধৈর্যশীলভাবে জেগে থেকে শত্রুর অভিসন্ধিসমূহ উদঘাটিত করার জন্যও তারা সমানভাবে পটু।

লগিং অন

অর্ধেকের বেশি জিহাদিই উপসাগরীয় অঞ্চলের বাসিন্দা, যেখানকার উচ্চশিক্ষিত লোকজন ১৯৮০র দশকের শেষ দিকেও কোনো পার্সোনাল কম্পিউটারের মালিক হওয়ার মতো পর্যাপ্ত ধনবান ছিল এবং তারা ইন্টারনেট ব্যবহার ও এর সুবিধাসমূহ কাজে লাগানোয় অতিমাত্রায় পারদর্শী ছিল। তারা শাসকবর্গের হস্তক্ষেপকে পাশ কাটানোর ক্ষেত্রেও ছিল যথেষ্ট পটু।

১৯৯৯ সালের পূর্বে সৌদি আরব সরকারিভাবে ইন্টারনেট ব্যবহারের অনুমতি দেয়নি এবং এখনও অবধি তাদের কেবল একটিই ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার (ISP) রয়েছে যেটা আবার রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত, নিগূঢ় নজরদারির আওতাধীন এবং সেন্সর্ড। এটা কিং আবদুল আজিজ সিটি ফর সায়েন্স এন্ড টেকনোলজিতে অবস্থিত। এরা ইন্টারনেটের সকল কাজ-কারবার একটি সেন্সরশিপের অধীনস্থ ফিল্টারের মধ্য দিয়ে চালিত করে। ইন্টারনেট অ্যাক্সেস উন্মুক্ত করে দেওয়ার জন্য দেশটি দীর্ঘকাল ধরে ঘরোয়া এবং আন্তর্জাতিক চাপকে উপেক্ষা করে আসছে। যার কারণ হিসেবে সৌদি সংস্কারবাদী আল-মাসারি বিশ্লেষণ করে বলেন—'এর অর্থ দাঁড়াবে প্রভাবিত মস্তিষ্কসমূহের ওপর একচেটিয়া প্রভাবের ভাঙন; এর মানে হলো, কিংডম অফ সাইলেন্স আর কিংডম অফ সাইলেন্স থাকবে না।' সেখানে তাই ইন্টারনেটের সেন্সরশিপসংক্রান্ত আইনে প্রচুর কঠোরতা বিদ্যমান এবং প্রতিনিয়তই লক্ষ লক্ষ ওয়েবপেইজ নিষিদ্ধ এবং বহিষ্কৃত করে দেওয়া হয়। তাই ইসলামপন্থিদের কর্তৃক কিং আবদুল আজিজ সিটিকে 'সিটি অফ ডার্কনেস' উপাধি দেওয়া অদ্ভুত কিছু নয়। তবে বাস্তবতা হলো, সৌদিরা অনলাইনে রয়েছে সেই ১৯৮০র দশকের শেষদিক থেকেই; তারা বিদেশি ISP গুলোতে পরদেশি হিসেবে সাবস্ক্রাইবের মাধ্যমে অথবা গোপনে আমদানিকৃত সফটওয়্যারসমূহের মাধ্যমে ইন্টারন্যাশনাল ডায়াল-আপ ব্যবহার করে ইন্টারনেট অ্যাক্সেস করে গেছে। প্রকৃতপক্ষে সেন্ট্রাল ফিল্টারটিকে খুব সহজেই এমনকি স্বল্প ব্যাবহারিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরাও বোকা বানাতে পারে। ইরাকের পরিস্থিতি এরচেয়ে আরও অনগ্রসর; কারণ সাদ্দাম হুসাইনের শাসনামলে ইন্টারনেট পুরোপুরিভাবে নিষিদ্ধ ছিল। আগ্রাসনের পরপরই মার্কিনীরা ইরাকিদেরকে স্যাটেলাইট ইন্টারনেট এবং আরও অন্যান্য লেটেস্ট প্রযুক্তি প্রদান করে। এবং এভাবে অধুনা প্রযুক্তি হাতে পেয়েই ইরাকি প্রতিরোধ যোদ্ধা এবং তাদের মিত্ররা প্রত্যহ হানাদার মার্কিন বাহিনীর

বিরুদ্ধে তাদের সামরিক সফলতাসমূহের অসংখ্য ছবি, ভিডিও এবং লিখিত বর্ণনা আপলোড করতে থাকে। এগুলো এখনও প্রধান রিক্রুটমেন্ট টুল হিসেবে বিদিত, যেটি ইরাকি যুদ্ধে যোগদানের জন্য হাজার হাজার যুবককে উৎসাহিত করেছে এবং অন্যান্যদেরকেও অনুরূপ নৃশংসতা ঘটাতে উদ্দীপনা জোগাচ্ছে। সাম্প্রতিক কালে আমরা যার সাক্ষী হয়েছি লন্ডনেই।

হোম পেইজ

এক্সপার্টদের মতে, বর্তমানে সুনিশ্চিতভাবেই ৪,৫০০ এর অধিক জিহাদি ওয়েবসাইট বিদ্যমান, যেগুলো আল-কায়েদাকে একটি আন্তর্জাতিক মতাদর্শিক আন্দোলন হিসেবে চালিত হতে সক্ষম করছে এবং সমগ্র পৃথিবীব্যাপী এর সমমনা লোকদের একত্রিত রাখছে। ১৯৯৫ সাল থেকেই ইসলামিস্ট এবং জিহাদি গোষ্ঠীগুলো তথ্য আদান-প্রদানের জন্য ই-মেইল ব্যবহার শুরু করে; এগুলোর মধ্যে লন্ডনে বিন লাদেন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'অ্যাডভাইস অ্যান্ড রিফর্ম' কমিটিও ছিল যার লন্ডন অফিসের পরিচালক ছিল, খালিদ আল-ফাওয়াজ। এটা অনুমান করা অযৌক্তিক হবে না যে, বিন লাদেন এবং আল-ফাওয়াজ এই উপায়েই যোগাযোগ রক্ষা করতেন। কিন্তু সেই সময় ইন্টারনেটের মাধ্যমে নজরদারি ব্যবস্থা এর শৈশবকালে ছিল।

আরব ইসলামিক বিশ্বে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারসংক্রান্ত নেতৃত্ব পর্যায়ের গবেষক আলব্রেচ হফহেইঞ্জ এর মতে 'সাইবার জিহাদ' শব্দটি প্রথম প্রচলন ঘটায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকৃত কিছু মুসলিম ছাত্র, যারা ১৯৯০র দশকের মাঝামাঝি সময় থেকেই বিভিন্ন ইসলামিক ওয়েবসাইট চালু করছিল। প্রথম পুরোদস্তুর জিহাদি ওয়েবসাইটটি সম্ভবত ১৯৯৯ সালে চেচেন বিদ্রোহীদের কর্তৃক চালু হয়েছিল, যার নাম ছিল kavkaz.org (এটিকে আবার kavkaz.com এর সাথে মিলিয়ে ফেলে বিভ্রান্ত হবেন না; কারণ এটি চেচেন সরকারের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট)। এই সাইটটি আন্তর্জাতিক হেডলাইনে জায়গা করে নেয় যখন এটি অর্থনৈতিকভাবে তালেবানকে সহায়তা করার জন্য এবং কীভাবে ও কোথায় টাকা পাঠাতে হবে তার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ তুলে ধরে পাঠকদের আহ্বান জানায়। maalemaljihad.com কে আল-কায়েদার প্রথম ওয়েবসাইট বলে মনে করা হয়। এটি মি. মুহাম্মাদ আলী নামক একজন 'ইজিপশিয়ান ইসলামিক জিহাদ' সমর্থক কর্তৃক ২০০০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে চালু হয়েছিল; যিনি এই উদ্দেশ্যেই দক্ষিণ চীনে সফর করেছিলেন। সম্ভবত চীনকে কেবল প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার কারণেই বেছে নেওয়া হয়নি বরং যেসব ওয়েব ডিজাইনাররা আলীর হয়ে কাজ করত তারা ধারণাও করতে পারেনি মুহাম্মাদ আলী বাস্তবিকপক্ষে কি লেখালেখি করতেন, 'আরবি বর্ণগুলো আমাদের

কাছে ঠিক কেঁচোর মতোই মনে হতো'—চেন রংবিন এভাবেই তার অভিজ্ঞতা ২০০২ সালে ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের কাছে ব্যক্ত করেছিলেন যিনি উক্ত আইএসপি এর জন্য কাজ করতেন। মনে করা হচ্ছে, অতি সাম্প্রতিক সময়ে সাইবার জিহাদিরা একই উদ্দেশ্যে জাপানিজ সার্ভার এবং এমনকি জাপানিজ চ্যাট ফোরাম ব্যবহার করছে। maalemalzihad.com এর হোম পেইজ আল-কায়েদার একটি প্রতীক প্রদর্শন করত; যেটা ছিল—দুটি তরবারি মিলিত হয়ে একটি ডানাওয়ালা মিসাইল; এটি সাইটটির জন্য একটি মানানসই উপমা ছিল যাতে মৌলবাদী ইসলামিক ধর্মতত্ত্ব এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তি মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। সামান্য কয়েক মাস পরেই পাকিস্তানে এর একটি মিরর সাইট চালু করা হয়েছিল (মিরর সাইট হলো ব্যর্থতার নিরাপত্তাস্বরূপ; যদি কোনো একটি সাইটকে ধ্বংস করে দেওয়া হয় তবে অপর সাইটটি রয়ে যায় এবং পূর্বেরটির জায়গায় চালু হয়ে যায়)। উক্ত সাইটটির উপাদানসমূহ সরবরাহ হতো বহুদূরের আফগানিস্তান থেকে : বিন লাদেন এবং আল-জাওয়াহিরির বিবৃতি, 'আল-মুজাহিদুন' বুলেটিন, সংবাদ সংকলন, নিউজ ডাইজেস্ট, শহিদদের ফটোগ্যালারি, শহিদি হামলার বৈধতার অনুমোদনসংক্রান্ত পঁয়তাল্লিশ পৃষ্ঠার ধর্মতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ইত্যাদি ইত্যাদি। এর আপলোড ব্যবস্থাও ছিল একটি বৈশ্বিক অভিযানের মতো, যেখানে ডিস্কে করে তথ্য প্রেরণ করা হতো এবং ইউরোপের বিভিন্ন কম্পিউটার থেকে সেগুলোকে উক্ত ওয়েবসাইটে পোস্ট করা হতো। ২০০১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে চায়নার সাইটটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়; কারণ মি. আলী সময়মতো এর রিনিউয়াল সাবস্ক্রিপশন ফি জমা দিতে ভুলে গিয়েছিলেন, এরূপ বিশাল একটি উদ্যোগের জন্য যেটি ছিল একটি হাস্যকর ভুল। পাকিস্তানভিত্তিক এর জমজ সাইটটিও ২০০১ সালের গ্রীষ্মে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

আল-কায়েদার ঘনিষ্ঠ সূত্র থেকে জানা যায়, ২০০১ সালে এই সংগঠনটি নাছোড়বান্দারূপে লন্ডনে একটি নিরাপদ পার্সোনাল সার্ভারের খোঁজ চালিয়েছিল। এটি একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত যে, সেই সময় তাদের অভিযানের জন্য ইন্টারনেট কত গুরুত্বপূর্ণ ছিল, যখন নাইন ইলেভেনের জন্য পূর্ণোদ্যমে প্রস্তুতি চলছিল। প্রায় ৪০০০ ইউরো (তখনকার প্রায় ৫৭৫০ ইউরো) খরচ করার পর তারা দেখতে পেল—সামান্য কিছুদিন পরেই সেই সাইটিকে সার্ভারের সিকিউরিটি সার্ভিস ব্লক করে দেওয়ার মাধ্যমে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। এভাবে আরও কিছু ব্যর্থ প্রচেষ্টার পর তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটেন ভিত্তিক সার্ভারসমূহ পরিহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। যদিও এখনও আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট বহু ওয়েবসাইটই মার্কিন ভিত্তিক সার্ভার ব্যবহার করে যাচ্ছে।

নাইন ইলেভেনের পর সেই উনিশ জন শহিদের ছবি সম্বলিত বিভিন্ন জিহাদি এবং ইসলামিক সাইটের সংখ্যা হুড়মুড় করে বাড়তে থাকে। এমনকি ওয়েবমাস্টাররা ক্রমবর্ধমানভাবে অবমাননার শিকার হতে থাকে। আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট 'জিহাদ অনলাইন' (jihad-online) ওয়েবসাইটির মালিক উক্ত সাইটটি রেজিস্ট্রেশন করেছিল আব্দুর রহমান আল-রশিদের নামে, যিনি সৌদি পত্রিকা আল-শারক আল-আসওয়াত এর সাবেক প্রধান সম্পাদক ছিলেন এবং বর্তমানে পশ্চিমা নিয়ন্ত্রিত স্যাটেলাইট চ্যানেল আল-আরাবিয়াতে কর্মরত আছেন। আল-রশিদ যখন এটা জানতে পেরেছিলেন, তিনি স্বভাবতই অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন।

আল-কায়েদার আঞ্চলিক মিলিশিয়াগুলোরও নিজস্ব ওয়েবসাইট এবং অনলাইন ম্যাগাজিন বিদ্যমান। আল-কায়েদা ইন সৌদি আরাবিয়ার তৎকালীন প্রধান ইউসুফ আল-আইয়িরি কর্তৃক ২০০৩ সালের শেষদিকে প্রতিষ্ঠিত (এই বছরের শেষদিকেই তিনি নিহত হন) ওয়েবসাইট 'আল-বাত্তার' আমার এই লেখার সময়কালেও এর দ্যুতি ছড়িয়ে যাচ্ছে। বিশদ সামরিক প্রশিক্ষণ নির্দেশাবলির অতীব সংমিশ্রণে 'আল-বাত্তার' এর শতাধিক সংস্করণ যে কাউকেই নিজস্ব গেরিলা আর্মি এবং সামরিক অভিযান পরিচালনার জন্য প্রস্তুত করে তুলতে সক্ষম। আল-বাত্তার জিহাদ এবং শাহাদাতের গুণকীর্তন করে কবিতাও প্রকাশ করত। নিম্নোক্ত পঙক্তিগুলো হামাদ আল-আসলামির একটি কবিতার নির্যাস–

কেন আমি একজন শহিদ হিসেবে মৃত্যুবরণ করব না?
শহিদের আত্মা তো অনেক অনেক উঁচুতে উড্ডয়ন করবে;
সে জান্নাতের পাখিদের সাথে উড়ে বেড়াবে
প্রাসাদের ওপর গুনগুন করতে করতে।
তুমি কবরের শান্তিও লাভ করতে পারবে-
তেমনইভাবে পুনরুত্থানকে উপভোগ করবে;
তোমাকে সম্মানের মুকুট পরানো হবে
এবং মানুষজন সর্বত্র তোমার তারিফ করবে।

একই ধরনের আরেকটি ওয়েবসাইট, 'সারওয়াত আল-সিনাম' আল-জারকাভির 'আল-কায়েদা ইন দ্য ল্যান্ড অফ টু রিভার্স' কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এটা মূলত ইরাকের অভিযানসমূহের খুঁটিনাটি খবরাখবর প্রদান করতো। সেখানেও শহিদদের গুণকীর্তন করা হতো এবং আল-জারকাভি কর্তৃক যুবক মুসলিমদের জিহাদে যোগদানের জন্য উৎসাহিত করা হতো। সাম্প্রতিক একটি সংস্করণে আল-জারকাভি দরদি ভঙ্গিমায় প্রতিরোধ কর্মকাণ্ডকে নিয়ে কবিতা

আহ্বান করে আরব মিডিয়াকে একটি খোলা চিঠি প্রেরণ করেছেন। সামরিক কৌশলের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিষয়াদি, কীভাবে বিস্ফোরক এবং রাসায়নিক অস্ত্র তৈরি করতে হয় সেসবও এই সাইটটিতে বিদ্যমান রয়েছে।

দ্য ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়া ফ্রন্ট অফ ইসলাম (IMFI) হলো বিন লাদেনের সাইবার উপস্থিতি। এর সাথে দুই শতাধিক সাইটের সংযোগ বিদ্যমান। ২০০৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অভাবনীয় দুঃসাহসের সাথে এটি এর নিজস্ব নিউজ প্রোগ্রাম চালু করে। তখন থেকেই এটি নিয়মিত হাজির হচ্ছে এবং আল-কায়েদা মতাদর্শ, ইরাক বিদ্রোহের হালনাগাদ অবস্থা প্রভৃতি দর্শকের সামনে হাজির করে এবং এমনকি উক্ত লেটেস্ট ব্রডকাস্টিং প্রচেষ্টায় অবদান রাখার জন্য স্বেচ্ছাসেবীদের আহ্বান করে।

প্রতিটি আল-কায়েদা মিলিশিয়ারই নিজস্ব ইনফরমেশন ডিপার্টমেন্ট রয়েছে, যারা ইন্টারনেটে আপলোডের বিষয়টি তদারকি করে। ইনার সার্কেলের আল-কায়েদা নেতৃবর্গ কোনো ডিস্কে তাদের বার্তা রেকর্ড করে; তারপর এটাকে কোনো বার্তাবাহকের মাধ্যমে নিম্নপদস্থ অপারেটরের কাছে হস্তান্তর করা হয় এবং সেই অপারেটর উক্ত বিষয়াদি কোনো জায়গার সাইবার ক্যাফের কম্পিউটার থেকে আপলোড করে দেয়। এই পদ্ধতিতে কাজ করা নিম্নপদস্থ কুশলীরা হঠাৎ হঠাৎ ইন্টারনেট ক্যাফেতে সন্দেহজনক আচরণ করে বসে অথবা সিসিটিভি ফুটেজে ধরা পড়ে এবং কেউ কেউ আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতেও আটক হয়। যে পাকিস্তানি গ্রুপটি রিপোর্টার ড্যানিয়েল পার্লকে অপহরণ করেছিল, (অবশেষে তাকে হত্যা করা হয়েছিল) তারা তাদের জিম্মির ছবিকে করাচির একটি সাইবার ক্যাফে থেকে আপলোড করেছিল। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা আইপি অ্যাড্রেস এর মাধ্যমে উক্ত ক্যাফের অবস্থান ট্র্যাক করতে সক্ষম হয় এবং ক্যাফে মালিকের কাছ থেকে সিসিটিভি ফুটেজ জব্দ করে সেসব অভিযুক্তদের শনাক্ত করতেও সক্ষম হয়; কিন্তু জিম্মিকে নিহত হওয়া থেকে বাঁচানোর জন্য অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। ট্র্যাকিংয়ের ঝুঁকির কারণে ইনার সার্কেলের আল-কায়েদা নেতৃবর্গরা এখন আর ইন্টারনেট ব্যবহার করেন না। বিন লাদেন এবং আল-জাওয়াহিরি হালনাগাদ ইন্টারনেট কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত থাকেন; যেখানে প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি ডিস্কে ডাউনলোড করে অথবা প্রিন্ট করে তাদের কাছে বিশ্বস্ত বার্তাবাহকের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়। সাইবার জিহাদে ইন্টারনেটের সফল ব্যবহার পুরোপুরিভাবে নির্ভর করে এক পক্ষের গোপনীয়তা ও ছলচাতুরী এবং অপর পক্ষের সতর্কতা এবং বুদ্ধিমত্তার ওপর। এখন আমরা কীভাবে বিভিন্ন উপায়ে অনলাইন লড়াই চালনা করা হয় এবং এর লুকোচুরি খেলা হয়, অর্থাৎ সাইবার জিহাদের প্রধান দিকগুলোর ওপর আলোকপাত করব।

লুকোচুরি খেলা

ইন্টারনেটকে নিয়ন্ত্রণের আওতায় আনা অসম্ভব। এই মাধ্যম যেসব ব্যাপক সুবিধাসমূহ উপস্থাপন করে, আন্ডারগ্রাউন্ড জিহাদি সংগঠনগুলো সহসাই সেগুলোকে উপলব্ধি করতে পেরেছিল। লন্ডনে বসবাসরত সৌদি সংস্কারপন্থি, পদার্থবিদ এবং আইটি বিশেষজ্ঞ ডক্টর মুহাম্মদ আল-মাসারি বলেন—'প্রতিবছর নয়শ মিলিয়ন মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করে। তাই এটাকে যথেচ্ছভাবে নজরদারির আওতায় আনা অসম্ভব।' বিখ্যাত গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর মতে—'কোনো গোপন বার্তার অর্থকে গোপন রেখে সাইবার স্পেসের মাধ্যমে আদান-প্রদান করার অগণিত পদ্ধতি বিদ্যমান।'

প্রচলিত যুদ্ধ-বিগ্রহেও প্রতিরক্ষা কৌশলের একটি মূল স্তম্ভ হলো, গুরুত্বপূর্ণ বার্তাসমূহের আদান-প্রদানকে হস্তক্ষেপমুক্ত করা এবং এর বিপরীতে এরূপ বার্তার অর্থকে গোপন রাখার পন্থাসমূহ খুঁজে বের করা আক্রমণকারীদের জন্য অত্যাবশ্যক। এর একটি সেরা ঐতিহাসিক উদাহরণ হতে পারে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্লেটচলেই পার্কে এনিগমা কোড ট্রাকিং, যা ব্রিটেনের লুফটওয়াফে আক্রমণকে ব্যর্থ করতে সমর্থ করেছিল এবং নিঃসন্দেহে এটি মিত্র বাহিনীর বিজয়ে অন্যতম ভূমিকা রেখেছিল।

এটা ব্যাপকভাবে মনে করা হয় যে, আল-কায়েদা এর মূখ্য হামলাসমূহ সুষ্ঠুভাবে সমন্বিত করার জন্য ১৯৯৮ সালের নাইরোবি এবং দারুস-সালামে মার্কিন দূতাবাস হামলার সময় থেকেই বৃহত্তর এবং ক্ষুদ্রতর পরিসরে ইন্টারনেট ব্যবহার করে আসছে। নাইন ইলেভেনের সাত মাস পূর্ব থেকেই এফবিআই তদন্তকারীরা বিন লাদেনের ইন্টারনেট সক্ষমতার ব্যাপারে ক্রমবর্ধমানভাবে উদ্ভ্রান্ত হচ্ছিলেন। ২০০১ সালের ফেব্রুয়ারিতে 'ইউএসএ টুডে' তাদের প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছিল যে, বিন লাদেন এবং অন্যান্যরা স্পোর্টস চ্যাট রুম, অশ্লীল বুলেটিন বোর্ড এবং অন্যান্য ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জঙ্গি হামলার টার্গেটের ছবি এবং ম্যাপ লুকিয়ে রাখছে এবং নির্দেশাবলির চালান করছে। মার্কিন গোয়েন্দা কর্মকর্তারা আবু জুবাইদার কম্পিউটারকে জব্দ করতে সক্ষম হয়, যাকে মনে করা হয় নাইন ইলেভেন হামলার মাস্টারমাইন্ড এবং তারা দাবি করেছিল যে, তারা ব্যাপক সংখ্যক এনকোডেড ইমেইল এর সন্ধান পেয়েছে, যেগুলোর সর্বশেষ ইমেইলটির তারিখ ছিল ২০০১ সালের ৯ সেপ্টেম্বর। কোনো ইলেক্ট্রনিক বার্তার অর্থকে গোপন রেখে আদান-প্রদান করার একটি সহজ এবং সাধারণ উপায় হলো 'এনক্রিপশন' (Encryption)। এনক্রিপশন প্রোগ্রামসমূহ 'ম্যাথমেটিক্যাল কি' (Mathematical key) ব্যবহার করে কোনো বার্তাকে জট পাকাতে পারে এবং পুনরায় সেই জট খুলতে পারে। এরূপ সফটওয়্যার যে কেউই বিনামূল্যে ইন্টারনেট

থেকে ডাউনলোড করতে পারে। যদিও বর্তমানে অনেক কমার্শিয়াল প্রোগ্রাম 'ব্যাক ডোর' (Back Door)-এর প্রচলন করেছে যেটা সরকারি সংস্থাগুলোকে এসব কি-সমূহের (Keys) অ্যাক্সেস দিতে পারে এবং এর মাধ্যমে তারা সেসব বার্তা আটক করতে পারে অথবা আড়ি পাততে পারে। এনক্রিপটেড কমিউনিকেশন চালানোর জন্য উভয় পক্ষকেই পাসওয়ার্ড নির্ধারণ করে নিতে হয় এবং উভয় পক্ষকেই সেই পাসওয়ার্ড বিনিময় করতে হয়। তত্ত্ব মোতাবেক এভাবেই কেবল তারা বার্তাটি ডিক্রিপ্ট (Decrypt) করতে সক্ষম। সমস্যাটি ঘটে যদি সেসব কি-সমূহ (keys) ইন্টারনেটের মাধ্যমে আদান-প্রদান করা হয়। এনক্রিপশন সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য হতে পারে, যদি পাসওয়ার্ডসমূহ নন-ইলেকট্রনিক মাধ্যমে আদান-প্রদান করা হয় যেমন কোনো ব্যক্তি অথবা চিঠির মাধ্যমে। মনে করা হয়, এরূপ এনক্রিপশন সেটআপ আল-কায়েদা কর্তৃক বহুল ব্যবহৃত হয়, উদাহরণস্বরূপ, কোনো স্লিপিং সেল প্রতিষ্ঠা করা বা সক্রিয় করার ক্ষেত্রে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ব্যাপক গোপনীয়তাপূর্ণ এবং সামান্য প্রোগ্রামিং জ্ঞান রাখে এরূপ কোনো জঙ্গি বা অপরাধী গোষ্ঠী নিজেরাই নিজস্ব অতিশয় নিরাপদ চোরাগোপ্তা এনক্রিপশন সফটওয়্যার তৈরি করতে সক্ষম।[১] এটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে, আল-কায়েদা কর্মীদের মধ্যে অসংখ্য যুবক আইটি বিশেষজ্ঞ থাকার পরও আল-কায়েদা সাইবার জিহাদের এই ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকবে; যেখানে লেটেস্ট টেকনিক্যাল ডিভাইসসমূহ বিজয়ের প্রধানতম ভূমিকা পালন করতে পারে। নিজের হাতে তৈরি কোনো এনক্রিপশন সফটওয়্যার ডেভেলপ করার পর সেটিকে গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে পূর্ণ নিরাপত্তায় পাঠিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হয়। আরেকটি পদ্ধতি যেটি ঐতিহাসিকভাবেই আল-কায়েদার জন্য অতীব তাৎপর্যপূর্ণ, সেটি হলো স্টিগ্যানোগ্রাফি (Steganography)। এর মাধ্যমে সফটওয়্যার ব্যবহার করে কোনো বার্তা—যেটি এনক্রিপটেডও থাকতে পারে—কোনো আপাত প্রতীয়মান সাধারণ ছবি, ভিডিও, অডিও বা এমনকি কোনো সাইট বা ই-মেইল এর আইপি অ্যাড্রেস এর মধ্যেও লুক্কায়িত রাখা হয়। স্টিগ্যানোগ্রাফি ব্যবহার করে কোনো গোপন বার্তা পুরোপুরি অলক্ষ্যে এবং মূলত যাদের নিকট এর কোনো জ্ঞান নাই যে সেখানে কি রয়েছে, তাদের শনাক্তের অযোগ্যভাবে আদান-প্রদান করা সম্ভব। অবগত প্রাপকের জন্য কোনো সাদাসিধা পাসওয়ার্ডই উক্ত বার্তাটিকে উন্মুক্ত করে দেয়। মেইলবক্স হিসেবে স্পাম ই-মেইলও প্রায়শ ব্যবহৃত হয়। এটি কোনো অশ্লীল ওয়েবসাইটের লিংক হিসেবে প্রেরণ করা যেতে পারে অথবা সেখানে এমন কোনো অশ্লীল ছবি আপলোড হতে পারে যার মধ্যে

---

[১] Bruce Scheier, expert on Internet espionage, www.theregister.co.uk, 3 October 2001.

স্টিগ্যানোগ্রাফিক বার্তা লুকানো থাকতে পারে। যতবারই কোনো স্পাম ই-মেইলের আগমন ঘটবে এটি কোনো উদ্দিষ্ট প্রাপকের জন্য একটি সিগন্যাল হিসেবে কাজ করে যে, কোনো নতুন বার্তা প্রেরণ করা হয়েছে। বাকি সরল বিশ্বাসী অ্যাড্রেস লিস্টের জন্য এটি কেবল কোনো তুচ্ছ উপদ্রব (গুপ্ত রাখার লক্ষ্যে ইসলামিস্টরা অশ্লীল ছবি ব্যবহার সমর্থনযোগ্য মনে করে। আল-মাসারি বলেন, সেখানে একটি যুদ্ধাবস্থা বিদ্যমান এবং কোনো যুদ্ধে নিজ পরিচয় ঢাকার জন্য পাপমূলক উপাদান ব্যবহার করা বৈধ) ইন্টারসেপ্টরের (Interceptor) জন্য কোনো ফাইলের মধ্যে কোনো স্টিগ্যানোগ্রাফিক বার্তার উপস্থিতি আবিষ্কার করা একটি সহজ কাজ। অনেক স্টিগ্যানালাইসিস প্রোগ্রাম রয়েছে, যেগুলো কোনো গোপন বার্তার উপস্থিতিকে শনাক্ত করতে সক্ষম; কিন্তু পাসওয়ার্ড ব্যতীত উক্ত বার্তাটিকে উন্মুক্ত করা অতিশয় কঠিন। মনে করা হয়, সাইবার ক্যাফে ব্যবহারের কারণে বর্তমানে আল-কায়েদা কুশলীদের কর্তৃক স্টিগ্যানোগ্রাফি বহুলভাবে ব্যবহৃত হয় না। কোনো সাইবার ক্যাফেতে স্টিগ্যানোগ্রাফিক বার্তা তৈরির সফটওয়্যার তো দূরের কথা সেখানে এরূপ ফাইল ওপেন করার সফটওয়্যার থাকাও অসম্ভব।

সাইবার জিহাদিরা গোয়েন্দা সংস্থাসমূহকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য ক্রমবর্ধমানভাবে নিম্ন টেকনোলজির ডিভাইস ব্যবহার করাকে বেছে নিচ্ছে; কারণ গোয়েন্দা সংস্থাসমূহ স্বাভাবিকভাবেই তাদের কাছ থেকে কোনো লেটেস্ট ক্রিপ্টোগ্রাফিক সফটওয়্যার ব্যবহারের আশা করে থাকে।

বার্তা আদান-প্রদানে ব্যাপকভাবে সকল ধরনের আন্ডারগ্রাউন্ড এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীগুলো কর্তৃক ব্যবহৃত ইন্টারসেপশন এবং কোনোপ্রকার ভয়-ভীতি ব্যতীত অন্যতম সহজ এবং নিরাপদ একটি পদ্ধতি হলো—একটি ই-মেইল অ্যাকাউন্ট তৈরি করে যারা যোগাযোগে ইচ্ছুক তাদের মধ্যে সেই অ্যাকাউন্টটির পাসওয়ার্ড দিয়ে দেওয়া হয়। তখন তাদের যে কেউই উক্ত অ্যাকাউন্টে কোনো ই-মেইল লিখে সেটিকে ড্রাফ্ট ফোল্ডারে সেইভ করে রাখতে পারে এবং যাদের কাছে পাসওয়ার্ডটি থাকে তাদের সকলেই পৃথিবীর যেকোনো জায়গা থেকে যেকোনো কম্পিউটারের সাহায্যে উক্ত ই-মেইলে প্রবেশ করতে পারে। আবার যেহেতু ই-মেইলটি প্রকৃতপক্ষে প্রেরিতই হয়নি তাই সেটিকে অন্য কারও কর্তৃক ইন্টারসেপ্ট করা বা আড়িপাতা সম্ভব হয় না।

সাইবার জিহাদিদের আরেকটি পছন্দ হলো ওয়ান-টাইম ইমেইল অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করা। এর মাধ্যমে কোনো সাইবার ক্যাফেতে ইয়াহু বা হটমেইল দিয়ে কোনো ই-মেইল অ্যাকাউন্ট চালু করে তার মাধ্যমে কোনো বার্তা পাঠিয়ে আবার সাথে সাথেই সেটিকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। আল-কায়েদা বিশেষজ্ঞ ড. আল-ফকিহ এর মতে, এই পদ্ধতিটি মাফিয়া এবং অন্যান্য অপরাধী সংগঠনগুলোর

নিকটও খুব পছন্দনীয়। এটি খুবই সহজ এবং একটি নিম্নপ্রযুক্তির ছলচাতুরীর উপায়। কিন্তু উক্ত ব্যক্তি তাহলে কীভাবে এর প্রতিউত্তর দেয়? কারণ, তারা অগ্রিমভাবেই কোনো সংকেত ব্যবহার নির্দিষ্ট করে নেয়, যেটা শারীরিকভাবে উপস্থিত কোনো মিটিংয়েই বাঞ্ছনীয় এবং যেমন ধরা যাক, যদি কেউ এমন একটি ই-মেইল অ্যাড্রেস ব্যবহার করে যার শুরু হয় ডব্লিউ দিয়ে (W), তবে উক্ত ব্যক্তির জানা থাকে এর উত্তর কোন ই-মেইলে পাঠাতে হবে।

তথ্য আদান-প্রদানের জন্য স্বল্পমেয়াদি ওয়েবসাইটও আরেকটি জনপ্রিয় পদ্ধতি। এর মাধ্যমে কোনো একটি ক্ষণস্থায়ী ওয়েবসাইটে তথ্য আপলোড করা হয় এবং সেই গ্রুপের সদস্যদেরকে এনক্রিপটেড ই-মেইলের মাধ্যমে এর অ্যাড্রেস জানিয়ে দেওয়া হয়। তখন তারা সেই সাইটে প্রবেশ করে গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের টের পাওয়ার পূর্বেই সেখানকার তথ্যসমূহ ডাউনলোড করে নিতে পারে। অতঃপর সেই সাইটটি সাথে সাথেই ধ্বংস করে দেওয়া হয়। এই পদ্ধতিটি ইরাকি মুজাহিদদের কর্তৃক তাদের কোনো অভিযানের ভিডিও পোস্ট করতে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। এজন্য তারা ইরান, সিরিয়া, তুরস্ক প্রভৃতি দেশের সার্ভার ব্যবহার করে, যাতে করে আইপি অ্যাড্রেস ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে তাদের সঠিক অবস্থানকে না জানা যায়। আরেকটি সাধারণ কৌশল রয়েছে যার সাথে একটি নিরস কৌতুকও বিদ্যমান; সেটি হলো অন্য কোনো ব্যক্তি বা সংগঠনের ওয়েবসাইট হ্যাক করা। এভাবেই ২০০৪ সালে 'আর্কানসাস ডিপার্টমেন্ট অফ হাইওয়েস এন্ড ট্রান্সপোর্টেশন'-এর মালিকানাধীন সার্ভারে জিহাদি ভিডিওর সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল।

আরেকটি ঘটনায় ফ্যান্টাসি লেখক ক্লিভ বার্কারের এক ভক্ত তার কাজগুলোকে নিয়ে একটি ওয়েবসাইট চালু করার পর সে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল, যখন তাকে উক্ত সাইটের একটি গোপন ফোল্ডারে বিন লাদেনের একটি বার্তা পাওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয় (২০০২ সালের অক্টোবরে)। ইন্টারনেট সিকিউরিটি বিশেষজ্ঞ মাইক সুইনি ব্যাখ্যা করেন কত সহজভাবে সেটি করা যায়—

> 'আপনি কোনো ওয়েবসাইটে অনুপ্রবেশ করবেন, তাহলেই আপনাকে যেকোনো ফোল্ডার তৈরির অনুমতি দেওয়া হবে। অতঃপর আপনি আপনার ফাইল যোগ করবেন এবং আপনার পদচিহ্ন মুছে দেবেন। এটাকে খুব সাধারণ মনে করা হয়; কিন্তু আপনার যদি এর ঠিকানা জানা থাকে তবে খুব সহজেই এটিকে খুঁজে পাবেন। সেই গুপ্ত ফাইলে কেবল সঠিক কোড দ্বারা প্রবেশ করা যাবে এবং সেই কোডটি উক্ত ওয়েবসাইটে ফাইলটির লিংক সহকারে অগ্রিমভাবেই আগ্রহী প্রাপকদের দিয়ে দেওয়া হয়।'

নজরদারি সংস্থাসমূহ খুব সহজেই আইপি অ্যাড্রেসের মাধ্যমে ট্র্যাকিং করতে পারে। এটা তখনই সম্ভব, যখন কোনো ইন্টারনেট অ্যাকাউন্ট রেজিস্টারকৃত থাকে এবং যদি আসলও হয় তবুও অনলাইন অ্যাক্টিভিটি চালানো উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক ব্যবহৃত যন্ত্রটিকে ভৌগোলিক অবস্থান শনাক্ত করার মতো প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি সংরক্ষিত থাকতে হয়। সাইবার জিহাদিরা এটা সম্পর্কে খুবই সচেতন এবং বর্তমানে তারা ঘন ঘন তাদের আইপি এড্রেস এবং সার্ভার পরিবর্তন করে থাকে।

আইপি অ্যাড্রেসের মাধ্যমে শনাক্তকরণ এড়ানোর আরেকটি উপায় হলো প্রক্সি সার্ভার ব্যবহার করা। মূলত এটা কোনো কম্পিউটার যা ব্যবহারকারী এবং ইন্টারনেটকে সংযুক্ত করে। যখন কোনো সাইবার জিহাদি কোনো ফাইলের অনুরোধ পাঠায়, তখন এটি প্রক্সির মাধ্যমে অগ্রসর হয় এবং সেটা ব্যবহারকারীর আইপি ইনফরমেশনকে নিজস্ব আইপি ইনফরমেশন দ্বারা প্রতিস্থাপিত করে দেয়। এ ছাড়াও নিরাপত্তা সংস্থাসমূহ নির্দিষ্ট কোনো দেশ থেকে নির্দিষ্ট কোনো সাইট ব্লক করে দিলে উক্ত ব্লককে প্রক্সি সার্ভারের মাধ্যমে পাশ কাটানো যায়। উদাহরণস্বরূপ, সৌদি আরব সেই দেশ থেকে আল-মাসারির tajeed.com ওয়েবসাইটটি ব্লক করে দিয়েছে। আল-মাসারি ব্যাখ্যা করেন :

> 'তাই আমাদের সাইটে অ্যাক্সেস করার জন্য ব্যবহারকারীরা কোনো প্রক্সি সার্ভার ব্যবহার করে। যখন আমরা কোনো নতুন সাইট প্রবর্তন করি এবং আইপি অ্যাড্রেস এর পরিবর্তন ঘটাই, তখন আমরা কেবল আমাদের নিয়মিত পাঠক ও সাবস্ক্রাইবারদের কাছে উক্ত সাইটটির বিস্তারিত সকল কিছু পাঠিয়ে দিই।'

Find-Not সার্ভার ব্যবহার করে আইপি ডিটেইলস এর মাধ্যমে গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে ভুল ট্র্যাকিং এর দিকে যেমন চালিত করা যায়, তেমনই ব্যবহারকারীও তার নিজস্ব পরিচয়কে গোপন রাখতে পারে। এটির ব্যবহারকারীর সঠিক আইপি ডিটেইলস সরিয়ে দিয়ে অন্য কোনো ভুয়া আইপি অ্যাড্রেস সরবরাহ করে, যেমন ধরুন চায়নার কোনো আইপি অ্যাড্রেস। সাইবার জিহাদিদের নিকট জনপ্রিয় এই Find-Not সার্ভার বিভিন্ন মহাদেশজুড়ে বিদ্যমান এবং তাই সেগুলোকে বন্ধ করে দেওয়া অসম্ভব। তারা এক ধরনের ই-মেইল সার্ভিসও প্রদান করে যেটা এনক্রিপশনের সাথে সাথে অতি উচ্চমানের নিরাপত্তাও প্রদান করে। আরেক ধরনের সফটওয়্যার প্যাকেজ রয়েছে যেটা দৃশ্যমান আইপি অ্যাড্রেসকে (যদি এটিও আসল নয়) সেকেন্ডে সেকেন্ডে পরিবর্তন করে এবং ফিজিক্যাল ট্র্যাকিংকে অসম্ভব করে দেয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের দাবি মোতাবেক আল-কায়েদার অধিকাংশ আর্থিক লেনদেন ই-মেইলের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। তবে আমি যেসব

ইসলামিস্ট ভাষ্যকারদের সাথে আলোচনা করেছি তাদের প্রায় সকলেই এটাকে খারিজ করে দিয়েছেন। তাদের মতে এরূপ যোগাযোগব্যবস্থা এখন খুব ঝুঁকিপূর্ণ এবং এটি একটি অতীত ইতিহাস। ক্যাশ টাকাই এখনও তাদের পছন্দনীয় মাধ্যম, যেটা বার্তাবাহকদের মাধ্যমে ব্যাগভরতি করে পাঠানো হয়।

কিছু কিছু লেনদেন ইলেকট্রনিক্যালি নতুন পে-অ্যাজ-ইউ-গো ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে করা হয়। এটি ভাউচার ক্রয়ের মাধ্যমে তহবিলের জোগান দেয়। আল-মাসারি বর্ণনা করেন—

> 'মনে করুন, কেউ আল-জারকাভির ইরাক জিহাদে সহায়তা করার ইচ্ছা পোষণ করল। এ ক্ষেত্রে আল-জারকাভিকে যে কারও নামে কোনো পে-অ্যাজ-ইউ-গো ক্রেডিট কার্ড অ্যাকাউন্ট চালু করতে হবে; হতে পারে এটা সুদূর পূর্বাঞ্চলের কোনো গাধার নামে। এরপর সেই আগ্রহী ব্যক্তিকে ভাউচার ক্রয় করে এর রেফারেন্স নাম্বার আল-জারকাভিকে ই-মেইল করতে হবে এবং সে সেটি ব্যবহার করে তার ক্রেডিট কার্ড ভাঙাতে পারবে এবং তখন তার পছন্দসই সকল কিছুই ক্রয় করতে পারবে।'

আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট সাইটসমূহে যেমন alneda.com এ আরও নিরাপদ বিভিন্ন সাইটের জন্য এনক্রিপটেড লিংক বিদ্যমান থাকত। যখন কোনো নতুন আল-কায়েদা সাইট চালু করা হয়, লিংকের এই ইঁদুর-বিড়াল খেলা এখনও একটি প্রচলিত ঘটনা; যদিও এগুলো সর্বদাই এনক্রিপটেড থাকে না এবং এর বদলে বরং আগ্রহী পাঠকদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের জন্য কাজ করা ইন্টারপ্রেটাররা উৎকৃষ্ট আরবি কথক হতে পারে, কিন্তু তাদের কর্তৃক ক্রিপটিক ধরন, ইসলামিক, ভৌগোলিক অথবা জিহাদি রেফারেন্সসমূহ উপলব্ধি করতে পারা অসম্ভবই বটে এবং এসবের মাধ্যমেই কোনো লিংক তার পথনির্দেশক মূলভিত্তির সূত্র প্রদান করে থাকে। যখন নতুন কোনো পোস্ট করা হয়, কোনো অভিজ্ঞ সাইবার জিহাদির জন্য লেটেস্ট আল-কায়েদা সাইটের লিংক অনুসরণ করা পাঁচ মিনিটের ব্যাপার। অন্যদিকে বিশেষজ্ঞদের মতে মার্কিন কিংবা ব্রিটেনের গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের জন্য প্রচলিত উপায়ে সেই সাইটে আগমন করতে চব্বিশ থেকে আটচল্লিশ ঘণ্টা লাগতে পারে, যে সময়ের মধ্যেই আল-কায়েদা উক্ত সাইটটি বন্ধ করে দেয়।

অপরিবর্তনীয়ভাবেই এসবের সূত্রপাত হয় জিহাদি ওয়েবসাইটসমূহে কোনো-না-কোনো চ্যাট ফোরাম থেকে। এগুলো প্রকৃত চ্যাট ফোরাম এবং সেখানে পরিকল্পনা, সংবাদ, মিথস্ক্রিয়া প্রভৃতি গুনগুনিয়ে চলতে থাকে এবং প্রায় সময়ই অতিমাত্রায় হিংসাত্মক প্রকৃতিতে। কোনো প্রশিক্ষিত চোখ সহজেই সূত্রসমূহ ধরে ফেলতে পারে, যেগুলো অন্য কোনো সাইটের লিংকে তাদের পরিচালিত করে।

নিবেদিত ভিজিটর বুঝে ফেলে যে, কোন পথনির্দেশক লিংকে তাকে ক্লিক করতে হবে এবং অসংখ্য ওয়েব সাইটের মধ্য দিয়ে একের পর এক দুঃসাহসিক অভিযানের কোথায় তাকে নোঙর ফেলতে হবে। তবে একটি নতুন ধরনের সফটওয়্যার প্যাকেজ রয়েছে, যেটা অনলাইন ভিজিটরকে স্বয়ংক্রিয় পথনির্দেশনা দেওয়ার মাধ্যমে লেটেস্ট সাইটে তাৎক্ষণিক অ্যাক্সেস প্রদান করে এবং এগুলো সাম্প্রতিক সময়ে ঘরোয়াভাবেই জিহাদ সহানুভূতিশীল আইটি বিশেষজ্ঞরা ডেভলপ করে এবং জিহাদি ওয়েবসাইটগুলোর মাধ্যমে নির্ভরযোগ্য পরিচিতদের কাছে সরবরাহ করা হয়। যখন কোনো নতুন ওয়েব এড্রেস সকলের জানাশোনা হয়ে যায়, তখন সেটি বন্ধ করে দেওয়া হয় অথবা হ্যাক হয়ে যায়। কিছু কিছু জিহাদি ওয়েবসাইট চূড়ান্ত গোপনীয়তা অবলম্বনের মাধ্যমে টিকে থাকে। সেখানে তাদের প্রতিনিয়ত পরিবর্তনকৃত পাসওয়ার্ডসমূহ বিশ্বস্ত ভিজিটরদের ছোট কোনো দলের মধ্যে প্রদান করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, আল-কায়েদা ইন দ্য ল্যান্ড অফ টু রিভার্স এর 'আল-আনসার' ওয়েবসাইটে কোনো সাধারণ উপায়ে প্রবেশ করতে চাইলে মনে হবে সেটি হ্যাকড হয়েছে। কিন্তু লেটেস্ট পাসওয়ার্ডধারী ব্যক্তিরা তাতে অ্যাক্সেস করতে পারে। আল-ফিরদাউস এখনো (সাইটটি ইরাকের জাইশ আনসার আস-সুন্নাহ এর অভিযানসমূহ পোস্ট করে থাকে) সার্ভার কিছুদিন পরপরই পরিবর্তন করে এবং নির্বাচিত সামান্য কিছু লোকের নিকট—যাদের মধ্যে কিছু সাংবাদিকও রয়েছে—এনক্রিপটেড ই-মেইলের মাধ্যমে নতুন অ্যাড্রেসের বিস্তারিত পাঠিয়ে দেয়।

আল-ফকিহ্ উল্লেখ করেন—

> 'শারীরিক সুরক্ষা সাইবার জিহাদেও সংকটপূর্ণ হতে পারে। তবে ইরাকের সুন্নি ট্রায়াঙ্গলের জিহাদিরা সেখানকার বিপুল সংখ্যক বিদ্রোহীদের দ্বারাই সুরক্ষিত থাকে। যদি মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাসমূহ ইরাকের বিদ্রোহী অঞ্চলে কোনো ইন্টারনেট যোগাযোগে ব্যবহৃত সাইবার ক্যাফে বা টেলিফোন লাইনের সঠিক অবস্থান খুঁজে বের করে ফেলতে সক্ষম হয়... তাহলে কি হবে? তারা খুব কম ক্ষেত্রেই সেখানে কোনো অভিযান পরিচালনা করতে সক্ষম হয়। অন্যদিকে যদি বাগদাদের কোন সাইবার ক্যাফে থেকে কেউ জিহাদি ওয়েবসাইটসমূহে লগইন করে; তখন যদি ক্যাফের মালিক সতর্ক থাকে এবং নিরাপত্তা সংস্থার সাথে সরাসরি যোগাযোগ থাকে তবে তাকে আটক করা সম্ভবপর হতেও পারে।'

বিন লাদেন এবং অন্যান্য পলাতক আল-কায়েদার নেতারা আর ইন্টারনেট ব্যবহার করেন না। কারণ বর্তমানে কোন সহানুভূতিশীল রাষ্ট্র কর্তৃক তাদের সুরক্ষা দেওয়া হয় না যেমনটা আফগানিস্তান দিত।

অনুসন্ধান

জিহাদি সাইটসমূহ ট্রাকিংয়ের জন্য নজরদারি কার্যক্রমের অধিকাংশই বিভিন্ন প্রাইভেট সংস্থা করে থাকে; এফবিআই (FBI) কিংবা এমআই-সিক্স (MI-6) নয়। সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত এবং সর্বাধিক সফলগুলো হলো, হাগানাহ, সাইট (SITE; রিটা কেটজ পরিচালিত, যার পারিশ্রমিক-ভিত্তিক ক্লায়েন্টদের মধ্যে এফবিআইসহ সমগ্র বিশ্বব্যাপী আরও অনেক মিডিয়া আউটলেট বিদ্যমান) এবং জিহাদ-ওয়াচ। এদের মত কার্যকরী বা বিখ্যাত না হলেও itshappening.com ভিন্ন আরেকটি কারণে খুব সাড়া ফেলেছিল। এই ওয়েবসাইটটি জন মেসনার নামক এক সাবেক পর্নোগ্রাফি ব্যারন কর্তৃক পরিচালিত হতো। নাইন ইলেভেনের পর জিহাদি ওয়েবসাইট বিষয়ে সে তার দৃষ্টির পাল্লাকে সম্প্রসারণ করে। সে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটে al-neda.com এ সাইবার অ্যাটাকের জন্য সুপ্রসিদ্ধি লাভ করেছিল এবং সেটিকে সে এমনভাবে হ্যাক করেছিল যাতে করে এর ভিজিটররা এফবিআইয়ের মোস্ট ওয়ান্টেড পেইজে পুনঃনির্দেশিত হয়। তবে এ ক্ষেত্রে জিহাদিরাই শেষ হাসি হেসেছিল। কারণ তারা শেষ পর্যন্ত তার চ্যাট ফোরাম ব্যবহার করা শুরু করে দেয় এবং এর অ্যাড্রেসটিকে উক্ত সাইটের অ্যাড্রেস দিয়ে প্রতিস্থাপন করে। সুতরাং এটাই প্রতীয়মান হলো যে, এই যুদ্ধটি কৌতুকরসবোধ বিবর্জিত নয়; যদিও অত্যাবশ্যকভাবেই উক্ত কৌতুকরসবোধটি তিক্ত।

আমেরিকা ভিত্তিক প্রো-জায়োনিস্ট ওয়েবসাইট হাগানাহ (হিব্রুতে হাগানাহ অর্থ প্রতিরক্ষা) অ্যারন ওয়েইসবার্ড কর্তৃক পরিচালিত হয়। এটি জিহাদি সাইটগুলোকে ট্রাকিং করে তাদের আইএসপিকে জানিয়ে দেয় যে, তারা কোনো জঙ্গি সাইটের হোস্টিং করছে। স্বাভাবিকভাবেই উক্ত আইএসপি তৎক্ষণাৎভাবে সেই সাইটটি বন্ধ করা নিশ্চিত করে। অনেক পর্যবেক্ষকদের মতে হাগানাহ নিজেও জিহাদি সাইটগুলো হ্যাক করে ধ্বংস করে দেয়। 'উটাহ ইনডাইমিডিয়া' নামক আমেরিকা ভিত্তিক মিডিয়া কালেক্টিভ দাবি করেছে তারাও হাগানাহ এর সাইবার অ্যাটাকের শিকার হয়েছে। এ ছাড়াও তারা ওয়েইসবার্ডকে 'জাতিগত ঘৃণা পোষণকারী' এবং 'সকল স্বাধীন চিন্তার বিরোধী' বলে সমালোচনা করে। হ্যাকিং এর কারণে প্রায়ই কোনো উদ্যমী জিহাদি তার পছন্দের ওয়েবসাইটে প্রবেশের পর দেখতে পায় সেটি কোনো মার্কিন অনলাইন শপ দিয়ে প্রতিস্থাপিত করে দেওয়া হয়েছে অথবা এরকম পরিহাস্যকর কোন কিছু। ওয়েইসবার্ড এর মতে তিনি কোন

সাইট ট্র্যাকিং করা এবং তাদের ওয়েবমাস্টারদের খুঁজে বের করার ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা থেকে দুই সপ্তাহ এগিয়ে থাকেন। আজ অবধি হ্যাগানাহ্ প্রায় সাতশরও অধিক জিহাদি সাইট ধ্বংস করেছে। ওয়েইসবার্ড নিজেও হ্যাকারদের হামলার শিকার হয়েছেন এবং তারা যখন তার বাসার ঠিকানার সন্ধান পেতে সক্ষম হয়, তখন তারা উক্ত ঠিকানাকে বিভিন্ন প্রো-জিহাদি ওয়েবসাইটে পোস্ট করে দেয়। ওয়েইসবার্ড বলেন, এরপর থেকেই তিনি ক্রমাগত মৃত্যুর হুমকি পেয়ে আসছেন।

১৯৯০ দশকজুড়েই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে এনক্রিপশন প্যাকেজসমূহ রপ্তানি কঠোর থেকে কঠোরতর হয়েছে এবং এমনকি কিছু প্রোগ্রাম অস্ত্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়। নাইন ইলেভেনের ঘটনার পর ইন্টারনেটে ক্রিপ্টোগ্রাফি ক্র্যাক-ডাউন করার জন্য মার্কিন এবং ব্রিটেন প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায় থেকে আহ্বান জানানো হয়েছিল। এরূপ একটি আইডিয়া কি এসক্রো (key escrow) প্রয়োগের ব্যাপারে ২০০১ সালের শেষদিকে বেশ বাদানুবাদ হয়েছিল। কি এসক্রো (key escrow) দ্বারা কোন বার্তা এনক্রিপ্ট এবং ডিক্রিপ্ট করার জন্য প্রয়োজনীয় কি (key) কে প্রয়োজন হলে অন্য কোনো তৃতীয় পক্ষ যেমন সরকারি সংস্থাসমূহের আয়ত্তাধীন করে দেওয়া সম্ভব হতো। যদিও মানবাধিকার সংস্থাসমূহ যেমন 'প্রাইভেসি ইন্টারন্যাশনাল' নাগরিক স্বাধীনতাহরণ এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাবার ভিত্তিতে এর প্রতিবাদ করে। তারা উল্লেখ করে—এই ব্যবস্থা অনলাইন ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে লেনদেনকে ঝুঁকির মুখে ফেলবে এবং এর ফলে লোকজন অনলাইন শপিং বন্ধ করে দেবে। অতএব, এই আইডিয়া আস্তে করে নিভে গেল।

কিন্তু তা সত্ত্বেও এটি একটি ধ্রুব সত্য যে, বাণিজ্যিকভাবে সুলভ এনক্রিপশন প্যাকেজগুলোতে সর্বদাই কোনো-না-কোনো 'ব্যাক ডোর' থাকে, যার ফলে নজরদারি কর্তৃপক্ষ সেসব কি (key) এর অ্যাক্সেস পেতে পারে। তবে পরিহাসের ব্যাপার হলো, যাদের কোনো কিছু লুকানোর থাকে তাদের কেউই প্রথম ধাপে এরূপ অনিরাপদ সফটওয়্যার ক্রয় করবে না; হয় তারা নিজেরাই সফটওয়্যার ডেভেলপ করে নেয় অথবা অতি সাম্প্রতিক টেকনোলজি যেটি ২০৪৮ বিট এনক্রিপশন প্রদান করে এবং 'ব্যাক ডোর' এর অনুপস্থিতির নিশ্চয়তা দেয় সেখানে বিনিয়োগ করে। (এই পরিপ্রেক্ষিতে এটা বলে রাখা ভালো যে, যেসব এনক্রিপশন ৪০ বিটের হয় সেগুলোকে ভাঙতে পারাও অত্যন্ত জটিল বলে বিবেচিত হয়)।

আল-কায়েদা কুশলীদের সাথে সাথে জব্দকৃত ল্যাপটপসমূহ নিরাপত্তা সংস্থাসমূহের তথ্যের একটি অমূল্য উৎস। সাইবার ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা সেখানে ব্যবহৃত তথ্যগুলো ডাউনলোড করতে পারে। যেসব ওয়েবসাইট পরিদর্শন করা

হয়েছে সেগুলোকে শনাক্ত করতে পারে। জিহাদিরা বর্তমানে কোন সফটওয়্যারগুলো ব্যবহার করছে সেগুলো হুবহু জেনে নিতে পারে এবং এটাও জানতে পারে যে, চলমান সময় আল-কায়েদা বাস্তব এবং ভার্চুয়াল এই উভয় জগতেই কোন স্ট্র্যাটেজি অবলম্বন করছে।

আল-ফকিহ এর মতে, এটা সর্বজন পরিজ্ঞাত যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সৌদি আরবকে লেটেস্ট আপডেটেড পর্যবেক্ষণ সফটওয়্যার (Monitoring Software) জোগান দেয়; কারণ সাইবার জিহাদিদের অধিকাংশই (৭০ ভাগ পর্যন্ত) সৌদি ভিত্তিক। অবধারিতভাবেই এসব সফটওয়্যার কেবল আল-কায়েদার বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয় না, বরং সকল ভিন্নমত পোষণকারীদের বিরুদ্ধেই ব্যবহৃত হয়। এটিও সর্বজন স্বীকৃত বলে মনে করা হয় যে, মিশরীয় কর্তৃপক্ষেরও নিজস্ব সাইবার স্কোয়াড রয়েছে। ইসলামিস্ট ইয়াসির আল-সিরির মতে—যার নিজস্ব ওয়েবসাইটও ক্রমাগত হ্যাকিং, নষ্ট এবং ধ্বংস হবার সম্মুখীন হয়েছে—সাইবার স্পেসে মিশর কর্তৃপক্ষের প্রথম পছন্দই ওয়েবসাইটসমূহ ধ্বংস করে দেওয়া এবং DOS ট্রিগারিংয়ের মাধ্যমে তারা সেগুলো করে থাকে। এর মাধ্যমে বিশেষভাবে নির্মাণকৃত সফটওয়ার ব্যবহার করে অনলাইন অ্যাটাকের মাধ্যমে উক্ত সাইটটিকে বেহুদা এবং আজেবাজে উপাদান দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিয়ে সম্পূর্ণ নেটওয়ার্কটিকেই ধ্বংস করে দেওয়া হয়। সরল বিশ্বাসে আমরা যেসব নিরাপত্তা উপাদানসমূহ গ্রহণ করি সেগুলো প্রকৃতপক্ষে কোন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ্যাকারের সামনে অন্তঃসারশূন্য। পাসওয়ার্ড ব্রেকিং সফটওয়্যার কোনো স্পাইকে আট ডিজিটের নিচের পাসওয়ার্ড সেকেন্ডের মধ্যেই ব্রেক করতে সমর্থ করে। এর চেয়ে অধিক জটিল পাসওয়ার্ড এর ক্ষেত্রে কি ট্র্যাকার (key tracker) নামের একটি সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে, যেটা যখনই আপনি কোন কিছুতে অ্যাক্সেস করবেন, সেটা সাদামাটাভাবে স্পাই এর সাথে যোগাযোগ করে সবকিছুই সংযুক্ত করে দেবে।

অধিকাংশ জিহাদি ওয়েবসাইটগুলো কয়েক সপ্তাহের মধ্যে হয়তো হ্যাকারদের দ্বারা বন্ধ হয়ে যায় নতুবা সেই সাইটের মালিকই সেটিকে বন্ধ করে দেয়। যেগুলো এরচেয়েও বেশি সময় ধরে চালু থাকে সেগুলো হয়তো অধিক শক্তিশালী স্তরবিশিষ্ট সফটওয়্যার দিয়ে সুরক্ষিত থাকে নয়তো নজরদারি কার্যক্রমের উদ্দেশ্যে নিরাপত্তা সংস্থা কর্তৃক সেগুলোর স্থিতিকে মঞ্জুর করা হয়। যদি কোন সাইটের সুপ্রতিষ্ঠিত এবং জনপ্রিয় কোন চ্যাট ফোরাম থাকে তবে সেটাকে বন্ধ করে দেওয়ার পরিবর্তে চালু রাখার মধ্যেই গোয়েন্দা সংস্থার অধিকতর লাভ বিদ্যমান। এ ছাড়াও কিছু বাহ্যিক জিহাদি সাইটসমূহ প্রকৃতপক্ষে গোয়েন্দা সংস্থাসমূহ কর্তৃক চালুকৃত, যেগুলোর মাধ্যমে অতিসরল এবং শিশুসুলভ জঙ্গিদের পরিচয় এবং উদ্দেশ্য উন্মোচন করা যায়। এই জোচ্চুরি সচরাচর অভিজ্ঞ ব্যবহারকারীদের কাছে

প্রতীয়মান হয়ে যায়। যারা খুব দ্রুতই পর্যবেক্ষণ করতে পারে যে, উক্ত সাইটটি খুবই মসৃণ এবং বাকপটুতাপূর্ণ, খুব ব্যয়বহুল অথবা কিছু কিছু ক্ষেত্রে খুবই পশ্চিমা ঘেঁষা অথবা কখনো কখনো এই কারণেও যে, সেগুলোতে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট অথবা বিক্রয়ের জন্য পণ্যও থাকতে দেখা যায়। যারা বুলেটিন বোর্ডের দায়িত্বে থাকে তাদের দিকে একটু দৃষ্টিপাত করা কোনো সাইট কতটা নির্ভরযোগ্য তা বের করে ফেলার আরেকটি উপায়। প্রকৃত যুদ্ধের মতো সাইবার যুদ্ধ-বিগ্রহেও গুপ্তচরবৃত্তি একটি অতিমাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ অংশ। গোয়েন্দা সংস্থাসমূহ জিহাদি সাইটগুলোতে বিভিন্ন উপায়ে গোয়েন্দাগিরি করে। সবচেয়ে প্রচলিত উপায় হলো জিহাদ সন্ধানি কোনো আগ্রহী মুসলিমের ভান করে কোনো চ্যাট ফোরামে অনুপ্রবেশ করা। এর পেছনে অভিসন্ধি থাকে রিক্রুটদের ফাঁদে ফেলা, কোনো অভিযানের পরিকল্পনা চলছে কিনা তা উদঘাটিত করা বা অতি উৎসাহী সহকর্মীদের ধোঁকায় ফেলে তাদের পরিচয়কে উন্মোচন করা। পরিহাসের বিষয় হচ্ছে, এসব প্রচেষ্টাসমূহ জেমস বন্ডের চাইতে ইন্সপেক্টর ক্লোসেয়াই এর সাথেই অধিকতর মানানসই। অনলাইন পরিদর্শকরা রসিকতা করেই বলে যে, জিহাদি চ্যাটরুমসমূহ সৌদি পুলিশ সদস্যদের দ্বারা ভরতি থাকে যাদেরকে বেতনই দেওয়া হয় কেবল সারাদিন অনলাইন চ্যাট করার জন্য। এ নিয়ে বিভিন্ন চিত্তাকর্ষক গল্পও প্রচলিত আছে যে, কীভাবে মেকি ধর্মীয় উদ্দীপনা, অসংগত বুলি অথবা নিছক কোন অনিয়ন্ত্রিত উচ্ছ্বাস আন্ডারকভার এজেন্টদের ছদ্মবেশেকে উন্মোচন করে দিয়েছে। যদিও কোনো অভিজ্ঞের চোখে এসব ভন্ডামি সহজেই ধরা পড়ে, কিন্তু মাঝেমধ্যেই শিক্ষানবিশদের অনায়াসে ফাঁদে ফেলা যায়। যদি গোয়েন্দা তথ্যের মাধ্যমে কাউকে আটক করা যায় তবে সিক্রেট পুলিশ উক্ত কয়েদির অনলাইন পরিচয় এবং পাসওয়ার্ডকে ব্যবহার করে এবং আরও অসতর্ক ভিজিটরদের ফাঁদে ফেলানোর চেষ্টা চালাতে থাকে। ইদানীংকালে কোন স্বতন্ত্র পরিস্থিতি বাদে আসল জিহাদিরা চ্যাট ফোরামে কথা বলার ব্যাপারে খুবই সচেতন। এর ব্যতিক্রম হয় যখন খুব সামান্য কিছু নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির কাছে কোন পাসওয়ার্ড সরবরাহ করা হয় অথবা যখন অফলাইন আলোচনা চলমান থাকে এবং কোনো ব্যক্তিদের মধ্যে এনক্রিপটেড মেইল চালাচালি হয়।

সর্বপরি পশ্চিমা সরকারব্যবস্থা এর বাণিজ্যিক প্রয়োগের বিস্তর পরিসর এবং সুবিশাল কার্যকারিতার ক্ষয়ক্ষতি না করে বিভিন্ন উপায়ে এখনও ইন্টারনেটকে নিয়ন্ত্রণের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করা হয়েছে, যেগুলো আইএসপিদের আরও সতর্ক হয়ে কাজ করতে বাধ্য করছে। যদি কোন আইএসপি কোন গেরিলা সাইটের হোস্টিং করে তবে তার মালিক 'ষড়যন্ত্র এবং সন্ত্রাসবাদের সমর্থন এবং পৃষ্ঠপোষক' হিসেবে অভিযুক্ত হতে পারে। এ

কারণেই পূর্বে লন্ডনে বসবাসকৃত বাবর আহমাদকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের মাটিতে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে। তিনি ১৯৯৮ থেকে ২০০৪ সাল অবধি বিভিন্ন ইন্টারনেট ওয়েবসাইট তৈরি এবং ব্যবহার; ই-মেইল যোগাযোগ এবং সহায়তা; বিশেষজ্ঞসুলভ উপদেশ; কমিউনিকেশন ইকুইপমেন্ট, মিলিটারি আইটেম, মুদ্রা পাচার, চেচেন মুজাহিদ এবং তালেবানদের জন্য রিক্রুটিং, সহায়তার জন্য কর্মী নিয়োগ, সহিংস জিহাদের জন্য তহবিল জোগান প্রভৃতির সাথে জড়িত ছিলেন।

অনলাইন উম্মাহ

অলব্রেচট হফেইঞ্জ উল্লেখ করেন—

> 'বিশ্বজনীনভাবেই আরবি ভাষার ওয়েবসাইটগুলো এই দিক দিয়ে অনন্যসুলভ যে, এর সবচেয়ে জনপ্রিয় একশ ওয়েবসাইটের মধ্যে কমপক্ষে দশটি সন্দেহাতীতভাবে ইসলামিক ঘরানার। অগণিত চাহিদা বিশিষ্ট পশ্চিমা ইন্টারনেট ইউজারদের বিপরীতে, আমরা এটা বলতে পারি যে, ইন্টারনেটের ভার্চুয়াল জগতেও মুসলিম জনগোষ্ঠী স্বতন্ত্রভাবে তাদের সংস্কৃতি এবং ধর্মচর্চা করে।'

কোন সাইটে লগইন বা কোনো চ্যাট ফোরামে জয়েন করার মাধ্যমে বিশ্বের যেকোনো প্রান্তের যেকোনো মুসলিম তাৎক্ষণিকভাবে নিজেকে উম্মাহর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে অনুভূত করতে পারে। জিহাদি ওয়েবসাইটগুলো মুসলিম সাইবার কমিউনিটিকে যেমন ভাবাদর্শিক লড়াইয়ে সক্ষম করেছে তেমনই শরীরিক লড়াইয়ের পথকেও প্রশস্ত করে দিয়েছে এবং এটিই আল-কায়েদার চলমান উপস্থিতি এবং সম্প্রসারণের একটি প্রধান ফ্যাক্টর। প্রশিক্ষিত যোদ্ধাদের খুঁজে বের করা আল-কায়েদার জন্য কোনো চ্যালেঞ্জ নয়, বরং অপেক্ষমান হাজার হাজার নতুন জিহাদি এবং জিহাদ-প্রেমিক আফগানিস্তান, ইরাক, বসনিয়া, চেচনিয়া প্রভৃতি যুদ্ধ ফেরত যুবকদের কেন্দ্রীয় সমন্বয় এবং বিস্তৃতিই তাদের বড় চ্যালেঞ্জ। আগ্রহী যোদ্ধাদেরকে কোনো লড়াইয়ে যুক্ত করা এবং হালনাগাদ অভিযানসমূহের সাথে তাদের সংযুক্ত রাখার মাধ্যমে ইন্টারনেট এই চ্যালেঞ্জের সর্বোত্তম সমাধান সরবরাহ করেছে।

অধিকাংশ জিহাদি সাইটের অনেকগুলো বিভাগ থাকে। সচরাচর এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সবচেয়ে বৃহত্তম হলো ধর্মীয় বিভাগ; যেটিতে অসংখ্য ফতোয়া অন্তর্ভুক্ত থাকে। যেমন কাদেরকে বৈধ লক্ষ্য হিসেবে গণ্য করা যাবে, জিহাদের কুরআনিক রেফারেন্স, কোন কোন কর্মপন্থা জিহাদ হিসেবে গণ্য হবে, শাহাদাতের পরিপ্রেক্ষিত প্রভৃতি। প্রায়শ ধর্মীয় শাইখদের নিয়ে অনলাইন ধর্মতত্ত্বীয়

আলোচনার আয়োজন করা হয় এবং সেখানে ব্যাপক পরিসরের অসংখ্য প্রশ্ন এসে থাকে—যেমন, কোনো ব্যক্তি কর্তৃক তার বাগদত্তার সাথে মোবাইলে আলাপচারিতার বৈধতা থেকে কোন জিম্মিকে চাকু বা তলোয়ারের পরিবর্তে করাত দিয়ে শিরশ্ছেদ করা যাবে কি না ইত্যাদি ইত্যাদি। (এই দুটি প্রশ্নই বাস্তব যেগুলো আল-কুদস আল-আরাবির গবেষকরা এই ধরনের ওয়েবসাইটসমূহে খুঁজে পেয়েছে)।

ওয়েবসাইটসমূহের জিহাদ বিভাগে আগ্রহী রিক্রুটদের লড়াইয়ে যোগদানে উদ্দীপনা দেওয়া হয় এবং বিভিন্ন সাধারণ পরামর্শ দেওয়া হয়; উদাহরণস্বরূপ, ইরাকের সবচেয়ে নিরাপদ গমনপথ এবং এমনকি নিকটস্থ দেশগুলোর সহানুভূতিশীল মসজিদগুলোর নাম ঠিকানা প্রভৃতি। তবে কখনোই সংবেদনশীল তথ্যসংক্রান্ত কোনো ঝুঁকি নেওয়া হয় না। সেখানে শহিদদের ওছিয়তনামা সহকারে তাদের ছবির সংগ্রহশালার প্রদর্শনী থাকে এবং সেটা অনেক সময় ভিডিও ফরম্যাটে থাকে। অধিকাংশ সাইটের IT সেকশন থাকে, যেখানে অংশগ্রহণকারীদেরকে জিহাদকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সাইবারস্পেস ব্যবহারের নতুন নতুন পন্থা খুঁজে বের করা এবং তাদের জ্ঞানকে শেয়ার করা জন্য আহ্বান জানানো হয় । এসব আবেদন উৎসাহের সাথে তরুণ প্রজন্মের হাতেই পূর্ণ হয়; যারা একসময় বাস্তব জগতে যতটুকু সময় ব্যয় করত সাইবার স্পেসে ক্রমবর্ধমানভাবে এর চেয়েও বেশি সময় ব্যয় করছে। বুলেটিন বোর্ড বা চ্যাটরুম নিশ্চিতভাবেই জিহাদি ওয়েবসাইটসমূহের সর্বাধিক জনপ্রিয় ফোরাম; সেখানে ভিজিটররা তাদের কমেন্ট করতে পারে এবং চলমান আলাপচারিতা বা বিতর্কে প্রত্যুত্তর জানাতে পারে। অনেকসময় বিশেষজ্ঞরা প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্যই বসে থাকে; বিশেষত সেসব সাইটে, যেগুলো সামরিক প্রশিক্ষণ এবং লজিস্টিকস প্রদর্শন করে।

অনেক জিহাদি সাইটেরই 'ফিমেল সেকশন' বিদ্যমান, যেখানে স্ত্রী এবং মায়েদের উৎসাহিত করা হয় জিহাদে তাদের পুরুষদের সহায়তা করার জন্য এবং উক্ত মনস্তাত্ত্বিক লড়াইয়ে সঙ্গ দেওয়ার জন্য, যেটাকে একটি ওয়েবসাইট বর্ণনা করে, 'সেই ব্যাধি এবং সেই ত্রুটি যেটা জীবনকে ভালোবাসে এবং মৃত্যুকে ঘৃণা করে'।

২০০৫ সালের মে মাসে ইন্টারনেটে বিশেষভাবে মহিলাদের জন্য ডিজাইনকৃত একটি সাইটের আবির্ভাব ঘটেছিল। সৌদিভিত্তিক 'আল-খানসা' ওয়েবসাইটটি মহিলাদেরকে তাদের সন্তান এবং উগ্রপন্থি স্বামীদেরকে জিহাদে রত হওয়ার অনুপ্রেরণা দিতে উৎসাহিত করত। (আল-খানসা ইসলামি ইতিহাসের শুরুর দিককার একজন মহিলা কবি, যিনি কাফেরদের সাথে যুদ্ধে নিহত শহিদদের

গুণকীর্তন করে কবিতা রচনা করতেন)। যেসব মহিলা যুদ্ধে যোগদান করতে চায়, তাদের জন্য শারীরিক প্রশিক্ষণের পরামর্শ প্রদান করলেও এটি তাদেরকে স্মরণে রাখতে বলত যে, আল্লাহর রাহে নিবেদনের নৈবেদ্য হিসেবে (তাদের) স্বামীদের রক্ত এবং (তাদের) সন্তানদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে উৎসর্গ করে দেওয়াই তাদের প্রথম কর্তব্য।

নজরদারির ঊর্ধ্বে

সুনিশ্চিতভাবেই জিহাদি গোষ্ঠীগুলোর নিকট ইন্টারনেটের একটি দীর্ঘমেয়াদি সুবিধা হলো আনসেন্সরড প্ল্যাটফর্ম; যা তাদের খবরাখবর এবং তথ্যাবলির পূর্ণাঙ্গ প্রচারণাকে সুনিশ্চিত করে। উদাহরণস্বরূপ নিজস্ব নিউজ প্রোগ্রাম 'ভয়েস অফ দ্য খিলাফত' আল-কায়েদা নেটওয়ার্ককে বহিরাগত যেকোনো সম্পাদকীয় হস্তক্ষেপ এবং এক সময়কার আল-জাজিরার ওপর নির্ভরশীলতা থেকে মুক্তি দিয়েছে এবং সুচারুরূপে এর প্রতিটি বার্তা এবং ভিডিও ফুটেজসমূহ সম্প্রচারে সমর্থ করে তুলেছে। ২০০৫ সালের এপ্রিল মাসে আল-কায়েদা এর নেতৃত্বস্থানীয় কৌশলবিদ মিশরীয় বংশোদ্ভূত মুহাম্মদ মাক্কাভির মাধ্যমে একটি ডকুমেন্ট প্রকাশ করেছিল, যার শিরোনাম ছিল '২০২০ সাল পর্যন্ত আল-কায়েদার স্ট্র্যাটেজি'। এটি উক্ত সংগঠনটির দীর্ঘকালীন পরিকল্পনার রূপরেখা অঙ্কন করে যার সূচনা হয় ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের মাধ্যমে। এই দীর্ঘ ডকুমেন্টটি অনলাইনে পোস্ট করার উদ্দেশ্য ছিল স্বাধীন মিলিশিয়াগুলোকে উক্ত নেটওয়ার্কের দীর্ঘকালীন স্ট্র্যাটেজিতে সর্বোচ্চ ভূমিকা রাখতে সমর্থ করে তোলা।

সাম্প্রতিক সময়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পোস্ট ছিল ২০০৪ সালের আল-জারকাভি কর্তৃক বিন লাদেনের প্রতি আনুগত্যের ঘোষণা। যখনই এই সংবাদটি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে, এটি আল-কায়েদাপন্থি জিহাদি ইচ্ছুকদের নিকট ইরাকে পাড়ি জমানোর একটি উন্মুক্ত আমন্ত্রণ হিসেবে পরিগণিত হয় এবং তারা সেভাবেই এর সাড়া দিয়েছিল। ইন্টারনেট সেন্সরশিপের এই বিস্ময়কর অনুপস্থিতিই সেসব লক্ষ লক্ষ মুসলিমদের নিকট ব্যাপক আকর্ষণপূর্ণ, যারা কঠোর অত্যাচারী শাসনব্যবস্থার অধীনে বসবাস করে। যখন সেই উপাদানটি এমন কিছু হয়, যেটা তারা মনেপ্রাণে কামনা করে তখন সেসবের সমাহার দুর্নিবার হয়ে ওঠে। লন্ডনে বসে ইন্টারনেটের মাধ্যমে আল-ফকিহ রিয়াদের বিরুদ্ধে কমপক্ষে একটি হলেও সফল আলোড়ন তৈরিতে সক্ষম হয়েছিলেন। সৌদি কর্তৃপক্ষ সাইবার স্পেসে ঘটমান আয়োজন এবং প্রস্তুতিসমূহে বাধা দিতে পারেনি; যদিও যখন এর বাস্তবায়ন ঘটেছিল শরীরীভাবে, যা সেই দেশে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল, তখন তারা এর কঠোর দমন-নিয়ন্ত্রণ এবং শাস্তিবিধান করেছিল।

ইরাকের প্রায় প্রতিটি বিদ্রোহী অভিযানকেই ক্যামেরাবন্দি করা হয় এবং সেগুলোর সাথে জিহাদি সংগীত যোগ করে বেশ কিছু ওয়েবসাইট এবং বুলেটিন বোর্ডে পোস্ট করা হয়। সেখানে এসব রক্তারক্তিকে বীরোচিত এবং মহিমান্বিত করে উপস্থাপন করা হয় এবং সর্বদাই যখন বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হয় অথবা স্নাইপার থেকে ফায়ার করা হয় তখন ক্যামেরাম্যান আল্লাহু আকবার (আল্লাহ মহান) বলে তাকবির দেয়। কোনো পত্রিকা বা টেলিভিশনের সম্পাদকীয়-হস্তক্ষেপমুক্ত থাকার কারণে চরমপন্থি গোষ্ঠীগুলোর সকল কর্মকাণ্ডই সর্বোচ্চ প্রকাশ এবং প্রচার লাভ করতে পারে। ইন্টারনেটের এই স্বাধীনতাটি উপাদানের ক্ষেত্রেই নয় বরং উপস্থাপনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সকল প্রকার বহিরাগত নিয়ন্ত্রণ এবং লাইসেন্স থেকে মুক্ত থাকার কারণে ঘটনাবলি জিহাদি গোষ্ঠীগুলো নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করতে পারে এবং বিবিধ অভিষ্ঠ শ্রোতাদের কর্তৃক সেভাবেই এর হৃদয়ঙ্গম হয়। এর একটি উদাহরণ হলো 'আল-কায়েদা ইন দ্য ল্যান্ড অফ টু রিভার্স'-এর 'অল রিলিজিয়ন উইল বি ফর আল্লাহ' যেটা ইন্টারনেটের সাহায্যে বিশেষজ্ঞসুলভভাবে এবং ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়েছিল। এর পরবর্তী আগস্ট মাসেই সতেরো মিনিটের 'টপ টেন' বিদ্রোহী হামলার একটি ডকুমেন্টারি সম্প্রচার করা হয়েছিল এবং ইন্টারনেটে এটাকে তাদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত করা হয়েছিল, 'যারা আমেরিকান ক্রুসেডারদের রক্ত প্রবাহিত হওয়া দেখতে চায়।' মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের একটি অস্ত্র হিসেবে জিহাদিরা ইন্টারনেটকে পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করছে। কেবল জিহাদি বা সাধারণ মুসলিম নয় বরং পশ্চিমাদের কাছেও সেসব ছবি এবং ভিডিও পৌঁছায়, যেখানে দেখা যায় আমেরিকান এবং ইউরোপিয়ান বন্দীদেরকে অত্যাচার করা হচ্ছে অথবা কখনো কখনো কাঁধে কালাশনিকভ ঝোলানো এবং মুখোশধারী ব্যক্তি তাদের শিরশ্ছেদ করছে। এসব প্রবল কার্যকর অতিপ্রাকৃতিক দৃশ্যসমূহ পশ্চিমা ও অন্যান্যদের দুঃস্বপ্নের উপাদান।

ইসরায়েলি গবেষক গ্যাব্রিয়েল ওয়েইম্যান সম্প্রতি ইউনিভার্সিটি অফ হাইফার জন্য একটি প্রতিবেদনে ইন্টারনেটকে 'জঙ্গিবাদি প্রশিক্ষণ, রিক্রুটমেন্ট এবং তহবিলের একটি নতুন আফগানিস্তান হিসেবে' বর্ণনা করেন। সৌদিভিত্তিক 'আল বাত্তার' সাইটে 'দ্য সোর্ড অফ ভিক্টোরি' নামক একটি অনলাইন মিলিটারি ট্রেনিং কোর্স অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। জিহাদি ইচ্ছুকদের আহ্বান জানানো হয় ঘরে বসে একাকি বা সদলবলে সেই কোর্স অনুসরণ করার জন্য; আগ্নেয়াস্ত্র জোগাড় করার জন্য (মূলত কালাশনিকভ) এবং প্রকৃত মুজাহিদদের সাথে যোগদানের উদ্দেশ্যে একটি উচ্চ মানের ফিজিক্যাল ফিটনেস অর্জন করার জন্য। সেখানকার টপিকসমূহের মধ্যে আরও রয়েছে অপহরণ কৌশল, অস্ত্রশস্ত্র-বিস্ফোরক-রাসায়নিক অস্ত্র প্রভৃতি তৈরি এবং নিয়ন্ত্রণ, সুইসাইড বেল্ট তৈরির পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্দেশনা, ল্যান্ডমাইন

মোতায়নের নিয়মাবলি, মোবাইল ফোনের সাহায্যে দূরবর্তী স্থান থেকে বোমা বিস্ফোরণের কৌশল, টপোগ্রাফি (ভূসংস্থানবিদ্যা), অরিয়েন্টিয়ারিং (কীভাবে রাতের আধারে কোন মরুভূমি পাড়ি দিতে হয় সেটাও এর অন্তর্ভুক্ত), টিকে থাকার কৌশল (survival skills) প্রভৃতি। mojihedun.com নামের পাকিস্তান ভিত্তিক একটি ওয়েবসাইট লন্ডন অ্যাটাকের সময়ও সক্রিয় ছিল, যেখানে একটি সেকশনের নাম ছিল 'হাউ টু স্ট্রাইক এ ইউরোপিয়ান সিটি (কীভাবে কোনো ইউরোপিয়ান শহরে আঘাত হানতে হবে)'। এই সেকশনে সেইরূপ হামলার জন্য বিশদ তালিম এবং পরামর্শের ভান্ডার ছিল। পাসওয়ার্ড পরিবেষ্টিত জিহাদি ফোরাম 'আল-ফিরদাউস' বিস্ফোরক তেল তৈরির নিয়মাবলি সরবরাহ করে এবং তারা এ ক্ষেত্রে নাইট্রোগ্লিসারিনকে অগ্রাধিকার দেয়, যেহেতু এটি টিএনটির চেয়েও ভয়াবহ বিস্ফোরক।

জিহাদি ওয়েবসাইটগুলো বাস্তবিকই একটি ইলেকট্রনিক উম্মাহ্ কায়েম করেছে এবং বিভিন্ন তরুণ মুসলিমদেরকে সমমনা বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশ্বব্যাপী নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত করে দিয়েছে, যারা কি না একটি সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে এবং তাদের এই ঐক্যের উদ্দেশ্য একই। এর মাধ্যমে স্থানীয় যোগাযোগ স্থাপিত হচ্ছে এবং এটা বিশ্বাস করা হয় যে, যেসব অগণিত সেল বর্তমান আল-কায়েদাকে চিহ্নিত করছে তারা এই উপায়েই গঠিত হয়েছে। যারা শারীরিকভাবেই জিহাদে যোগদান করতে চায়, বুলেটিন বোর্ড তাদেরকে ব্যাবহারিক পরামর্শ প্রদান করে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক যুবক ইরাক যুদ্ধে যেতে ইচ্ছুক আমেরিকান মুসলিমদের এই পরামর্শ দিয়েছিল যে : প্রথমে আমেরিকার মেরিনে যোগদান করতে এবং যখন ইরাকে যাওয়া সম্ভব হবে তখনই পক্ষ পরিবর্তন করে ফেলতে। আরেকটি পরামর্শ হলো, জিহাদে গমনেচ্ছুককে প্রথমে কোন সিরিয়া ভিত্তিক চ্যাট রুমে জয়েন করতে হবে। অতঃপর কোন সিরিয়ান যুবকের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে হবে যে ইরাক বর্ডারের পার্শ্ববর্তী কোন গ্রামে বসবাসকারী হলে সবচেয়ে ভালো হয়। তারপরের পরামর্শ ছিল—কিছু সময় পর আপনি তার মোবাইল নাম্বার চাইতে পারেন। তারপর আপনি তাকে ফোন করবেন, কিন্তু কেবল একবারই। এবং তার থেকে আপনার আসল উদ্দেশ্য গোপন রাখবেন। তাকে বলবেন আপনি তার সাথে এবং তার পরিবারের সাথে দেখা করতে খুবই আগ্রহী। যদি কোন অতিসরল সিরিয়ান আমন্ত্রণ জানায়, তখন জিহাদির কাজ হলো সাদামাটাভাবে বর্ডার ক্রস করে ইরাকে চলে যাওয়া এবং প্রতিরোধ যুদ্ধে যোগদান করা।

তবে ইন্টারনেটকে উভয় পক্ষ থেকেই গুজব ছড়ানোর উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যায়। কখনো কখনো এটা বিভিন্ন স্তর বিশিষ্ট জটিল খেলায় রূপান্তরিত হয়।

২০০৫ সালের জুন মাসে আল-জারকাভি মারাত্মক আহত বা নিহত হয়েছেন এরূপ একটি গুজব ছড়ানোর পর তিনি নিজেই এর উত্তরে একটি ওয়েবসাইটে মৌখিক বার্তা প্রেরণ করেছিলেন। এটা মিডিয়াতেও ব্যাপকভাবে এভাবে প্রচার করা হয়েছিল যে—'একটি ঘোষণা এসেছে, আল-জারকাভি নিরাপদ আছেন, তার আঘাতটি ছিল সামান্য এবং তিনি সুস্থ হয়ে গেছেন।' নিবিড় পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, ঘোষণাটিতে বিন লাদেনের প্রতি সরাসরি একটি বার্তাও ছিল এই বলে যে, আমি আপনাকে আমার পরিকল্পনা পাঠিয়েছি এবং আমি আপনার আদেশের জন্য অপেক্ষা করছি। সেটা হয়তো আল-জারকাভি কর্তৃক বিন লাদেনের সাথে চালাকি করে যোগাযোগ প্রচেষ্টা ছিল এই আশায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এটা হয়তো লক্ষ করবে না অথবা সে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাকে এটার মধ্যে কোন সূত্রের তালাশে লিপ্ত করে দিতে চাইছিল যাতে করে তারাই অবশেষে গুজব ছড়িয়ে দেয় যে—বড় ধরনের কোনো হামলা অত্যাসন্ন।

সাইবার লড়াইয়ের কিছু নমুনা

অধিকাংশ জিহাদি ওয়েবসাইটেরই হ্যাকিংসংক্রান্ত একটি সেকশন বিদ্যমান। যারা সাইবার শব্দভান্ডারের সাথে ভালোভাবে পরিচিত নন তাদের জন্য বলে রাখি, হ্যাকিং বলতে বুঝায়—যখন কোন ব্যক্তি তার বিশেষজ্ঞসুলভ জ্ঞানের সাহায্যে কোনো ওয়েবসাইটের নিরাপত্তা ত্রুটিগুলো অন্বেষণ করে বের করে উক্ত সাইটটিতে অনুপ্রবেশ করতে সক্ষম হয় এবং অতঃপর সেখানকার তথ্যসমূহ চুরি করে অথবা সেখানে কোন ধ্বংসাত্মক ভাইরাস বা কীট রেখে আসে। বর্তমানে ইন্টারনেটে সাধারণ হ্যাকিং সফটওয়্যারসমূহ সহজলভ্য যেগুলো বিনামূল্যেই ডাউনলোড করা যায়। প্রথম গুরুতর সাইবার লড়াই সংঘটিত হয় ১৯৯৯ সালের সার্বিয়ান গোলযোগের সময়কালে। তখন সার্বিয়ান হ্যাকাররা ন্যাটো এবং মার্কিন প্রতিরক্ষা নেটওয়ার্কসমূহ লক্ষ্য করে সাইবার হামলা চালিয়েছিল। ২০০০ সালে ফিলিস্তিনি এবং ইসরাইলি হ্যাকাররা একটি তীব্র লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়েছিল, যা দ্বিতীয় ইন্তিফাদা ছড়িয়ে পড়ার সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। ইসরাইলি হ্যাকাররা হিজবুল্লাহর ওয়েবসাইটে আক্রমণ চালিয়ে সেখানে তাদের পতাকাকে ইসরাইলের পতাকা দিয়ে প্রতিস্থাপন করে দিয়েছিল। তারা একটি ফিলিস্তিনি ডাটাবেইসকেও হাতিয়ে নিয়েছিল এবং সেখান থেকে সকল ফিলিস্তিনি নেতাদের প্রাইভেট টেলিফোন নাম্বার বের করে সেগুলোকেও সম্প্রচার করেছিল। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্য এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রো-ফিলিস্তিনি হ্যাকারদের কর্তৃক ইসরাইলিদের ওপর আরোপিত ক্ষয়ক্ষতির তুলনায় এসব কিছুই ছিল না। সেসব হ্যাকাররা তুমুলভাবে সাইবার অ্যাটাক শুরু করে এবং সফলভাবে অসংখ্য

ইসরাইলি ওয়েবসাইটে পাঁচ গুণ শক্তিশালী হামলা চালাতে সক্ষম হয় যেগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল 'ব্যাঙ্ক অফ ইসরাইল', 'তেল আবিব স্টক এক্সচেঞ্জ', 'ইসরাইলি আর্মি ওয়েবসাইট' এবং এমনকি ইসরাইলপন্থি সাইটসমূহও যেমন ওয়াশিংটন ভিত্তিক আমেরিকান—'ইসরাইলি পলিটিকাল অ্যাকশন কমিটি'। যেহেতু ইসরাইলি অর্থনীতি ই-কমার্সের ওপর বহুলভাবে নির্ভরশীল ছিল তাই সাইবার অ্যাটাকের এই বিধ্বংসী উৎসবে ইসরায়েলের স্টক এক্সচেঞ্জ সূচক আট শতাংশ নেমে গিয়েছিল। আল-জাজিরাও অসংখ্যবার তাদের কর্তৃক সাইবার অ্যাটাকের সম্মুখীন হয়েছে যারা এর সম্প্রচার বিষয়বস্তুকে অপছন্দ করে। ২০০৩ সালের মার্চ মাসে ইরাকে আমেরিকান সৈন্যদের বন্দী হিসেবে নিয়ে যাওয়ার ছবি প্রকাশ করার পর এর ওয়েবসাইটটি সিস্টেমিক ডিএনএস ফ্লাড অ্যাটাকের কারণে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ডিএনএস ফ্লাড অ্যাটাকের অনুরূপ ধরনের আরেকটি সাইবার অ্যাটাক হলো আইআরসি 'রোবট' বা 'বট' অ্যাটাক। এ সব ধরনের আক্রমণ পরিচালনার জন্য সাইবার যোদ্ধাদের একটি নিবেদিতপ্রাণ দল এবং উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হয় এবং এর একমাত্র প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ওয়েবসাইটের ব্যান্ড-ওয়াইডথকে সম্প্রসারণ করাও বেশ ব্যয়বহুল। ২০০৩ সালের জুন মাসে চব্বিশ বছর বয়সী এক কানাডিয়ান একাকিই আল-জাজিরার ইন্টারনেট সাইটটি হ্যাক করতে সক্ষম হয়েছিল। এর ফলে আল-জাজিরার ওয়েবসাইট পরিদর্শনইচ্ছুক ভিজিটররা এমন একটি প্রো-ওয়ার সাইটে চলে যেত যেটা ইরাকের মার্কিন সেনাদের গুণকীর্তন দিয়ে ভরতি ছিল। উক্ত ব্যক্তি সাদামাটাভাবে আল-জাজিরার ওয়েবসাইট হোস্টিং প্রশাসকদের সাথে যোগাযোগ করে আল-জাজিরার ওয়েব অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের ভান ধরেছিল এবং তাদেরকে একটি নতুন পাসওয়ার্ড সেটআপ করতে বলেছিল। আমাদের আল-কুদস আল-আরাবির ওয়েবসাইটটিও বিভিন্ন ঘটনায় হ্যাকিংয়ের শিকার হয়েছিল এবং একবার এর সাইটটিতে পাঠকরা তিনদিন যাবৎ অ্যাক্সেস করতে পারেনি।

'ইসলামিক হ্যাকারস' সাম্প্রতিক সময়ের একটি ওয়েবসাইট, যেটা স্বঘোষিত 'সাইবার জিহাদি' উপাধিধারী একটি দল কর্তৃক পরিচালিত হয় এবং তাদের হাতে সর্বাধিক লেটেস্ট প্রযুক্তির অসংখ্য শক্তিশালী হ্যাকিং উপকরণ বিদ্যমান। 'ইসলামিক হ্যাকারস' গোঁড়া ক্রিশ্চিয়ান ওয়েবসাইট 'জয় জাংকশন' (Joy Junction) কে ২০০৫ সালের মে মাসে এতই ব্যাপকভাবে হ্যাক করেছিল যে, এই অ্যাকাউন্টটি সার্ভার থেকেই হাওয়া হয়ে গিয়েছিল। সাইবার জিহাদিদের আরেকটি গ্রুপ o-h-cjb.net নামক আরেকটি ওয়েবসাইট পরিচালনা করে। যেসব ওয়েবসাইট ইসলামকে কটূক্তি করে কোনো পোস্ট দেয় তারা সেগুলোকে ধ্বংস করে দেয় এবং তারা তাদের ওয়েবসাইট পরিদর্শনকারীদেরকে আমন্ত্রণ

জানায় সেরূপ ওয়েবসাইটসমূহের নাম সুপারিশ করার জন্য এবং অতঃপর সেগুলো তাদের লক্ষ্যবস্তু নির্বাচিত হয়ে যায়। এরূপ একটি ক্ষেত্রে, একজন ভাগ্যবান বিজয়ীর সুপারিশক্রমে আরবিভাষী খ্রিষ্টান মিশনারি সাইট 'আল-হাকিকাহ'কে Webhackerz নামক একটি বিশেষায়িত সফটওয়্যার প্রোগ্রামের সাহায্যে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল।

সাইবার-অস্ত্রাগারে (Syber-arsenal) বহু ধরনের অসংখ্য অস্ত্র বিদ্যমান। এখানে এর তালিকা দেওয়া অসম্ভব। তবে এগুলোর মধ্যে বিন লাদেনের প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপনকারী একটি অদ্ভুত অস্ত্র উল্লেখ না করলেই নয়। যখন ইরাকে মার্কিন আগ্রাসনকে অত্যাসন্ন বলে মনে হচ্ছিল তখন মিলহ্যাকার ওরফে কামিল নামক এক সাইবার-জিহাদি nedal নামের একটি ভাইরাস উদ্ভাবন করেন (যেটিকে উল্টো করে পড়লে দাঁড়ায় laden) এবং এরপর সেটিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাজার হাজার ঠিকানায় পাঠিয়ে দেয়। একইসাথে VBS.osamaladen@mm নামক আরেকটি ভাইরাসও অনুরূপভাবে প্রেরণ করা হয়। এগুলো একটি কোড ধারণ করত এবং সেটা ১১ সেপ্টেম্বরের দিকে ইঙ্গিত করে একটি বার্তা রেখে আসত এবং অতঃপর সেটি ব্যবহারকারীর সকল ফাইল মুছে দিত ও তার সিস্টেমকে শাট ডাউন (Shut Down) করে দিত।[১]

সাইবার জিহাদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

সব ধরনের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি নখদর্পণে থাকা সত্ত্বেও বর্তমানে যোগাযোগের জন্য বিন লাদেনের পছন্দসই মাধ্যম হচ্ছে পদচালিত বার্তাবাহক অথবা গাধা। এর মাধ্যমে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, আল-কায়েদার ইনার সার্কেল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য দেশের গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের নজরদারি প্রযুক্তির ব্যাপারে খুবই সতর্ক। আল-কায়েদার সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত অসংখ্য ব্যক্তিবর্গ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে নজরদারি ব্যবস্থার আওতাধীন এবং এই কারণে তাদের কর্তৃক ইন্টারনেট যোগাযোগের কোনো সম্ভাব্য 'ব্যাক ডোর' একটি নিত্য ঝুঁকি এবং সেটা তারা গ্রহণে একেবারেই অনিচ্ছুক। এই কারণেই সংগঠনটির মূলভিত্তি ইনার সার্কেল একধাপ পেছনে প্রত্যাবর্তন করেছে এবং বর্তমানে তারা ইন্টারনেটের পরিপূর্ণ সামরিক সুবিধাকে হাসিল করতে সমর্থ হচ্ছে না। এর বিপরীত ব্যাপারটিও সত্য, যেখানে আল-জারকাভি এবং এককথায় আল-কায়েদার বৈশ্বিক নেটওয়ার্ক সক্রিয় রয়েছে। 'আল-কায়েদা ইন দ্য ল্যান্ড অফ টু রিভার্স' সাইবারস্পেসে যেমন তীব্রভাবে সক্রিয়, তেমনই মূল ভূখণ্ডেও। নিয়মিত

---

[১] www.pcworld.com, 20 November 2002.

অনলাইন উপস্থিতি এই প্রমাণেরই জোগান দেয় যে, তারা জীবিত এবং সুস্থ রয়েছে এবং বিদ্রোহীদের লড়াইও চলমান এবং অনেকের মতেই লড়াইটি বিজয়ের দিকেই অগ্রসর হচ্ছে। অনেক নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞই মনে করেন, মাদ্রিদ এবং লন্ডনের সাম্প্রতিক হামলার আয়োজন ইন্টারনেটের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়েছে।

সাইবার জিহাদের আরও বিস্তার লাভ করার সম্ভাব্য বিষয়বস্তুসমূহও প্রকট। সামান্য ব্যয়েই আমেরিকান অবকাঠামোসমূহের ওপর সাইবার হামলা ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি আরোপ করতে সক্ষম এবং এর সাথে সাথে যদি কোন প্রকৃত হামলাও ঘটে তবে এর ফলাফল হবে সর্বনাশা ধরনের। ২০০৩ সালের মার্কিন নেভাল ইন্টেলিজেন্স সাইবার-ডিফেন্স রিপোর্ট বিশেষজ্ঞরা অনুমান করেন যে, মাত্র দশ মিলিয়ন ডলার বাজেটের মধ্যেই কৌশলগতভাবে অবস্থানরত ও ভালোভাবে প্রস্তুত এবং সংযুক্ত কোন হ্যাকারদের সাইবার হামলা আমেরিকার পাওয়ার গ্রিড, এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল সিস্টেম, জরুরি সেবাসমূহ এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে ধস নামিয়ে আমেরিকার কোমর ভেঙে দিতে সক্ষম।

বুশ প্রশাসন স্পষ্টভাবেই সাইবার জিহাদের এই তীব্রতাবৃদ্ধিতে ভীত। কেবল ২০০৪ সালেই তাদের প্রতিরক্ষা দপ্তর ৭৫,০০০ বার অনুপ্রবেশ প্রচেষ্টার টার্গেট হয়েছিল।[১] 'হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্ট'-এর অভ্যন্তরে একটি বিশেষ সাইবার সিকিউরিটি ডিভিশন বিদ্যমান। ২০০৫ সালের এপ্রিল মাসে মার্কিন সামরিক বাহিনী 'জয়েন্ট ফাংশনাল কোম্পনেন্ট কমান্ড ফর নেটওয়ার্ক ওয়ারফেয়ার' নামক একটি প্রকল্প চালু করেছে। এটা মূলত একটি এলিট হ্যাকারদের টিম এবং তাদের দায়িত্ব হলো 'ডিপার্টমেন্ট অফ ডিফেন্স নেটওয়ার্ক'কে প্রতিরক্ষা দেওয়া। এর সাথে তারা অতিশয় গোপনীয় মিশন 'কম্পিউটার নেটওয়ার্ক' অ্যাটাকেরও দায়িত্বপ্রাপ্ত।

এরূপ ভীতিকে অনেক রাজনীতিবিদ—যারা ব্যক্তিস্বাধীনতাকে সীমিত করে দিতে ইচ্ছুক—নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে পারে। ২০০৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমগ্র পূর্ব উপকূল এবং কানাডারও কিছু অংশে বিদ্যুৎ সরবরাহ পুরোপুরিভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বৈরুত ভিত্তিক সংবাদপত্র আল-হায়াত অতিরঞ্জিত করে এই ঘটনাকে প্রকাশ করেছিল যে, আল-কায়েদা ই-মেইল এর মাধ্যমে উক্ত ঘটনার দায় স্বীকার করেছে (আল-কায়েদা কোনোভাবেই বিদ্যুৎ সরবরাহ বিঘ্নতার পেছনে দায়ী ছিল না)। ইন্টারনেট এখনো তুলনামূলকভাবে হস্তক্ষেপমুক্ত এবং শাসনমুক্ত রয়েছে যদিও মানবাধিকার সংস্থাসমূহ যেমন 'প্রাইভেসি ইন্টারন্যাশনাল' এটা নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে যে, এই

[১] John Lasker, 'US Military's Elite Hacker Crew', Wired, 18 April 2005.

ডোমেইনেও সন্ত্রাসবাদের অজুহাতে নাগরিক স্বাধীনতাকে রুদ্ধ করে দেওয়া সময়ের ব্যাপার মাত্র, ঠিক যেমনটা ক্রমবর্ধমানভাবে বাস্তব জগতে ঘটছে। তথাপি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাইবারস্পেসের ক্রমবর্ধমান মুক্তবাজারকে ক্ষতিগ্রস্ত না করেই অ-বাণিজ্যিক শত্রুদের অনলাইন উপস্থিতি এবং কার্যকলাপকে রুদ্ধ করে দেওয়ার জন্য বিকল্প পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে।

যেহেতু আল-কায়েদা ক্রমবর্ধমান স্থানীয় মিলিশিয়া নেটওয়ার্কের মাধ্যমে আনুভূমিকভাবে বিস্তার এবং বিকাশ লাভ করেছে, তাই এ ক্ষেত্রে তাদের জন্য লজিস্টিকস, প্রশিক্ষণ, রিক্রুটমেন্ট, ভাবাদর্শ, যোগাযোগের বৈশ্বিক ফোরাম প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইন্টারনেটের ভূমিকা ক্রমবর্ধমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। ঠিক যেমন ১১ সেপ্টেম্বর হামলাকারীরা বিমান চালনার প্রশিক্ষণ নিয়েছিল, তেমনইভাবে তাদের একটি বিশাল আকারের নতুন প্রজন্ম ইনফরমেশন টেকনোলজিতে পারদর্শী হয়ে উঠছে।

২০০৫ সালের জুলাই মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সন্ত্রাসবাদ বিশেষজ্ঞদের একটি সভায় দীর্ঘদিনের মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট বিশেষজ্ঞ ডেনিস প্লুচিন্সকি আক্ষেপের সুরে রায় দিয়েছিলেন যে, আল-কায়েদা দ্রুতবেগে বিশ্বের প্রথম ইন্টারনেট পরিচালিত গেরিলা নেটওয়ার্ক হয়ে উঠছে।

পঞ্চম অধ্যায়

আল-কায়েদা ইন সৌদি আরাবিয়া

আল-কায়েদা ইন সৌদি আরাবিয়া

'শাসনব্যবস্থা হলো একজন ইমাম এবং সেসব জনগণের মধ্যে একটি চুক্তি, যারা উক্ত ইমাম কর্তৃক শাসিত হয় এবং এই চুক্তিতে উভয় পক্ষের জন্যই অধিকার এবং বাধ্যবাধকতা থাকে। এই চুক্তিকে রদ এবং অকার্যকর করে দেওয়ার বিভিন্ন বিষয়বস্তু বিদ্যমান রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম একটি বিষয়বস্তু হলো দীন এবং উম্মাহর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা। ঠিক সেটাই তোমরা (হাউজ অফ আল-সৌদ) করছ। জনগণ তাদের নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়েছে এবং তাদের সম্পত্তি ও অর্থে তোমাদের অনুপ্রবেশ, দুর্নীতি ও আইন লঙ্ঘনের ব্যাপকতাকে উপলব্ধি করা শুরু করেছে। পবিত্র দুই মসজিদের ভূখণ্ডের মুসলিমরা তাদের অধিকার আদায় করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—এর জন্য যে মূল্যই পরিশোধ করতে হোক না কেন'

—ওসামা বিন লাদেন, সৌদি শাসকবর্গের প্রতি বার্তা

১৬ ডিসেম্বর ২০০৪

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর হামলার কিছু পরেই আমি প্রয়াত সৌদি বাদশা কিং ফাহাদের এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলাম। আমাকে হতভম্ব করে দিয়ে তিনি (মহিলা) গোপনে আমাকে জানিয়েছিলেন যে, বিন লাদেন এবং আমেরিকার ওপর তার সাম্প্রতিক এই প্রবল আক্রমণকে তিনি অত্যন্ত প্রশংসার চোখেই দেখছেন। তিনি জানতেন আমি বিন লাদেনের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলাম এবং তিনি তখন আমাকে বিন লাদেন, তার সঙ্গীসাথি এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কিত ব্যাপারাদি জানতে চেয়ে এক প্রকার প্রবল প্রশ্নবানে জর্জরিত করেছিলেন। বিন লাদেনের প্রতি এই অত্যধিক আগ্রহ দেশটির সাধারণ জনগণের মাঝেও আমি দেখতে পেয়েছি। ১১ সেপ্টেম্বরের পর সৌদি গোয়েন্দা সংস্থার একটি জরিপে এই তথ্য উঠে আসে যে, 'পঁচিশ থেকে আটচল্লিশ বছর বয়সী শিক্ষিতদের মধ্যে পঁচানব্বই শতাংশই বিন লাদেনের কার্যকলাপকে সমর্থন করে।'[১] ২০০৪

[১] ২০০১ সালের ২৯ জানুয়ারী দ্য নিউইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০০১ সালের অক্টোবরে পরিচালিত এই সমীক্ষাটি একটি নির্ভরযোগ্য মার্কিন গোয়েন্দা নথিতে উল্লেখ রয়েছে। নিউইয়র্ক টাইমস আরও জানিয়েছে যে, সৌদি গোয়েন্দা সংস্থার পরিচালক প্রিন্স নওয়াফ বিন আবদুল আজিজ দলটির অস্তিত্বের এই বিষয়টি নিশ্চিত

সালে সিএনএন প্রতিবেদন করেছিল যে, মতামত গ্রহণের ভিত্তিতে ফলাফল এসেছে—'সৌদিতে বিন লাদেনের জনপ্রিয়তা বাদশা ফাহাদের জনপ্রিয়তাকেও অতিক্রম করে গেছে।'[১]

কিছু কিছু ক্ষেত্রে সৌদি রাজপরিবার মূলত আল-কায়েদার হাতে খেলার শিকার হয়েছে। দেশটির ৬,০০০ উমারা (রাজপুত্র বা প্রিন্স) জন্মের পর থেকেই ভাতা পেতে থাকে; তারা এবং তাদের ২৪,০০০ সন্তানসন্ততি ও আত্মীয়স্বজন জাঁকজমকপূর্ণ ধন-দৌলত ও জমকালো বিলাসিতার মধ্যে জীবন কাটায়, যেটাকে অনেকেই মনে করেন আংশিকভাবে হলেও দুর্নীতির মাধ্যমেই জোগান দেওয়া হয়। ওয়াশিংটনের সাবেক সৌদি রাষ্ট্রদূত প্রিন্স বানদার বিন সুলতান টেলিভিশনে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে দুর্নীতি এবং ঘুষ সম্পর্কে অকপটে উল্লেখ করেন—

> 'এটি একটি স্বাভাবিক মানবীয় প্রবৃত্তি। আপনি যদি আমাকে বলেন যে, রাষ্ট্র নির্মাণে ব্যবহৃত ৪০০ বিলিয়ন ডলারের মধ্যে বাস্তবে ৩৫০ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করা হয়েছে এবং ৫০ বিলিয়ন ডলার অপব্যবহার অথবা দুর্নীতির শিকার হয়েছে; তবে আমি আপনাকে বলব যে, হ্যাঁ, এটাই হয়েছে এবং তাতে সমস্যা কি হয়েছে?'

বিন লাদেন এবং অনেক চরমপন্থি আলেমরা প্রায়ই সৌদি রয়্যালদের সমালোচনা করে। তারা তাদেরকে দেখে তেল সম্পদের অপহরণকারী হিসেবে, যা ন্যায়সংগতভাবে জনগণের সম্পত্তি; শাসকশ্রেণির নয়। এটি আল-কায়েদার বিবৃতি অনুসারে—'অতীত, বর্তমান এবং আগামী প্রজন্মের ইতিহাসেও বৃহত্তম ডাকাতি।' ২০০৪ সালে সর্বোচ্চ তেল রাজস্বসহ প্রতি বছর ১১০ মিলিয়ন ডলার তেল রাজস্বের ফলাফল বিবেচনায় সম্ভাব্য বিষয় এটাই ছিল যে, প্রতিটি সৌদি নাগরিকই একটি যৌক্তিক মানসম্পন্ন জীবন যাপিত করতে পারবে। অথচ, এর বদলে সৌদি রাজ পরিবারের সদস্যরা রাজকীয় প্রাসাদ, প্রমোদতরী, সলিড গোল্ড ফিক্সচার এবং ফিটিংসের প্রাইভেট বোয়িং ৭৪৭-সহ অত্যধিক বিলাসিতায় নিমগ্ন রয়েছে আর অন্যদিকে দেশটির মাথাপিছু আয় ৭,৬০০ ডলারে নেমে এসেছে।

এই অসম সামাজিক ব্যবস্থার কারণে অন্তর্নিবিষ্ট ভিন্নমত পোষণকারীদের নিকট থেকে প্রতিক্রিয়া অনিবার্য। বেকারত্ব বর্তমানে পঁচিশ শতাংশে পৌঁছেছে এবং বিশ বছরের নিচের পুরুষ জনগোষ্ঠীর ষাট শতাংশ বা প্রতি বছর চার লক্ষ ছাত্রের গ্রাজুয়েশনের পর বেকারত্ব তাদের মোহমুক্তি ঘটাচ্ছে। আবার সৌদি শিক্ষাব্যবস্থা

করেছেন; তবে তিনি বিন লাদেনের পক্ষ সমর্থনের সঠিক স্তর সম্পর্কে কিছু বলেন নি; যার জন্য তিনি আমেরিকা বিরোধী মনোভাবকে দায়ী করেছিলেন।

[১] সিএনএন কর্তৃক প্রচারিত **Nick Robertson** এর রিপোর্ট, ৯ ডিসেম্বর ২০০৪।

মূলত ওয়াহাবিজম কেন্দ্রিক হওয়ায় জিহাদের প্রতি তাদের জোরদানের কারণে তারাই সম্ভবত তাদের গ্রাজুয়েটদেরকে আল-কায়েদার রিক্রুট হয়ে যেতে সহায়তা করছে এবং এ ক্ষেত্রে মধ্যস্থতার ভূমিকা পালন করছে নির্দিষ্ট কিছু স্থানীয় মসজিদ। ২০০৪ সালে রাইদ আল-কুসতি লিখেছিলেন—'আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা, যা অন্যান্য মতকে বরদাস্ত করে না—এর আগাগোড়া পুনর্মূল্যায়ন প্রয়োজন।'[১] এটা কোন আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, বিন লাদেন সৌদিতে বহুল জনপ্রিয়; কারণ তিনি অপ্রতিরোধ্য অবিচারের বিরুদ্ধে কণ্ঠ তুলেছেন, যেটা জনগণ অনুভব করছে কিন্তু অভিব্যক্তিতে রূপ দিতে পারছে না, আর বিন লাদেন তার কণ্ঠকে কর্মে রূপান্তরিত করছেন।

নিন্দন

২০০৩ সালের মে মাস থেকেই 'আল-কায়েদা ইন দ্য অ্যারাবিয়ান পেনিনসুলা' নামক আল-কায়েদার একটি নতুন শাখা সৌদি আরবে সক্রিয় রয়েছে; যাদের লক্ষ্য হলো দেশি এবং বিদেশি লক্ষ্যবস্তুতে সম্মিলিত আক্রমণ অভিযান পরিচালনা করে শাসনব্যবস্থার পতন ঘটানো। এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান যে, সৌদি আরবে আল-কায়েদা একটি দীর্ঘমেয়াদি এবং চোরাগুপ্তা অভিযান পরিচালনার পরিকল্পনা করছে। ২০০৪ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিন লাদেন নিম্নোক্ত বিবৃতি প্রদান করেছিলেন—

> 'এটা জানিয়ে দাও যে, পবিত্র মসজিদসমূহের ভূখণ্ডের (সৌদি আরব) মুজাহিদরা সরকারের বিরুদ্ধে এখনও লড়াই শুরুই করেনি। যখন তারা শুরু করবে, তখন সন্দেহাতীতভাবেই এটা কুফফার সর্দার রিয়াদের শাসকবর্গকে দিয়েই আরম্ভ হবে।'

অনেক ভাষ্যকারই মনে করেন, রয়্যাল ফ্যামিলির ওপরে কোনো বড় ধরনের হামলা আসন্ন এবং সৌদি আরাবিয়া এখন পতনের দ্বারপ্রান্তে অবস্থান করছে। আমির-উমারা ও প্রিন্সদের স্বৈরাচারী শাসনের অধীনে সেখানে সবকিছুই রুদ্ধদ্বারে পরিচালিত হয় এবং সেখানে তাদের অতি সামান্য সমালোচনার ফলেও সর্বনিম্ন কারাদণ্ড এবং সর্বোচ্চ প্রকাশ্য শিরশ্ছেদের সম্মুখীন হতে হয়।

দেশটির মাটির নিচের তেলের বিশাল ভান্ডারের বদৌলতে উক্ত জাতিটির ধনাঢ্য হওয়ার কথা থাকলেও সেখানকার স্কুল, হাসপাতাল এবং সাধারণভাবে অন্যান্য অবকাঠামোগুলো বেহাল দশায় রয়েছে। এমনকি সর্বাধিক মৌলিক প্রয়োজন যেমন পানি এবং পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাও মূলত অপূর্ণই রয়ে গেছে; যদিও

---

[১] Raid Qusti, 'How Long Before the First Step?', Daily Anal News, 5 May 2004.

OPEC এর পরিসংখ্যান প্রদর্শন করে, বর্তমান সময় অবধি তেল রাজস্ব থেকেই ১২০০ বিলিয়ন ডলার সৌদি অর্থভান্ডারে সঞ্চিত হয়েছে এবং কেবল ২০০৫ সালেই এ ক্ষেত্রে ১৫০ মিলিয়ন ডলার চলমান রয়েছে।[১] ক্ষমতাসীন আল-সৌদ পরিবার এই গ্রহের অন্যতম উৎপীড়ন ও জুলুমের শাসনব্যবস্থা কায়েম করেছে এবং বজায়ও রাখছে। প্রতিবাদের কণ্ঠ সেখানে সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ।

বর্তমানে এই শাসনব্যবস্থা দুটি অভ্যন্তরীণ হুমকির সম্মুখীন। প্রথমত, উদারপন্থি বিরোধীপক্ষ; তারা মূলত তেল রাজস্বের রমরমা অবস্থাকালীন (১৯৬০ এর দশকের শেষদিক থেকে তার পরবর্তী ২০ বছর) ইউরোপ এবং আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে পড়ুয়া গোষ্ঠী। তখনকার একটি সময়ে সতেরো হাজারেরও অধিক ছাত্র আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে তাদের স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রিতে পড়াশোনা করছিল। অতঃপর যখন সেসব তরুন গ্রাজুয়েটরা ঘরে ফিরে আসে এবং তাদের দেশের বেহাল দশা এবং নির্বাক জনগণের ওপর আল-সৌদের সর্বগ্রাসী শাসনের মাধ্যমে প্রভূত্বব্যাঞ্জকভাবে অতিকায় গোঁড়া ন্যায়-নীতি চাপিয়ে দেওয়া দেখতে পায়; তখন তারা রাজনৈতিক সংস্কার এবং গণতন্ত্রের আহ্বান শুরু করে। এসব উদারপন্থি প্রতিপক্ষ চিঠিপত্র, আর্টিকেল, দরখাস্ত প্রভৃতির মাধ্যমে তাদের দাবি-দাওয়া প্রকাশ করে থাকে।

অপর বিরোধীপক্ষটি হলো, জিহাদিস্ট—এরা বন্দুকের সাহায্যে পরিবর্তন প্রত্যাশা করে। বিজয়ীবেশে সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে ঘরে ফিরে আসার এক বছরের সামান্য বেশি কিছু সময়ের মাথায় প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধের সূত্রপাত হলে এই আরব-আফগান যোদ্ধারা আরেক গুরুতর কুফফার শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনাদের তাদের মাটিতেই জড়ো হতে দেখে এবং প্রচণ্ডভাবে ক্ষুব্ধ হয়। অতি অবশ্যই, তারা যে পরিবর্তন কামনা করে সেটা সেসব উদারপন্থিদের দাবি থেকে অনেক ভিন্ন। তারা শরিয়াহ আইনের সঠিক এবং পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন চায় এবং তাদের আপত্তি হলো হাউজ অফ আল-সৌদ এবং তাদের অনুগত আলেমরা সেটা করছে না। এর সাথে সাথে তারা দুই পবিত্র শহরের (মক্কা এবং মদিনা) ভূখণ্ড থেকে পশ্চিমা সংস্কৃতি, উপাদান এবং এর ব্যক্তিবর্গের অপসারণ কামনা করে।

আল-কায়েদার বৃদ্ধিলাভের জন্য সৌদির পরিবেশ একেবারে জুতসই। অধিকন্তু এটাও বলা যেতে পারে যে, আল-কায়েদার হয়তো কোনো অস্তিত্বই থাকত না যদি এটা প্রথমত সৌদি আরব থেকে উদ্ভূত না হতো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্মস্থান এবং ইসলামের বিদ্যাপীঠ সেখানে ইসলামি আন্দোলন তৈরির পেছনে ভূমিকা রেখেছে এবং সেটাই আল-কায়েদায় রূপান্তরিত হয়েছে।

[১] www.eia.doe.gov/emeu/cabs/saudi.html.

দেশটির ইসলামি মতাদর্শ 'ওয়াহাবিজম' এবং 'বিন লাদেন'—একে অপরের সাথে নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট। দেশটি সর্বদাই আল-কায়েদার প্রধান রিক্রুটিং গ্রাউন্ড। আশির দশকের শেষ দিকে আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত দখলদারদের তাড়ানোর জন্য সরকার কর্তৃক খোলাখুলিভাবে উৎসাহিত হয়ে কমপক্ষে ৪৫,০০০ সৌদি বিন লাদেনের মুজাহিদ বাহিনীর সাথে যোগ দিয়েছিল। দেশে ফিরে আসার পর তারাই জিহাদিদের একটি নতুন প্রজন্মের প্রণোদনাদায়ক রিক্রুট সরবরাহকারী হিসেবে প্রতিপাদিত হয়েছে। অনুমিত হিসেবে দেখা যায়, আল-কায়েদা সদস্যের প্রায় সত্তর ভাগই সৌদি নাগরিক এবং একই গণনা দেখা যায় ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর হামলার হাইজ্যাকারদের ক্ষেত্রেও—যেখানে ১৯ হাইজ্যাকারের মধ্যে ১৫ জনই ছিল সৌদি। এটি একটি ঐতিহাসিক পরিহাসজনক ব্যাপার যে, বিন লাদেন এবং আল-কায়েদার জন্মস্থানটিই উপসাগরীয় অঞ্চলে আমেরিকার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ মিত্র প্রতিপন্ন হয়েছে। যদি আমেরিকা ২০০৩ সালে তাদের সৈন্য প্রত্যাহার করেও নিত; তবুও সৌদি আরবের সেসব অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যাবলি—যেগুলো ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশনে তাদের সংযুক্তিকে নিশ্চিত করবে (২০০৫ সালের শেষদিকে অনুমিত); সেগুলোও নিশ্চিতভাবে বিন লাদেন এবং সমমনা ইসলামি জঙ্গিদের আরও ক্রুদ্ধ করে তোলবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হুকুম—'আরবের মাটিতে দুটি ধর্মের কোন স্থান দেওয়া চলবে না'—এটা যেমন বহুজাতিক কর্পোরেশনের কারণে হুমকির সম্মুখীন তেমনই খ্রিষ্টান গির্জাসমূহ থেকেও। স্থানীয় এবং বৈশ্বিক উভয় ক্ষেত্রেই আল-কায়েদার বর্তমান স্ট্র্যাটেজি এবং উচ্চাভিলাষ উপলব্ধি করার প্রধান হাতিয়ার হলো বিন লাদেন এবং হাউজ অফ আল-সৌদের মধ্যবর্তী মারাত্মক বিরোধের উৎপত্তি এবং ইতিহাসকে জানা।

ওয়াহাবি-আল সৌদ সম্পর্ক

সৌদির শাসনব্যবস্থা এবং সমাজব্যবস্থা উভয়টিই ওয়াহাবি মতবাদ দ্বারা শাসিত এবং চালিত। হাউজ অফ আল-সৌদের অর্থনৈতিক সহায়তা এবং পৃষ্ঠপোষকতা না থাকলে 'ওয়াহাবিজম'—যেটি মূলত হাম্বলী মাযহাবের একটি দুর্বোধ্য শাখা—হয়তো কোন চিহ্ন না রেখেই বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারত।

'হাউজ অফ আল-সৌদ' এবং 'ওয়াহাবিজম' এর মধ্যবর্তী এই জটিল পারস্পরিক সম্পর্কই জাতিরাষ্ট্র হিসেবে সৌদি আরবের গোড়াপত্তনের ভিত্তিমূলে প্রোথিত। ওয়াহাবিজম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নজদ অঞ্চলের সুন্নি স্কলার মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব আল-নাজদি (১৭০৩-৯২) এর দ্বারা এবং এই নজদ অঞ্চলটিই পরবর্তী কালে সৌদি আরব নামে অভিহিত হয়েছে। তৎকালীন সময়ের দারইয়াহ নামক মরুদ্যানের শাসক মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহহাব কর্তৃক প্রচারিত উক্ত রক্ষণশীল মতবাদকে আলিঙ্গন করে নিয়েছিলেন এবং তারপর এই মতবাদ

দ্রুতবেগে সমগ্র আরব উপদ্বীপে ছড়িয়ে পড়ে। ১৭৪৫ সালে এই দুই ব্যক্তি শপথ করেন যে, তারা একত্রে উক্ত উপদ্বীপকে বিজিত করবেন (তখন এটি অটোমান সাম্রাজ্যের অংশ ছিল) এবং সেখানে একটি ওয়াহাবিজম ভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবেন।

উক্ত দুই পরিবারের মধ্যে ধারাবাহিক অনেকগুলো বিবাহ সেই ঐক্যকে আরও দৃঢ় করেছিল (রাজনৈতিক বিবাহবন্ধনের এই স্ট্র্যাটেজিটি বিন লাদেন কর্তৃকও অনুসৃত হয় এবং তিনি ২০০১ সালে তার পুত্রকে তার তৎকালীন লেফটেন্যান্ট আবু হাফস আল-মাসরির কন্যার সাথে বিবাহ দিয়েছিলেন)। মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহহাব, বিন সৌদ এবং তাদের উত্তর পুরুষদের প্রারম্ভিক সামরিক বিজয় চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে মক্কা দখলের মাধ্যমে। ১৮১১ সালের মধ্যেই ওয়াহাবি নেতারা যেসব মতাদর্শকে ত্রুটিপূর্ণ মনে করতেন, সেসবের বিরুদ্ধে একটি জিহাদ পরিচালনা করেন এবং তারা আরব উপদ্বীপের অধিকাংশ অঞ্চলকে তাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে সফল হন। কিন্তু ১৮১৮ সালে অটোমান সাম্রাজ্য এবং মিসরের যৌথ বাহিনী সেখানে আগ্রাসন চালায় এবং ক্ষমতাসীন প্রিন্স বিন সাউদের নাতিকে মৃত্যুদণ্ড দেয়।

এটা উল্লেখ করা কৌতূহলউদ্দীপক যে, যা কিছু অষ্টাদশ শতাব্দীজুড়ে ওয়াহাবিজমের উত্থানে ভূমিকা রেখেছিল, সেসব উপাদানগুলোই বর্তমান কালের ইসলামি মৌলবাদিদের অভিযোগে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। ওয়াহাবিরা মনে করত, ইসলাম ভেতর থেকে তাদেরই দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে, যারা সঠিক ধর্মবিশ্বাসকে অনুসরণ করছিল না। তাই তারা তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা করেছিল। ঠিক এই ইতিহাসটিরই মারাত্মকভাবে পুনরাবৃত্তি ঘটে ১৯৯০ এর দশকে আলজেরিয়ার সশস্ত্র ইসলামিক গোষ্ঠীগুলো কর্তৃক এবং আরও সাম্প্রতিক সময়ে ইরাকে আল-জারকাভির লোকেরা শিয়াদের লক্ষ্যবস্তু বানানোর মাধ্যমে। ১৯০২ সালে আবদুল আজিজ বিন আব্দুর রহমান আল-সৌদ রিয়াদ দখল করে নেন। ইখওয়ান (ভাই) ওয়াহাবি যোদ্ধাদের সহায়তায় ১৯২৬ সালের মধ্যেই আল-সৌদ হেজাজ এবং নজদকে নিজের অধীনে নিয়ে নেন এবং ১৯৩২ সালে 'কিংডম অফ সৌদি আরাবিয়া' প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। ওয়াহাবি রাজ্যের সেই স্বপ্ন, যা আবদুল আজিজের পূর্বপুরুষদের অনুপ্রাণিত করেছিল; তখন সেটা একটি বাস্তবতায় রূপান্তরিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছিল। কিন্তু বিন লাদেন সম্যকভাবে বিবৃত করেন—'সেই রাজ্যটি ইসলামিক আইনের বাস্তবায়নের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি বরং আবদুল আজিজের পরিবারের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে'।[১] যখন আবদুল আজিজ

[১] Osama bin Laden interviewed by Robert Fisk. The Independent, 6 December, 1996.

বিন আব্দুর রহমান আল-সৌদ ১৯৫৩ সালে মারা যান, তখন পর্যায়ক্রমে তার চার ছেলে কোনো লিখিত সংবিধান, নির্বাচিত পার্লামেন্ট, স্বাধীন বিচারব্যবস্থা ব্যতিরেকেই দেশটি শাসন করতে থাকেন, যেখানে নাগরিক স্বাধীনতার কোন জায়গা নেই বললেই চলে। সেখানে সকল ধরনের রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ছিল আর আজও তেমনই বিদ্যমান রয়েছে।

ওয়াহাবিজম এই রাষ্ট্রের এত গভীরে প্রোথিত যে, দেশটির একমাত্র কর্তৃত্বপরায়ণ আল-সৌদদেরকে কোন শাসনতান্ত্রিক কার্যক্রমের জন্য ধর্মীয় অনুমোদনের প্রয়োজন হয়। আল-সৌদদের নিয়োগকৃত উলামারাই কুরআন এবং শরিয়তের ব্যাখ্যার আলোকে সকল বিষয় নির্ধারণ করে দেয় এবং এমনকি বৈদেশিক নীতিও। উলামারা সময়ে সময়ে বাদশা-প্রণেতা হিসেবেও আবির্ভূত হয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৬৪ সালে তারা একটি ফতোয়া জারি করে বাদশা সৌদকে অপসারণ করে এবং তার জায়গায় বাদশা ফাহাদকে ক্ষমতায় বসায়। ঠিক যেমনটা ওয়াহাবি ও আল-সৌদ অভিযানের সূচনালগ্ন থেকেই কিছু উলামারা আল-সৌদদের ক্ষমতা ধরে রাখার বৈধতা এবং জোরালো সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে, তেমনই আল-সৌদ এবং তাদের ক্রমবর্ধমান আমিরতন্ত্র এটাই নিশ্চিত করছে যে, সৌদি সমাজ চরম রক্ষণশীল রীতিনীতি এবং অনুশীলনের সাথে এঁটে থাকবে এবং এটি আবার ওলামাদের পক্ষ থেকেও সমর্থিত হবে। তবে ওপরে বর্ণিত কোনো কাঠামোগত বিষয় নিয়ে বিন লাদেনের মাথাব্যথা নেই। তিনি খোলাখুলিভাবে ব্যক্ত করেছেন তিনি গণতন্ত্র বিরোধী এবং শরিয়াহ শাসনের সমর্থক। নির্দিষ্ট করে বললে তিনি যে বিষয়টির বিরোধী সেটা হলো, বর্তমান সৌদি শাসনব্যবস্থার ভন্ডামি—যেখানে সব ধরনের দুষ্কর্মকে লুক্কায়িত করা হচ্ছে এবং ন্যায্যতা প্রদানের জন্য ধর্মকে একটি ছদ্মবেশী পোশাক হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

আল-সৌদদের সাথে বিন লাদেনের বিবাদের উৎপত্তিকে ১৯৩৩ সালে টেনে নিয়ে যাওয়া যায়; যখন আল-সৌদরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'স্ট্যান্ডার্ড অয়েল কোম্পানি'র সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল। সেখানে তাদেরকে একচেটিয়া অনুসন্ধান এবং উপচিতির অধিকার দেওয়া হয়েছিল। ১৯৩৮ সালে এসে কোম্পানিটি এবং রাজ্যটিও উপলব্ধি করতে পারল যে, তারা একটি তরল সোনার খনির ওপরেই উপবিষ্ট রয়েছে।

তেলসম্পদ, টাকাকড়ি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯২০ এর দশক থেকেই তাদের দেশজ তেল সম্পদের রিক্ততা নিয়ে চিন্তিত ছিল। সৌদি আরবের সাথে অভূতপূর্ব সম্পর্ক এবং এযাবৎকাল পর্যন্ত উক্ত অঞ্চলে অধিকাংশ আমেরিকান এজেন্ডাই মূলত তাদের

নিজেদের তেলের আগাম-সাপ্লাইকে সুনিশ্চিত করা, এর ওপর নিয়ন্ত্রণ এবং একে আগলে রাখার ভিত্তিতেই উৎসারিত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন যখন মিত্র দেশগুলো থেকে তেল সরবরাহের চাহিদার ব্যাপক বৃদ্ধি দেখা দিয়েছিল; তখন থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য সৌদির তেল ভান্ডারের ওপর নিয়ন্ত্রণ এবং একে আগলে রাখার স্ট্র্যাটেজিক গুরুত্ব পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ১৯৪৩ সালে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্ট ঘোষণা করেছিলেন যে—'সৌদি আরবকে প্রতিরক্ষা দেওয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব বলে বিবেচিত হবে'। যদিও এটি কোনো দিক থেকেই যুদ্ধের কোনো অংশ ছিল না এবং এই ঘোষণাই দেশটিকে ঋণ-ইজারা আনুকূল্যের জন্য উপযোগী করে তোলে।[১]

যুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সৌদি আরাবিয়া কেবল অর্থনৈতিক সম্পর্কই গড়ে তোলেনি বরং প্রতিরক্ষা সম্পর্কও প্রতিষ্ঠা করেছে। ১৯৪৫ সালে সুয়েজ খালে বহমান একটি প্রমোদতরীতে রুজভেল্ট এবং বাদশা আবদুল আজিজ বিন সাউদের মধ্যে অনুষ্ঠিত বৈঠকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরিমিত মূল্যে সৌদি আরবের তেল সরবরাহের প্রতিশ্রুতির বদলে তাদেরকে প্রযুক্তি এবং প্রতিরক্ষা সহায়তার আশ্বাস দেয়।

যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৪০ এর দশকের শেষদিকে দাহরান এয়ার বেইস নির্মাণ করেছিল; কিন্তু ১৯৯০ সালের পূর্ব অবধি তারা তাদের তেল সরবরাহ নিরাপদ করার লক্ষ্যে কৌশলে ঘাঁটি নির্মাণ করে এবং সরাসরি মার্কিন সামরিক হস্তক্ষেপ পরিহার করে কেবল সেদেশের নিরাপত্তা বাহিনীকে অস্ত্র এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করে। ১৯৪৫ সালে তেলের বাণিজ্যিক উৎপাদনের কারণে সৌদি শাসনব্যবস্থার দৌলত ব্যাপক বৃদ্ধি পাওয়ার পরবর্তী সময়ে দুটি সম্পূর্ণ বৈসাদৃশ্যপূর্ণ দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব দেখা যায়। একদিকে সৌদি সরকার সমগ্র মুসলিমবিশ্বজুড়েই, এমনকি পশ্চিমের মুসলিম জনগোষ্ঠীর মাঝেও ওয়াহাবিজম ছড়িয়ে দেওয়ার কর্মসূচি গ্রহণ করে এবং অন্যদিকে তাদের প্রিন্সরা টাকার ক্ষমতা, আধুনিক বিশ্ব এবং পশ্চিমা বস্তুবাদকে আবিষ্কার করে। তখন থেকেই সমগ্র বিশ্বজুড়ে ওয়াহাবি স্পনসর্ড স্কুল, কলেজ এবং ইউনিভার্সিটি বৃদ্ধি পেতে থাকে। এখানে এটা মনে

[১] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক তার মিত্রদের জন্য 'ঋণ-ইজারা সহায়তা' দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালেই ১৯৪১ সাল থেকে শুরু হয়েছিল। এই কর্মসূচির আওতায় আমেরিকা এই পারস্পরিক বোঝাপড়ার উপর ভিত্তি করে ঋন দেয়া শুরু করে যে, এসব অনুদান কড়ায়গণ্ডায় উসুল করা হবে। এই প্রোগ্রামের জন্য পঞ্চাশ বিলিয়ন ডলার মঞ্জুর করা হয়েছিল এবং এতে বিপরীত ঋণ-ইজারা নীতিও অন্তর্ভুক্ত ছিল—যার ফলে মিত্ররা অর্থের পরিবর্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে নির্দিষ্ট ধরনের উপকরণ এবং পরিসেবা দিয়ে ঋণ পরিশোধ করতে পারবে।

রাখা জরুরি যে, অধিকাংশ মুসলিম দেশগুলোতে সামান্যই রাষ্ট্র-অর্থায়িত শিক্ষাব্যবস্থা বিদ্যমান এবং তাই সেসব সৌদি-অর্থায়িত স্কুল অথবা মাদ্রাসাগুলোই সেখানকার শিক্ষাব্যবস্থার একমাত্র উপাদান। ইসলামের ওয়াহাবি ব্যাখ্যা সম্বলিত কারিকুলামের কারণে এসব মাদ্রাসাগুলোর কিছু কিছু—বিশেষ করে পাকিস্তান এবং সৌদি আরবিয়ায়—সেসব জিহাদিদেরকেই উৎপাদন করেছে, যারা বর্তমানে সৌদি শাসনব্যবস্থার টিকে থাকার জন্য এ যাবৎকালের সম্মুখীন হওয়া হুমকিসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় হুমকি হিসেবে দেখা দিয়েছে। ১৯৬০, ৭০ এবং ৮০-এর দশকজুড়েই এসব মাদ্রাসাসমূহ ভিনদেশে কঠোর ধর্মীয় নীতিমালাসমূহের পক্ষাবলম্বন ও উন্নীত করেছে এবং সবশেষে তার প্রভাব তাদের ঘরে এসেও পড়েছে।

তাদের অত্যুচ্চ স্বাদেশিক সৌভাগ্যের একেবারে শুরুর দিন থেকেই আল-সৌদরা বিনামূল্যে শিক্ষাব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের মাধ্যমে জাতীয় তেল উৎপাদন থেকে প্রাপ্ত অর্থনৈতিক লাভকে বিতরণ করতে চেয়েছে। তবুও শাসক পরিবারের ক্রমবর্ধমান এবং প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান দৌলত সামাজিক অসাম্যতাকে সকলের দৃষ্টিগোচর করে তুলেছে এবং বিরোধিতার বীজ বপন করেছে। সেখানে রাজপরিবারের জন্য জনসম্মতির কোনো প্রয়োজন পড়ে না; ক্ষমতায় থাকার জন্য তাদের দেশবাসীর ভোটের প্রয়োজন পড়ে না এবং রাষ্ট্রীয় তহবিল জোগানোর জন্য তাদের ইনকাম ট্যাক্সসংক্রান্ত কোনো অভিযোগেও অভিযুক্ত হতে হয় না। তবে তারা সচেতন ছিল যে, গণঅসন্তোষ তাদের আধিপত্যকে অস্থিতিশীল করে দিতে পারে। তাই বর্তমানে ক্রমবর্ধমানভাবে ধর্মীয় শিক্ষাব্যবস্থার কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে উঠেছে, 'ধর্মতত্ত্বের বদলে বাদশার প্রতি আনুগত্য এবং রয়্যাল ফ্যামিলির রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তা'। সা'দ আল-ফকিহ উল্লেখ করেন—

> 'উলামারা ক্রমবর্ধমানভাবে আল-সৌদের বশীভূত হচ্ছে এবং তারা জনগণকে নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ধর্মকে ব্যবহার করছে। রয়্যাল ফ্যামিলির বিরোধিতা অথবা এমনকি মতভেদকেও একটি প্রকাণ্ড পাপ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা তাদের দ্বারাই সফল হয়েছে।'

আল-ফকিহ দৃঢ়তার সাথে দাবি করেন—

> 'এই বিষয়গুলোই নির্জনতার একটি সহজাত অনুশীলন তৈরি করেছে, জনসাধারণ বর্তমানে গোয়েন্দাসংস্থা বা বিচারব্যবস্থার ভয়ে নয়, বরং স্বভাবগতভাবেই নিজেদেরকে রাজনীতির সাথে সংযুক্ত করাকে পরিহার করছে।'

বাদশা ফয়সালের শাসনামল সংক্ষেপে সৌদি শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রে নিহিত বিরোধকে স্পষ্ট করে। একজন আধুনিকতাবাদী হওয়ার সাথে সাথে তিনি আরববিশ্বে গণতন্ত্রনীতির উত্থান নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন; কারণ এটি হাউজ অফ আল-সৌদের ভবিষ্যৎকে হুমকির মুখে ফেলবে। তাই তিনি এর কেন্দ্রবিন্দুকে বিনাশ করার চেষ্টাও করেছিলেন। ১৯৬৫ সালে তিনি একটি অধিবেশন আহ্বান করেছিলেন এবং সেখানে তিনি প্রযুক্তির নতুনত্বের ঊর্ধ্বমুখী প্রবাহের বিরুদ্ধে ইসলামিক আইন জোরদার করার কথা বলেন। সেই একই বছর, তিনি দেশবাসীকে টেলিভিশনের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন, যেটি রক্ষণশীল ওয়াহাবি ঘরানাকে এতই ক্ষুব্ধ করেছিল যে, বাদশার নিজেরই এক ভাতুষ্পুত্র একটি টেলিভিশন স্টেশন হামলায় নেতৃত্ব দেয় এবং সেখানে পুলিশের গুলিতে নিহত হয়। বাদশা ফয়সালকেও এর মূল্য পরিশোধ করতে হয় এবং তিনি নিজেও ১৯৭৫ সালে তার অন্য আরেক ভ্রাতুষ্পুত্র কর্তৃক হত্যার শিকার হন। যা বাহ্যত ছিল টিভি স্টেশনে পুলিশের গুলিতে নিহত হওয়া তার ভাইয়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ।

১৯৭৯ সালে প্রথমবারের মতো সৌদি আরব ওয়াহাবিদের দ্বারা প্রকাশ্য বিদ্রোহের সম্মুখীন হয়। ২০ নভেম্বর কট্টরপন্থিদের নেতা জুহাইমান আল-উতাইবির নেতৃত্বে কয়েকশ মৌলবাদী মক্কার গ্র্যান্ড মসজিদকে দখল করে নেয় এবং আল-সৌদকে দুর্নীতি ও অধঃপতনের অভিযোগে অভিযুক্ত করে। তাদেরকে সেখান থেকে বিতাড়িত করতে এগারো দিন সময় লেগেছিল। সেসময় আল-সৌদ ফরাসি দাঙ্গা পুলিশের সহায়তা নিতে বাধ্য হয় এবং এই বিষয়টি দেশের অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা মোকাবিলায় পশ্চিমা শক্তির ওপর তাদের মুখাপেক্ষিতাকে অত্যন্ত নগ্নভাবে প্রদর্শন করে, যা আজও অবধি স্থায়ী রয়েছে। পরবর্তীকালে বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারী তেষট্টি জনকে জনসম্মুক্ষে শিরশ্ছেদ করা হয় অন্যান্য বিদ্রোহ-ইচ্ছুকদের জন্য একটি সতর্কীকরণ হিসেবে। সেই একই সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তানের আগ্রাসনের প্রস্তুতি নিচ্ছিল (২৫ ডিসেম্বর, ১৯৭৯) যেটা সৌদি নাগরিকদেরকে একটি জিহাদ পরিচালনা করতে অনুপ্রেরণা দেয় এবং সম্ভবত অভ্যন্তরীণ বিরোধিতার ক্রমবিকাশকে মুলতুবি করে দেয়, যেটা নভেম্বর মাসে গ্র্যান্ড মসজিদে দেখা গিয়েছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক সৌদিরা তাৎক্ষণিকভাবে আফগান যুদ্ধে আনীত হয় এবং এটা নিয়ে শাসকদের মাঝেও তেমন কোনো ভিন্নমত ছিল না। তাদের নিজেদের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অব্যাহত নিরাপত্তা সহায়তার প্রয়োজন ছিল এবং তাদের নিজেদের উৎখাতের ডাক আসা নিয়ে তারা শংকিত ছিল (তারা দেখেছিল কীভাবে অন্য আরেক আমেরিকান মিত্র ইরানের শাহকে উৎখাত হতে

হয়েছে)। অধিকন্তু একটি প্রকৃত জিহাদ হাউজ অফ আল-সৌদের ন্যায়পরায়ণতা এবং ধর্মীয় বিশ্বাসযোগ্যতাকে পুনরায় ফিরিয়ে আনবে।

সৌদি সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় থেকে সরাসরি আফগান যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করেছিল এবং তারা প্রায় ২০ বিলিয়ন ডলার এই কাজে ব্যয় করেছিল। এটি ছাড়াও আফগান মুজাহিদদের তহবিল জোগানো এবং সশস্ত্র করার জন্য আরও শত শত মিলিয়ন ডলার উপসাগরীয় অঞ্চলের অনেক ধনাঢ্যদের কর্তৃক সরবরাহ হয়েছিল।

প্রাণের মিত্র থেকে জানের শত্রু

১৯৭৯ সালে আফগান যুদ্ধ শুরু হওয়ার সামান্য সময়ের মধ্যেই বিন লাদেন পাকিস্তান চলে আসেন। প্রারম্ভিক সময়ে অন্যান্য আরব আফগানদের মতোই তিনিও যুদ্ধক্ষেত্রের প্রত্যক্ষ কাজকারবার অপেক্ষা সাহায্যকারী কার্যকলাপের সাথেই সংযুক্ত ছিলেন। কিন্তু ১৯৮৬ সালের মধ্যেই তিনি অনেকগুলো লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং মধ্যপ্রাচ্যে সুপরিচিত হয়ে ওঠেন 'মিলিয়নার থেকে বীর মুজাহিদে রূপান্তরিত ব্যক্তিত্ব' হিসেবে।

সৌদি সরকার সক্রিয়ভাবে তাদের যুবকদের জিহাদে যোগদানে উৎসাহিত করেছিল এবং বিন লাদেনকে এই ক্ষেত্রে একটি আইকনিক মডেল হিসেবে তুলে ধরেছিল। দেশটির সকল মিডিয়া এবং মসজিদসমূহ আফগান জিহাদের জন্য তহবিল এবং যোদ্ধা সংগ্রহের প্রচারণা চালিয়েছিল। আশির দশকের শেষ দিকে আনুমানিক ৩৫,০০০ থেকে ৪৫,০০০ সৌদিকে পাকিস্তানের ভিসা দেওয়া হয়।[১] তারা আব্দুল্লাহ আযযামের প্রতিষ্ঠিত (এবং পরবর্তীকালে বিন লাদেনের প্রতিষ্ঠিত) পেশোয়ার, পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব আফগানিস্তানের আরব-আফগান ঘাঁটিগুলোতে গমন করত। তাদের কারও কারও অভিপ্রায় ছিল সামরিক প্রশিক্ষণ সুবিধা গ্রহণ করা; কেউবা কয়েক মাসের জন্য জিহাদের অভিজ্ঞতা লাভের ইচ্ছুক ছিল এবং অনেকেই দীর্ঘকালীন অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিল এবং তারাই পরবর্তী কালে উদীয়মান আল-কায়েদা নেটওয়ার্কের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হয়ে যায়।

১৯৮০ এর দশকজুড়েই সমগ্র সৌদি আরবে অসংখ্য গেস্টহাউজ ছিল, যেগুলো প্রতিষ্ঠাই করা হয়েছিল আফগানিস্তান থেকে আগত আহত মুজাহিদদেরকে গ্রহণ করার জন্য এবং তাদেরকে সেখান থেকে জেদ্দা এবং রিয়াদের হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসার জন্য প্রেরণ করা হতো। এগুলো সরকার এবং বিভিন্ন ইসলামিক দাতব্য সংস্থা কর্তৃক অর্থায়িত ছিল। সেসব রেস্টহাউজগুলো

---

[১] Saad al-Faqih, based on official Saudi government records.

জিহাদের ওপর বিভিন্ন ভিডিও টেপ এবং সাথে সাথে অসংখ্য ইসলামি বইপত্রের দ্বারা ভরতি ছিল।

সেসময় প্রতিটি সৌদি স্কুলগামী বালকদের জন্য মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব রচিত '*কিতাবুত তাওহিদ*' (আল্লাহর একত্ববাদ) বইটি আবশ্যক ছিল, যেটাকে অনেক স্কলারই মৌলবাদী ইসলামের একটি উৎস হিসেবে গণ্য করেন। জিহাদ তখন দৈনন্দিন জীবনের শব্দতালিকার একটি অংশ হয়ে উঠেছিল। এসব সময়গুলোই এমন একটি প্রজন্ম তৈরি করেছে যারা ইতিমধ্যেই চরমপন্থি ছিল এবং যখন কয়েক বছর পরেই সৌদিতে আল-কায়েদার আগমন ঘটে, এসব কিছুই তাদের জন্য রিক্রুটমেন্টকে আরও সহজ করে দেয়। একক দাতাগোষ্ঠী, সৌদি সরকার এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানের বহু ঘাঁটি তৈরিতে অর্থায়ন করেছিল। যেগুলো ১৯৮৯ সালে সফলভাবে সোভিয়েত উৎখাতের পরও গোটা ১৯৯০ এর দশকজুড়েই তাদের কাজ-কারবার চালিয়ে গেছে। দিনশেষে এসব ঘাঁটিগুলোই জিহাদিদের উৎপাদন করেছে, যারা মূলত আল-কায়েদা কর্তৃকই প্রশিক্ষিত হয়েছিল। তারাই পরবর্তী কালে সমগ্র বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে তাদের নিজস্ব অভিযান পরিচালনার জন্য এবং তাদের নিজ নিজ দেশ থেকে রিক্রুটিং করার জন্য।

বিন লাদেন সোভিয়েত জিহাদের সময় বিভিন্ন নির্মাণ এবং সেগুলো টেকসই করার জন্য সৌদি আরবে তার পারিবারিক ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান থেকে যন্ত্রপাতি এবং বিশেষজ্ঞদের আমদানি করেছিলেন। অনেক পূর্ব থেকেই হাউজ অফ আল-সৌদের সাথে লাদেন পরিবারের ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং তাদের মধ্যে কেবল টেকসই ব্যবসায়িক সম্পর্কই নয়, বরং বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল। এমনকি যখন ১৯৬৭ সালে মুহাম্মদ বিন লাদেন প্লেন দুর্ঘটনায় মারা যান, তখন বাদশা ফয়সাল বলেছিলেন যে, মুহাম্মাদ বিন লাদেনের চুয়ান্ন জন এতিম সন্তান এখন থেকে তারই আপন সন্তান। বিন লাদেন সম্ভবত অনেক পূর্ব থেকেই আল-সৌদের প্রতি সন্দেহ পোষণ করতেন। নিশ্চিতভাবেই তার মনে আফগানিস্তান যুদ্ধে সৌদি আরবের ঘনিষ্ঠতম মিত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি বিদ্বেষ তখন থেকেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তিনি ইতিমধ্যে আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে তার চারপাশের জিহাদিদের বলেছিলেন যে, আমেরিকা ইসলামের শত্রু এবং তিনি ১৯৮৭ সালেই প্রথম ফিলিস্তিনি ইন্তিফাদার সমর্থনে আমেরিকান এবং ইসরাইলি পণ্য বয়কটের আহ্বান জানিয়েছিলেন।

বিন লাদেন এবং আল-সৌদের মধ্যবর্তী সম্পর্কের প্রকৃত ভাঙনের সূত্রপাত হয় ১৯৮৯ সালে। আফগান যুদ্ধ শেষ হলে বিন লাদেন আবিষ্কার করছিলেন যে, তার হাতে একটি প্রশিক্ষিত সামরিক বাহিনী রয়েছে, কিন্তু কোনো আশু যুদ্ধ নেই। তার অনেক মুজাহিদ সদস্য ছিল দক্ষিণ ইয়েমেন থেকে আগত, যা তখন

কমিউনিস্ট শাসনের অধীনে ছিল। প্রশিক্ষিত এবং সশস্ত্র এসব ইয়েমেনি তখন স্বপ্ন দেখছিল মার্কসবাদী সরকারকর্তৃক তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া ভূখণ্ডসমূহ পুনরুদ্ধার করার। এই বিষয়টি সেই সময় বিন লাদেনের নিজস্ব আকাঙ্ক্ষার সাথেও পরিপূর্ণভাবে মিলে যায়। হাদিসের ভবিষ্যৎবাণী বলে—১২,০০০ সদস্যের একটি ইসলামি সেনাবাহিনী ইয়েমেন থেকে উদ্ভূত হবে। তাই তিনি সেই সরকারকে উৎখাত করার জন্য আবেগপূর্ণভাবে দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ হলেন। সেসব ইয়েমেনি যোদ্ধারা ইতিমধ্যেই সেখানে সংস্থাপিত হয়ে গিয়েছিল। বিন লাদেন তাদের তহবিল এবং অস্ত্রের জোগান দিতে থাকেন। বিভিন্ন সোর্স থেকে জানা যায়, তখন রিয়াদ থেকে দক্ষিণ ইয়েমেনে সুটকেস ভরতি টাকার চালান হতো।[১] বিন লাদেন ইতিমধ্যেই দেশটির গোত্রীয় নেতাদের সাথেও সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছিলেন এবং নির্ভরযোগ্য সূত্র মতে তার অভিপ্রায় ছিল দক্ষিণ ইয়েমেনকে আরব আফগানদের জন্য একটি নতুন ঘাঁটি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা।

যখন ১৯৯৬ সালে আমি যখন তার সাথে সাক্ষাৎ করেছিলাম, তখনও তিনি আমাকে এই ব্যাপারে বলেছেন—'আমি ইয়েমেনের বিভিন্ন মসজিদে ধারাবাহিকভাবে অসংখ্য বয়ান পেশ করেছিলাম এবং মুসলিমদেরকে দক্ষিণ ইয়েমেনি শাসনব্যবস্থাকে উৎখাতের জন্য উদ্দীপ্ত করছিলাম। আমার বয়ানের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার জন্য এটি সৌদি সরকারকে প্ররোচিত করেছিল।' দক্ষিণ ইয়েমেনের 'ইয়েমেন আরব রিপাবলিকান' সৌদি আরব এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী একটি বাফার হিসেবে কাজ করত। বিন লাদেনের প্রয়াস সৌদির জন্য একটি বড় ধরনের নিরাপত্তা হুমকি হিসেবে দেখা দেয়। সৌদি আরব এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইতিপূর্বে ১৯৭৯ সালে একটি সীমান্ত সংঘাত নিয়ে ইয়েমেনে হস্তক্ষেপ করেছিল এবং তারা ইয়েমেন আরব রিপাবলিক সেনাদের প্রশিক্ষিত এবং সশস্ত্র করে তুলেছিল। এগারো বছর পর যখন সোভিয়েত সমর্থিত কমিউনিজম একটি বৈশ্বিক পতনের সম্মুখীন হয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তখন একটি ভিন্ন পথে অগ্রসর হয় এবং দুই ইয়েমেনের একত্রীকরণের জন্য দালালি করে। এটি বিন লাদেনের ইয়েমেন অভিযাত্রাকে সাফল্যের সাথে বিনাশ করে দেয়।

ইয়েমেনে বিন লাদেনের জড়িত হবার সময় থেকেই সৌদি শাসনব্যবস্থা বাস্তবেই তাকে নিয়ে সংশয় শুরু করেছিল। সে সময় তিনি কেবল পার্শ্ববর্তী একটি দেশের অভ্যন্তরীণ কার্যকলাপেই হস্তক্ষেপ করছিলেন না বরং তিনি নিজ দেশেও সক্রিয় ছিলেন। ইয়েমেনের মতো রাষ্ট্রে সমালোচনাকেও রাজদ্রোহিতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়, অথচ সেখানে বিন লাদেন শাসনব্যবস্থাকেই প্রশ্নবিদ্ধ করা

---

[১] Jonathan Randal, Osama, p.100.

আরম্ভ করেছিলেন। বাদশা ফাহাদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত ১৯৮৯ সালের একটি চিঠিতে বিন লাদেন তাকে সংস্কার এবং শরিয়াহ আইনের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের অনুরোধ জানিয়েছিলেন। তিনি সেখানে সৌদির প্রতিবেশী ইরাক কর্তৃক অনিবার্য হুমকির কথাও উল্লেখ করেছিলেন। সেখানে তিনি দাবি করেছিলেন, লোভী এবং আক্রমণাত্মক সাদ্দাম হুসাইনের চোখ এখন কুয়েত এবং চূড়ান্তভাবে তাদের নিজ দেশের তেলক্ষেত্রগুলোর ওপর পড়েছে। তিনি সৌদি কর্তৃপক্ষকে আরও চটিয়ে দিয়েছিলেন সাদ্দাম হুসেইনকে সরাসরি 'কাফের' হিসেবে নিন্দিত করার মাধ্যমে। যথাযথ কারণে এই সাদ্দাম হুসাইনকে নিয়ে রয়্যাল ফ্যামিলিও উদ্বিগ্ন ছিল। রয়্যাল ফ্যামিলি তার সেই প্রচেষ্টার প্রতিউত্তর দিয়েছিল সাবধানবাণীর মাধ্যমে—যদি তিনি আর কোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হন, চাই সেটা গোপনে হোক বা প্রকাশ্যে, তবে তাকে গ্রেপ্তার হতে হবে। কিছুকাল পরেই তারা তার পাসপোর্ট জব্দ করে নেয় যেটি শাস্তি হিসেবে মৃদু হলেও একটি অপমানজনক ঘটনা ছিল।

অবশেষে ইরাক ১৯৯০ সালের আগস্ট মাসে কুয়েতকে আক্রমণ করে। তখন বিন লাদেন দ্রুতই অবশ্যম্ভাবী ইরাক আগ্রাসন থেকে নিজ দেশকে প্রতিরক্ষার জন্য তার স্ট্র্যাটেজির বর্ণনা করে আল-সৌদের কাছে আরেকটি চিঠি প্রেরণ করেন। বিন লাদেন নিজেও আমাকে এই চিঠিটির ব্যাপারে বলেছিলেন। তিনি আল-সৌদকে তার যুদ্ধভিজ্ঞ আরব-আফগানদেরকে কাজে লাগানোর পরামর্শ দিয়েছিলেন, যারা সৌদি স্বেচ্ছাসেবকদেরকেও যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দিতে পারবে। বিন লাদেনের পূর্বেকার চমকপ্রদ দূরদর্শিতাকে উপেক্ষা করার মতো এ ক্ষেত্রেও আল-সৌদের প্রত্যুত্তরে ছিল অবহেলা ও উপেক্ষা। তারা চিঠি এবং এর লেখক উভয়কেই উপহাস করে এবং পুনরায় হস্তক্ষেপ না করার জন্য বিন লাদেনকে সতর্ক করে দেয়। এই দ্বিতীয় অবমাননার সময়ই শত্রুতার বীজ বপন হয়েছিল। (অনেক ভাষ্যকারই প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্রিন্স সুলতান বিন আবদুল আজিজ আল-সৌদ এবং বিন লাদেনের মধ্যবর্তী একটি মুখোমুখি তর্কমূলক সাক্ষাতের কথা লিখেছেন। এটিকে দৃঢ়ভাবে সুনিশ্চিত করার জন্য আমি কোনো সূত্র পাইনি)।

পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র কুয়েতে স্থিত এক লক্ষ ইরাকি সৈন্য এবং এর সাথে ইরাকের মিলিয়ন স্ট্রং আর্মিকে যুক্ত করে যদি সাদ্দাম হোসেইন সৌদিকে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেন, তবে এটা সুনিশ্চিত ছিল যে, সৌদিরা নিজেদেরকে প্রতিরক্ষা করতে পারবে না। সৌদির বিপুল অর্থ-সম্পদ থাকা সত্ত্বেও সেটি সামরিক দিক দিয়ে দুর্বল একটি রাষ্ট্র ছিল এবং আক্রমণ থেকে সুরক্ষার সামর্থ তাদের ছিল না। যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের কাছে অস্ত্র বিক্রি করেছিল এবং তাদের সামরিক বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ করে দিয়েছিল। কিন্তু সৌদির নগণ্য সত্তর হাজার সদস্যের সেনাবাহিনীর মাত্র এক হাজার সেনাকে উত্তরস্থ কুয়েত এবং ইরাক সীমান্তে

সংস্থিত করা হয়। দেশটির উলামা এবং অধিকাংশ জনগণকে হতবুদ্ধ করে দিয়ে আল-সৌদ তখন অর্ধ মিলিয়ন মার্কিন সেনাকে তাদের মাটিতে নিমন্ত্রণ জানালো। বিন লাদেনের মতে সৌদি আরব তখন থেকেই একটি 'আমেরিকান উপনিবেশে' রূপান্তরিত হয়েছে। তিনি বলেন, 'আমরা মনে করি আমেরিকা আরব উপদ্বীপে প্রবেশ করে তাদের ইতিহাসের সবচেয়ে মারাত্মক ভুলটি করেছে, যেখানে চৌদ্দশ বছর যাবৎ কোনো অমুসলিমজাতি প্রবেশ করেনি। ব্রিটিশ এবং অন্যান্যরাও এক বিলিয়নের অধিক মুসলিমের অনুভূতিকে সমীহ করেছে এবং তারা এই দুই পবিত্র এলাকার ভূখণ্ডকে দখল করেনি। এখানে প্রবেশ না করলে আমেরিকার তো কোন স্বার্থহানি হতো না।'

১৯৯০ সালের ঘটনাবলি নিয়ে বিন লাদেনের উপলব্ধি ১৯৯৬ সালে তার 'ডিক্লারেশন অব ওয়ার' এ কাব্যিক ভাষায় ফুটে উঠেছে—

> 'যখন আল্লাহ আরব উপদ্বীপকে অধিষ্ঠিত করলেন; এর মরুভূমি সৃষ্টি করলেন; সমুদ্র দিয়ে একে ঘিরে দিলেন, এরপর থেকে এরূপ কোন চরম দুর্দশা এর ওপর আপতিত হয়নি যেটা হয়েছে ক্রুসেডারদের পঙ্গপালের মতো এখানে ছড়িয়ে পড়ার দ্বারা। তারা এই ভূখণ্ডে ভিড় জমিয়েছে, এর ফল-ফলাদি আহার করেছে, এর সবুজ শ্যামল বাগান বিনষ্ট করেছে। এটাই সেই সময়, যখন মুসলিম বিদ্বেষী জাতিসমূহ একে অপরকে সেখানে আহ্বান জানাবে, যেমন খাবারের প্লেটে একে অন্যকে আহ্বান করে।'

অধিকন্তু আল-সৌদ সর্বাধিক জ্যেষ্ঠ আলেম আবদুল আজিজ বিন বায থেকে গররাজিভাবে এমন একটি ফতোয়া আদায় করে নেয়, যেখানে মার্কিন সেনাদের সাময়িক উপস্থিতিকে অনুমোদন দেওয়া হয়। কারণ তারা 'ইসলামের প্রতিরক্ষা' করছে!

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সৌদি সরকারকে আশ্বস্ত করেছিল যে, যখনই যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটবে তাৎক্ষণিকভাবে সকল সেনাকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে। অথচ তারা তাদের সামরিক উপস্থিতিকে ২০০৩ সাল অবধি ধরে রেখেছিল, যখন তাদের সামরিক এবং কর্মকর্তাদের ওপর আল-কায়েদার হামলা সকল হিসাব-নিকাশ পাল্টে দিয়েছিল। এসবের ফলে দেশে অস্থিরতার ঝড় বয়ে যায়। বিন লাদেন এবং অন্যান্যরা দেশের অনেক ওয়াহাবি আলেম এবং স্কলারদের একই ব্যানারে সংঘবদ্ধ হয়ে বিরুদ্ধাচরণের জন্য তাদের উৎসাহিত করে। প্রকাশ্যে বিন বাযের ফতোয়ার বিরোধিতা করা হয়। সেসব ব্যক্তিদের অনেককেই সৌদি সরকার নির্বাসিত করে দেয়। কিন্তু তখন প্রতিবাদ এবং বিরোধিতার যে মানস গঠিত হয়েছিল সেটা কেবলই বেড়েছে। অতঃপর কুয়েতকে মুক্ত করার পরও যখন

মার্কিন সেনারা বিদায় নিল না, তখন ১০৯ জন চিন্তাবিদ, আলেম এবং প্রফেসরদের একটি দল বাদশা ফাহাদের নিকট ছেচল্লিশ পৃষ্ঠার 'মেমোরেন্ডাম অফ অ্যাডভাইস অ্যান্ড রিফর্ম' নামে একটি স্মারকলিপি প্রেরণ করে। ১৯৯২ সালের এই ডকুমেন্টটিতে দুর্নীতি এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য সরকারের সমালোচনার পাশাপাশি মার্কিন সেনাদের অব্যাহত উপস্থিতির বিরোধিতা করা হয়। তখন বাদশার ফাহাদ দেশটির সর্বোচ্চ ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ সতেরো সদস্যের গ্র্যান্ড উলামাদের আদেশ দেন উক্ত স্মারকলিপিটিকে খারিজ করে দেওয়ার জন্য। অতঃপর তাদের মধ্যে যে সাত জন এটি করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল বাদশা সংক্ষিপ্তভাবে তাদেরকে বরখাস্ত করে দেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯১ সালের আগস্ট মাসে ইরাক আক্রমণ করেন। এতে অভ্যন্তরীণ জঙ্গিবাদের বিপুল আশঙ্কা সত্ত্বেও কেবল একটি ঘটনাই ঘটেছিল। জেদ্দায় একটি মিলিটারি বাসে হামলায় দুইজন আমেরিকান বৈমানিক এবং একজন সৌদি গার্ড আহত হয়। বিন লাদেনের মতে হাউজ অফ আল-সৌদ ইসলামের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ অপরাধ সম্পন্ন করেছে। কারণ তারা মক্কা এবং মদিনার পবিত্র ভূখণ্ডে আমেরিকা এবং ইসরাইলের দ্বৈত দখলদারি স্থাপিত করেছে এবং এর মাধ্যমে এই ভূখণ্ডের মর্যাদাকে তারা কলুষিত করেছে। পরবর্তী দেড় দশকজুড়েই আল-সৌদের প্রতি বিদ্বেষ বৃদ্ধি পাওয়ার মতো অসংখ্য বিষয় বিন লাদেনের সম্মুখে হাজির হয়েছে। ২০০৪ সালের ১৬ ডিসেম্বর তিনি জিজ্ঞাসা রাখেন—

— ইহুদিদের বিরুদ্ধে প্রথম ফিলিস্তিনি অভ্যুত্থানকে পরাস্ত করার জন্য কারা ইয়াসির আরাফাতকে ১০০ মিলিয়ন ডলার প্রদান করেছিল?

— শারম-আল-শেইখে ১৯৯৬ সালে দুর্বলদের বিরুদ্ধে কারা ইহুদিদের সাথে জোটবদ্ধ হয়েছিল?

— ইরাক আগ্রাসনের জন্য কারা সৌদি সামরিক ঘাঁটিগুলোকে উন্মুক্ত করে দিয়েছিল?

— কারা ইরাকি পুলিশ বাহিনীকে প্রশিক্ষণের ব্যয়ভার বহনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যাতে তারা সেখানকার মুজাহিদদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে এবং তাদের হত্যা করতে পারে?

— তোমরাই কি বৈরুত পদক্ষেপের গর্বিত অধিপতি নও যেটাতে তোমরা ইসরাইল এবং একই সাথে ফিলিস্তিনের ওপর তাদের দখলদারির বৈধতাকে স্বীকৃতি দিয়েছিলে?

— তোমরা কি মানসিক বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়েছ? মানবজাতি হিসেবে তোমরা কি তোমাদের সকল মর্যাদা এবং সম্মানকে হারিয়ে ফেলেছ?

বিন লাদেনের মতে হাউজ অফ আল-সৌদ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত। তাই তিনি উভয়ের বিরুদ্ধেই যুদ্ধের ঘোষণা দেন। লক্ষণীয় হলো, ১৯৯১ সালে বিন লাদেন শাসকদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণ করেননি। যদিও তিনি তাদের উপড়ে ফেলার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, এর বদলে তিনি বরং তার স্বভাবগত ধৈর্য প্রদর্শন করেন। তার এই সংযতভাবকে নতিস্বীকার বলে গণ্য করা হয় এবং যখনই তিনি পাকিস্তান ভ্রমণের জন্য একটি অস্থায়ী পাসপোর্ট পান, তিনি সাথে সাথেই দেশ ত্যাগ করেন এবং কখনোই আর সেখানে ফিরে যাননি।

প্রতিশোধ

বিন লাদেন যখন পেশোয়ারে ফিরে এলেন, তিনি আবিষ্কার করলেন যেসব আফগান যুদ্ধংদেহী সেনাপতিরা আকুলভাবে সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে একে অপরকে সহযোগিতা করেছিল; তাদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে তা এখন হিংসাত্মক এবং মারাত্মক সংঘাতে রূপান্তরিত হয়েছে। হতাশ হয়ে তিনি সুদানে চলে যাবার আয়োজন করেন। তিনি আশা করেছিলেন, সেখানে তিনি কোনোরূপ বাহ্যিক হস্তক্ষেপ ছাড়াই তার মুজাহিদদের সংস্থাপিত করতে পারবেন। ১৯৮৯ সালের জুন মাসে কর্নেল ওমর বশীর এবং 'রেভ্যুলেশনারি কমান্ড কাউন্সিল ফর ন্যাশনাল স্যালভেশন' এর অভ্যুত্থান একটি সরকারে পর্যবসিত হয়। তাদের সাথে 'ন্যাশনাল ইসলামিক ফ্রন্ট' এবং 'মুসলিম ব্রাদারহুডের' পলিটিক্যাল শাখার সঙ্গে শক্তিশালী বন্ধন ছিল যারা সেখানে শরিয়াহ-ভিত্তিক রাষ্ট্র বাস্তবায়ন করছিল।

চূড়ান্ত গোপনীয়তার সাথে একটি প্রাইভেট জেটবিমানে করে বিন লাদেন তার সহকারী বন্ধুবান্ধব এবং নির্বাচিত মুজাহিদদের নিয়ে পাকিস্তান থেকে সুদান চলে আসেন। তিনি তার দূরদর্শিতার মাধ্যমে সৌদি আরব থেকে বিশাল অঙ্কের টাকা অপসারণ করেন। তিনি আমাকে জানিয়েছিলেন যে, উক্ত টাকার পরিমাণ ছিল ৩০০ মিলিয়ন ডলার। সুদানে আগমনের পরপরই তিনি তার প্রকৃত উদ্দেশ্যকে আড়াল করার জন্য খার্তুমে একটি ঠিকাদারি ব্যবসা খুলে বসেন এবং তার প্রকৃত উদ্দেশ্যটি ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বৈশ্বিক জিহাদের গতিকে বাড়িয়ে তোলার পরিকল্পনা; যে পরিকল্পনার সূত্রপাত ঘটেছিল অনেক পূর্বেই। অন্যান্য চরমপন্থি সংগঠন; যেমন মুসলিম ব্রাদারহুড প্রভৃতি সুদানে স্থানান্তর হয়েছিল এবং তারা দ্রুতই অসংখ্য প্রশিক্ষণ শিবির স্থাপন করে। যদিও তিনি আপাতদৃষ্টিতে তার জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত ছিলেন; বিন লাদেন আমাকে বলেছিলেন যে, সুদান-সরকারের জন্য তার গ্রহণকৃত বৃহৎ বৃহৎ নির্মাণ প্রকল্পগুলোর অনেকগুলো সৌদি

সরকারের অর্থায়নে ছিল, যেখানে সৌদি সরকার তার কোম্পানিকে একটি ঠিকাদার হিসেবে নিযুক্ত করে। বিন লাদেন সৌদি আরবে তার পারিবারিক কোম্পানি থেকে তহবিল এবং বিশাল বিশাল নির্মাণ যন্ত্রপাতি পরিবহন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তখন বেশ কিছু বছর ধরে সৌদি সরকারের সাথে তার সম্পর্ক দ্ব্যর্থবোধক ছিল। বিন লাদেন আমাকে বলেছিলেন রয়্যাল ফ্যামিলির কিছু সদস্যও আল-কায়েদার জন্য তাদের সমর্থন এবং সৌদি আরবে মার্কিন উপস্থিতির বিরোধিতাকে ব্যক্ত করেছিল, কিন্তু তিনি আমাকে তাদের নাম বলতে অস্বীকৃতি জানান। এই কারণে তারা চরমপন্থি ইসলামিক আলেমদের শিক্ষাসমূহকে বরদাশত করত এবং মাঝে মধ্যে সক্রিয়ভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করত। অতীতে এটি আল-কায়েদা অবধি বিস্তৃত হওয়াও অসম্ভব কিছু নয়। আমি এই বোঝাবুঝির ওপর ভিত্তি করে মনে করি যে, যতদিন আল-কায়েদা রয়্যাল ফ্যামিলি বা সৌদি নাগরিকদের লক্ষ্যবস্তু বানাবে না, ততদিন উক্ত সরকারও সেই সংগঠনের কার্যক্রমে চোখ বন্ধ করেই থাকবে। বিন লাদেন এবং আল-সৌদের মাঝে একটি অলিখিত চুক্তি হয়েছিল। কিন্তু এই চুক্তি নাইন ইলেভেনের পর ভাঙতে থাকে, যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শাসক পরিবারের ওপর জঙ্গিবাদীদের থেকে নিজেদের বিশোধিত করার জন্য এবং জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ডের অর্থায়নকারী উৎসসমূহ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। সুদানে থাকাকালে বিন লাদেন এবং অন্যান্য ইসলামি গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক ছিল। যেমন 'মুসলিম ব্রাদারহুড', (মিশর এবং ইয়েমেনের) 'ইসলামিক জিহাদ' ইত্যাদি এবং তিনি উক্ত অঞ্চলজুড়ে একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তুলছিলেন যাতে তিনি উপযুক্ত সময়ে আঘাত হানতে সক্ষম হন।

ইন্টারনেট সহজলভ্য হওয়ার পূর্বের সেই যুগে তারবার্তা এবং পত্রিকার খবরাখবরের সাথে নিজেকে সংযুক্ত রাখার মাধ্যমে বিন লাদেন উপসাগরীয় অঞ্চলে সাদ্দাম হুসাইনের অভিপ্রায় সম্পর্কে পূর্বেই অনুমান করতে পেরেছিলেন। এগুলোর সহায়তায় ১৯৯২ সালেই বিন লাদেন নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলেন যে, আমেরিকা সোমালিয়ায় হস্তক্ষেপ করবেই। সেখানকার অন্যান্য দলগুলোর সাথে মিলিতভাবে কাজ করার মাধ্যমে তিনি ধারাবাহিক অসংখ্য হামলা পরিচালনার পরিকল্পনা করলেন; যেন যত দ্রুত সম্ভব তাদেরকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া যায়। একজন মুসলিম ব্রাদারহুড নেতা 'আল-ফাদলি'কে বিন লাদেন লন্ডন থেকে ইয়েমেনে নিয়ে আসেন। তিনিই ১৯৯২ সালের ২৯ ডিসেম্বরে ইয়েমেনের আদেনে অবস্থিত গোল্ড মুর হোটেল হামলায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আরেকটি ঘটনায় আল-কায়েদা পৃষ্ঠপোষিত একটি যোদ্ধাদলকে আরপিজিসহ একটি বিমান ঘাঁটির প্রতিরক্ষা বেষ্টনীতে আটক করা হয়, যেখানে মার্কিন বিমানবাহিনীর মালপত্র

গোডাউন করা হতো। (এসব হামলার পর ইয়েমেনে অবস্থিত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আরব-আফগান চরম দুর্দশায় পতিত হয়। অতঃপর ১৯৯৩ সালের মাঝামাঝি সময়ে বিন লাদেন ব্যক্তিগত খরচে বিমানযোগে তাদেরকে দেশত্যাগে সহায়তা করেন। কিছু সূত্র থেকে পাওয়া যায়, উক্ত কাজে তিনি তিন মিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছিলেন)।

বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা—যেগুলোর মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সৌদি আরব এবং মিশরেরগুলোও অন্তর্ভুক্ত ছিল—উপলব্ধি করতে পারল যে, সুদান জঙ্গিবাদী চরমপন্থি ইসলামিস্ট এবং জিহাদি গোষ্ঠীগুলোর জন্য একটি অভয়ারণ্য হয়ে উঠেছে। তখন সৌদি সরকার ওসামা বিন লাদেন এবং এরূপ গোষ্ঠীর সাথে তাদের পূর্বেকার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে দিলো এবং বিন লাদেনের প্রজেক্টসমূহেও অর্থায়ন বন্ধ করে দিলো। তবে বিন লাদেন অব্যাহতভাবে সেসব প্রজেক্ট চালিয়ে যান। এখানে তিনি প্রায় ২০০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছিলেন, যা ছিল তার সম্পত্তির প্রায় ৬৫ শতাংশ। ১৯৯৩ সালের অক্টোবর মাসে আল-কায়েদা পৃষ্ঠপোষিত আরব আফগানরা মোগাদিশুতে ব্ল্যাক-হক হেলিকপ্টার অ্যাটাক পরিচালনা করে। উক্ত অভিযানে আঠারো জন মার্কিন সেনা নিহত হয়, আটাত্তর জন আহত হয় এবং একজনকে বন্দি করা হয়, যাকে রাস্তার ওপর দড়ি দিয়ে বেঁধে টানাহেঁচড়া করা হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের প্রায় সকল সেনাকে উক্ত অঞ্চল থেকে ১৯৯৪ সালের মার্চ মাসে প্রত্যাহার করে নেয় এবং এটাকে বিন লাদেন বর্ণনা করেছিলেন একটি মহান বিজয় হিসেবে।

সৌদি সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক আরোপিত প্রচণ্ড চাপের কারণে উপলব্ধি করতে পারল যে, নিজেদের সেই দলত্যাগী সন্তানকে নিয়ে তাদের কিছু করা উচিত। নাইন ইলেভেনের পর বিল ক্লিনটন বলেছিলেন যে, তিনি ১৯৯৪ সালেই বিন লাদেনকে হত্যার আদেশ দিয়েছিলেন। বাস্তবিকপক্ষেও যখন তিনি সুদানে ছিলেন তখন তার জীবনকে হরনের জন্য তিনবার প্রচেষ্টা করা হয়েছিল। এর মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ ছিল ১৯৯৪ সালের একটি আক্রমণ; তখন চারজন বন্দুকধারী তিনি মসজিদে রয়েছেন ভেবে সেখানে হামলা চালালে একষট্টিজন মুসল্লি নিহত হয়। মসজিদে বিন লাদেনের অনুপস্থিতি উপলব্ধি করতে পেরে আক্রমণকারীরা তার কোম্পানির হেডকোয়ার্টারে হামলা চালায়। সেখানে তারা বিন লাদেনকে লক্ষ্য করে গুলিও ছুড়েছিল এবং তার নিরাপত্তা রক্ষীদের সাথে বন্দুকযুদ্ধে জড়িত হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে এটা উদঘাটিত হয়েছিল যে উক্ত হত্যাকাণ্ডের নেতৃত্বপ্রদানকারী ছিল একজন লিবীয়; কিন্তু বাকিদের উৎপত্তি এবং তাদের উদ্দেশ্যকে উদ্ধারের পূর্বেই সুদানি নিরাপত্তা বাহিনী রহস্যজনকভাবে তাদেরকে গুলি করে হত্যা করে। এটা ধারণা করলে কোন ভুল হবে না যে, উক্ত

হামলাকারীরা সিআইএ পৃষ্ঠপোষিতই ছিল। সৌদি সরকার ১৯৯৪ সালের এপ্রিল মাসে বিন লাদেনের নাগরিকত্ব কেড়ে নেয় এবং দেশে অবস্থিত তার সম্পত্তিসমূহ ছাড়াও সেসব ব্যাংক অ্যাকাউন্টকেও জব্দ করে নেয়, যেগুলোতে তার পারিবারিক কোম্পানির মোটা অংশের লভ্যাংশ জমা হয়ে যেত।

আল-সৌদের দীর্ঘকাল যাবৎ করা ভুলের মধ্যে বিন লাদেনকে এরূপ হেনস্থা করা একটি নতুন সংযোজন ছিল; কিন্তু তার সাথে তাদের সমস্যার তখন কেবল সূত্রপাত ঘটেছিল। তিনি আমাকে ১৯৯৬ সালে বলেছিলেন—

> 'যখন সৌদি সরকার ১৯৯৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে উলামাদের ওপর ব্যাপক ধরপাকড় শুরু করে; যারা মসজিদ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সাহসের সাথে তাদের সমালোচনা করত—তাদের বরখাস্ত করে; তাদের টেপ বিতরণকে বন্ধ করে দেয়; তাদের কথা বলার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে—তখন আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে, সত্যের পক্ষে এবং মিথ্যার বিপক্ষে আমিই ব্যক্তিগতভাবে কথা বলব। সত্যকে প্রচার এবং ঘটনাবলিকে স্পষ্ট করার জন্য তাই আমরা 'এডভাইস এন্ড রিফর্ম কমিটি (ARC) প্রতিষ্ঠা করলাম।'

১৯৯৩-৯৮ সাল অবধি সৌদি সরকার নিম্নপদস্থ থেকে উচ্চপদস্থ প্রায় দুইশ উলামাকে আটক করে। তাদেরকে আল-সৌদ বিদ্রোহী হিসেবে গণ্য করেছিল কারণ তারা জিহাদের বয়ান করত; আমেরিকান সামরিক উপস্থিতি, পশ্চিমাকরণ এবং সরকারি দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলত। তাদের কণ্ঠরোধ করার একটি প্রচেষ্টা হিসেবে সেসব ব্যক্তিদের ওপর জেলখানায় প্রচণ্ড নির্যাতন চালানো হয়। কিন্তু এসবের ফল হিতে-বিপরীত হয়ে যায়। যখন সেসব উলামারা মুক্তি পান, তখন তারা প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠেন এবং সরকারকে মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হিসেবে ঘোষণা করেন; শরিয়াহ্ অনুযায়ী যার একমাত্র শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড।

এসব নির্যাতিত উলামাদের একটি বড় অংশই পরবর্তী সময়ে আল-কায়েদায় যোগদান করেন এবং দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন সেল গড়ে তুলতে থাকেন। তারাই ১৯৯৫, ৯৬ এবং ২০০৩ সালে দেশের অভ্যন্তরে মারাত্মক আঘাত হানতে শুরু করেছিল। আফগানিস্তান অথবা বসনিয়ায় লড়াই করার কারণে তাদের অনেকেই সামরিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ছিল। এবং এমনকি তারা নিরাপত্তা বাহিনীর অভ্যন্তরেও অনুপ্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিল। অন্যদিকে একইসাথে বিন লাদেনও দেশের বাইরে বসে সৌদি শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনগণকে উত্তেজিত করে তুলছিলেন। তিনি জানান—

'আমি সুদান থেকে বিবৃতি প্রকাশ করতাম। সৌদি সরকার যখন এসবের বৃহৎ প্রভাবকে এবং এর গভীর কার্যকারিতাকে উপলব্ধি করতে পারল, তখন তারা সুদান-সরকারের সাথে তাদের পূর্বেকার সকল বিরোধিতাকে নিষ্পত্তি করতে লাগল; যারা অনেক পূর্ব থেকেই তাদের সাথে সম্পর্কের উন্নয়ন করার চেষ্টা করলেও সবসময় প্রত্যাখাত হয়ে আসছিল।'

১৯৯৫ সালের মধ্যেই বিন লাদেন কেবল সৌদি শাসনব্যবস্থার নিন্দা করার সক্ষমতাই অর্জন করেননি বরং তিনি এতে হামলার সক্ষমতাও অর্জন করেন। ১৯৯৫ সালের আগস্ট মাসে সৌদিতে অব্যাহত মার্কিন সামরিক উপস্থিতি সমাপ্তির আহ্বান জানিয়ে বিন লাদেন বাদশা ফাহাদের উদ্দেশ্যে একটি খোলা চিঠি প্রেরণ করেন। তাতে তিনি লিখেন—

'আপনার দেশটি এখন আমেরিকার একটি আশ্রিত রাজ্য ব্যতীত আর কোনো কিছু নয় এবং আপনিও ওয়াশিংটনের পদতলে আশ্রিত।'

এর প্রত্যুত্তরে (নীরবতা) অখুশি হয়ে বিন লাদেন সৌদিতে অবস্থিত আফগান অভিজ্ঞদের একটি স্লিপার সেলকে সক্রিয় করেন। তারা রিয়াদে মার্কিন পরিচালিত ন্যাশনাল গার্ড ট্রেনিং সেন্টারে বোমাবিস্ফোরণ ঘটায় এবং এতে সাতজন মারা যায়। বিন লাদেন আমাকে বলেছিলেন, সেই হামলাটি সেসব উলামাদের ওপর চালানো নির্যাতনের একটি প্রতিশোধস্বরূপও ছিল।

আল-সৌদ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তখন বিন লাদেনকে হস্তান্তর করার জন্য সুদানের ওপর প্রচণ্ড চাপ প্রয়োগ শুরু করে। বিন লাদেনের বিবৃতিকে বন্ধ করা এবং তাকে বহিষ্কারের লক্ষ্যে উচ্চ পর্যায়ের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং সৌদি সরকার সুদানের সাথে মিত্রতা প্রস্তাব প্রদান করে। বিন লাদেন বলেন—

'সুদান-সরকারের উচ্চপর্যায় থেকে এসব প্রতিকূলতা এবং সৌদির পক্ষ থেকে তাদের ওপর প্রচণ্ড চাপের কথা আমাকে জানানো হলো। সেই দিনই আমি বিকল্প একটি ভূখণ্ডের খোঁজ করতে লাগলাম, যেটা সত্যকে বহন করতে পারবে।... আল্লাহর রহমতে আমরা খোরাসানে (আফগানিস্তানের প্রাচীন নাম) পুনঃপ্রবর্তন করলাম।... সেখানে সর্বদাই এই সম্ভাব্যতা বিদ্যমান ছিল এবং সেখানেই আমরা শিবির স্থাপন করলাম।'

১৯৯৬ সালের মে মাসে বিন লাদেন এবং তার সহচরবর্গ সুদান থেকে আফগানিস্তান চলে আসেন। এটা একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় যে, যদিও তারা সৌদি আরব এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক সুদান থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন; কিন্তু এই বিতাড়নের ফলে তারা তাদের কর্মকাণ্ড গুটিয়ে নেননি। বরং আল-কায়েদা পুনরায়

আঘাত হানে; তারা জুন মাসেই খোবার টাওয়ারে হামলা চালায়। সৌদি কর্তৃপক্ষ উক্ত হামলার জন্য ইরান সমর্থিত শিয়া জঙ্গিদের ওপর দোষ চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে, যতক্ষণ না তাদের হতবুদ্ধি করে দিয়ে ঘরোয়া জঙ্গিবাদ সমস্যাটি অনস্বীকার্য হয়ে ওঠে। তারা এই ঘটনাকে প্রকাশ করতে চাচ্ছিল না যে, তাদের মাটিতে মার্কিন সেনা মোতায়েন করার জন্য তারা অভ্যন্তরীণ বিরোধিতার সম্মুখীন হচ্ছে। সৌদি আরব তখন আপাতদৃষ্টিতে খুবই শান্ত একটি পরিবেশ উপভোগ করছিল। কিন্তু অনেক ভাষ্যকারের মতেই যাদের মধ্যে ডা. সা'দ আল-ফকিহও বিদ্যমান, তিনি বলেন যে—'সে সময়ে আল-কায়েদা দেশের অভ্যন্তরে অত্যন্ত সক্রিয় ছিল। তারা সদস্য রিক্রুট করছিল এবং ভবিষ্যৎ হামলা অভিযানের জন্য পরিকাঠামো নির্মাণ করছিল।'

১৯৯৮ সালে নাইরোবি এবং দারুস সালামে আমেরিকান দূতাবাসে বোমা হামলার পর সৌদি আরবে আল-কায়েদার জনসমর্থন ব্যাপক বৃদ্ধি পায়। ১৯৯৮-২০০১ সাল অবধি এগারো হাজারেরও অধিক রিক্রুট সৌদি আরব থেকে আফগানিস্তানের প্রশিক্ষণ শিবিরগুলোতে আগমন করে। দেশের অভ্যন্তরীণ নতুন সেল তৈরির রিক্রুটমেন্টও এই বোমা হামলার কারণে ব্যাপক বৃদ্ধি পায় যেগুলো তাদের পূর্বপরিকল্পিতই ছিল।

নাইন ইলেভেনের পর সৌদি সরকার আফগানিস্তানে মার্কিন আগ্রাসনে সহায়তা করতে সম্মত হয়। তারা সন্দেহভাজন ব্যক্তি এবং সংগঠনের সম্পত্তিসমূহ বাজেয়াপ্ত করে এবং সেসব ইসলামিক দাতব্য সংস্থাসমূহকেও বন্ধ করে দেয়, যেগুলো হয়তো ভবিষ্যতে আল-কায়েদাকে অর্থায়ন করতে পারে। অধিকন্তু আল-সৌদ আমেরিকান দাবি-দাওয়াগুলোকেও মেনে নেয় যে, তারা শিক্ষা কারিকুলামে পরিবর্তন আনবে এবং সেসব উৎসসমূহকেও বন্ধ করে দেওয়া হবে, যেগুলো জিহাদের সমর্থন করে এবং ওয়াহাবিজমকে উৎসাহিত করে। তারা দুই হাজারেরও অধিক ইমাম এবং ধর্মপ্রচারকদের বরখাস্ত করে। তাদেরকে বিদ্রোহী হিসেবে গণ্য করা হয়েছিল কারণ তারা উক্ত অঞ্চলে আমেরিকান এবং পশ্চিমা নীতির সমালোচনা করত। এতে আল-কায়েদার জনপ্রিয়তা সৌদি আরবে সর্বকালের সর্বোচ্চ উচ্চতায় পৌঁছে যায়। আরও গভীরভাবে বললে এই জনপ্রিয়তা পুলিশ, ন্যাশনাল গার্ড থেকে গোয়েন্দা সংস্থা অবধি সকল নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যেই সঞ্চারিত হয়। অভ্যন্তরীণ গোয়েন্দা সংস্থা 'মাবাহিস' আল-কায়েদার সাথে লড়াইয়ের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল এবং এফবিআই থেকে তথ্য, নির্দেশনা এবং সহায়তাও লাভ করত। সোর্সসমূহের মতে, সেখানে কেবল একটি সমস্যাই ছিল

এবং সেটি হলো—মাবাহিসের কর্মকর্তাদের শতকরা আশি ভাগই বিন লাদেনের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল।[১]

আফগানিস্তানে ২০০১ সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে আমেরিকার বোমাবর্ষণের ফলে অনেক সৌদি আল-কায়েদা সদস্যই দেশে ফিরে আসে এবং সেখানে ক্রমবর্ধমানভাবে বৃদ্ধি পাওয়া জিহাদিদের পাল্লা আরও ভারী হয়। পরিহাস্যকরভাবে, যে নিরবতা এতদিন সৌদি সংস্কৃতিরই একটি অংশ ছিল, শাসকদের উৎপীড়নের কারণে তাদের বিরোধিতায় এমনভাবে রূপান্তরিত হয় যেটাকে উচ্ছেদ করা অসম্ভব বলেই প্রতীয়মান হচ্ছিল।

আল-কায়েদার নীড়ে প্রত্যাবর্তন

'আল-কায়েদা ইন দ্য অ্যারাবিয়ান পেনিনসুলা' তাদের প্রথম আমিরের সময়কালেই অসংখ্য সেল, নিরাপদ আশ্রয়, অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাবারুদ সম্বলিত একটি পরিকাঠামো প্রতিষ্ঠা করেছিল। ২০০৩ সালের মে মাসে তারাই দেশের অভ্যন্তরে ঝটিকা অভিযান শুরু করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তখন ইরাক নিয়ে ব্যস্ত ছিল, যদিও ১ মে প্রেসিডেন্ট বুশ ইরাকের বিরুদ্ধে মূখ্য যুদ্ধ সমাপ্তি ঘোষণা করেছিল। (এই যুদ্ধেও সৌদি সরকার আরও একবারের জন্য আগ্রহী মিত্র হিসেবে প্রমাণিত হয়)।

সৌদি আরবে আল-কায়েদা যখন সেল নির্মাণ করে, তখন তাদের প্রথম সেলটির নেতৃত্বে ছিলেন তুর্কি আল-দানদানি। দ্বিতীয়টির নেতৃত্বে ছিলেন আব্দুর রহমান আল-ফাগআসি (তিনি আবু বকর আল-আযদি নামেও পরিচিত)। তৃতীয় সেলটির নেতৃত্ব ছিলেন ইয়েমেনি বংশোদ্ভূত খালেদ আল-নাজ (অনেকের মতে তিনিই আল-কায়েদা ইন দ্য অ্যারাবিয়ান পেনিনসুলার প্রধান ছিলেন) এবং চতুর্থটির নেতৃত্বে ছিলেন আবদুল আজিজ আল-মুকরিন। অধিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্যে তারা নিজ নিজ সেলের সদস্যদেরকে স্বাধীন নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার জন্য উৎসাহিত করতেন। পঞ্চম আরও একটি সেলকে সুপ্ত রাখা হয়েছিল। যখন অন্যান্য সেলগুলোতে একের পর এক নিরাপত্তা বাহিনীর অনুপ্রবেশ ঘটে, সেগুলোর নেতারা তখন পঞ্চম সেলটিতে আশ্রয় নেন।

প্রাথমিকভাবে, প্রথম সেলটি সবচেয়ে শক্তিশালী, বিপুল অর্থায়িত এবং সর্বাধিক উপকরণ-সজ্জিত ছিল। তারাই প্রথম হামলার জন্য দায়ী ছিল যেটা ২০০৩ সালের ১২ মে ঘটে। উক্ত ঘটনায় রিয়াদে বিদেশি কর্মীদের তিনটি হাউজিং

---

[১] Richard Beeston et al, The Times, 9 November 2002 and 5 July 2004.

কমপ্লেক্স নয়জন আত্মঘাতী হামলাকারী একইসাথে নিজেদেরকে বিস্ফোরিত করে। এতে ৩৫ জন নিহত হয় এবং আহত হয় আরও প্রায় দুইশ জন। এসব হামলাগুলোতে বড়সড় সংখ্যক সৌদি নাগরিক এবং অন্যান্য মুসলিমও মারা যায়, যা আল-কায়েদার জনপ্রিয়তাকে নিম্নমুখী করে দেয়। আল-ফকিহ মন্তব্য করেন—

> 'সৌদি জনগণ সহিংসতার সাথে পরিচিত ছিল না। তারা এটাকে গ্রহণ করতে পারে না যে, কোন আমেরিকান বা ইউরোপিয়ান নাগরিককে এত সহজে হত্যা করা যেতে পারে এবং তারা সুনিশ্চিতভাবেই এই বিষয়ে সম্মত নয় যে, একজন আমেরিকানকে হত্যা করতে দুই বা তিন জন সৌদিকে হত্যা করা যাবে।'

২০০৩ সালের আগস্ট মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এর পূর্বপরিকল্পিত ৭০০০ সেনা এবং ২০০ যুদ্ধবিমানকে আল-খারজের প্রিন্স সুলতান বিমান ঘাঁটি থেকে কাতারের দোহায় স্থানান্তরিত করে। আমেরিকান মিডিয়া তখন প্রচার করে যে, বিন লাদেনই উক্ত স্থানান্তরকে ত্বরান্বিত করেছে। ইউএসএ টুডে পত্রিকার মতে—

> 'সেদেশের অনেকেই তাদের সেখানে মার্কিন সামরিক উপস্থিতির বিরোধী ছিল। এ কারণেই সৌদি বংশোদ্ভূত ওসামা বিন লাদেন এবং তার আল-কায়েদা ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর আমেরিকায় আঘাত হানে।'

সৌদি আরবে আল-কায়েদার লক্ষ্যবস্তুর পরিসর বিস্তৃত হতে থাকে এবং এতে সকল বিদেশিই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। বিশেষ করে যারা তেল কোম্পানিগুলোতে কর্মরত ছিল। তারা এর কারণ হিসেবে দাঁড় করায় যে, যদি গুরুত্বপূর্ণ কর্মীদেরকে দেশ থেকে ভাগিয়ে দেওয়া যায় তবে সৌদির তেল উৎপাদন বাধাগ্রস্ত হবে এবং এই বিষয়টি সৌদি সরকার এবং পেট্রোল-লোলুপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পতনে ভূমিকা রাখবে। ২০০২ সাল থেকেই আইমান আল-জাওয়াহিরি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর হামলার একটি মাধ্যম হিসেবে জিহাদিদেরকে নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছেন তেল উৎপাদন ব্যবস্থাকে লক্ষ্যবস্তু বানানোর জন্য।

পরবর্তী বৃহত্তর অভিযানটি 'আল-কায়েদা ইন দ্য অ্যারাবিয়ান পেনিনসুলা' এর তৎকালীন প্রধান আল মুকরিন চালিত করেন; তিনি ছিলেন বসনিয়া এবং সোমালিয়ার লড়াইয়ে অংশগ্রহণকারী একজন অভিজ্ঞ মুজাহিদ। উক্ত অভিযানে ২০০৩ সালের ৮ নভেম্বর রিয়াদের আল মুহাইয়া হাউজিং কম্পাউন্ডে আত্মঘাতী বোমা হামলা চালানো হয়। ইতিপূর্বে যদিও সেখানে মার্কিন নাগরিকরা থাকত (বোয়িং কর্মকর্তারা), কিন্তু সেই সময় সেখানে অল্পসংখ্যক আমেরিকান বসবাস

করত এবং এর ফলে আবারও যে আঠারো জন মারা যায় তাদের অধিকাংশই ছিল সৌদি এবং অন্যান্য মুসলিম।

এর পরবর্তী হামলাগুলোর ধরন ছিল নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের লক্ষ্যবস্তু বানানো, যাকে আল-কায়েদার কৃত একটি গুরুতর কৌশলগত ভুল হিসেবে দেখা হয় এবং এর কারণে তাদের জনপ্রিয়তায় আরেকবার ধস নামে। এটি নতুন সদস্য রিক্রুটিংয়েও একটি সমস্যার তৈরি করে। আল-ফকিহ বলেন—

> 'এটিকে অনুপোযোগী বলেই মনে হয় যে, বিন লাদেন সেই সময়ে সৌদি নাগরিক বা মুসলিমদের ওপর হামলাকে অনুমোদন করেছিলেন। স্পষ্টতই তখন যোগাযোগ সমস্যা বিদ্যমান ছিল; কারণ বিন লাদেন এবং আল-জাওয়াহিরি তখন পলায়মান ছিলেন। সম্ভবত সৌদি আরবের আল-কায়েদা কুশলীদের কাছে নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে কোনো স্থূল অনুমোদন ছিল; হতে পারে তারাও কোনো স্থূল অনুমোদনের অনুরোধ জানিয়েছিল এবং বিন লাদেন তাদের স্থূল কোনো উত্তরই দিয়েছিলেন। কারণ তখন এরূপ কোনো উপায় ছিল না যে, তিনি বিস্তারিত সকল কিছু জানতে পারতেন। আবার কি করতে হবে বা কীভাবে সর্বোত্তম লক্ষ্যবস্তু নির্বাচিত করতে হবে এরূপ সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রেরণেরও কোন উপায় ছিল না।'

সুনির্দিষ্টভাবে অয়েল ইন্ডাস্ট্রিকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে ২০০৪ সালের ১ মে চারজন আল-কায়েদা বন্দুকধারী 'ইয়ানবু পেট্রোকেমিক্যাল কোম্পানি কমপ্লেক্সে' হামলা চালিয়ে দুইজন আমেরিকান, দুইজন ব্রিটিশ এবং একজন অস্ট্রেলিয়ানকে হত্যা করে। ২০০৪ সালের ২৯ মে 'শেল', 'লিউকোইল' এবং 'আরব পেট্রোলিয়াম ইনভেস্টমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি কোম্পানি'র অনেকগুলো কমপ্লেক্স এবং অফিসে একটি টেকসই এবং সুপরিকল্পিত হামলা চালানো হয়। টানা পঁচিশ ঘণ্টার উক্ত অভিযানে জিহাদিরা যখন গুলি চালিয়েছিল তখন তারা স্পষ্টতই মুসলিমদের হত্যাকে এড়ানোর প্রচেষ্টা করেছিল। কিন্তু তবুও যে বাইশ জন নিহত হয় তাদের মধ্যে তিনজন ছিল সৌদি নাগরিক। ২০০৪ সালের মে থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মাঝে আল-কায়েদা একটি নতুন এবং মারাত্মক মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ পরিচালনা করে, যেখানে সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ওপর হামলা চালানো হয়। তখন অপহরণ এবং রাস্তায় গোলাগুলির ঘটনা মামুলি হয়ে ওঠে এবং এতে আটজন পশ্চিমা নাগরিক নিহত হয়। এগুলোর ভেতর সবচেয়ে লোমহর্ষক ছিল 'আমেরিকান লকহেড মার্টিন'-এর কর্মকর্তা পল জনসনের শিরশ্ছেদ। স্পষ্টতই এসবের লক্ষ্য ছিল বিশিষ্ট বিদেশি কর্মকর্তাদেরকে ভয় দেখিয়ে দেশত্যাগে বাধ্য করা এর মাধ্যমে অর্থনীতির ধ্বংসসাধন করা।

লক্ষ্যবস্তু নির্বাচনে আরেক দফা পরিবর্তন ঘটে ২০০৪ সালের ডিসেম্বর মাসে। সে সময় আল-কায়েদা দুর্ভেদ্য লক্ষ্যবস্তু গুলোতে হামলা চালায়। প্রথমত ২০০৬ সালের ডিসেম্বরে তারা জেদ্দায় মার্কিন কনস্যুলেটে হামলা করে এবং এতে পাঁচজন নন-আমেরিকান কর্মকর্তা নিহত হয়। এরপর একই সাথে সৌদির মিনিস্ট্রি অফ দ্য ইন্টেরিয়র এবং স্পেশাল ফোর্সেস রিক্রুটমেন্ট অফিসে হামলা চালানো হয়।

একই সময়ে ইরাকে অব্যাহত মার্কিন আগ্রাসন মুসলিম অসন্তোষ এবং ক্রোধকে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করেছিল। ২০০৪ সালের ৬ নভেম্বর ২৬ জন সৌদি আলেম একটি মুক্ত চিঠিতে স্বাক্ষর করেন, যেখানে ইরাকে আমেরিকানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অংশগ্রহণের জন্য মুসলিমদের আহ্বান জানানো হয় এবং এটিকে জিহাদ হিসেবে ঘোষণা করা হয়। আল-ফকিহ এর তথ্যানুযায়ী সৌদি সরকারি হিসাবেই দেখা যায়, বিদ্রোহ শুরু হবার পর থেকে ইতিমধ্যেই ৩০০০ সৌদি ইরাকের উদ্দেশ্যে দেশত্যাগ করেছিল। মুহাম্মাদ আল-মাসারি অভিযোগ করেন, সৌদি সরকার এই ভেবে আনন্দিত ছিল যে, জিহাদিরা যেহেতু ইরাকে গমন করছে তাই দেশের অভ্যন্তরে অপারেশন চালানোর জন্য কেউ থাকবে না। তিনি আরও উল্লেখ করেন, এই কারণেই ইরাক সীমান্তে প্রহরা ততটা জোরদার ছিল না যতটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চেয়েছিল।[১]

এটা প্রায়ই দাবি করা হয় যে, সৌদি নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যেও অনেক আল-কায়েদা সহানুভূতিশীল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আল-ফকিহ এর তথ্যানুযায়ী, উপরোক্ত সৌদি হিসেবে আরও বলা হয়, যারা ইরাকে গমন করেছে তাদের মধ্যে প্রায় ৫০০ জন ছিল ন্যাশনাল গার্ড সদস্য এবং আরও প্রায় ৫০০ জন ছিল সেনা এবং অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য। 'আল-কায়েদা ইন দ্য অ্যারাবিয়ান পেনিনসুলা'র প্রয়াত আমির আল-ইউফিও একজন সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা ছিলেন এবং ২০০৫ সালের আগস্ট মাসে নিহত হন। মার্কিন কনস্যুলেটে হামলার নেতৃত্বদানকারী আওয়াদ আল-জুহাইনি ছিলেন একজন সাবেক ধর্মীয় পুলিশ সদস্য। অনেক বিশেষজ্ঞই দাবি করেন, জেদ্দা এবং খোবার কম্পাউন্ডের হামলাগুলো ন্যাশনাল গার্ড এবং অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীর গোপন আঁতাত ব্যতীত সম্ভব ছিল না; কারণ সেগুলো ছিল নিচ্ছিদ্রভাবে সুরক্ষিত।

২০০৩ এবং ২০০৪ সালে আল-কায়েদার হত্যাকাণ্ডগুলো উন্মোচন করে যে, তারা তাদের শিকারদের গোয়েন্দা তথ্য সম্পর্কেও ভালোভাবেই অবহিত থাকে। উদাহরণস্বরূপ, রবার্ট জ্যাকসন সরকারিভাবে সৌদিতে একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে পরিচিত থাকলেও মূলত তিনি ছিলেন একজন আন্ডারকভার সামরিক

[১] Dr. Muhammad al-Masari, interviewed in London, March 2005.

উপদেষ্টা এবং অ্যাপাচি হেলিকপ্টার বিশেষজ্ঞ। যে বন্দুকধারী তাকে গুলি করে হত্যা করে, সে ভালোভাবেই জানত কোথা থেকে তাকে খুঁজে বের করতে হবে। একইভাবে তার পরবর্তী শিকার 'বিবিসি'র ফ্র্যাঙ্ক গার্ডনার যখন তার ক্যামেরাম্যানকে নিয়ে কাজ করছিলেন, তখন তাকে অ্যাম্বুশের মাধ্যমে হত্যা করা হয় এবং এ ক্ষেত্রেও তারা জানত যে, কোথায় তাকে পাওয়া সহজ হবে। ২০০৪ সালের ডিসেম্বর মাসে সৌদি সরকার রিয়াদ এবং জেদ্দায় বিদ্রোহীদের দমনের জন্য জর্ডানের দাঙ্গা পুলিশের সহায়তা নেওয়ার ব্যাপারে চুক্তিবদ্ধ হয়। এতে তাদেরকে উল্লেখযোগ্য বেতন দেওয়া হয় এবং জর্ডান সরকারকে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলারের উপহার প্রদান করা হয় এবং তাদেরকে বিনামূল্যে তেল সরবরাহ করা হয়। এটাই স্পষ্ট করে যে, সৌদি তাদের নিজস্ব নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর কত সামান্য ভরসা করতে পারে। ড. আল-মাসারির মতে, 'আল-রাস-এ আল-কায়েদার দুর্গগুলোতে ২০০৫ সালের এপ্রিল মাসজুড়ে পরিচালিত অভিযানগুলোয় একজন ন্যাশনাল গার্ড সদস্যকেও ব্যবহার করা হয়নি এবং এটা এ কথাই প্রকাশ করে যে, এরূপ অভিযানগুলোতে তারা তাদের বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করতে পারে না।' আল-মাসারি এই বিস্ময়কর দাবিও করেন যে, অনেক সৌদি সরকারি কর্মকর্তাই আল-কায়েদার প্রতি সহানুভূতিশীল এবং এরূপ দাবি তিনি একাই প্রকাশ করেননি। উদাহরণস্বরূপ, এই একই দাবি আমেরিকান একাডেমিক জার্নাল 'ফরেন অ্যাফেয়ার্স'ও উল্লেখ করেছে।[১]

অনেক ভাষ্যকারের মতে ইরাক আগ্রাসন, এর উত্তরকালীন বিদ্রোহ এবং আবু মুসআব আল-জারকাভির 'আল-কায়েদা ইন দ্য ল্যান্ড অফ টু রিভার্স' এর উত্থান প্রভৃতি সৌদি আরবে আল-কায়েদার শ্রীকে পুনরুজ্জীবিত করেছে। আল-ফকিহ এর মতে, সৌদি আরবে নিজেদের ভুলগুলোর জন্য আল-কায়েদা মারাত্মক অসুবিধায় পড়তে পারত। এর গোটা বৈশ্বিক অর্জনকেই ভুগতে হতো যদি না আমেরিকা ইরাকে আগ্রাসন চালাত। সেখানে এখন কেবল যেটা প্রয়োজন সেটা হলো সাদ্দামের হাত থেকে নিস্তার লাভ করা এবং আগ্রাসী হানাদারদের বিরুদ্ধে লোকজনকে মবিলাইজ করা।

অর্থনৈতিক জিহাদ

সৌদি আরবে আল-কায়েদার অভিযানসমূহ বৈশ্বিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতেও মারাত্মক প্রভাব ফেলে এবং এমনকি পশ্চিমা মিডিয়াসমূহ ওয়াশিংটনের সাথে তেলসংক্রান্ত 'টেরোর প্রিমিয়াম' ধারণার অবতারণা করে

---

[১] Michael Scott Doran, 'The Saudi Paredd', Foreign Affairs, pp. 35-51, January/February 2004.

ফেলে। পেট্রোলিয়াম ইন্ডাস্ট্রির একজন নেতৃত্বস্থানীয় অর্থনীতিবীদ পরিমাপ করেন যে, আল-কায়েদা অভিযানগুলোর কারণে ২০০৩ সালের নভেম্বর মাসেই প্রতি ব্যারেল তেলের দাম আট ডলার করে বেড়েছে এবং আরও যোগ করেন যে, সৌদি আরবের গুরুত্বপূর্ণ কোন তেল রপ্তানি টার্মিনালে একটি সফল হামলাই তেলের এই মূল্যকে আকাশচুম্বী করে তুলতে পারে। তিনি একে চিহ্নিত করেন বৈশ্বিক অর্থনীতির একক সর্বাধিক ঝুঁকি হিসেবে।

সৌদি আরব কোন দিক থেকেই এই গ্রহের একমাত্র তেলসমৃদ্ধ দেশ নয় এবং আমেরিকার জন্য অন্যান্য তেল উৎপাদনকারী দেশগুলোর ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব নিয়েও অনেক লেখালেখি করা হয়েছে। তবুও অর্থনীতিবিদদের বিশ্লেষণ প্রমাণ করে যে, সৌদি আরব—যেমনটা অর্থনীতিবিদরা অবহিত করেন—তেলের জন্য একটি অত্যাবশ্যক রাষ্ট্র হিসেবেই আসীন রয়েছে।[১]

প্রতিরক্ষার বদলে তেল বিনিময়সংক্রান্ত সৌদি-মার্কিন সমঝোতা বরাবরের মতোই প্রাসঙ্গিক ছিল। কেবল এর খুঁটিনাটি বিষয়সমূহ পরিবর্তিত হয়েছে। হাউজ অফ আল-সৌদের অব্যাহত মৈত্রীতাকে মার্কিনীদের জন্য নিশ্চিত করার ফলে, সেখানে তাদের সামরিক উপস্থিতি চালিয়ে যাওয়ার আর কোনো প্রয়োজন নেই। হাউজ অফ আল-সৌদ নিজেদেরকে নিজ অঞ্চল থেকেই বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে ইরাক এবং আফগানিস্তানে মার্কিন নেতৃত্বাধীন যুদ্ধে অংশগ্রহণে সম্মতির মাধ্যমে। আবার উক্ত শাসনব্যবস্থার জন্য তাদের সুপার-পাওয়ার বন্ধুকে পূর্বের যেকোনো সময়ের চাইতে আরও বেশি প্রয়োজন। অন্যদিকে তেলের মূল্য এযাবৎকালের সর্বোচ্চ উচ্চতায় পৌঁছায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরও প্রয়োজন সৌদিদের পাশে থাকাকে বজায় রাখা, যারা তাদের উৎপাদন মাত্রাকে সামঞ্জস্য করার মাধ্যমে তেলের মূল্যকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম। টেক্সাসে ২০০৫ সালের এপ্রিল মাসে প্রেসিডেন্ট বুশের নিজস্ব খামারে জর্জ ডব্লিউ বুশ এবং বাদশা আব্দুল্লাহর মিলিত হাত কীভাবে তারা তাদের মিলিত ভবিষ্যৎকে দেখে, সেই-সংক্রান্ত সকল অনিশ্চয়তাকে দূরীভূত করে দেয়। এ ছাড়াও এই উভয়েরই একটি সাধারণ শত্রু বিদ্যমান এবং তা হচ্ছে আল-কায়েদা।

যদি আল-কায়েদা সৌদি তেল শিল্পকে ক্ষতিগ্রস্ত করে (অথবা সাধারণভাবে এর তেল সরবরাহকেও বাধাগ্রস্ত করে) তবে এটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেও ক্ষতিগ্রস্ত করবে। সৌদি-মার্কিন এই অর্থনৈতিক পারস্পরিক অধীনতাকে নিজেদের কাজে লাগানো সাম্প্রতিক সময়ে আল-কায়েদা এজেন্ডার শীর্ষে উন্নীত হয়েছে। তেল কেবল এই উভয়ের অর্থনীতির জন্যই গুরুত্বপূর্ণ নয় বরং সার্বিকভাবে আমেরিকার

[১] What If?, special report, 27 May 2004.

বৈশ্বিক পরিকল্পনার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। রিয়াদের বাজেটের শতকরা আশিভাগই আসে তেল রাজস্ব থেকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেবল নিজেদের ভোগের জন্যই সৌদির তেলের ওপর নির্ভরশীল নয়; অধিকন্তু তারা সৌদির তেল বিক্রয় এবং বিতরণকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশ যেমন চীন, জাপান, ভারত প্রভৃতি দেশের সাথে ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতাকে টেক্কা দিতে সক্ষম হচ্ছে।

২০০২ সাল থেকেই আল-কায়েদা নেতারা OPEC নেতাদের আহ্বান জানিয়ে আসছেন তেল উৎপাদনকে হ্রাস করার জন্য; যাতে তেলের দাম বাড়িয়ে দিয়ে পশ্চিমা অর্থনীতিকে চেপে ধরা যায়। ইরাকে বিদ্রোহের সূত্রপাতের পর থেকেই সেখানকার পাইপলাইনে হামলা একটি নিত্য ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এর ফলে তেলের দাম নজিরবিহীন উচ্চতায় পৌঁছেছে। কেবল ২০০৫ সালের আগস্ট মাসে ব্যারেলপ্রতি তেলের দাম সত্তর ডলার করে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৪ সালের ১৬ ডিসেম্বর একটি ইসলামিক ওয়েবসাইটে সম্প্রচারিত রেকর্ডকৃত একটি বার্তায় বিন লাদেন দাবি করেন, তেলের দাম ব্যারেল প্রতি কমপক্ষে ১০০ ডলার হওয়া উচিত। এর প্রায় সাথে সাথেই আল-কায়েদা ইন অ্যারাবিয়ান পেনিনসুলা সেখানকার জিহাদিদের প্রতি বার্তায় নির্দেশনা প্রদান করে তেল উৎপাদন ব্যবস্থার দিকে মনোযোগ বৃদ্ধির করার জন্য। কেবল উক্ত ঘোষণাদ্বয়ের ফলেই, সেই মাসে নাইমেক্স কমোডিটাইস এক্সচেঞ্জে অশোধিত তেলের দাম পাঁচ শতাংশ বৃদ্ধি পায়।

তবে অনেক বিশ্লেষকই সৌদি আরবের তেল উৎপাদন ব্যবস্থায় আল-কায়েদার হামলার সক্ষমতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন। সেগুলো সৌদি এবং মার্কিন নিরাপত্তা বাহিনী কর্তৃক সুরক্ষিত এবং মূলত দেশটির পূর্বাঞ্চলের শিয়া অধ্যুষিত এলাকায় অবস্থিত, যেখানে আল-কায়েদার কোন পরিকাঠামো অথবা সমর্থন নেই। অন্যান্য ভাষ্যকারদের দাবি মোতাবেক, এরূপ বহু মাইল পাইপলাইন রয়েছে যেগুলো আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত নয়। তবে অর্থনীতিবিদরা এই বিষয়ে একমত যে, সৌদি তেল উৎপাদন ব্যবস্থায় এমনকি কোনো এলোমেলো হামলাও তাদের তেল উৎপাদনকে বিপর্যস্ত করে দিতে পারে এবং এর ফলে তেলের দাম লন্ডভন্ড হয়ে যাবে এবং পশ্চিমা অর্থনীতি ক্ষতির মুখে পড়বে।

এ-সংক্রান্ত নিরাপত্তা নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্পষ্টতই শঙ্কিত এবং গোপনে তারা টেক্সাস এবং লুজিয়ানায় লবন খনিগুলোতে প্রায় ৭০০ মিলিয়ন ব্যারেল তেল গুদামজাত করে রেখেছে। এটা তাদের তিন মাসের তেলের চাহিদা পূরণের জন্য

যথেষ্ট হয়ে যাবে এবং এটি তেলের মূল্যবৃদ্ধির অনাকাঙ্ক্ষিত এবং নাটকীয় পরিবর্তনকে বিপরীতমুখী করে দিতে পারবে।[১]

সৌদি ভাষ্যকার মাদাভি আল-রশিদ উল্লেখ করেন,

> 'যদিও তেলের উচ্চমূল্য সৌদি অর্থনীতির জন্য উপকারী হবে এবং আনুগত্য কিনে নেওয়ার জন্য আল-সৌদের সক্ষমতাকে আরও বাড়িয়ে তুলবে; কিন্তু যদি আল-কায়েদা সৌদিতে সক্রিয় থাকে তবে সেটা অর্থনীতিকে লন্ডভন্ড করে দেবে। শিরশ্ছেদকৃত মৃতদেহের ছবি...বিদেশি কর্মকর্তাদের লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে আল-কায়েদার শিকার অভিযান...এগুলো যন্ত্রণাদায়ক এবং অসুবিধাজনক। পশ্চিমা ব্যবসায়ীরা বিনিয়োগের জন্য প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় ওজন করে দেখে। বিদেশি বিনিয়োগ এবং তাদেরকে আকর্ষিত করা পুরোপুরিভাবে নিরাপত্তার ওপর নির্ভরশীল।'[২]

বর্তমানে সৌদি সরকারের নিকট এই ইস্যুটি বিশেষ মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং একই সাথে পশ্চিমা শেয়ারবাজার এবং বিনিয়োগ থেকে তাদের অংশকে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য উপসাগরীয় অঞ্চলের বিনিয়োগকারীদের মধ্যে একটি প্রবণতা দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। (এই ভয়ে যে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হতে পারে)। অবকাঠামো নির্মাণ এবং স্থানীয় শেয়ারের আকাশচুম্বী মূল্যবৃদ্ধির কারণে উপসাগরীয় দেশগুলো বর্তমানে অর্থনৈতিক কারবারে সহসা উন্নতিকে উপভোগ করছে। ২০০৫ সালে সৌদি আরবের 'তাদাউল অল-শেয়ার ইন্ডেক্স' প্রায় ৭০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বর্তমানে এটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় উদীয়মান শেয়ারবাজার।[৩]

সৌদি তেলের ওপর পশ্চিমাদের মুখাপেক্ষিতা অকথনীয় দুর্নীতি এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের জটিলতায় পর্যবসিত হয়েছে। WTO তে সৌদি আরবের সংযুক্তি এই অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে পারে। এতে সংযুক্তির শর্ত পূরণের জন্য যে সংস্কার এবং পরিবর্তন আনতে হবে, সেগুলোও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবে। এই আমেরিকা অধীন ক্লাবে শরিয়াহ আইন কখনোই খাপ খাবে না। বিচারব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ লিখিত করে এতে বিদেশী সেক্যুলার বিচারব্যবস্থা এবং মামলা-মোকাদ্দমার নিয়মকানুন আমদানি করতে হবে। অনেক উলামা এবং সাধারণ মানুষই শান্তিপূর্ণ

[১] Jane Padgham, Evening Standard (London), 3 June 2004; quoted in Mark Hollingsworth, Saudi Babylon.
[২] Al-Quds al-Arabi, 2 May 2005.
[৩] The Economist, Pumped Up: Saudi Arabia's Stock Market Soars, 20 August 2005.

আন্দোলন—যেটা সেই দেশে নিষিদ্ধ—প্রদর্শনের জন্য জেল খাটছেন। যদিও এই অবস্থার সামান্য উন্নতি হয় ২০০৫ সালের আগস্টে বাদশা ফাহাদের মৃত্যুর পর। তার উত্তরসূরি বাদশা আবদুল্লাহ ইতিমধ্যেই বহু রাজবন্দীদের ক্ষমা করে দিয়ে মুক্তি দিয়েছেন।

শেষ খেলা

বিন লাদেনকে নিজেদের দলে নিয়ে আসার জন্য সৌদি সরকার বিভিন্ন অনিয়মিত প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৯৬ সালে তারা তাকে প্রস্তাব দিয়েছিল, যদি তিনি সর্বসমক্ষে বাদশাকে একজন প্রকৃত মুসলিম বলে ঘোষণা করেন, তবে তার নাগরিকত্বকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। তারা তাকে আরও অফার দিয়েছিল যে, তারা তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে বাজেয়াপ্ত করা ২০০ মিলিয়ন ডলারকে দ্বিগুণ করে ফেরত দেবে, যদি তিনি সহযোগিতা করেন। বিন লাদেন এর সবকিছুই প্রত্যাখ্যান করেন। ক্রমশ এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, আল-কায়েদা (বর্তমানে সৌদি নিয়ন্ত্রিত মিডিয়াতে একে বর্ণনা করা হয় একটি বিপথগামী দল হিসেবে) এবং সৌদি শাসনব্যবস্থার এ লড়াইয়ে সমঝোতার কোনই সুযোগ নেই।

সৌদি আরব বহুবিধ কারণে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র। বিন লাদেন এবং বিশ্বের ১.৩ বিলিয়ন মুসলিমদের নিকট এটি মুসলিমবিশ্ব এবং ইসলামিক রাষ্ট্রগুলোর কেন্দ্রবিন্দু। এর তেলসম্পদ যেমন আমেরিকার প্রোজেক্টের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তেমন আল-সৌদও মনে করে তারা তাদের পেট্রোডলার দিয়ে দেশে এবং বিদেশে উভয় জায়গাতেই ক্ষমতা এবং প্রতিপত্তিকে কিনে নিতে পারবে। এ ছাড়াও এটি বিশ্বের সবচেয়ে প্রাণবন্ত এবং গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলসমূহের একটি। ঘটমান ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী সৌদি আরবে আল-কায়েদার কৌশলও পরিবর্তিত হয়েছে। এই বিষয়ে সকল বিশেষজ্ঞই একমত যে, স্থানীয়ভাবে সেখানে তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো শাসনব্যবস্থার পতন ঘটানো এবং এটি আমেরিকাকে ঘায়েল করার উচ্চাকাঙ্ক্ষার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

সৌদি আরবে আল-কায়েদার দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য দুটি পথকে বিবেচনা করা হয়। যদি আল-সৌদদের লক্ষ্যবস্তু বানানো হয় এবং তাদেরকে উৎখাত করা হয় তবে উক্ত অঞ্চলে আমেরিকার পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাবে। অন্যথায় যদি আমেরিকা নিজেই তাদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয় এবং জিহাদি স্ট্র্যাটেজিস্টরা মনে করেন বুশ প্রশাসনের বিরোধীরা আরও অধিকতর চরমপন্থা অবলম্বন করলে সেটি অভ্যন্তরীণ বিভাজন এবং দ্বন্দ্বকে উসকে দেবে—যা আল-কায়েদা এবং সমমনা গোষ্ঠীসমূহ কর্তৃক আল-সৌদের পতনকে সহজতর করবে। আরেকটি ক্ষেত্রে অনেক ভাষ্যকারই মন্তব্য করেন, তারা আশা করছেন নিকট

ভবিষ্যতেই আল-সৌদ পরিবারের সদস্যরা লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হতে পারে। কোনো সতর্কবার্তা হিসেবে এরূপ হামলা পরিচালনা করার ক্ষেত্রে আল-কায়েদার পূর্ব ইতিহাস রয়েছে এবং ২০০৪ সালের ১৬ ডিসেম্বর, বিন লাদেন স্পষ্টভাবে রিয়াদের শাসকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযান শুরু করার হুমকি দেন।

আল-কায়েদা ইন অ্যারাবিয়ান পেনিনসুলা দুই বছররের কিছু বেশি সময়কালে ধারাবাহিকভাবে চারবার নেতৃত্ব পরিবর্তনের মুখোমুখি হয়েছে। আল-আইরী ২০০৩ সালের জুন মাসে একটি রোডব্লকে নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে গোলাগুলিতে নিহত হন এবং তারপর নেতৃত্ব পান খালিদ আল-হাজ। তিনিও ২০০৪ সালের ১৬ মার্চ রিয়াদে অ্যাম্বুশের শিকার হয়ে মারা যান। তার পরবর্তী নেতা আল-মুকরিন সেই বছরের জুন মাসে পুলিশের হাতে নিহত হন। তার উত্তরসূরি সাবেক পুলিশ সদস্য সালেহ আল-ইউফি ২০০৫ সালের আগস্টে নিহত হন। সৌদি নিরাপত্তা বাহিনীর এসব সফল অভিযানের অর্থ হলো অল্প সংখ্যক আফগান-আরবই টিকে থাকবে। কিন্তু বিভিন্ন জরিপ বলছে যে, জিহাদিদের বরং একটি নতুন প্রজন্ম গড়ে উঠছে। তবে যতক্ষণ না ইরাক যুদ্ধ শেষ হচ্ছে ততক্ষণ সৌদিতে আল-কায়েদার কার্যক্রমসমূহ পুরোদমে শুরু হওয়া সম্ভব বলে মনে হচ্ছে না। কারণ বর্তমানে হাজার হাজার সৌদি জিহাদি সেখানে জড়িত হয়ে গেছে। আল-ফকিহ এর তথ্যানুযায়ী, ইরাকের আল-কায়েদা নেতারা ২০০৫ সালের মে মাসে জিহাদিদের একটি ছোট দলকে সৌদিতে প্রেরণ করেছেন সেখানে ছোটখাটো অপারেশন চালু রাখার জন্য এবং তাদেরকে এটা স্মরণে রাখার জন্য যে, তারা সেখান থেকে চিরদিনের জন্য চলে যায়নি। সাম্প্রতিক একটি প্রতিবেদন, যেখানে সৌদি নিরাপত্তা বাহিনী কর্তৃক একটি বিস্ফোরক এবং কালাশনিকভ ভরতি একটি গাড়িকে রোডব্লকে আটক করার ঘটনা উঠে আসে, উক্ত দাবিটিকেই সত্যায়িত করে। অবশেষে যখন আল-কায়েদা নেতাদের যেকোনো ডাকে সাড়া দেওয়ার মতো যুদ্ধে উৎরে যাওয়া এবং সুপ্রশিক্ষিত হাজার হাজার মুজাহিদ ইরাক থেকে প্রত্যাবর্তন করবে, সেটা নিশ্চিতভাবেই সৌদির শাসন ব্যবস্থার জন্য ভীতিকর একটি বিষয় হবে।

ড. আল-মাসারি ভবিষ্যৎবাণী করে বলেন—

'সেটি হবে একটি চূড়ান্ত নিষ্পত্তির দিন।'

ষষ্ঠ অধ্যায়

আল-কায়েদা ইন ইরাক

আল-কায়েদা ইন ইরাক

১৯৯৬ সালে যখন আমি বিন লাদেনের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলাম তখন তিনি আমাকে তার দীর্ঘমেয়াদি স্ট্র্যাটেজি ব্যাখ্যা করেছিলেন। তিনি ভালোভাবেই জানতেন তার শত্রু সুপারপাওয়ার আমেরিকাকে তিনি তাদেরই মাটিতে প্রচলিত অস্ত্রাদি ব্যবহার করে কখনোই পরাজিত করতে পারবেন না। বরং তার পরিকল্পনা ছিল আরেকটি। এরূপ একটি পরিকল্পনা, যার সফলতার জন্য বহু বছর ধৈর্য ধরতে হবে। আমরা বর্তমানে ইরাকের রণক্ষেত্রে সেই পরিকল্পনারই কিঞ্চিৎ অংশকে প্রত্যক্ষ করছি।

ধৈর্য সর্বদাই আল-কায়েদার অস্ত্রাগারের একটি অন্যতম প্রধান অস্ত্র। বিন লাদেনকেও তার অভিপ্রেত লক্ষ্যে পৌঁছুতে হলে ধৈর্য অত্যাবশ্যক। যখন আমরা তোরাবোরায় সুউচ্চ পর্বতমালার গাছপালার মধ্য দিয়ে হাঁটছিলাম, তখন তিনি আমাকে বলেছিলেন—

'আমরা আমেরিকাকে মুসলিম ভূখণ্ডে নিয়ে এসে লড়াই করতে চাই। যদি আমরা নিজস্ব অঞ্চলে তাদের সাথে লড়াই করতে পারি, তবে আমরা তাদেরকে সহজেই ঘায়েল করতে পারব। কারণ যুদ্ধ তখন এমন একটি ভূখণ্ডে আমাদেরই মর্জি অনুসারে চলবে যেটা সম্পর্কে তাদের কোনো জানাশোনা থাকবে না এবং সেটাকে তারা উপলব্ধিও করতে পারবে না।'

২০০৩ সালের মার্চ মাসে ইরাকে দেড় লক্ষ আমেরিকান সৈন্যের আগমন আল-কায়েদার ইতিহাসের মোড়কে ঘুরিয়ে দিয়েছে এবং এরূপ স্বপ্নই বিন লাদেন দেখতেন।

ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে আল-কায়েদা

বিন লাদেনের আফগান ডেরায় আমার ভ্রমণের পাঁচ বছর পর যখন আমেরিকা নাইন ইলেভেনের হামলার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আল-কায়েদা এবং তাদের আশ্রয়দানকারী তালেবান সরকারকে ধ্বংস করে দিতে চাইল, তখন তোরাবোরা ভয়াবহ ক্লাস্টার বোম্বিংয়ের ফলে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। এটি এবং এর পরবর্তী কিছু বোমা হামলায়—যেটি ২০০১ সালের ১০ই অক্টোবর থেকে ১১ সপ্তাহ ধরে

চলমান ছিল—প্রায় বিশ হাজার আফগান বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়। এসব বোমাবর্ষণে ১২৮টি আফগান শহর এবং শহরতলী বিধ্বস্ত হয়ে যায়।

সামরিক প্রতাপের এই প্রদর্শনে কেবল একজন তালেবান নেতা, নিরাপত্তা বিষয়ক মন্ত্রী ক্বারী আহমাদউল্লাহ নিহত হন। প্রচলিত আছে, পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই (ISI) এর সহায়তায় বিন লাদেন এবং আল-কায়েদা নেতৃবর্গের ইনার সার্কেল ইতিমধ্যেই পেছনের দরজা দিয়ে পাকিস্তানে চলে আসে। যদিও আল-কায়েদার নেতারা গ্রেপ্তার অথবা মৃত্যুকে এড়াতে পেরেছিলেন, কিন্তু এটাই তাদের পতনের গোড়াপত্তন করতে পারত। আফগানিস্তানে মার্কিন হামলা সফলভাবে তাদের সামরিক সক্ষমতা এবং অবকাঠামোর আশি শতাংশেরও বেশি ধ্বংস করে দিয়েছিল। সেখানে তারা তাদের নিরাপদ আশ্রয় এবং প্রশিক্ষণ শিবিরগুলোকেও হারায়। তারা অত্যধিক মডারেট মুসলিমদের থেকেও তাদের সমর্থন হারায়, যারা নাইন ইলেভেনের হামলাসমূহের ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি প্রচণ্ড সহানুভূতি অনুভব করেছিল। এবং সবচেয়ে গুরুতরভাবে আল-কায়েদার নিজের অভ্যন্তরেও ফাটলের সৃষ্টি হয়েছিল। সংগঠনটির অনেক প্রধান ব্যক্তিত্বই নাইন ইলেভেনের হামলাসমূহের বিরোধিতা করেছিলেন; যাদের মধ্যে আবু মুসআব আল-সুরী এবং এই অধ্যায়ের সাথে আরও সংগতিপূর্ণভাবে আবু মুসআব আল-জারকাভিও বিদ্যমান ছিলেন। তিনিই পরবর্তী সময়ে 'আল-কায়েদা ইন ইরাক' এর আমির হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন।

ওমর মাহমুদ উসমান আবু ওমর, যিনি আবু কাতাদাহ নামে সুপরিচিত একজন চরমপন্থি আলেম; তাকে ইউরোপে আল-কায়েদার আধ্যাত্মিক নেতা মনে করা হয়। তার মতে ১১ সেপ্টেম্বরের হামলাগুলোর প্রতি আল-জারকাভির অমতই প্রধান কারণ, যার ফলে তিনি তখনও বিন লাদেনের প্রতি আনুগত্যের শপথ প্রদান করেননি এবং আল-কায়েদা থেকে স্বাধীনভাবে কার্যক্রম পরিচালনাকেই অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন।[১] আবু কাতাদাহ আরও বলেন, আল-কায়েদার ইনার সার্কেলের কিছু সদস্য এই সময়ে বাস্তবিকই এই সংগঠনটি ছেড়ে চলে গিয়েছিল। কারণ তারা একে মনে করেছিল একটি সর্বনাশা সিদ্ধান্ত এবং তারা অনুমান করেছিল যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তুলনাহীন হিংস্রতার মাধ্যমেই এর জবাব দেবে। তারা তালেবানের আদর্শ ইসলামিক রাষ্ট্রকেও (তারা একে এভাবেই দেখত) ধ্বংস করে দেবে এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে আল-কায়েদার টিকে থাকা এবং বিস্তার লাভের জন্য অতীব জরুরি তাদের নিরাপদ আশ্রয়কেও হারাবে। তবে আল-

[১] আবু কাতাদা পূর্বে লন্ডনে বসবাস করতেন। বর্তমানে (আমার এই লেখার সময়; আগস্ট ২০০৫) তার ওপর দেশত্যাগের পরোয়ানা জারি রয়েছে। Interview with Abdel Bari Atwan, London, June ২০০৫.

কায়েদার ওপর বিজয় ঘোষণা করায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র খুব তাড়াহুড়ো করে ফেলেছিল। কারণ যদিও এর নেতৃবর্গরা আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়েছিল, কিন্তু তখনও সংগঠনটির যথেষ্ট বৈশ্বিক উপস্থিতি বিদ্যমান ছিল এবং ২০০২ সালেও তারা বহু বৈশ্বিক হামলা পরিচালনার সক্ষমতা প্রদর্শন করেছে। এগুলোর মধ্যে তিউনিসিয়ার ড্যেরবায় ১১ এপ্রিলের হামলা এবং ইন্দোনেশিয়ার বালিতে ১২ অক্টোবর নাইটক্লাবে বোমা হামলা অন্যতম। অতএব, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এটা সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়া উচিত ছিল যে, তাদের শত্রু ক্ষতিগ্রস্ত হলেও পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়নি।

একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক মুহূর্তে, ঠিক আঠারো মাস পর যখন আফগানিস্তানের আল-কায়েদা নাজেহাল অবস্থায় ছিল, তখন তাদের ডুবুডুবু শ্রী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ২০০৩ সালের ১৯ মার্চ ইরাক আক্রমণের মাধ্যমে পুনর্জাগরণ লাভ করে। এই পদক্ষেপটি মুসলিম ক্রোধের যে জাগরণ ঘটাবে, তার মাত্রাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সত্যিকারার্থেই ছোট করে দেখেছিল। সম্ভবত সাদ্দাম হুসাইন সেক্যুলার নেতা হওয়ার কারণে তারা ভেবেছিল যে, জনগণ হয়তো শাসনব্যবস্থার পরিবর্তনে আনন্দিত হবে; কিন্তু এটা তাদেরকে কোনরূপ সহায়তা করেনি। ফিলিস্তিনের প্রধানমন্ত্রী মাহমুদ আব্বাসের মতানুসারে (২০০৩ সালের জুন মাসে) জর্জ ডব্লিউ বুশ তাকে বলেছিল যে—'সৃষ্টিকর্তাই প্রেসিডেন্টকে নির্দেশ দিয়েছেন আল-কায়েদা এবং ইরাকে আক্রমণ করার জন্য।' ব্যাপকভাবে প্রচারিত এই তথাকথিত মন্তব্য অসংখ্য মুসলিমের নিকট ধর্মীয় অবমাননা হিসেবে গৃহীত হয় এবং আরেকটি ক্রুসেডের অবতারণা করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এজেন্ডার এই দাম্ভিকতা উম্মাহর ঐতিহাসিক দুর্দশা এবং এর সাথে অবমাননার অনুভূতি ও হতাশার ক্রোধকে বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তেলসমৃদ্ধ ইরাকের ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক তাৎপর্যকে নিয়েও অন্যমনস্ক ছিল; যেটা কেবল একটি মুসলিম ভূখণ্ডেই নয় বরং বিশ্বের যেকোনো অঞ্চল অপেক্ষা মুসলিমদের নিকট অতিশয় তাৎপর্যপূর্ণ। সেখানে ইসলামিক পবিত্র স্থান এবং স্থাপত্যের সংখ্যা অনেক বেশি। এর রাজধানী বাগদাদ খিলাফতের প্রাচীন পাদপীঠ, যা সালাফি-জিহাদিদের নিকট অতি মহার্ঘ্য এবং সর্বোপরি ইরাক মুসলিমদের নিকট সৌদি আরব এবং ফিলিস্তিনের মতোই তাৎপর্যপূর্ণ।

শাসনব্যবস্থায় পরিবর্তন

ঐতিহাসিকভাবে ইরাক, যেটি সাবেক অটোমান সাম্রাজ্যের তিনটি প্রদেশ যথা মসুল, বাগদাদ এবং বসরা নিয়ে গঠিত হয়েছে, শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনের সাথে মোটেও অপরিচিত নয়। কেবল বিংশ শতাব্দীতেই এটি অটোমান সাম্রাজ্য থেকে

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশ ম্যান্ডেটে পরিণত হয় (১৯১৯)। কিন্তু এর পরপরই সেখানে ব্রিটিশদেরই প্রতিস্থাপিত হাশিমী রাজবংশের সূচনা হয়, যেটি ১৯৩২ সালে পূর্ণস্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৫৮ সালে একটি গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে এই রাজবংশের পতন ঘটে এবং ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবদুল করিম কাসেম ক্ষমতা দখল করে একটি সামরিক এবং বামপন্থি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। এই সরকারকে উৎখাত করে (১৯৬৩) কর্নেল আব্দুস সালাম আরিফ ক্ষমতা দখল করেন এবং এরপর আবার তার সরকারকে ১৯৬৮ সালে আরব সোশিয়ালিস্ট বাথ পার্টি পদচ্যুত করে ক্ষমতা দখল করে। সাদ্দাম হোসাইনও বাথ পার্টির প্রথম সারির একজন নেতা ছিলেন। বাথ পার্টির মূলনীতি ছিল ন্যাশনালিজম, মিলিটারিজম, সোশিয়ালিজম এবং প্যান-অ্যারাবিজম। সাদ্দাম হুসাইন ১৯৭৯ সালে ইরাকের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সাদ্দাম হুসাইন নিষ্ঠুর স্বৈরশাসক ছিলেন। তার শাসনামলজুড়েই কুর্দি, যেকোনো ভিন্নমত পোষণকারী, কমিউনিস্ট, দলত্যাগী সেনাসদস্য এবং এরূপ আরও অন্যান্যদেরকে হত্যার শিকার হতে হয়েছে। যেকোনো রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীর সাথে তার বোঝাপড়ার পদ্ধতি ছিল অতিশয় নৃশংস। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৭৯ সালে তার পূর্বসূরি আহমাদ হাসান বকরকে জোরপূর্বক পদত্যাগে বাধ্য করার পর তিনি তাঁর সহকারী নেতাদের দ্বারা ব্যক্তিগতভাবে ১৬৮ জন বেসামরিক নাগরিক এবং সামরিক ব্যক্তিবর্গকে (যাদের মধ্যে বাথ পার্টির সদস্যও অন্তর্ভুক্ত ছিল) হত্যা করান। কারণ তিনি ভেবেছিলেন, তারা হয়তো তার বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করবে।

সাদ্দাম হুসাইন কর্তৃক সবচেয়ে বীভৎস নৃশংসতা সংঘটিত হয় ইরানের সাথে ১৯৮০-৮৮ এর যুদ্ধচলাকালীন এবং যুদ্ধ সমাপ্তির সামান্য কিছু পরে। যেখানে ১৯৮৮ সালের বসন্তে হালাবজায় রাসায়নিক বোমা হামলায় প্রায় সাত হাজার কুর্দি নিহত হয়। দশকের পর দশক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেন সাদ্দাম হুসাইনের নৃশংসতাকে প্রত্যক্ষ করে গেছে এবং একে নিবারণ করার জন্য তারা কোনো পদক্ষেপ নেয়নি অথবা তাকে অভিযুক্তও করেনি। বরং, ১৯৮৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরাকে তাদের অর্থনৈতিক সহায়তাকে দ্বিগুণ করে। ব্রিটেনও সাদ্দাম হুসাইনকে সহায়তার জন্য অধীর থাকত এবং ব্রিটেন সরকারের এক্সপোর্ট ক্রেডিটস গ্যারান্টিস ডিপার্টমেন্ট ১৯৮৮ সালে সাদ্দাম হুসাইনের সাথে ১৭৫ মিলিয়ন ইউরো (তৎকালীন প্রায় ৩০ কোটি ৯০ লাখ ইউরো) এবং ১৯৮৯ সালে প্রায় ৩৪০ মিলিয়ন ইউরো (তৎকালীন প্রায় ৫ লক্ষ ৩৫ হাজার ডলার) ঋণ সহায়তার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়।

স্বাধীনতার পর ইরাকে প্রথমবারের মতো মার্কিন এবং ব্রিটিশ সামরিক হস্তক্ষেপ ঘটেছিল ১৯৬১ সালের জুলাই মাসে। তখন ব্রিটিশ সৈন্যরা কুয়েতের বর্ডারে জড়ো হওয়া ইরাকি সৈন্যদের থেকে কুয়েতকে প্রতিরক্ষার জন্য সেখানে গমন করে। অটোমান সাম্রাজ্যের সময় থেকেই কুয়েত ইরাকের অধীন ছিল—এই পূর্ব-ইতিহাসের ভিত্তিতে ইরাক কুয়েতকে নিজেদের বলে দাবি করে। কিন্তু উক্ত অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যের স্বার্থের একটি প্রধান উপাদান ছিল কুয়েত। 'গালফ অয়েল কোম্পানি' (ব্রিটিশ এবং আমেরিকান যৌথ মালিকানাধীন) সেখানকার 'বারগান তেলক্ষেত্র' থেকে ১৯৪৬ সাল থেকেই তেল আহরণ করে আসছিল। ১৯৬১ সালের ডিসেম্বর মাসে ইরাকের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জেনারেল কাসেম তার দেশে বহিরাক্রমণের প্রতিশোধস্বরূপ 'ইরাকি পেট্রোলিয়াম কোম্পানি'কে (এতে আমেরিকান কোম্পানিসমূহের পঁচিশ শতাংশ শেয়ার ছিল এবং ব্রিটিশদের আরও কিছু বেশি শেয়ার ছিল) তাদের ৯৫.৫ শতাংশ ছাড় থেকে বঞ্চিত করেন। এই ঘটনার পর ১৯৬৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যে অভ্যুত্থানে জেনারেল কাসেম উৎখাত হন, তাতে অনেকেই সিআইএ-এর জড়িত থাকাকে সন্দেহ করেন। তাঁর উত্তরসূরি প্রেসিডেন্ট আব্দুস সালাম আরিফ সেই বছরের অক্টোবর মাসেই কুয়েতের স্বাধীনতার অধিকারকে স্বীকৃতি দেন। তারপর ১৯৬৮ সালে বাথ পার্টি ক্ষমতা দখল করে নেয় এবং ১৯৭২ সালের জুন মাসে ইরাকের সকল তেল ক্ষেত্রগুলোকে জাতীয়করণ করা হয়।

ক্ষমতায় আরোহণের এক বছর পরই সাদ্দাম হুসাইন ইরান আক্রমণ করে বসেন। ইরাক-ইরান যুদ্ধটি ছিল একটি দীর্ঘ এবং রক্তাক্ত যুদ্ধ। এটি একটি ক্ষয়কারী যুদ্ধে পরিণত হয়; যার সমাপ্তি ঘটে উভয় দেশের সীমানা অপরিবর্তিত থেকেই। এই নিষ্ফল যুদ্ধজুড়ে ইরাককে এক মিলিয়ন পরিমাণ হতাহতের সম্মুখীন হতে হয় এবং যুদ্ধের ফলে তাদের ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬০ বিলিয়ন ডলার। যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমগ্র যুদ্ধজুড়েই ইরাককে সামরিক এবং অর্থনৈতিক সহায়তা দিয়ে গেছে, কিন্তু তারা একে পুনর্গঠনের জন্য কোনো প্রকারের অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদানে অস্বীকৃতি জানায় এবং আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংস্থাসমূহকেও কোনোপ্রকার ঋণ সহায়তা এবং পূর্ব ঋণের পুনঃসময় নির্ধারণ না করার ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়। সাদ্দাম হুসাইন তখন উক্ত অঞ্চলে একটি উদীয়মান সামরিক হুমকি হিসেবে বিবেচিত হতে থাকে। তিনি ইরানের সাথে যুদ্ধের মাধ্যমে ব্যাপক সামরিক এবং স্ট্র্যাটেজিক অভিজ্ঞতা অর্জন করেন এবং তিনি তখন পারমাণবিক অস্ত্রের জন্য প্রয়াস করে যাচ্ছিলেন। একইসাথে তিনি গণবিধ্বংসী অস্ত্রের সমাহার গড়ে তুলেছিলেন যা সরাসরি ইসরাইল ও মধ্যপ্রাচ্যে

আমেরিকার সামরিক আধিপত্যের প্রতি একটি হুমকিস্বরূপ ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অবশেষে সাদ্দাম হুসাইনকে নিজেদের তৈরি একটি দানব হিসেবেই দেখতে পেল।

কুয়েত এবং আরব আমিরাত তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত তেল দিয়ে বাজারকে সয়লাব করে দেওয়ায় ইতিমধ্যেই দুরবস্থাগ্রস্ত ইরাকি অর্থনীতিকে আরও গুরুতরভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছিল (যেটা পুরোপুরিভাবেই তেল রাজস্বের ওপর নির্ভরশীল)। তখন প্রতি ব্যারেল তেলের দাম কমে দশ ডলারে এসে দাঁড়ায়। এর মাঝে কুয়েত হঠাৎ করেই ইরানের সাথে যুদ্ধের সময় ইরাককে দেওয়া তাদের ৩০ বিলিয়ন ডলার ঋণকে ফেরত চেয়ে বসে। ইরাকের তেল রাজস্ব তখন তাদের ঋণের বোঝাকে লাঘব করার কাজেই ক্রমবর্ধমানভাবে ব্যবহৃত হচ্ছিল। সাদ্দাম হুসাইন তখন মরিয়া হয়ে কুয়েত দখল করার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং কুয়েত সীমান্তে এক লক্ষ সেনা সমাবেশ করলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাৎক্ষণিকভাবেই হস্তক্ষেপ করলে 'অপারেশন ডেজার্ট স্টর্ম' নামে ১৯৯১ সালের ১৭ জানুয়ারি প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধের সূত্রপাত হয়; এবং কেবল ছয় সপ্তাহের মধ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তাদের মিত্রদের অনিবার্য বিজয়ের মাধ্যমে এর সমাপ্তি ঘটে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তখন আশঙ্কা করেছিল ইরাকের আক্রমণ কুয়েতের বাইরেও বিস্তৃত হবে এবং সৌদি আরবকে হুমকির মুখে ফেলবে; যেটি তাদের প্রধান তেল উৎপাদক এবং মধ্যপ্রাচ্যে তাদের ঘনিষ্ঠতম মিত্র। অতএব, তারা যথাযথ কারণেই তাদের স্থীরদৃষ্টিকে ইরাকের নিজস্ব তেল মজুদের দিকে নিক্ষেপ করা শুরু করল।

ইরাকের তেল মজুদ সৌদি আরবের পরই বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অবস্থানে রয়েছে এবং এর পরিমাণ হলো প্রায় তিনশ বিলিয়ন ব্যারেলেরও বেশি। উৎপাদন খরচের দিক থেকে সৌদি আরবের মতো ইরাকের তেল উৎপাদন খরচও সবচেয়ে কম। কারণ সেখানে প্রচুর সংখ্যক তেলক্ষেত্র রয়েছে এবং সেগুলোকে তুলনামূলকভাবে অগভীর কূপের সাহায্যে উত্তোলন করা যায়। মজুদের প্রকাণ্ড আয়তন এবং এর সাথে পানি ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রাকৃতিক গ্যাসের মিশ্রণের কারণে মজুদ তেলে উচ্চমাত্রার চাপ বিদ্যমান এবং এসব কারণে তেলের ফ্লো-রেটও অত্যন্ত বেশি। 'অয়েল এন্ড গ্যাস জার্নাল' এর তথ্যানুযায়ী পশ্চিমা কোম্পানিগুলোর হিসাব মোতাবেক তারা প্রতি ব্যারেল ইরাকি তেলকে ১.৫ ডলারেরও কম এবং সর্বনিম্ন ১ ডলারেই উৎপাদন করতে পারবে। তুলনামূলক আপেক্ষিক কম উৎপাদন খরচের অঞ্চল; যেমন মালয়েশিয়া এবং ওমানে প্রতি ব্যারেল তেল উৎপাদনে ৫ ডলার ব্যয় হয়। মেক্সিকো এবং রাশিয়ায় প্রতি ব্যারেল তেল উৎপাদনে খরচ হয় ৬-৮ ডলার (স্থানীয় কোম্পানিগুলোর দ্বারা বর্তমান উৎপাদনব্যবস্থার আলোকে খরচ আরও বেশি পড়ে)। টেক্সাস ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য এবং কানাডিয়ান তেলক্ষেত্র থেকে গভীর কূপ এবং ক্ষুদ্রাকার মজুদের

কারণে প্রতি ব্যারেল তেল উৎপাদন খরচ পড়ে ২০ ডলারেরও অধিক। যখন বিশ্ববাজারে তেলের দাম ২০ ডলারেরও নিচে নেমে আসে তখন উত্তর আমেরিকার তেলক্ষেত্রগুলোর সর্বোপরি কোন লাভই করতে পারে না। কিন্তু তখনও ইরাকি তেলক্ষেত্রগুলো উল্লেখযোগ্য পরিমাণ লাভ করে।

ইরাকি তেল কতটা আকর্ষণীয়, এর আরেকটি উদাহরণ নিয়ে আসা যাক। বিভিন্ন দেশের বর্তমান তেল মজুদ আর কত বছর পর্যন্ত স্থায়ী হবে এর একটি হিসাব মার্কিন অর্থনীতিবিদ জেরেমি রিফকিন বের করেছেন। এই গবেষণার ফলাফল থেকেই সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তেল মজুদ আর মাত্র ১০ বছর স্থায়ী হবে, ইরানের ৫৩ বছর, সৌদি আরবের ৫৫ বছর, আরব আমিরাতের ৭৫ বছর, কুয়েতের ১১৬ বছর এবং বিস্ময়করভাবে ইরাকের তেল মজুদ আরও ৫২৬ বছর স্থায়ী হবে।[১]

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য সাদ্দাম হোসাইন তাই মধ্যপ্রাচ্যে তাদের এজেন্ডার প্রতি একটি বড় ধরনের হুমকিস্বরূপ এবং সবচেয়ে বড় ব্যাপারটি হলো, প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে সাদ্দাম হুসাইন ইসরাইলে মিসাইল হামলা পরিচালনা করেছিল। তাই তারা তাকে অপসারণ করবে কিনা, এটি আর এখন কোনো বিষয় নয়; বরং বিষয় হলো কীভাবে এবং কখন তারা তার থেকে নিস্তার পাবে।

১৯৯০ এর দশকজুড়ে মার্কিন নিষেধাজ্ঞার ফলস্বরূপ প্রতি মাসে হাজার হাজার নিরাপরাধ বেসামরিক নাগরিক পুষ্টিহীনতা এবং প্রয়োজনীয় ওষুধের অভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে। যখন মার্কিন সেক্রেটারি অফ স্টেট মেডেলিন অলব্রাইটকে নিষেধাজ্ঞার কারণে পাঁচ লক্ষ শিশুর মৃত্যু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তখন তিনি এই কুখ্যাত মন্তব্য করেছিলেন যে—'এই মূল্য ঠিকই আছে।'[২] এই নিষেধাজ্ঞা ইরাককে একটি উৎকৃষ্ট জনসেবাসমৃদ্ধ আধুনিক রাষ্ট্র থেকে দারিদ্র্যপীড়িত বিধ্বস্ত রাষ্ট্রে পরিণত করে।

যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উপলব্ধি করতে পারল, সাদ্দাম হুসাইনকে সামরিক অভ্যুত্থান, গণবিদ্রোহ অথবা স্থানীয় বিপ্লব দ্বারা আপাতদৃষ্টিতে উৎখাত করা সম্ভব নয়; তখন তারা **WMD (Weapon of Mass Destruction** : গণ-বিধ্বংসী অস্ত্র) টেক্কার অবতারণা করে। এখন আমরা যেমনটা জানি, সেখানে এরূপ কোন অস্ত্রই ছিল না। প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধের পর এবং দ্বিতীয় উপসাগরীয় যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়কালটিতে এগুলোকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল অথবা নিজ

---

[১] www.globalpolicy.org/security/oil/2002/12heart.htnm.

[২] 60Minutes, CBS-TV, 5 December 1996.

থেকেই বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল (কারণ সেগুলোর আয়ু ছিল দুই থেকে চার বছর পর্যন্ত)। কিন্তু এসব ২০০৩ সালের মার্চ মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সাথে ব্রিটেনের পূর্ণ অংশগ্রহণে ইরাক আগ্রাসনকে নিবারণ করতে পারেনি।

২০০৪ সালের আগস্ট মাসে একটি ইউরোপিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের বিতর্ক অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। সেখানে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন একজন সাবেক উচ্চপদস্থ মার্কিন সামরিক কৌশলবিদ। অনুষ্ঠানের বাইরে একটি আলাপচারিতায় তিনি আমাকে জানিয়েছিলেন যে, ইরাক আক্রমণের পূর্বে মার্কিন প্রশাসন কিরূপ উভয় সংকটের সম্মুখীন হয়েছিল। তাদের সামনে সোজা দুটি বিকল্প ছিল; যথা—জাতিসংঘ পরিদর্শকদের কর্তৃক তাদের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য অনুমোদন অথবা একটি পুরোদস্তর আক্রমণ। যদি পরিদর্শকরা WMD এর কোন প্রমাণ না পায়, তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নিতে হবে এবং সাদ্দাম হুসাইন আরববিশ্বে একজন মহান নেতা হিসেবে আবির্ভূত হবে। আবার সাদ্দাম হুসাইন থেকে কীভাবে নিস্তার পাওয়া যায় এ বিষয়ে পেন্টাগনে দুটি মত ছিল। একপক্ষের রায় ছিল একটি ঝটিকা আক্রমণ পরিচালনা করে দ্রুতগতিতে বাগদাদ দখল করা এবং অতিসত্বর সৈন্য প্রত্যাহারের পূর্বেই সাদ্দাম এবং তার পরিপার্শ্বের লোকজনকে হত্যা করে ইরাকিদেরকে নিজেদের সমস্যা নিজেদের মতো করে সমাধানের জন্য রেখে আসা। অন্যপক্ষের রায় ছিল, বরং একটি পূর্ণমাত্রা অভিযান পরিচালনা করে উক্ত রাষ্ট্র ও এর প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধ্বংস করা এবং এরপর সেগুলোকে গণতান্ত্রিক মডেলে পুনর্নির্মিত করা।

২০০৩ সালের ফেব্রুয়ারি এবং মার্চ মাসের প্রথমার্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্য তাদের উদ্দিষ্ট ইরাক আক্রমণকে বিধিসম্মত করার প্রচেষ্টা হিসেবে নিরলসভাবে জাতিসংঘের নিরাপত্তা কাউন্সিল সদস্যদের আহ্বান জানিয়েছিল। কেবল স্পেন এবং বুলগেরিয়া সামরিক অভিযানের পক্ষে ভোট দেওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিল। যেহেতু কোনো রেজুলেশন পাশের জন্য পনেরো সদস্যরাষ্ট্র থেকে কোনো ভেটো ব্যতিত কমপক্ষে নয়টি ভোট পেতে হয়, তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাদামাটাভাবে সিদ্ধান্ত নিল যে, তারা এই ভোটাভুটি নিয়ে মাথা ঘামাবে না বরং সরাসরি সামনে এগিয়ে যাবে এবং আক্রমণ করবে।

অবশেষে সাদ্দাম হুসাইন এবং অন্যান্য নেতাদের সম্ভাব্য অবস্থানকে লক্ষ্য করে ২০০৩ সালের ১৯ মার্চ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিমান হামলা পরিচালনা করে এবং এতে কেবল অসংখ্য বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়। ২০ মার্চ স্থল আক্রমণ শুরু হয় এবং কুয়েত সীমান্ত থেকে জোট সেনারা ইরাকে প্রবেশ করে। এই 'শক অ্যান্ড অ্যাওয়ে' অভিযানে অনবরত বোমাবর্ষণের আড়ালে সেনারা অগ্রসর হয় এবং এই অভিযানটি সীমিত হলেও সাহসী প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছিল। ৯ এপ্রিলেই

বাগদাদের পতন ঘটে এবং ১ মে জর্জ ডব্লিউ বুশ কর্তৃক 'মূখ্য লড়াইয়ের সমাপ্তি' ঘোষিত হয়।

প্রতিরোধ

সত্যিকারের যুদ্ধ শুরু হয় ২০০৩ সালের ১ মে'র পর থেকেই। সকল সম্ভাব্য বিদ্রোহীরা, বাথিস্ট থেকে শুরু করে আল-কায়েদা এবং উত্তরাঞ্চলীয় পর্বতমালার কুর্দি জিহাদি গোষ্ঠীসমূহ উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে, গতানুগতিক যুদ্ধে জড়ানোর দ্বারা কোন ফায়দা হবে না। তাই তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ব্যাপক সামরিক আধিপত্যের সুযোগ করে দেয়। সূত্রসমূহ অনুসারে তখন তাদের অধিকাংশই একটি নিচু ঠাঁট বজায় রাখার সিদ্ধান্ত নেয় এবং কেবল তাদের সময়ক্ষেপণ করতে থাকে। অনিবার্য মার্কিন আগ্রাসনের সম্মুখে নিরুপায় হয়ে সাদ্দাম হুসাইন আক্রমণের সূত্রপাতের কয়েক মাস পূর্ব থেকেই সম্ভাব্য সকল পরিকল্পনা প্রণয়ন শুরু করেছিলেন। বাথ শাসনব্যবস্থার ঘনিষ্ঠ কিছু সূত্র আমাকে বলেছে, সাদ্দাম হুসাইন সুন্নি এলাকার কৃষকদের কাছে বার্তাবাহক পাঠিয়ে তাদের কাছ থেকে ছোট ছোট জমি কিনে নিতেন এবং মধ্যরাতে সেখানে তার সেনারা ভবিষ্যৎ প্রতিরোধ যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য অস্ত্রশস্ত্র এবং টাকাকড়ি পুঁতে রেখে আসত। এমনকি আত্মগোপনে থাকা অবস্থাতেও সাদ্দাম হুসাইন একেবারে ২০০৩ সালের ১৩ ডিসেম্বর আটক হওয়ার পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত ক্রমবর্ধমানভাবে বিদ্রোহের খোরাক জোগানো অব্যাহত রাখেন।

২০০৩ সালের ২৮ এপ্রিল আত্মগোপনে থাকা অবস্থাতেই আমার পত্রিকা সাদ্দাম হুসাইন থেকে ফ্যাক্সের মাধ্যমে একটি চিঠি পায়। সেখানে তিনি ইঙ্গিত দেন যে, তিনি পূর্বেই জানতেন প্রকৃত যুদ্ধটি হবে কোনো বিদ্রোহ ঘরানার এবং এটা তখনই শুরু হবে যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মনে করবে যুদ্ধের সমাপ্তি হয়েছে। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য সাধারণ ইরাকিদেরকে আহ্বান জানিয়ে লিখেছিলেন—'বুশ ততক্ষণ বিজয়ী হতে পারবে না যতক্ষণ আপনাদের হৃদয়ে এবং মনে প্রতিরোধশক্তি থাকবে।' ইরাকের প্রতিরোধ যুদ্ধটি মুসলিম সত্তাগত অনুভূতি, উম্মাহ, জিহাদ প্রভৃতির সাথে ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত থাকবে, যেন এটা উপলব্ধি করেই উক্ত চিঠির প্রকাশভঙ্গি এবং পরবর্তী চিঠিগুলোতেও তার কথার সুর ক্রমবর্ধমানভাবে ইসলামিক হতে থাকে এবং সেখানে বিভিন্ন জায়গায় কুরআনের উদ্ধৃতি দেওয়া থাকত। অনেক পূর্ব থেকেই সেক্যুলার হিসেবে পরিচিত হওয়ার কারণে সেই সময় এটা আমার কাছে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়েছিল। আমরা আরও বেশ কিছু চিঠি পেয়েছিলাম; সেগুলোর সর্বশেষটি ছিল ২০০৩ সালের জুন মাসের প্রথম দিকে। এরপর তিনি তার লোকজনের সাথে অডিও

টেপের মাধ্যমে যোগাযোগ করা শুরু করেন। সেগুলোকে রেকর্ড করে আল-জাজিরায় পাঠিয়ে দেওয়া হতো ঠিক যেমনটা বিন লাদেন করতেন।

শক্তি এবং সম্পত্তিসমূহকে না উড়িয়ে বরং সঠিক সময়ের খোঁজে ওত পেতে থাকা বহুবিধ বিদ্রোহী গোষ্ঠী মূলত তাৎক্ষণিকভাবে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকেই সক্রিয় ছিল। অতঃপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজেদেরকে একটি অদম্য এবং অপরাজেয় প্রতিরোধের সম্মুখীন দেখতে পায়; যে প্রতিরোধে পুরোপুরি ভিন্ন ভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ডের বহুবিধ গোষ্ঠী অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ইরাকের যুদ্ধ পরবর্তী পরিস্থিতি বুঝতে হলে আমেরিকান দখলদারির পূর্বে যেসব গোষ্ঠী সেখানে সক্রিয় ছিল সেগুলো সম্পর্কে আমাদের সংক্ষিপ্তভাবে জানতে হবে।

প্রতিরোধ যুদ্ধের প্রেক্ষাপট

ইরাকে মার্কিন আগ্রাসনের পূর্বে দেশটির উত্তরাঞ্চলে ইরান এবং তুরস্কের সীমানালগ্ন কুর্দিস্তানে সাদ্দাম হুসাইনের সেক্যুলার শাসনব্যবস্থাবিরোধী বেশকিছু সুন্নি সংগঠন ছিল। ১৯৮৮ সালে প্রতিষ্ঠিত এরূপ একটি জিহাদি সংগঠন হলো 'দ্য ইসলামিক মুভমেন্ট' বা 'তানজিম আল-হারাকাহ আল-ইসলামিয়াহ'। এটি এই কারণে তাৎপর্যপূর্ণ যে পরবর্তী আনসার আল-ইসলামের প্রধান মোল্লা ক্রিকার এই সংগঠনেরই একজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। যখন মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাসমূহ সাদ্দাম হুসাইন এবং বিন লাদেনের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের প্রচেষ্টা করছিল, যেন সাদ্দামকেও নাইন ইলেভেনের সাথে জড়ানো যায় এবং তাদের আগ্রাসনকে বৈধতা দেওয়া যায়, সে সময় অধিকাংশ বিদ্রোহী গোষ্ঠীই 'আনসার আল-ইসলাম' অথবা আল-কায়েদার সাথে সম্ভাব্য সাংগঠনিক এবং অর্থনৈতিক যোগাযোগ স্থাপন করছিল।

২০০৫ সালের এপ্রিল মাসে অসলোতে আমি মোল্লা ক্রিকারের সাথে সাক্ষাৎ করি। তিনি তখন আল-কায়েদা কর্তৃক কোনোভাবে আনসার আল-ইসলামের সহায়তা পাওয়ার বিষয়টিকে পুরোপুরিভাবে অস্বীকার করেন। তবে তিনি স্বীকার করেন যে, ১৯৮৮ সালে তিনি বিন লাদেনের কাছে আর্থিক সহায়তা চেয়েছিলেন। তখন তিনি এবং ইসলামিক মুভমেন্টের আরও দুই সদস্য বাথ শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধে তহবিল জোগানোর জন্য পেশোয়ারে গিয়েছিলেন। প্রাথমিকভাবে তিনি আব্দুল্লাহ আযযামের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন। তিনি কুর্দি সালাফি-জিহাদি গ্রুপগুলোকে ভীষণভাবে সমর্থন দিতেন এবং তিনি সাদ্দাম হুসাইনকে কাফির বলে বিবেচনা করতেন। আযযাম তাদেরকে একজন সৌদি প্রিন্সের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন, যে প্রিন্স তাদেরকে বলেছিলেন যে, তিনি

তাদেরকে সহায়তা করবেন যদি তারা ইরানিদেরকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে তাদের যুদ্ধকে সম্প্রসারিত করে। উক্ত প্রিন্স ইরানকে আরও বিপজ্জনক বলে মনে করতেন; তখন সাদ্দাম হুসাইন ইরানের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল এবং অন্যান্যদের সাথে সাথে সৌদি আরব কর্তৃকও সমর্থিত এবং অর্থায়িত হচ্ছিল।

মোল্লা ক্রিকার আমাকে বলেন যে, মিটিংয়ের পর কেউ একজন তাকে লম্বা পাতলা একজন ব্যক্তির দিকে নির্দেশ করে, যিনি প্রিন্সের পার্শ্ববেষ্টনীতে থাকা সত্ত্বেও সমগ্র কথোপকথন জুড়ে পুরোপুরি নীরব ছিলেন। তাকে বলা হয়—'উনি হলেন ওসামা বিন লাদেন; আফগানিস্তানে আরবদের শাইখ। আপনার উচিত তার কাছে অর্থ সহায়তা চাওয়া।' যথাযথভাবেই আযযাম আরও একটি মিটিংয়ের আয়োজন করে দিলেন। কিন্তু এটিও পূর্বেরটির মতোই ব্যর্থ ছিল। মোল্লা ক্রিকার স্মরণ করছিলেন—ওসামা বিন লাদেন আমাকে বলেছিলেন যে, তার সমুদয় অর্থ-সম্পত্তি তিনি আফগানিস্তানের আরব মুজাহিদদের অর্থায়নের জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছেন। তাই অন্য কাউকে এসব দেওয়ার তার কোনো অধিকার নেই এবং তার সাথে আমার সর্বশেষ সাক্ষাৎ ছিল সেটিই। এটাকে অবশ্যই এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, কারণ অনেক সূত্রই এটাকে খারিজ করে দেয় যে, সেটিই মোল্লা ক্রিকার এবং ওসামা বিন লাদেনের সর্বশেষ সাক্ষাৎ ছিল।

আরও অনেকগুলো গোষ্ঠীর সাথে ২০০১ সালের ডিসেম্বর মাসে আনসার আল-ইসলাম উদিত হয়। তাদের দুর্গ ছিল ইরান সংলগ্ন সীমান্ত অঞ্চলে এবং ২০০৩ সালের মার্চ মাস অবধি তারা তাদের নিয়ন্ত্রণের দশটি গ্রামের প্রায় পনেরো হাজার লোকের ওপর সালাফি জীবন ব্যবস্থা প্রণয়ন করেছিল। সেখানে নামাজের সময় দোকান বন্ধ হয়ে যেত; অ্যালকোহল নিষিদ্ধ ছিল এবং তারা তাদের অনুসারীদেরকে জিহাদের প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য উৎসাহিত করত। উক্ত অঞ্চলের সারগাত এলাকার বারহাম রাহুফ নামক একজন শিক্ষক এভাবে তার অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেন—'তারা বোরকা ছাড়া মহিলাদেরকে ঘর থেকে বের হওয়ার অনুমতি দিত না। তারা সকল স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলো নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল এবং সেসব পার্টিকেও নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল যেখানে নারী পুরুষ একত্রিত হতো এবং গান-বাজনা হতো। তারা লোকজনকে বলত এগুলোই নিয়ম এবং এগুলোকে অবশ্যই মানতে হবে।'

অসংখ্য আরব আফগান, যারা ২০০১ সালের অক্টোবর-নভেম্বরের আফগানিস্তানে মার্কিন বোমাবর্ষণে পালিয়ে গিয়েছিল, তারা আনসার আল ইসলামের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করে। এবং এটিও আরেকটি কারণ, যেজন্য লোকজন আল-কায়েদা এবং আনসার আল-ইসলামের মাঝে ভুলভাবে সাংগঠনিক যোগাযোগ স্থাপন করে (যেমনটা এর প্রধান কর্তৃক অস্বীকৃত)। তবে,

ভাবাদর্শগতভাবে এই দুই গোষ্ঠী প্রায় একই রকম। আল-কায়েদার মতো আনসার আল ইসলামও সালাফি, সুন্নি এবং জিহাদের সমর্থক। তারাও সাইয়িদ কুতুব এবং ইজিপশিয়ান ইসলামিক জিহাদ প্রভৃতি গোষ্ঠী কর্তৃক প্রভাবিত। একজন আমির এবং দুইজন ডেপুটি দ্বারা পরিচালিত ও এর সাথে একটি শরিয়াহ আদালত এবং সামরিক পরিকল্পনা, তথ্য, নিরাপত্তা, শরিয়াহ নির্দেশনা প্রভৃতির জন্য আরও বিভিন্ন কমিটি সম্বলিত এই দলটি কাঠামোগতভাবেও আল-কায়েদার সদৃশ।

সেখানে বেশকিছু শিয়া বিদ্রোহী গোষ্ঠীও ছিল যারা বাথ সরকারে সংখ্যালঘিষ্ঠ সুন্নি মুসলিম সম্প্রদায়ের আধিক্যের বিরোধী ছিল। কেবল চরমপন্থি শিয়া আলেম মুকতাদা আল-সদরের অনুসারীরা ব্যতিত এরূপ সবগুলো দলই পূর্বে অথবা পরে ইরাকে মার্কিন আগ্রাসনে সহায়তা করেছিল। প্রধান শিয়া গোষ্ঠীগুলির একটি হলো আল-দাওয়া (আহ্বান), যার মুখপাত্র ইব্রাহিম জাফরী পরবর্তী কালে ইরাকের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। সুপ্রিম কাউন্সিল ফর ইসলামিক রেভ্যুলেশন ইন ইরাক (SCIRI), যার হিংস্র বদর ব্রিগেড মিলিশিয়ারা বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সুন্নি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে লড়ছে। কুর্দি সেক্যুলার সংগঠনসমূহের মধ্যে জালাল তালাবানি নেতৃত্বাধীন 'প্যাট্রিয়টিক ইউনিয়ন অফ কুর্দিস্তান' এবং মাসুদ বারযানি নেতৃত্বাধীন 'কুর্দিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি' প্রধানতম। এই দুজন সাবেক গেরিলা প্রধান বর্তমানে যথাক্রমে ইরাকের প্রেসিডেন্ট এবং কুর্দি অ্যাসেম্বলির সভাপতি। কুর্দিশ মিলিশিয়া যোদ্ধা 'পেশমেরগা'ও প্রতিরোধযুদ্ধকে দমন করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং জোট সেনাদের সহযোগিতা করছে। মোল্লা ক্রিকার আমাকে বলেছিলেন যে, যখন মার্কিন আগ্রাসনের পূর্বে জালাল তালাবানি বুশ প্রশাসন কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়েছিলেন এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন, তিনি এই শর্তে জোট সেনাদেরকে সহযোগিতা করতে সম্মত হয়েছিলেন যে, তারা আনসার আল-ইসলামকে ধ্বংস করে দেবে। তিনি বলেন, তালাবানি আমেরিকাকে বলেছিল যে, আল-কায়েদা আনসার আল-ইসলামের নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলে তাদের প্রশিক্ষণ শিবিরগুলো পরিচালনা করে; তাদের রাসায়নিক অস্ত্র তৈরির সক্ষমতা রয়েছে এবং তারা সাদ্দাম হুসাইনেরও সহযোগী। বাস্তবে এর একটিও সত্য না হওয়ার পরেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২১ মার্চ থেকে আট দিন যাবৎ আনসার আল-ইসলামের এলাকাগুলোতে বোমাবর্ষণ করে। এতে শত শত মানুষ নিহত হয় এবং বাকিরা বিভিন্ন দেশে পালিয়ে যায়।

আনসার আল-ইসলাম এবং আল-কায়েদার সাথে সাদ্দাম হুসাইনের সংযোগকে না খুঁজে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহজেই সাদ্দাম এবং ইরানি অ্যান্টি-ক্লেরিকান গ্রুপ মুজাহিদ-ই-খালক (MK) এর মধ্যকার বাস্তব সম্পর্ককে সামনে নিয়ে আসতে পারত। এটি ১৯৯৮ সাল থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট

কর্তৃক সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে তালিকাভুক্ত ছিল। ১৯৮৬ সাল থেকেই বাগদাদে তাদের হেডকোয়ার্টার অবস্থিত ছিল এবং তাদের ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি ইরাকি সামরিক বাহিনী কর্তৃক সমর্থিত এবং প্রশিক্ষিত। তারা ইরান সরকারের বিরুদ্ধে অসংখ্য সন্ত্রাসী হামলাও পরিচালনা করেছে। এমনকি যদিও MK নাইন ইলেভেনের হামলাকে 'আমেরিকার ওপর আল্লাহর প্রতিশোধ'[১] হিসেবে অভিহিত করেছিল, তবুও তাদের রাজনৈতিক শাখা 'ন্যাশনাল রেজিস্ট্যান্স কাউন্সিল অফ ইরান' ২০০৩ সাল অবধি ওয়াশিংটনে তাদের অফিস চালিয়ে গেছে।

যুদ্ধপূর্ববর্তী ইরাকে আল-কায়েদা

অধিকাংশ বিশেষজ্ঞই একমত যে, ইরাকে মার্কিন আগ্রাসনের পূর্বেই সেখানে আল-কায়েদা উপস্থিত ছিল। তবে এখানে প্রশ্নটি হলো, কতটা সময় যাবৎ এবং কতটা বিস্তৃতভাবে তারা সেখানে সক্রিয় ছিল। সূত্রসমূহ একমত যে, সেই সময়ে আবু মুসআব আল-জারকাভি বিন লাদেন এবং আল-কায়েদা থেকে স্বাধীনভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করতেন। তিনি উত্তরাঞ্চলের আনসার আল-ইসলামের এলাকাতেই ঘাঁটি গেড়েছিলেন। সেখানে তার সাথে জর্ডানি যোদ্ধাদের পরিচিতি ছিল, যারা সেখানে আফগানিস্তানে মার্কিন বোমাবর্ষণের কারণে পালিয়ে এসেছিল।

মুহাম্মাদ আল-মাসারির তথ্য মোতাবেক, সাদ্দাম হুসাইন আরব আফগানদের সাথে ২০০১ সাল থেকেই সম্পর্ক স্থাপন শুরু করেছিলেন—এই বিশ্বাসে যে, তালেবানদের উচ্ছেদ করার পর তিনিই মার্কিন লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হবেন। এই সংস্করণের আলোকে, যেটাকে অন্যান্য অনেক বিশেষজ্ঞই খারিজ করে দিয়েছেন, ভূমিকাস্বরূপ কথাবার্তার পর সাদ্দাম হুসাইন প্রথম বোমাবর্ষণের ছয় মাস পূর্বে আল-কায়েদা কুশলীদের ইরাকে স্থানান্তর হওয়ার জন্য তহবিলের জোগান দিয়েছিলেন এই শর্তের আলোকে যে, তারা কেবল মার্কিন এবং জোট লক্ষ্যবস্তুতেই আঘাত হানবে এবং বাথ শাসনব্যবস্থায় ক্ষতিসাধনমূলক কোনো কিছু করবে না।

আল-মাসারির মতে, সাদ্দাম হুসাইন উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, ইসলাম মুসলিম জাতিসমূহকে ঐক্যসাধনের একটি উদীয়মান নতুন শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে, এবং তার ধারণা হয়েছিল, আরব জাতীয়তাবাদের সময় শেষ হয়ে এসেছে। তিনি স্পষ্টতই দেখতে পেয়েছিলেন যে, আগ্রাসনের ক্ষেত্রে একটি সর্বজনীন প্রতিরোধ গঠনে ইসলামই প্রধান ভূমিকা পালন করবে। তাই তখন

---

[১] The New York Times, 1 July 2003.

ইরাকি আর্মি কমান্ডারদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল প্রাক্টিসিং মুসলিম হওয়ার জন্য এবং জিহাদিদের বুলি এবং মানসকে আত্মস্থ করার জন্য। আগমনের পর পরই আল-কায়েদা কুশলীদেরকে সেসব কমান্ডারদের সংস্পর্শে রাখা হয় এবং সাবেক অফিসারদের এই নেটওয়ার্কটিই পরবর্তী সময়ে আল-কায়েদা এবং অন্যান্য প্রতিরোধ গোষ্ঠীগুলোকে সাদ্দাম হুসাইন থেকে অস্ত্রশস্ত্র এবং টাকাকড়ি প্রদানের বন্দোবস্ত করেছিল।

তবে, সা'দ আল-ফকিহ্ এর মতে, ইরাক আগ্রাসনের কয়েক মাস পূর্ব থেকে সেখানে আল-কায়েদা কুশলীরা আগমন করতে থাকে; কিন্তু সাদ্দাম হুসাইনের প্রণোদনায় নয় এবং খুব সম্ভবত তার অগোচরেই। আল-ফকিহ্ আরও বলেন, বাগদাদ ও মসুলের মধ্যবর্তী সুন্নি ট্রায়াঙ্গেলে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আল-কায়েদা নেতৃবর্গ প্রায় তিনশত সদস্যের একটি দলকে সেখানে পাঠিয়েছিল। তবে তিনি এ বিষয়ে একমত যে, তাদের প্রতি ইসলামি ঘরানার ইরাকি সামরিক ব্যক্তিবর্গের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের নির্দেশনাও ছিল। যুদ্ধ আরও ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে হাজার হাজার আরব বিভিন্ন দেশ থেকে ইরাককে সমর্থনের জন্য ছুটে আসে এবং আল-কায়েদা এজেন্টরা তাদের ভিরের মধ্যে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার অলক্ষ্যেই থেকে যায়। যারা পরবর্তী কালে প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল তাদের অধিকাংশের মতো তারাও নিচু ঠাঁট বজায় রাখে এবং সময়ক্ষেপণ করতে থাকে।

আবু মুসআব আল-জারকাভি

বর্তমানে আবু মুসআব আল-জারকাভি দৃঢ়ভাবে 'আল-কায়েদা ইন দ্যা ল্যান্ড অফ টু রিভার্স' এর আমির হিসেবে প্রতিষ্ঠিত এবং সর্বোপরি সমগ্র প্রতিরোধ যুদ্ধেরই একজন ক্ষমতাবান নেতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন।[১] তিনি আপেক্ষিক ক্ষিণালোক থেকে একেবারে লাইমলাইটে চলে এসেছেন। তিনি আফগানিস্তানে আল-কায়েদার কোন নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন না; বরং তিনি তার নিজস্ব দল 'তাওহিদ আল-জিহাদ' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং হেরাত অঞ্চলে স্বাধীনভাবে নিজের প্রশিক্ষণ শিবির পরিচালনা করতেন। যখন তিনি ইরাকের উদ্দেশ্যে ইরান হয়ে আফগানিস্তান ত্যাগ করেন, একজন বিশেষজ্ঞের ভাষ্যমতে, 'কোনো একটি অভিযানের খোঁজে', তখন মনে হয়েছিল তিনি হয়তো নিজস্ব উদ্যোগেই কার্যক্রম

---

[১] এটি লেখার সময় আবু মুসআব আল-জারকাভি জীবিত ছিলেন। এর কিছুদিন পরই ২০০৬ সালের জুন মাসের শুরুতে একটি মার্কিন বিমান হামলায় জারকাবি মৃত্যুবরণ করেন। এই অধ্যায়ের শেষে পরবর্তী সংস্করণে সংযোজিত পুনশ্চ অংশে লেখক এটি উল্লেখ করেছেন।-সম্পাদক

পরিচালনা করবেন।[১] যে লোকটি কারও কারও মতে আল-কায়েদার ইতিহাসে বিন লাদেনের মতোই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছেন এবং নিশ্চিতভাবেই এই মুহূর্তে তার চেয়ে আরও ভয়ানক, যেহেতু তিনি প্রায় প্রতিদিনই সামরিক অভিযান পরিচালনায় সমর্থ হচ্ছেন, যেখানে বিন লাদেন আত্মগোপনে রয়েছেন। তার উৎপত্তি এবং প্রেক্ষাপট জানা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আমার এই লেখার সময় বিন লাদেন এবং আল-জারকাভি—উভয়ের মাথার মূল্যই পঁচিশ মিলিয়ন ডলার। এটিও সম্ভবত তাদের প্রতিপত্তির আরেকটি সাক্ষ্য যে, এই বৃহৎ মূল্যের জন্যও কেউ তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে প্রলুব্ধ হবে না।

এমনকি যদিও আমার পত্রিকা আল-জারকাভির একটি পরিচিতি ছাপিয়েছিল, কিন্তু এই লোকটির অনেক খুঁটিনাটি বিষয় এখনও কুয়াশাচ্ছন্ন রয়ে গেছে এবং প্রতিটি তথ্যের জন্যই ভিন্ন ভিন্ন সোর্স ভিন্ন ভিন্ন কথা বলে। এই ব্যাপারটিও বিতর্কের জন্য উন্মুক্ত যে, তার কয়টি হাত-পা রয়েছে; সেখানে এক পক্ষের মতে তিনি তার একটি পা হারিয়েছেন এবং অপরপক্ষ তাদের দাবিতে অনড় যে, তার হাত-পা এর পূর্ণাঙ্গ এখনো বিদ্যমান। তাই যেখানে প্রয়োজনীয় সেখানে আমি বিকল্প উল্লেখ করব।

আল-জারকাভির জন্ম ১৯৬৬ সালের ২০ অক্টোবর। তার বিভিন্ন ছদ্মনাম রয়েছে; তবে তার প্রকৃত নাম হলো আহমাদ ফাদিল আল-খালায়িলাহ। তিনি জর্ডানের জারকা শহরে জন্মগ্রহণ করেন, যেটি আম্মানের পনেরো মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। তাই তার নামের শেষের পদবী আল-জারকাভি, এর সাদামাটা অর্থ দাঁড়ায় 'জারকা থেকে আগত'। তিনি আবুল-হাসান বা বনু হাসান নামক মরুভূমির একটি ক্ষুদ্র বেদুইন গোত্রের অধিবাসী। তার গোত্রীয় বুৎপত্তি তার প্রকৃতি এবং ব্যক্তিত্ব আলোচনায় প্রাসঙ্গিক। বেদুইন গোষ্ঠী তাদের সহযোগিতা এবং বদান্যতার প্রায়োগিক মানসের জন্য সুপরিচিত, যা মরুভূমির রুক্ষ পরিবেশে টিকে থাকার জন্যই প্রসূত হয়েছে। এ ছাড়া তারা তাদের সাহসিকতা এবং যুদ্ধস্পৃহার জন্যও বিখ্যাত। ইরাকি সূত্রসমূহের মতে, বেদুইনরা অতিশয় পাষাণ-হৃদয় ও ক্ষমাহীন এবং তাদেরকে ছোট থেকেই শিক্ষা দেওয়া হয় যে, যেকোনো অনিষ্টের প্রতিশোধ নেওয়া একটি অবশ্যকর্তব্য, সেটা যত পূর্বেরই হোক না কেন। যেখানে ইংরেজরা বলে যে—'Revenge is a dish best served cold', সেখানে বেদুইনদের ভাষ্য হলো—'যদি কোনো ব্যক্তি কোনো প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য চল্লিশ বছরও বিলম্ব করে তবুও সে তাড়াহুড়ো করল'। বিন লাদেনের মতো আল-জারকাভিও এই অত্যুচ্চ সম্পদ—ধৈর্যের অধিকারী। ভিন্ন ভিন্ন সূত্র অনুসারে, আল-জারকাভির

---

[১] Interview with Yassir al-Sirri, London, 27 April 2005.

বাবা হয়তো একজন অবসরপ্রাপ্ত আর্মি অফিসার, নয়তো পুরুষানুক্রমিক চিকিৎসাবিদ্যায় অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি ১৯৮৪ সালে মৃত্যুবরণ করেন এবং তার পরিবারের জন্য যৎসামান্য অর্থকড়ি রেখে গিয়েছিলেন। বলা হয়, আল-জারকাভির আরও সাত বোন এবং দুই ভাই রয়েছে। বিন লাদেনের মতো তিনিও যখন খুব ছোট ছিলেন তখনই তার বাবা মারা যান এবং তিনিও তার মাকে খুব ভালোবাসতেন।

আল-জারকাভি পরিবারের আর্থিক সংস্থানের জন্য সতেরো বছর বয়সেই বিদ্যালয়ের পাঠ চুকিয়ে ফেলেন এবং সম্ভবত তার বাবার মৃত্যুর পর খুব দ্রুতই বখে যান। তখন তিনি রাস্তার দুর্বৃত্ত ধরনের কিছু একটা হয়ে ওঠেন। ব্যাপক মদ্যপানের জন্য পরিচিত এবং তার ট্যাটুর জন্য 'দ্যা গ্রীন ম্যান' ডাকনামটি এটাই প্রতীয়মান করে যে, তিনি একদা রাস্তায় খুব ভীতিকর এবং সম্মানীয় বলে গণ্য হতেন। তিনি নিজের এবং বন্ধুদের প্রতিরক্ষার সময় হিংস্র সাহসিকতা প্রদর্শন করতেন এবং সর্বদাই তার মধ্যে চরম সহিংসতার প্রবণতা ছিল যেটা এখনও তাকে চিহ্নিত করে রেখেছে, এমনকি আল-কায়েদার পদমর্যাদাতেও। তিনি নিম্নমানের একজন ক্রিমিনাল হয়ে ওঠেন এবং এজন্য তাকে জেলেও যেতে হয়েছিল। একবার ছুরিকাঘাত করে আহত করার জন্যও অভিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি ক্রেতার ছদ্মবেশে দোকান থেকে চুরি করা এবং মাদক কারবারের অভিযোগেও আটক হয়েছিলেন। এবং একবার তিনি ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিলেন।

সম্ভবত ১৯৮০র দশকের শেষ দিকে এসে তার চরিত্রের মোড় ঘুরে যায় এবং তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে চরমপন্থি ইসলাম নিয়ে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তাঁর অপরাধী জীবন প্রায়ই তাকে নিকটবর্তী শরণার্থী শিবির 'আল-রুসেইফা'তে নিয়ে যেত, যেখানে জিহাদিদের প্রতি সহানুভূতিশীল বহু লোক বিদ্যমান ছিল। পর্যবেক্ষকদের মতে জারকা এবং আল-রুসেইফার আশেপাশের এলাকা থেকে কমপক্ষে তিনশ যুবক আফগান যুদ্ধে গমন করেছিল এবং বর্তমানে ইরাকি প্রতিরোধ যুদ্ধের অধিকাংশ জর্ডানি সেখান থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। আল-জারকাভি 'ইবনে আব্বাস মসজিদে' ঘন ঘন যেতে থাকেন, যেখানকার অধিকাংশ মুসল্লীই চরমপন্থি ইসলামি গোষ্ঠীগুলোর সাথে সংযুক্ত ছিল এবং তারা জিহাদের গুণাবলির প্রশংসা করত। তারা যুবক মুসলিমদেরকে আফগানিস্তান যুদ্ধে যোগদানে উৎসাহিত করত। তখন আরব মিডিয়াসমূহও আফগান বীর মুজাহিদদের গীত গাইত এবং অধিকাংশ আরব শাসনব্যবস্থাই তাদের ঐকান্তিক সমর্থন করেছিল; যাদের মধ্যে জর্ডানও অন্তর্ভুক্ত ছিল। নতুন রিক্রুটদের অর্থায়নের জন্য মসজিদ এবং জনসমাগমে খোলাখুলিভাবেই অনুদান সংগ্রহ করা হতো। তবুও সম্প্রতি চাচাতো বোনকে বিয়ে করা আল-জারকাভি যখন ১৯৮৯ সালে হঠাৎ করেই আফগানিস্তানের উদ্দেশ্যে দেশ ত্যাগ

করেছিলেন, তখন তার পরিবার বিস্মিতই হয়েছিল। তিনি আব্দুর রাসূল সাইয়াফ কর্তৃক (ইসলামিক ইউনিয়ন অফ দ্য লিবারেশন অফ আফগানিস্তান এর প্রধান) উক্ত মসজিদে একটি জ্বালাময়ী বক্তৃতার দ্বারা প্রভাবিত হয়েই এরূপ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তবে অনেক দেরিতে আগমন করায় সোভিয়েত আর্মির সাথে আল-জারকাভির লড়াই করার কোন সুযোগ হয়নি।

তবে তিনি সামরিক প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর সোভিয়েতপন্থি নাজিবুল্লাহ সরকারের উৎখাতের পরবর্তী সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। সূত্রসমূহ অনুসারে, তিনি ১৯৯১ সালের খোস্তকে মুক্ত করার লড়াইয়েও অংশগ্রহণ করেছিলেন। এ ছাড়াও তিনি দুইজন সর্বজনবিদিত আফগান সেনাপতি জালালউদ্দিন হাক্কানি এবং গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ারের সাথে আরও অনেক ভয়ানক লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন। জর্ডানে ফিরে আসার পূর্বে তিনি ১৯৯২ সালে মুজাহিদদের হাতে কাবুলের পতন এবং পরবর্তীকালে নাজিবুল্লাহর মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। আফগানিস্তানে থাকাকালে যে দুইজন ব্যক্তি তার ভাবাদর্শ গঠনে ভূমিকা রেখেছিল তারা হলেন, আব্দুল্লাহ আযযাম এবং আবু মুহাম্মদ আল-মাকদিসি। আযযাম তখন মাকতাবুল খিদমাহ আল-মুজাহিদ পরিচালনা করতেন। এটি পেশোয়ারে অবস্থিত ছিল এবং মুজাহিদদের জন্য আফগানিস্তান যাওয়ার রাস্তাকে পরিষ্কার করত। বিন লাদেনের ওপরও আযযামের একটি শক্তিশালী প্রভাব ছিল এবং তিনিও আযযামের কাজে সহায়তা করতেন। আল-জারকাভিও গভীরভাবে আযযাম দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েন। তিনি নিয়মিত তার লেকচারে উপস্থিত হতেন, তার কার্যকলাপকে পর্যবেক্ষণ করতেন, এবং প্রায়শই তার বুলিকে পুনরাবৃত্ত করতেন।

আল-মাকদিসি (প্রকৃত নাম ইসাম মুহাম্মদ তাহের আল-বুরকাভি) একজন বিশিষ্ট সালাফি আলেম, যিনি তার রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্য বর্তমানে জর্ডানে দীর্ঘমেয়াদে জেলে আটক রয়েছেন। তিনি একজন ফিলিস্তিনি, তবে তিনি জর্ডানেরও নাগরিকত্বপ্রাপ্ত। আফগানিস্তানে তার সাথে আবু কাতাদাহ আল-ফিলিস্তিনি নামক আরেক জন ফিলিস্তিনি সঙ্গী ছিল, যিনি জর্ডানে বসবাস করতেন এবং আল-জারকাভিকে ভালোভাবেই চিনতেন। তিনিই এই দুই ব্যক্তির পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন।

আল-জারকাভি এবং আল-মাকদিসি আফগানিস্তানে থাকাকালে 'বাইত আল-ইমাম' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। উক্ত সংগঠনটি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল যখন আফগান জিহাদের সমাপ্তি ঘটবে, তখন জর্ডানি যোদ্ধাদের মধ্যে সমন্বয়সাধন এবং তাদেরকে সুসংগঠিত রাখা। এই দূরদর্শিতা এবং ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা এখনও আল-জারকাভির নৈপুণ্যের প্রধান হাতিয়ার।

আফগানিস্তান থেকে প্রস্থানের প্রাক্কালে আল-মাকদিসি আবিষ্কার করলেন যে, তিনি কখনোই আর কুয়েতে তার বাড়িতে ফিরতে পারবেন না; কারণ সেখানকার সরকার তাদের দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার শরণার্থীকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তিনিও সেই এক লক্ষ ষাট হাজার তথাকথিত কুয়েত ফেরতদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাদের অনেকেরই সালাফি-জিহাদি দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এবং তাদের অধিকাংশই আল-জারকার দিকে ঝুঁকে পড়ে; কারণ সেখানে তারা তাদের সমমনা সাথিদেরকে খুঁজে পেয়েছিল এবং এভাবেই সেখানে একটি উদীয়মান জিহাদি প্রবণতা শিকড় গেড়ে বসে।

আল-মাকদিসি 'আল-তাওহিদ' (একত্ববাদ) নামক একটি নতুন গ্রুপের আমির হয়ে ওঠেন এবং আল-জারকাভি দ্রুতই সেই গ্রুপে একটি সক্রিয় ভূমিকা পালন করা শুরু করেন। আল-মাকদিসিকে তার আধ্যাত্মিক পরামর্শদাতা হিসেবে রেখে আল-জারকাভি তরুণ-যুবকদের একত্রিত করতে থাকেন এবং অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করতে থাকেন। তাদের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল, প্রশিক্ষণ তবে চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল জিহাদ এবং সম্ভবত সেটা ফিলিস্তিনে। ১৯৯৪ সালের জুলাই মাসে জর্ডানের নিরাপত্তা বাহিনী অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাবারুদের অসংখ্য ভান্ডার খুঁজে পায়। বাহ্যত সেগুলো ছিল উক্ত শাসনব্যবস্থাকে উৎখাত করার একটি সংগঠিত চক্রান্তেরই অংশ। আল-মাকদিসি এবং আল-জারকাভি উভয়ই অস্ত্রশস্ত্রসহ ধরা পড়েন এবং ষড়যন্ত্রের অভিযোগে তাদের উভয়কেই পনেরো বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। তাদেরকে আম্মানের পঁচাশি কিলোমিটার দক্ষিণে মরুভূমির কেন্দ্রস্থলে সুওয়াকাহ জেলে প্রেরণ করা হয়। জেল কর্তৃপক্ষ সকল ইসলামিস্টদের একটি বড় কামরায় রাখার বন্দোবস্ত করেছিল এবং এর মাধ্যমে তারা মূলত গরাদের পেছনে একটি ইমারত প্রতিষ্ঠার সুযোগ করে দেয়। অনেক বিশেষজ্ঞই বলেন, আফগান যুদ্ধ অপেক্ষা এই সময়কালটিই আল-জারকাভির একজন আল-কায়েদা নেতা হয়ে ওঠার পেছনে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সেখানে তিনি আল-মাকদিসির পরিচালিত দীর্ঘকালীন ধর্মতাত্ত্বিক এবং মতাদর্শিক আলোচনায় অংশ নেন এবং মনেপ্রাণে সমগ্র কুরআন শিক্ষা লাভের জন্য নিজেকে নিযুক্ত করেন। নিজস্ব ব্যক্তিগত অধ্যয়ন এবং ধ্যানের জন্য তিনি তার শয়নের পাটাতনের ওপর কম্বল টানিয়ে একটি তাঁবুও তৈরি করে নিয়েছিলেন।

যেকোনো ইসলামিক গোষ্ঠীর একটি সহজাত অংশ হলো প্রথমে একজন আমির বা নেতা সংস্থাপন। প্রারম্ভিকে স্বাভাবিকভাবেই এই ভূমিকা আল-মাকদিসির ওপর ন্যস্ত হয়েছিল। কিন্তু দুই বছরের মধ্যেই এই স্কলার আবিষ্কার করলেন যে, আল-জারকাভি তার জায়গা দখল করে নিয়েছে। সমকক্ষ সঙ্গীরা অধিকতর নম্র আচরণ বিশিষ্ট আল-মাকদিসির স্থলে সেই যুবককেই বেছে

নিয়েছিল। তারা আল-জারকাভির কর্তৃপক্ষের সাথে মারমুখী অবস্থান, তার দৈহিক শক্তি এবং সুস্পষ্ট শ্রমসাধ্যতার প্রশংসা করত। ইউসুফ রাবাবা সেসব লোকদের সাথে তিন বছর একই জেলে কাটিয়েছিলেন এবং তিনি ইসলামিস্টদের মধ্যে আল-জারকাভির প্রতিষ্ঠিত কঠোর শাসনব্যবস্থার এভাবে বর্ণনা দেন—'আল-জারকাভি তার লোকদের জন্য কুরআন ব্যতীত অন্য কোনো কিছু পড়াকে নিষিদ্ধ করে দেন এবং কেউ তাঁর অবাধ্য হলেই তাকে তীব্র শাস্তি প্রদান করতেন।' রাবাবা আরও বলেন—'সেখানে কোনো নিরপেক্ষ অঞ্চল ছিল না; হয়তো আপনি আল-জারকাভি এবং আল-মাকদিসির সাথে থাকবেন, নয়তো আপনি একজন শত্রু।'[১]

১৯৯৬ সালের গ্রীষ্মে ফুয়াদ হুসাইন[২] সুওয়াকাহ জেলে স্বল্পসময় কারাভোগ করেছিলেন। তিনি আমাকে বলেন যে, 'আল-জারকাভি একজন শান্ত এবং আত্মনিমগ্ন ব্যক্তি ছিলেন এবং তিনি তখনই কথা বলতেন যখন তাকে কোন কিছু জিজ্ঞেস করা হতো। নিয়মকানুনসমূহ নিজের সুবিধামতো করে নেওয়ার জন্য তিনি কর্তৃপক্ষের সাথে ইচ্ছাকৃত বাকবিতণ্ডায় জড়াতেন এবং তাকে মধ্যস্থতাকারী ব্যতিত তার গ্রুপের কোন সদস্যকে তারা ডেকে নিতে পারত না, এটা প্রতীয়মান হয় যে, সেসময় আল-জারকাভি একটি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত এবং সুপরিকল্পিত আত্মরূপান্তর সম্পন্ন করেছিলেন। তার আত্মশৃঙ্খলা ক্রমশই কঠোর হতে থাকে। তিনি নিয়মিত দীর্ঘসময় কঠোর সাধনা করতেন এবং তার দৈহিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য পাথরভরতি বালতিকে ওজন হিসেবে ব্যবহার করতেন। তার সকাল দেওয়ানি ও ফৌজদারি অভিযোগে কারাদণ্ডপ্রাপ্ত সহকারী বন্দীদের সাথে গল্পগুজব করেই কাটতো। তার উদ্দেশ্য ছিল চতুরভাবে ইসলামিক দিকনির্দেশনা প্রদান করে চরমপন্থি সম্ভাব্য জিহাদিদের একটি বড়সড় দল গড়ে তোলা। এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান যে, তিনি শতভাগ সফল হতে পেরেছিলেন এবং জর্ডানের সবচেয়ে দুধর্ষ শত শত অপরাধীকে একত্রিত করতে সক্ষম হন যাদের অধিকাংশই পরবর্তী সময়ে অত্যধিক ধার্মিক হয়ে ওঠে। বিভিন্ন সূত্র মোতাবেক তাদের অনেকেই পরবর্তী কালে আফগানিস্তান এবং ইরাকের যুদ্ধে নিহত হয়। আল-জারকাভি জেলখানায় ক্রমশ ব্যাপক সম্মানিত হয়ে ওঠেন। তাই যখন ১৯৯৬ সালে জেল কর্তৃপক্ষ তাকে নির্জন কারাবাস প্রদান করে তখন জেলখানায় দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়েছিল। তার সহকারীরা সিকিউরিটি ক্যামেরা নষ্ট করে দেয় এবং লোহার খাট ভেঙে প্রাণঘাতী অস্ত্র তৈরি করে। কর্তৃপক্ষ শেষ মুহূর্তে নতি স্বীকার করে এবং এর পরের দিনই আল-জারকাভি শান্ত এবং অবিচলিতভাবে ফিরে আসেন এবং আমির হিসেবে তার

---

[১] Yusef Rababa'a quoted in Paul Harris, 'Profile: Abu Mus'ab al-Zarqawi' The Observer, 29 May 2005. with Abdel Bari Atwan, April 2005.

[২] Jordanian journalist. Interview with Abdel Bari Atwan, April 2005.

দায়িত্বকে পুনরায় বুঝে নেন, যেটা তার এই স্বল্প সময়ের অনুপস্থিতিতে আল-মাকদিসির কাছে স্থানান্তরিত হয়েছিল (আল মাকদিসিও তার গবেষণা এবং লিখনে প্রত্যাবর্তন করতে পেরে খুশিই হয়েছিলেন)।

অনেক সূত্রই আল-জারকাভির শারীরিক এবং মানসিক প্রাণোচ্ছলতার সাক্ষ্য দেয়। তিনি এতই নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন যে, তার পায়ের নখগুলিকে তুলে ফেলা হয়েছিল এবং পূর্ববর্তী একটি ঘটনায় তাকে সাড়ে আট মাস নির্জন কারাভোগ করতে হয়েছিল। হয়তো তার কোন সংস্রবের প্রয়োজন ছিল না যতক্ষণ না তার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য আরও সম্প্রসারিত হয়—যেটা বর্তমানে কেবলই জিহাদকে উন্নীত এবং সংগঠিত করা। তার এই দূরে দূরে থাকা তাকে 'আল-গারিব' (অপরিচিত) উপাধিতে ভূষিত করে এবং তিনি মনেপ্রাণে তার এই পরিচয়কে গ্রহণ করেছিলেন। এখনো তিনি এই নামেই অভিহিত হওয়া পছন্দ করেন এবং তার পরিবারের কাছে প্রেরিত সকল চিঠিপত্রে তিনি এই নামেই স্বাক্ষর করেন।

১৯৯৯ সালে জর্ডানের নতুন বাদশা দ্বিতীয় আব্দুল্লাহ একটি সাধারণ রাজক্ষমার অনুমোদন করেন এবং তখন আল-জারকাভিও মুক্তি পান। নিরাপত্তা বাহিনী তখন পরিচিত ইসলামিক চরমপন্থিদের হয়রানি করার নতুন পলিসি গ্রহণ করে এবং তাই আল-জারকাভি কোনো চাকরি বা ব্যবসা করতে পারেননি। এরপর তার মায়ের লিউকোমিয়া ধরা পড়লে ডাক্তাররা উপদেশ দিয়েছিল পার্বত্য অঞ্চলে তার উন্নতিসাধন হতে পারে। তখন আল-জারকাভি আফগানিস্তানে প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত নেন। কিছু সোর্সের মতে আল-জারকাভি জর্ডান থেকে চলে আসার পূর্বে আম্মানে পশ্চিমাদের একটি হোটেলে বোমা হামলার পরিকল্পনা করেছিলেন; তবে সেটি বানচাল হয়ে যায়। তিনি কোনো-না-কোনোভাবে ২০০০ সালে আফগানিস্তান চলে আসেন এবং আগমনের পরই পেশোয়ারে সুনির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ ছাড়াই স্বল্পসময় কারাভোগ করেন।

আফগানিস্তানে তিনি আল-কায়েদার প্রশিক্ষণ শিবিরগুলোতে ভ্রমণ করেছিলেন; কিন্তু তিনি সেই সময়ে বিন লাদেনের হাতে বাইয়াত হননি এবং এর পরিবর্তে তিনি একাকী কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন। তালেবান শাসনব্যবস্থার আশীর্বাদ এবং সহায়তায় তিনি পশ্চিম আফগানিস্তানের হেরাত অঞ্চলে নিজস্ব প্রশিক্ষণ শিবির চালু করেন। ভৌগোলিক দিক থেকেও সেটি আল-কায়েদার জালালাবাদ (সুদূর পূর্ব) এবং কান্দাহার (দক্ষিণ-পূর্ব) ঘাঁটিসমূহ থেকে দূরবর্তী ছিল। আল-জারকাভি হেরাতকে বেছে নেওয়ার আরেকটি কারণ ছিল সম্ভবত ইরানের মাধ্যমে ইউরোপ এবং বিভিন্ন আরব দেশ থেকে চোরাচালান এবং রিক্রুটমেন্টকে সহজতর করা। হেরাতে তার শিবিরে প্রায় একশ সিরিয়ান, ফিলিস্তিনি এবং জর্ডানি ছিল, যাদের অনেকেই একসময় ইউরোপে বসবাস করত।

আল-জারকাভি তখন 'আত-তাওহিদ ওয়াল-জিহাদ' (একত্ববাদ এবং জিহাদ) সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যে সংগঠনটিই ইরাকে প্রথম হিমশীতল শিরশ্ছেদ এবং আত্মঘাতী হামলা চালু করেছিল।

আত-তাওহিদ ওয়াল-জিহাদ এর নেতৃত্বের প্রধান ব্যক্তিবর্গরা জারকারই বাসিন্দা ছিলেন। যেমন আবদুল হাদী ডাঘলাস, যিনি ছিলেন একজন ফিলিস্তিনি এবং পরবর্তী কালে ইরাকে নিহত হন; আবুল কাসিম এবং আল-জারকাভির দ্বিতীয় স্ত্রীর পিতা শাইখ ইয়াসিন। কীভাবে সেই প্রশিক্ষণ শিবিরটির অর্থায়ন হতো সেটা নিয়ে অনেক কথাই প্রচলিত রয়েছে। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ দাবি করেন, তখনই আল-কায়েদার অর্থায়ন এবং সংযোগ বিদ্যমান ছিল;[১] আবার অনেকে বলেন আল-জারকাভি সৌদি উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ করতেন আবার কারও মতে তিনি একজন নামহীন আফগান সেনাপতি কর্তৃক সমর্থিত ছিলেন।[২]

যেমনটা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে আল-জারকাভি বিন লাদেনের নাইন ইলেভেনের হামলাসমূহের সিদ্ধান্তের কারণে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন; কারণ তিনি জানতেন আফগানিস্তানে তিনি যে নিরাপত্তা উপভোগ করছিলেন সেটা চিরতরে নষ্ট হয়ে যাবে। আল-জারকাভির জন্য জিহাদের বিশ্বায়নের লক্ষ্যে সেসব প্রশিক্ষণ শিবিরগুলো এবং তালেবান শাসনব্যবস্থার আশীর্বাদ প্রধান উপাদানস্বরূপ ছিল। ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার এবং পেন্টাগনের হামলা পরবর্তী অক্টোবর মাসে আমেরিকার প্রতিশোধস্বরূপ হামলা শুরু হওয়ার পূর্বেই তিনি পাকিস্তান হয়ে ইরানে পালিয়ে আসেন। আল-জারকাভি এবং তার লোকজনের এই সময়ে প্রস্থান বিন লাদেনের সাথে তার সর্বশেষ একটি সাক্ষাতের ইঙ্গিত দেয়, যিনি তখনও পূর্ব আফগানিস্তানে অবস্থান করছিলেন।

আত-তাওহিদ ওয়াল-জিহাদের এগারো জন সদস্য জার্মানিতে আটক হওয়ার পর আল-জারকাভিকে ২০০২ সালে এপ্রিল অথবা মে মাসে ইরান থেকে বহিষ্কৃত করা হয়।[৩] আল-জারকাভি অনেক বছর পূর্বেই ইউরোপে তার যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং বজায় রাখছিলেন। এসব কাজে তার ঘনিষ্ঠ সহযোগী আবু মুসআব আল-সুরিও তাকে সহায়তা করতেন। আবু মুসআব আল-সুরি সম্পর্কে মনে করা হয় তিনি পশ্চিমা কিছু আল-কায়েদা নেটওয়ার্ক নিয়ন্ত্রণ করেন এবং আল-কায়েদা ইন ইউরোপের দাবিকৃত লন্ডন এবং মাদ্রিদ হামলায় এই দুজনের জড়িত থাককেও সন্দেহ করা হয়। অবশেষে ইরাকের কুর্দিস্তান অতিক্রম করে আল-জারকাভি আনসার আল ইসলামের শক্তিশালী ঘাঁটিতে আগমন করেন।

---

[১] The Observer, 29 May 2005.
[২] Paul McGeough, Good Weekend, p. 23, 16 October 2004.
[৩] BBC News, 23 April, 2002.

জর্ডানের ১৯৯৯ সালের রাজক্ষমার পর থেকেই আত তাওহিদের অনেক সাবেক সদস্য আনসার আল ইসলামের সাথে ছিল এবং অনেকে আবার ২০০১ সালে আফগানিস্তানে মার্কিন বোমাবর্ষণের কারণে সেখান থেকে পালিয়ে এসেছিল। যখন তিনি সেখানে তার শিবির স্থাপন করেন—এসব যোগাযোগসমূহ তাকে উক্ত সংগঠনের সমর্থন এবং আস্থা অর্জনে সমর্থ করে তোলে। ইরাকে অনিবার্য মার্কিন আগ্রাসনকে উপলব্ধি করে আল-জারকাভি বাগদাদ এবং সুন্নি ট্রায়াঙ্গেলে স্থানীয় নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা শুরু করেন। মজার ব্যাপার হলো, আল-কায়েদাও ঠিক একই কৌশল অবলম্বন করা শুরু করেছিল, যেটা ইঙ্গিত প্রদান করে ইতিমধ্যেই হয়তো আল-জারকাভির সাথে আল-কায়েদার সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল অথবা আল-জারকাভির কৌশলগত সত্তা প্রকৃতিগতভাবেই আল-কায়েদা নেতৃবর্গের অনুরূপ ছিল। যুদ্ধ শুরু হলে বিদেশি যোদ্ধাদের নিয়ে আসার জন্য আল-জারকাভি যাত্রাপথ অন্বেষণ শুরু করেন এবং সিরিয়ান বর্ডারকেই সবচেয়ে রন্ধ্রযুক্ত আবিষ্কার করেন। ২০০৩ সালের মার্চ মাসে—এটা আমেরিকান আক্রমণের পূর্বে নাকি পরে সেটা স্পষ্ট নয়—আল-জারকাভি আল-কায়েদার সামরিক কৌশলবিদ মুহাম্মদ ইব্রাহিম আল-মাক্কাভির সাথে সাক্ষাৎ করেন। উক্ত সাক্ষাতে আল-জারকাভি আল-কায়েদা কুশলীদের ইরাক প্রবেশকে সহজতর করতে সম্মত হন।

আত-তাওহিদ ওয়াল-জিহাদ সংগঠনটি ক্রমশই গুরুত্ব অর্জন করতে থাকে। কারণ সেটি আল-কায়েদা কুশলীদেরসহ আগত অন্যান্য আরব রিক্রুটদের সমন্বয় সাধন করত এবং তাদেরকে লজিস্টিক সাপোর্ট দিত। তাদেরকে আল-জারকাভির পরিচিতি এবং স্থানীয় তথ্যের ওপরও নির্ভর করতে হতো। তার সুপ্রতিষ্ঠিত গোয়েন্দা তৎপরতা সমন্বিত হামলাকে আরও সহজতর করে তোলে, যেটা তাৎক্ষণিকভাবেই স্বাধীন এলোমেলো হামলা অপেক্ষা অধিকতর কার্যকর প্রমাণিত হয়। আল-জারকাভি ২০০৩ সালের শরতের শুরুর দিকেই ইরাকে বিদেশি যোদ্ধাদের আমির হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যান; যদিও তিনি আরও এক বছর পর বিন লাদেনের হাতে বাইয়াত হন এবং আল-কায়েদায় যোগদান করেন।

ভিমরুলের চাকে ঢিল

গতানুগতিক যুদ্ধ ইরাকে ছয় সপ্তাহেরও কম স্থায়ী হয়েছিল। আমেরিকান 'শক অ্যান্ড অ্যাওয়ে' সামরিক অভিযান প্রকাণ্ড প্রতিপত্তি সহকারে যখন বাগদাদ, মসুল, কিরকুক, বসরা প্রভৃতি শহরগুলোকে ভয়াবহ ক্লাস্টার বোমা এবং এমনকি ১৯৮০ সালে জাতিসংঘ কনভেনশনে নিষিদ্ধ নাপাম বোমা ফেলে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিচ্ছিল,

তখন সেগুলোর সামান্য প্রতিরোধ করাই সম্ভবপর হয়েছিল।[১] কঠোর বাস্তবতাসমৃদ্ধ মৃতের চিত্রগুলোকে প্রায় পুরোপুরি কেটে দিয়ে এই সমগ্র অভিযান সরাসরি আমেরিকান দর্শকদের জন্য টিভিতে সম্প্রচার করা হয়েছিল। সাধারণ হিসেবের আলোকে এই সময়ে প্রায় ৭,০০০ ইরাকি বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়। এ ছাড়াও ৪৫,০০০ ইরাকি সেনা নিহত বা আহত হয় এবং ১৪১ জন মার্কিন সেনা কর্মকর্তা নিহত হয়। অতঃপর যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেন যুদ্ধপরবর্তী ইরাকের জন্য একটি কর্মসূচি প্রণয়ন করে। এই দলিলটি ২০০৩ সালের ২২ মে জাতিসংঘ রেজুলেশন ১৪৮৩ হিসেবে গৃহীত হয়। উক্ত রেজুলেশনে সেই জোট নিজেদেরকে কেবল 'অধিষ্ঠিত ক্ষমতা' হিসেবেই চিহ্নিত করেনি বরং ইরাকের অবকাঠামো নির্মাণের অজুহাতে সমগ্র ইরাকের তেল রাজস্বের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দিয়ে নিজেদেরকে পুরস্কৃত করেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অবগত ছিল যে, তেলের বেসরকারিকরণ ব্যাপক বিরোধিতার সম্মুখীন হবে। কারণ তখন ইরাকিরা দেখতে পাবে তাদের তেলকে মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশনগুলোর হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। তবে বৃহদাকার অর্থনৈতিক লাভ ছাড়াও সেখানে একটি গভীর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও বিদ্যমান ছিল। যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরাকি তেলের বেসরকারিকরণকে বাস্তবায়িত করতে পারে, তবে এটি বিশ্ববাজারে OPEC চুক্তির বৃহত্তর ক্ষমতার পতন ঘটাতে পারবে। মূখ্য যুদ্ধের পর ইরাকে বুশ প্রশাসনের প্রো-কনসাল ছিলেন জেনারেল জে. গার্নার। অব্যবস্থাপনার কারণে সমালোচিত হয়ে—যার মধ্যে নির্বাচনকে অগ্রাধিকার প্রদান এবং ইরাকি স্বাধীন স্বশাসন প্রতিষ্ঠাও অন্তর্ভুক্ত ছিল—তিনি যুদ্ধবাজ পল ব্রেমার কর্তৃক প্রতিস্থাপিত হয়ে যান। ২০০৩ সালের মে মাসে ব্রেমার বাগদাদে আগমন করে। তার মনোভাব সংক্ষেপে জুন মাসে নেওয়া বিবিসি'র একটি সাক্ষাৎকারে ব্যক্ত হয়েছিল এভাবে যে—'আমরা সমস্ত পরিস্থিতিকেই নিজেদের আয়ত্তে নিয়ে এসেছি এবং আমরা এই দেশের ওপর আমাদের ইচ্ছাকে আরোপ করা অব্যাহত রাখব।'[২] এক বছর পর তখনও সে মার্কিন নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী প্রশাসনের প্রধান ছিল এবং তখন বিন লাদেন একটি বিখ্যাত পুরস্কারের ঘোষণা দেন—যে ব্যক্তি দখলদার ব্রেমারকে হত্যা করতে পারবে তাকে দশ হাজার গ্রাম (দশ কেজি) স্বর্ণ দেওয়া হবে।

কার্যালয়ে তার মেয়াদে ব্রেমার তেলসহ ইরাকের অন্যান্য রাষ্ট্রমালিকানাধীন সম্পত্তি বেসরকারিকরণের নির্দেশ প্রদান করেন এবং এগুলোকে ইরাকের অন্তর্বর্তীকালীন আইনেও লিপিবদ্ধ করা হয়। তবে আমার এই লেখার সময়

[১] Dilip Hiro, Secrets and Lies, P. 541.
[২] BBC interview, Breakfast with Frost, 29 June 2003.

(আগস্ট, ২০০৫) এগুলো এখনও ইরাকের বর্তমান সরকারের সাথেই সংযুক্ত রয়েছে। এ ছাড়াও এই অনভিজ্ঞ সরকারের ওপর সাদ্দামের যে বিশাল আকারের ঋণের বোঝা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সঞ্চালিত হয়ে গেছে সেই রাজস্বঘটিত চাপকেও প্রয়োগ করা হচ্ছে; যে ঋণের অধিকাংশই পুঞ্জিভূত হয়েছে সাদ্দাম হুসাইন কর্তৃক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে অস্ত্র ক্রয় করার মাধ্যমে। (সম্ভবত দরকষাকষিসংক্রান্ত কোনো হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের জন্যই এই ঋণকে মওকুফ করে দেওয়া হয়নি এবং এটিকে বেসরকারিকরণ নির্দেশ এবং লাভজনক মূল্যে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলোর সাথে চুক্তির জন্য চাপ প্রয়োগেও ব্যবহার করা হচ্ছে)।[১]

প্রায় সকল শিয়া এবং দুটি প্রধান কুর্দি গোষ্ঠীই একেবারে সূচনা থেকে দখলদার সেনাদের সাথে জোটবদ্ধ হয়েছে; কারণ এটিকে তারা দেখেছিল ক্ষমতা দখলের জন্য একটি ঐতিহাসিক সুযোগ হিসেবে। ২০০৩ সালে ব্রেমার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইরাকি অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রিসভায় জালাল তালাবানি এবং মাসুদ বারযানি উভয়ই অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ ছাড়াও ছিল SCIRI এর প্রধান গ্র্যান্ড আয়াতুল্লাহ আবদুল আজিজ আল-হাকিম, যিনি আগস্ট মাসে গুপ্ত হত্যার শিকার হন। প্রেস কনফারেন্সে অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রিসভাকে উপস্থাপনের সময় ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী আহমাদ চালাবি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ধন্যবাদ দেন—'আমেরিকাকে ধন্যবাদ ইরাকি জনগণের পক্ষ থেকে... সাদ্দামের চাবুকান থেকে আমাদেরকে মুক্ত করতে সাহায্য করার জন্য।' শিয়া নেতাদের মধ্যে আল-হাকিমের প্রতিদ্বন্দ্বী গ্র্যান্ড আয়াতুল্লাহ আলি আল-সিস্তানি এবং মুকতাদা আল-সদর দখলদার কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। যদিও আল-সিস্তানি ২০০৩ সালের এপ্রিলে ইরাকিদেরকে জোট সেনাদের অগ্রসর ব্যাহত না করার জন্য নির্দেশনা দিয়ে একটি ফতোয়া জারি করেন। এখন অবধি কেবল মুকতাদা আল-সদরই আমেরিকান দখলদারির বিরোধী হিসেবে রয়ে গেছেন। যখন যুদ্ধের তীব্রতা বাড়ছিল তখন এর সাথে সাথে প্রতিরোধের আগুনেও বাতাস বইছিল। ৮ এপ্রিল বিন লাদেন একটি টেপ বার্তায় যেসব মুসলিম সরকার মার্কিন আগ্রাসনে সহায়তা করছে যেমন—পাকিস্তান, আফগানিস্তান, বাহরাইন, কুয়েত এবং সৌদি আরব, তাদের বিরুদ্ধে মুসলিমদেরকে অস্ত্র তুলে নিয়ে জিহাদে যোগদানের আহ্বান জানান। যারা ইরাকের অভ্যন্তরে ইতিমধ্যেই গেরিলা অপারেশন শুরু করে দিয়েছিল তিনি তাদের উদ্দেশ্যে আত্মঘাতী বোমা হামলার ব্যাপক অভিযান শুরু করার আহবান জানান—

---

[১] Discussion between Hassan Juma'a Awad al-Asade, President of General Union of Oil Workers in Iraq and David Bacon, veteran Washington Post labour journalist, broadcast on Democracy Now, independent American television programme, 13 June 2005. See www.democracynow.org.

'তাদের ট্যাংক এবং সাঁজোয়াযানগুলোকে ভয় করবেন না; এগুলো কৃত্রিম জিনিস; যদি আপনারা আত্মঘাতী হামলা শুরু করেন তবে আপনারা সমগ্র বিশ্বব্যাপী আমেরিকানদের ভীতিকে দেখতে পাবেন।' ১১ এপ্রিল মার্কিন সেনারা মসুলে প্রবেশের পর ইরাকি আর্মির পঞ্চম ব্যাটালিয়ন তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। এভাবেই পুরোনো শাসনব্যবস্থার পতনের শুরু হতে থাকে এবং ২০০৩ সালের ২ মের মধ্যেই পঞ্চান্ন জন 'মোস্ট-ওয়ান্টেড' এর মধ্যে সতেরো জনকেই আটক করা হয়। (এসব 'মোস্ট ওয়ান্টেড'কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দাবার গুটি হিসেবে ব্যবহার করে যার দ্বারা বহু ইরাকি অপমান অনুভব করে এবং এটি এমন একটি যুদ্ধ উসকে দেয় যাতে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু অনিবার্য ছিল)।

অবমাননা একটি ভয়ংকর খেলা। ইরাকিরা খুবই আত্মমর্যাদাসম্পন্ন। যদিও তাদের বেশিরভাগই সাদ্দামকে সমর্থন করত না কিন্তু তারা তাদের দেশকে অত্যন্ত ভালোবাসত। তারা স্বভাবতই সুশিক্ষিত ছিল (১৯৮০ দশকেই ইরাক ৯০ শতাংশ সাক্ষরতা অর্জন করে) এবং তাদের একটি বড় অংশই ছিল উচ্চশিক্ষিত। বর্তমানে লন্ডনে বসবাসরত একজন ইরাকি এভাবে সেই ঘটনার স্মৃতিচারণ করছিলেন— 'আমাদের এই অনুভূতি যে, আমাদের জন্মস্থান, আমাদের পূর্ববর্তী নেতৃবৃন্দ, আমাদের দেশ, আমাদের সংস্কৃতি এবং আমাদের ইতিহাসে যখন মার্কিন সেনাদের কর্তৃক থুতু নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল; যাদের ইতিহাস, শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং সম্মান বলে কিছু নেই; তখন সেটা খুবই বেদনাদায়ক ছিল।'

জোট সেনারা একটি স্কুলে ঘাঁটি স্থাপন করলে এর প্রতিবাদ জানাতে ১৮ এপ্রিল হাজার হাজার শিয়া এবং সুন্নি ইরাকি সমভাবে রাস্তায় নেমে আসে। এর দশ দিন পর যখন ইরাকি নাগরিকরা বাগদাদের নিকটে আরেকটি আমেরিকা বিরোধী বিক্ষোভ প্রদর্শন করছিল, তখন মার্কিন সেনারা তাদের ওপর নির্বিচারে গুলি চালায়। এতে কমপক্ষে তেরো জন নিহত হয় এবং পচাত্তর জন আহত হয়।[১] দুইদিন পর ফাল্লুজায় এই হামলার প্রতিবাদে আরেকটি বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হলে সেখানেও গুলি চালানো হয় এবং কমপক্ষে দুইজন ইরাকি নাগরিক নিহত হয়। জর্জ ডব্লিউ বুশ ১ মে যেদিন 'মুখ্য অভিযানের সমাপ্তি' ঘোষণা দেন। কিন্তু প্রকৃত প্রতিরোধের প্রথম ঘটনা সেইদিনই সংঘটিত হয়েছিল। উক্ত ঘটনায় ফাল্লুজায় বিক্ষোভ মিছিলে গুলি চালানোর প্রতিশোধস্বরূপ সেখানকার একটি মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে একদল বেসামরিক নাগরিক গ্রেনেড নিক্ষেপ করলে সাত জন সেনা আহত হয়। ২৬ মে, সোমবারের মধ্যেই প্রতিরোধযুদ্ধ পুরোদমে আরম্ভ হয়ে যায় এবং এর পরবর্তী সপ্তাহ জুড়ে বাগদাদ এবং ফাল্লুজায় মার্কিন সেনাদের ওপর

[১] Sarah Left and agencies, 'US Troops Kill Iraqi Protesters, The Guardian, 29 April 2003.

অসংখ্য হামলার ঘটনা ঘটে। তখনই বেসামরিক যোদ্ধাদের হাতে প্রথম মার্কিন সেনা নিহতের ঘটনাটি ঘটে, যেখানে বাগদাদে গোলাগুলি এবং আরপিজি হামলায় দুইজন সেনা নিহত হয় এবং চারজন আহত হয়।

ব্রেমার পুনঃপুনঃ জোর দিয়ে বলছিল যে, এই প্রতিরোধযুদ্ধ সাদ্দামের শাসন ব্যবস্থার অবশিষ্টাংশ কর্তৃক সংঘটিত হচ্ছে এবং খুব দ্রুতই এটাও মিটে যাবে; কিন্তু এরূপ তাকে আরও বহু মাস এই কথা বলা অব্যাহত রাখতে হয়েছিল। ৩০ মে ইরাকি বন্দীদের ওপর অবমাননা এবং নির্যাতনের কিছু ছবি ফাঁস হয়; সেখানে আরও অসংখ্য ছবির সাথে দেখা গিয়েছিল যে, একজন বন্দিকে বীভৎসভাবে ফর্ক লিফট থেকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে এবং আরেকজন বন্দি তার নিজের মলের ওপর মাথা রেখে শুয়ে আছে। সমগ্র দেশ জুড়ে যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ছিল সেটাকে শান্ত করতে সামান্য হলেও এটা কাজ করেছিল।

এরপর দখলকৃত ভূখণ্ডে ইসরাইলি কৌশল ব্যবহার করার প্রমাণ উঠে আসে। রবার্ট ফিস্ক উল্লেখ করেন—'মার্কিন সেনারা এসব কৌশল বেসামরিক বাড়িঘরে অভিযানের সময় প্রয়োগ করেছিল। প্রতিরোধ যোদ্ধাদের প্রতিটি হামলার পরে তারা নৃশংসভাবে এরূপ সামগ্রিক শাস্তি প্রদান করত। এরূপ একটি ঘটনায় এক পল্লী গ্রামের খেজুর গাছের উদ্যান এবং লেবু ফলের বাগানকে তারা বুলডোজার দিয়ে উপড়ে ফেলছিল এবং তখন সৈন্যরা লাউডস্পিকারে গান বাজাচ্ছিল।'[১] ২০০৩ সালের ৯ ডিসেম্বর 'দ্য গার্ডিয়ান' পত্রিকা একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করে যে, ইসরাইলি সামরিক পরামর্শদাতারা ইরাকে মার্কিন কমান্ডারদেরকে গ্রামীণ এলাকায় গেরিলা যুদ্ধে তাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছিল এবং তাদের উপদেশসমূহ ২০০৪ সালের ৭ নভেম্বর শুরু হওয়া ফাল্লুজা পতনের অভিযানে প্রয়োগ করা হয়েছিল।

আগ্রাসন পরবর্তী ইরাকের মানচিত্র

২০০৩ সালের ২ জুলাইয়ের মধ্যেই প্রতিরোধযুদ্ধ সুশৃঙ্খল হওয়া শুরু হয়েছিল। ১ মে অবধি কমপক্ষে ৩০ জন মার্কিন সেনা নিয়মিত বন্দুক যুদ্ধ এবং আরপিজি হামলায় নিহত হয়। ৭ আগস্ট একটি নতুন রূপের মারাত্মক এবং ইঙ্গিতমূলক হামলা সংঘটিত হয়, যেখানে সামরিক বিস্ফোরক ব্যবহার করে বাগদাদে জর্ডানের দূতাবাসের বাইরে একটি ভয়াবহ গাড়িবোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হয় এবং এতে উনিশ জন মানুষ নিহত হয়। ২০০৩ সালের ১১ আগস্ট বুশ প্রশাসন 'ইরাকে ১০০ দিন' প্রতিবেদন প্রকাশ করে এবং সেখানে বলা হয়

---

[১] Dilip Hiro, Secrets and Lies, p. 414.

বিদ্রোহীদের সাথে সামান্য পরিসরের সংঘর্ষ এখন প্রায় সমাপ্তির পথে, যাদেরকে তারা তখনও 'বাথিস্ট বিচ্ছিন্নতাবাদী' বলে চিহ্নিত করছিল। সেখানে আরও মন্তব্য করা হয়—ইরাকের অধিকাংশ অঞ্চলই শান্ত রয়েছে এবং কেবল বিচ্ছিন্ন কিছু এলাকায় হামলার ঘটনা ঘটছে। এর আট দিন পর ১০,৬০০ পাউন্ড সামরিক বিস্ফোরকভরতি একটি ট্রাক দিয়ে জাতিসংঘের হেডকোয়ার্টারে আত্মঘাতী হামলা চালানো হলে উক্ত ভবনটি ধ্বংস হয়ে যায় এবং ইরাকে জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিনিধি সার্জিও ভিয়েইরা ডি মেলো-সহ তেইশ জন নিহত হয়। (জাতিসংঘকে সম্ভবত তাদের কর্তৃক তেরো বছর যাবৎ নিষেধাজ্ঞাকে সমর্থন করার জন্যই একটি বৈধ লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করা হতো। অধিকন্তু, আল-জাওয়াহিরি তার '*নাইটস আন্ডার দ্য প্রফেট'স ব্যানার*' বইয়েও এটিকে একটি বৈধ টার্গেট হিসেবে চিহ্নিত করেন)। এই হামলাটি সুনিশ্চিতভাবেই আবু মুসআব আল-জারকাভির কাজ ছিল এবং এটি আন্তর্জাতিক সংগঠনসমূহের জন্য ইরাক ত্যাগ করার একটি বার্তাস্বরূপ ছিল। এরপরই 'ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড' (IMF) এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাংক অতি দ্রুত তাদের কর্মকর্তাদের সরিয়ে নেয় এবং ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ—যারা ইতিপূর্বে শান্তিরক্ষী বাহিনীর জন্য সেনা প্রদানের আশ্বাস দিয়েছিল, তারা তখন অস্বীকৃতি জানিয়ে বসে। এর বিপরীতে প্রতিরোধ যুদ্ধ দ্রুতই ক্রমশ বহুজাতিক হয়ে ওঠে। যখন বুশ প্রশাসন মার্কিন বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর সাথে লাভজনক পুনর্নির্মাণ চুক্তি প্রণয়ন করে তখন নাশকতার সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। পানির প্রধান সরবরাহ লাইনগুলো উঠিয়ে ফেলা হয় এবং তেলের পাইপলাইনে বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। এতে তেল উৎপাদনব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং তেল উৎপাদন দৈনিক সাত লক্ষ ব্যারেলে নেমে আসে যেটা পূর্ববর্তী মোট উৎপাদনের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ ছিল। যেহেতু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পুনর্নির্মাণের কাজে ইরাকি তেল-রাজস্ব ব্যয়ের আশায় ছিল, তাই এটি ছিল একটি বিধ্বংসী আঘাত।

১৮ অক্টোবর ইরাকে আমেরিকান ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ পরিচালনার জন্য ইরাকিদেরকে আহ্বান জানিয়ে বিন লাদেনের একটি ভিডিও বার্তা বিভিন্ন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়। এ ছাড়াও অন্যান্য নামবিহীন জঙ্গিদের থেকে এরূপ আরও অনেক বার্তা প্রচার করা হয়েছিল, যেখানে একটি বার্তায় স্পষ্ট ইংরেজিতে বলা হয়—'আমরা চাই সকল ক্রুসেডার এবং ইহুদিরা আমাদের মুসলিম দেশগুলো থেকে বের হয়ে যাক, আমাদের ভাইদেরকে জেল থেকে মুক্তি দিক এবং মুসলিমদেরকে হত্যা করা বন্ধ করুক, না হলে আমরাই তোমাদেরকে হত্যা করব। আমরা কসম করছি, আমরা তোমাদের নিরাপদে বেঁচে থাকতে দেবো না এবং তোমরা আমাদের কাছ থেকে বোমা, আগুন, ঘরবাড়ি ধ্বংস এবং শিরশ্ছেদ ব্যতীত

অন্য কোন কিছু দেখতে পাবে না।' বাস্তবিকই পরবর্তী কালে ঘটিতব্য বিষয়গুলোর একটি হিমশীতল বার্তা ছিল এটি।

এখন আমার এই লেখার সময় প্রতিরোধ যুদ্ধ দুই বছর হতে চলল এবং এটা এখন সুস্পষ্ট যে, সেখানে এখন তিনটি প্রধান ধারার গোষ্ঠী বিদ্যমান।

১—ইসলামিক গোষ্ঠীসমূহ

ইরাক আগ্রাসন সূত্রপাতের পাঁচ মাস পর 'জাইশ আনসার আল-সুন্নাহ' নামে একটি সংগঠনের অভ্যুদয় হয়। এটি সালাফি এবং সুন্নি দলগুলোর একটি জোট সংগঠন। সেখানে প্রায় ২০০ জন আনসার আল ইসলামের সদস্যও ছিল, যারা ২০০৩ সালের মার্চ মাসে তাদের এলাকায় মার্কিন বোমা হামলার সময় ইরানে পালিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে বেঁচে গিয়েছিল। জাইশ আনসার আল-সুন্নাহের লক্ষ্য হলো দখলদার শত্রুদেরকে ইরাক থেকে উৎখাতের পর সেখানে একটি ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা।

আল-জারকাভির দল আত-তাওহিদ ওয়াল-জিহাদ এই জোট সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত ছিল না; যদিও তাদের লক্ষ্য এবং মতাদর্শ প্রায় একই রকম এবং তাদের উভয়ের সাথেই আবার আল-কায়েদারও সাদৃশ্য রয়েছে। ২০০৪ সালের ডিসেম্বর মাসে বিন লাদেনের সাথে তার মিত্রতার পূর্বে এবং এর পরেও আল-জারকাভির স্ট্র্যাটেজির চারটি সুস্পষ্ট দিক বিদ্যমান রয়েছে :

ক. আমেরিকাকে তার সম্ভাব্য মিত্র এবং সমর্থকদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া। এর একটি প্রধান উদাহরণ হলো জাতিসংঘকে লক্ষ্যবস্তু বানানো। আল-কায়েদাও পরবর্তী কালে ইরাকের বাইরে এরূপ বার্তাসূচক হামলাই মাদ্রিদ এবং লন্ডনে চালায় এবং মাদ্রিদ হামলার পরে স্প্যানিশ সৈন্যদেরকে ইরাক থেকে প্রত্যাহারই করে নেওয়া হয়।

খ. ইরাকিদেরকে দখলদারদের সহযোগী হওয়া থেকে বিরত রাখা। আর্মি রিক্রুটমেন্ট সেন্টার এবং পুলিশ স্টেশনগুলোতে ঘন ঘন আত্মঘাতী হামলা এই ক্ষেত্রে খুবই ফলপ্রদ প্রমাণিত হয়। যেসব রাজনৈতিক নেতারা আমেরিকা প্রবর্তিত নতুন প্রশাসনিক ব্যবস্থায় সহায়তা করছিল তাদেরকে হত্যা করা এবং হত্যাচেষ্টার পেছনেও আল-জারকাভিই প্রধান ভূমিকা রেখেছেন।

গ. এরূপ নৃশংসতা প্রদর্শন করা যেগুলোর দ্বৈত প্রভাব বিদ্যমান। যা একদিকে একটি মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ পরিচালনার কাজ করবে এবং অপরদিকে যারা ইরাক পুনর্গঠনে জড়িত থাকছে তাদের কার্যক্রমও ব্যাহত হবে। আল-জারকাভিই অপহরণ এবং বীভৎস হত্যাকাণ্ডে নেতৃত্ব দেন। সেসবের মধ্যে আমেরিকান

ব্যবসায়ী নিকোলাস বার্গের শিরশ্ছেদও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং কথিত আছে আল-জারকাভি নিজ হাতেই সেটা সম্পন্ন করেছিলেন।

ঘ. শিয়াদেরকে লক্ষ্যবস্তু বানানোর মাধ্যমে সেক্যুলার দ্বন্দ্বকে প্ররোচিত করা। প্রাথমিকভাবে মনে হয়েছিল যে, শিয়াদেরকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকতর সহযোগিতা থেকে সতর্ক করার জন্যই এই কৌশল অবলম্বন করা হচ্ছে। কিন্তু বর্তমানে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে যে, এর মধ্যে আরও মারাত্মক উদ্দেশ্য বিদ্যমান। আমি মনে করি, আল-জারকাভির লক্ষ্য হলো শিয়াদেরকে একটি গৃহযুদ্ধে টেনে আনা। বিভিন্ন উত্তেজক লক্ষ্যবস্তুকে বাছাই করার মাধ্যমে এটাই প্রতীয়মান হয়; ২০০৪ সালের ২ মার্চ আশুরার সময় বাগদাদ এবং কারবালায় চারজন আত্মঘাতী কর্তৃক পাঁচটি বোমা বিস্ফোরণের মাধ্যমে ১৮৫ জন শিয়া তীর্থযাত্রীকে হত্যা এবং পরবর্তী কালে আরও অন্যত্র শিয়া বেসামরিকদের ওপর অব্যাহত হামলার পেছনে প্রায় সুনিশ্চিতভাবেই আল-জারকাভির ভূমিকা বিদ্যমান। তিনি ২০০৩ সালের আগস্টে শিয়া নেতা আয়াতুল্লাহ মুহাম্মাদ বকর আল-হাকিমকে হত্যার দায়ও স্বীকার করেন এবং SCIRI এর বর্তমান প্রধান ও তার উত্তরসূরি আবদুল আজিজ আল-হাকিমের ওপরও বেশ কিছু হত্যা প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। শিয়াদের সম্পর্কে আল-জারকাভির ভাষা অত্যন্ত তীব্র। ২০০৪ সালের ১৫ জুন বিন লাদেনের নিকট প্রেরিত একটি চিঠিতে তিনি তাদেরকে 'ছদ্মবেশী সাপ' বলে অভিহিত করেন এবং দাবি করেন যে, 'তারা উম্মাহর ওপর আমেরিকার চেয়েও অধিক ক্ষতি আরোপ করতে সক্ষম।' তিনি আরও সম্প্রসারিতভাবে বলেছিলেন যে, 'তারা এমন সব লোক যারা তাদের ধর্মদ্রোহিতা এবং নাস্তিক্যবাদের সাথে সাথে এখন রাজনৈতিক চতুরতার মাধ্যমে শাসন প্রক্রিয়া ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ভারসাম্যের এই সংকটকে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করার জন্য ব্যবহার করছে।... নতুন মাত্রায় তাদের গোপন মিত্র আমেরিকানদের তাদের রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর দ্বারা সহযোগিতা করার মাধ্যমেও তারা ক্ষমতাকে বাগিয়ে নিতে চাইছে।' আল-জারকাভির চিঠি খোলাখুলিভাবেই ব্যক্ত করে যে, যদি বিন লাদেন এবং আল-জাওয়াহিরি শিয়া বিরোধী অভিযানকে অনুমোদন না করেন তবে তিনি আল-কায়েদায় যোগ দেবেন না।

অবশেষে ২০০৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর তাদের মৈত্রী ঘোষণা করে যে, পূর্বে আল-জারকাভি এক বছর ধরে আল-কায়েদা নেতৃবর্গের সাথে আলাপ-আলোচনা করেছিলেন। ইরাকে তার নিজস্ব দলের মধ্যে একজন সমীহ উদ্রেককারী নেতা হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পর আল-জারকাভি সুনিশ্চিতভাবে আরও শক্তিশালী কোন অবস্থানের সাথে সম্বন্ধ করার অপেক্ষায় ছিলেন। যেসব পরিস্থিতির অধীনে

কেবল তিনি কথা বলতে রাজি হয়েছিলেন সেগুলো ছিল—বড় মাত্রার স্বাধীনতা এবং যেকোনো ধরনের নমনীয়তার অনুপস্থিতি।

সম্ভবত তিনি বিন লাদেনকে আল-কায়েদা প্রধান থেকে প্রতিস্থাপিত করতে ইচ্ছুক ছিলেন যেমনটা তিনি পূর্বে আল-মাকদিসিকে জেলখানার আমিরের পদ থেকে প্রতিস্থাপিত করেছিলেন। কিন্তু এটা বোঝার মতো তার কৌশলগত অনুভূতি ছিল যে, এটা কখনোই সম্ভব হবে না এবং তাই তিনি বশ্যতা স্বীকারের সিদ্ধান্তই নিলেন। তার সেই বৈধতা এবং পদমর্যাদাও প্রয়োজন ছিল, যেটা বিন লাদেনের আশীর্বাদ এবং 'আল-কায়েদা' নামটি তাকে এনে দিয়েছে।

২০০৪ সালের অক্টোবর মাসে আল-জারকাভি ঘোষণা করেন - তিনি তার সংগঠনের নাম পরিবর্তন করে 'আত-তাওহিদ ওয়াল-জিহাদ' থেকে 'আল-কায়েদা ইন দ্য ল্যান্ড অফ টু রিভার্স' রেখেছেন। ডিসেম্বর মাসে বিন লাদেন বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান তার নতুন নেটওয়ার্ক এর সর্বশেষ সংযোজিত ফ্র্যাঞ্চাইজির আমির হিসেবে আল-জারকাভিকে স্বীকৃতি দেন। ২০০৫ সালের জুন মাসে আবু কাতাদাহ আল-ফিলিস্তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, যেহেতু বিন লাদেন আত্মগোপনে রয়েছেন তাই আল-জারকাভি ব্যক্তিগতভাবে আল-কায়েদা প্রধানের কাছে তার বাইয়াত সম্পন্ন করতে পারেনি এবং এর বদলে তিনি আবু কাতাদাহর মাধ্যমে এটি সম্পন্ন করেছিলেন। তবে আল-জারকাভির জুন আল্টিমেটামকে বিবেচনায় এনে বিশেষজ্ঞরা বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন যে কে কাকে বাইয়াত দিয়েছে। কিন্তু উক্ত বশ্যতা স্বীকারের পরও শিয়া লক্ষবস্তুতে হামলার তীব্রতাবৃদ্ধি এটাই প্রতীয়মান করে যে, আল-জারকাভি তার নিজের পথেই হাঁটছেন। আল-কায়েদার ঘনিষ্ঠ সূত্র থেকে পাওয়া আমার তথ্য হলো, বিন লাদেন এবং আল-জাওয়াহিরি শিয়াদের বিরুদ্ধে লড়াইকে অনুমোদন দিয়েছিলেন এবং এই শর্তের আলোকেই আল-জারকাভি বিন লাদেনকে তার বাইয়াত দেন।

আল-কায়েদা নেতৃবর্গের চাইতেও আল-জারকাভির এজেন্ডা আরও চরমপন্থি প্রতিপন্ন হয়। ২০০৫ সালের মে মাসে আল-কায়েদার ব্যানারে দৃঢ়ভাবে আসীন অবস্থায় আল-জারকাভি ঘোষণা করেন যে, 'জরুরাহ' (ضرورة) (আবশ্যক প্রয়োজনীয়তা)[১] এর অধীনে মুসলিমদের সমান্তরালভাবে নিহত হওয়া সমর্থনযোগ্য। আল-কায়েদার অভিযানসমূহে আরও ভয়ংকর খ্যাতি এবং রক্তাক্ত

[১] 'জরুরাহ' ইসলামি ফিকহের মূলনীতি বিষয়ক একটি পরিভাষা। এটি এমন একটি অবস্থাকে বোঝায়, যেখানে অত্যধিক প্রয়োজনের সময় অনন্যোপায় হয়ে কোনো গর্হিত কাজকে সাময়িকভাবে অগ্রাহ্য করা হয়। প্রায়ই এর দৃষ্টান্ত দেওয়া হয় যেমন অত্যাচারিত মৃত্যুর আশঙ্কা হলে সাময়িকভাবে কুফরি বাক্য উচ্চারণ করা যায়, কিংবা প্রচণ্ড অনাহারের সময় কিছু না পাওয়া গেলে মৃত কিংবা হারাম জিনিস ভক্ষণ করা যায়।-সম্পাদক

কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে একটি নতুন মাত্রার মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ আনয়নের জন্য তিনিই দায়ী।

নতুন মৈত্রীর এই সময়ের পূর্বে আল-কায়েদার শ্রী ক্রমশ ক্ষীয়মান হচ্ছিল। কারণ আফগানিস্তানে মার্কিন হামলা এবং বিশ্বব্যাপী নিরাপত্তা ব্যবস্থাদি বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদের প্রতিপত্তি দিন দিন হ্রাস পাচ্ছিল। ২০০৩ সালে সৌদি আরবে স্বদেশি নিরাপত্তা বাহিনী এবং বেসামরিকদের ওপর হামলার কারণে সেখানেও তাদের জনপ্রিয়তায় বিরূপ প্রভাব পড়েছিল। ইরাকে একটি নতুন উপস্থিতি, বিশেষ করে এরূপ হাই প্রোফাইলধারী এবং সম্মোহনী (যদিও আতঙ্কজনক) নেতা আল-জারকাভি তাদের এমন একটি নতুন জাগরণের নিশ্চয়তা প্রদান করে, যেখানে ভগ্নোৎসাহ হওয়ার কিছু ছিল না।

আল-কায়েদার এই মোড় পরিবর্তনের সময় বিন লাদেনের স্বীকৃতি আল-জারকাভিকে একটি নতুন মাত্রায় বৈধতা এবং পদমর্যাদা এনে দেয়। সমগ্র বিশ্ব থেকে বিন লাদেন এবং আল-জারকাভির বক্তৃতায় উজ্জীবিত (কেবল আরব দেশগুলো থেকে নয়) হাজার হাজার রিক্রুটিং নিশ্চিত হচ্ছিল। কারণ তারা উভয়েই তরুণ মুজাহিদদের যুদ্ধে যোগদান করতে উৎসাহিত করে বহু বার্তা সম্প্রচার করেছেন। আল-জারকাভির দলই ইরাকে আগত বিদেশি যোদ্ধাদের অধিকাংশকে প্রশিক্ষণ দেয় এবং সংগঠিত করে। সাম্প্রতিক দুটি গবেষণায় (একটি সৌদি আরবের করা এবং অপরটি একটি ইসরাইলি থিংকট্যাংক এর করা) ইরাকে আগত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শত শত তরুণ-যুবকদের প্রেরণা এবং প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণে উঠে আসে যে, বিদেশি যোদ্ধাদের অধিকাংশই ইরাক যুদ্ধের পূর্বে জিহাদি ছিল না বরং তারা এই যুদ্ধ দ্বারাই চরমপন্থিতে পরিণত হয়েছে। সোর্সসমূহের মতে, ইরাকের 'নিষেধাজ্ঞা প্রজন্ম' আল-কায়েদার বিভিন্ন পদমর্যাদায় যোগ দেওয়া শুরু করেছে এবং তারাই ইরাকি আত্মঘাতী হামলার অভূতপূর্ব ধারণা সৃষ্টি করেছে। প্রতিটি সুইসাইড হামলার পর যেসব লিফলেট প্রচার করা হয় সেখানে তাদের নাম থেকেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। আল-জারকাভির দলের সাথে নিজেদের সাদৃশ্যায়ন করার জন্য তাদের একটি বড় অংশই ইরাকি ছদ্মনাম ধারণ করে, সচরাচর যে শহর থেকে তারা আগমন করেছে তার ওপর ভিত্তি করে। যেমনটা পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে, নিষেধাজ্ঞার যুগটি ইরাকি যুবকদের মাঝে আক্রোশ এবং মরিয়া ভাবের সৃষ্টি করেছে এবং তাদেরকে বর্তমানে মৃত্যুপরবর্তী উত্তম জীবনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আকৃষ্ট করা হচ্ছে। পূর্ববর্তী প্রজন্মের চাইতে ইসলাম নিয়ে তাদের অধিক জানাশোনার কারণে তরুণ ইরাকিরা জিহাদি কথাবার্তা গ্রহণে আরও অধিক সমর্থ।

আজ অবধি ইরাকে সুন্নি ইসলামিক প্রতিরোধ যোদ্ধাদের মাঝে দুটি প্রধান ধারা বিদ্যমান। 'জাইশ আনসার আস-সুন্নাহ' এবং 'আল-কায়েদা ইন দ্য ল্যান্ড অফ টু রিভার্স'।

২—সেক্যুলার গোষ্ঠীসমূহ

আমাদের সোর্সসমূহ অনুসারে, প্রতিরোধ আন্দোলনে বড় রকমের একটি সেক্যুলার অংশ বিদ্যমান। এই গোষ্ঠীতে প্রায় পঞ্চাশ হাজার বাথিস্ট, সাবেক সেনা কর্মকর্তা, সাদ্দামের নিরাপত্তা বাহিনীর সাবেক সদস্য এবং চরমপন্থি নাগরিকরা বিদ্যমান।

প্রাথমিকভাবে বিভিন্ন নামে ব্রিগেড গঠিত হলেও যেমন 'জাইশ আল-মুজাহিদ', 'ব্রিগেড অফ ওমর', 'জেনারেল কমান্ড অফ দ্য ইরাকি আর্মড রেজিস্টেন্স'—তারা পরবর্তী কালে একত্রিত হয়ে 'ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ রেজিস্ট্যান্স (NCR)' নামে একটি জোট-সংগঠন গড়ে তোলে। সাদ্দামের সেনাবাহিনীর সাবেক জেনারেলদের কর্তৃক পরিচালিত হওয়ায় তারা সুশৃংখলবদ্ধ, সুপ্রশিক্ষিত এবং আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। যেহেতু সাদ্দামের যুগে প্রতিটি ইরাকি যুবককেই মিলিটারি সার্ভিসে যোগদান করতে হতো, তাই সকল দেশীয় প্রতিরোধ-যোদ্ধাই সামর্থ্যবান যোদ্ধা এবং অস্ত্র ও বিস্ফোরকে সুবিশারদ। ধাপে ধাপে বেসামরিক নাগরিকদের মৃত্যু বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং মার্কিন নৃশংসতার কারণে ক্রমবর্ধমানভাবে অসন্তোষ এবং আক্রোশে ফেটে পড়া ইরাকি যুবক এবং সাধারণ নাগরিকদের থেকে এনসিআর যোদ্ধা সংগ্রহ করে। নারী এবং শিশুদের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়ার সাংস্কৃতিকভাবে অবশ্যপালনীয় রীতিটিও বহু জনগণের হাতে অস্ত্র তুলে নেওয়ার ক্ষেত্রে বল সঞ্চার করছে।

এনসিআর খুবই পেশাদারিত্বমূলক সংগঠন এবং তারা স্বেচ্ছাসেবকদের উপযুক্ততাকে আনুষ্ঠানিকভাবে মূল্যায়ন করে তাদের পদমর্যাদার পদবিন্যাস করে। তাদের প্রশিক্ষণ শিবিরগুলো সিরিয়া সীমানা সংলগ্ন। তাদের প্রতিরোধ যোদ্ধারা প্রথম শ্রেণির গেরিলা যুদ্ধকৌশলসমূহ ব্যবহার করে এবং তারা আত্মঘাতী হামলাকে এড়িয়ে চলে। বিভিন্ন জরিপ প্রদর্শন করে যে, ইরাকি বেসামরিক নাগরিকদের কাছে চব্বিশ মিলিয়ন বন্দুক রয়েছে। এনসিআর এর নেতারা অস্ত্র এবং অর্থকড়ির গুপ্ত ভান্ডারসমূহ সম্পর্কেও অবগত এবং অধিকাংশ ইরাকি রাস্তাঘাট তাদের নখদর্পণে রয়েছে। এর মাধ্যমে তারা জোট সেনাদের জন্য সেগুলোকে অনিরাপদ করে রাখাকে সুনিশ্চিত করছে। ভূখণ্ড সম্পর্কে তাদের জ্ঞান এবং বাগদাদ ও অন্যান্য শহরের দৈনন্দিন জীবনযাপনের সম্পর্কিত খুঁটিনাটি ধারণা তাদের জন্য ঘন ঘন অপহরণ এবং গুপ্তহত্যাকেও সহজতর করেছে।

সেক্যুলার প্রতিরোধ যোদ্ধা এবং আল-কায়েদার মধ্যে সহযোগিতার মাত্রা নিয়ে সুস্পষ্ট তেমন কিছু জানা যায়নি। তবে, ২০০৪ সালের নভেম্বর মাসে বাথ পার্টি ...তি এবং আল-জারকাভিসহ বিভিন্ন গোষ্ঠীসমূহ কর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি যৌথ বিবৃতি বিভিন্ন জিহাদি ওয়েবসাইটে প্রচার করা হয়। এতে বলা হয়—'জোট সেনা এবং তাদের এজেন্ট ও গোয়েন্দাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র হামলাসমূহ তীব্রতর করার জন্য আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।' ইসলামিস্টরা এই বাক্য জুড়ে দেয় যে, 'আমরা এই কারণে এতে স্বাক্ষর করিনি যে, আমরা সাদ্দাম হুসাইন অথবা বাথ পার্টির সমর্থক। বরং এর কারণ হলো এটি ইরাকে প্রতিরোধ যোদ্ধাদের চাহিদাকে প্রকাশিত করে।' তবে, তাদের মাঝে কর্মক্ষেত্রেও কিছু মাত্রার সহযোগিতা স্থাপিত হয়েছে। মসুল, সামাররা এবং ফাল্লুজাতে সুন্নি ইসলামিক নেতাদের স্থানীয় কমিটির কাছে ইসলামিস্ট এবং বাথিস্ট উভয় ধরনের যোদ্ধারাই রিপোর্ট জমা দেয়।[১] মসুল অভ্যুত্থানের সময় (১০-১১ নভেম্বর) মার্কিন সেনা, ন্যাশনাল গার্ড এবং কুর্দি মিলিশিয়াদের বিরুদ্ধে জিহাদিস্ট, আনসার আস-সুন্নাহ এবং ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ রেজিস্টেন্স একজোট হয়ে লড়েছিল।

বিদ্রোহী নেতারা ইরাকি সেনা, নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য এবং পুলিশদেরকে পুনঃপুনঃ দখলদার বাহিনীকে সহায়তা করার বদলে পালিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানান। এসব আহ্বান প্রায়শ সফল হচ্ছে। ফাল্লুজা অবরোধকালে একটি সম্পূর্ণ আর্মি ব্যাটালিয়ন পালিয়ে গিয়েছিল যাদের প্রতি চারজনের একজন মার্কিন সেনাদের সহায়তা করত। মসুল অভ্যুত্থানের সময় চার হাজার লোকবলের শক্তিশালী পুলিশ বাহিনীর চার-পঞ্চমাংশ হয়তো পালিয়ে গিয়েছিল নয়তো বিদ্রোহীদের সাথে যোগ দিয়েছিল।[২] ইরাকি নিরাপত্তাবাহিনীগুলোও প্রতিরোধ যোদ্ধাদের কর্তৃক অনুপ্রবেশিত। কিছু কিছু সোর্স থেকে জানা যায়—সুন্নি শহরগুলোর পুলিশ বাহিনীতে প্রকৃত অফিসারদের চাইতে স্পাইয়ের সংখ্যাই বেশি। এর মাধ্যমে প্রতিরোধ যোদ্ধারা প্রতি সপ্তাহে গড়ে প্রায় একশত পুলিশ সদস্যকে নিজেদের দলে ভিড়িয়ে আনছে। প্রতিরোধ যোদ্ধারা প্রায়শই পুলিশের পোশাক পরে হামলা পরিচালনা করে যেগুলো কেবল কর্মরত অফিসারদের কর্তৃকই সরবরাহ হওয়া সম্ভব। মসুল এবং ফাল্লুজার গভর্নরকে হত্যার ঘটনাদ্বয়ে ব্যাপকভাবে মনে করা হয়, সেগুলো নিরাপত্তা বাহিনীর সহায়তায় মাধ্যমেই সংঘটিত করা হয়েছে।

---

[১] Dilip Hiro, Secrets and Lies, p. 413.
[২] Ibid., p. 515.

৩—শিয়া গোষ্ঠীসমূহ

যে একমাত্র ইরাকি শিয়া প্রতিরোধ যোদ্ধা-গোষ্ঠীটি ভিন্নতা প্রদর্শন করে এখনও দখলদারি-বিরোধী অবস্থান বজায় রেখেছে, তারা হলো সাদরিস্ট (চরমপন্থি আলেম মুকতাদা আল-সদরের অনুসারী) যাদের সামরিক শাখার নাম 'মাহদি আর্মি'। এটা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, লেবানিজ হিজবুল্লাহ দক্ষিণ ইরাকেও সক্রিয়।[১] আগ্রাসনের একটি সরাসরি প্রতিক্রিয়া হিসেবে ২০০৩ সালের জুন মাসে মুকতাদা আল-সদর কর্তৃক মাহদি আর্মি প্রতিষ্ঠিত হয়। সাদরিস্টরা বর্তমানে একটি অসাম্প্রদায়িক, দখলদারি বিরোধী সুসংগঠিত প্রতিরোধ গোষ্ঠী এবং তাদের জনপ্রিয় সমর্থন বিদ্যমান।

মুকতাদা আল-সদরের বাবা গ্র্যান্ড আয়াতুল্লাহ মুহাম্মদ বাকির আল-সদর ১৯৯৯ সালে গুপ্তহত্যার শিকার হন; কারণ তিনি বাথ শাসনব্যবস্থার পলিসিসমূহের স্পষ্টভাষী সমালোচনার কারণে তাদের অগ্নিদৃষ্টিতে পতিত হয়েছিলেন। তার মৃত্যুর পর তার সমর্থকদের অনেকেই তার ছেলের নিকট তাদের আনুগত্য স্থানান্তরিত করে। আমেরিকান আগ্রাসনের পূর্বে মুকতাদা আল-সদর তার বাবার মতো পরিণতির ভয়ে খুবই লো-প্রোফাইল বজায় রেখে চলতেন। সাদ্দামের পতনের পর তিনি আবার লাইমলাইটে চলে আসেন এবং ইরাকিদেরকে অস্ত্র হাতে তুলে নেওয়ার আহ্বান জানান। এরপর তার হাজার হাজার অনুসারী মাহদি আর্মিতে যোগদান করে। ইতিপূর্বেই আল-সদরের ক্ষমতার একটি শক্তিশালী ভিত্তি বিদ্যমান ছিল এবং এর মাধ্যমে তিনি তার বাবার প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন শিয়া দাতব্য সংস্থার বিস্তৃত নেটওয়ার্ক থেকে তহবিলের জোগান পাচ্ছেন।

মাহদি আর্মি হালকা অস্ত্রশস্ত্র, কালাশনিকভ, আরপিজি প্রভৃতিতে পর্যাপ্তভাবে সুসজ্জিত। যদিও একেবারে সূচনা থেকেই তিনি মার্কিন আগ্রাসনের বিরোধী ছিলেন, কিন্তু আল-সদর প্রাথমিকভাবে অহিংস এবং শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু যখন মার্কিন দখলদার কর্তৃপক্ষ তার 'আল-হাওযা' পত্রিকাকে নিষিদ্ধ করে দিলো, তখন যুদ্ধপরবর্তী সময়ে তিনি প্রথমবারের মতো ২০০৪ সালের ৪ এপ্রিল সশস্ত্র অভ্যুত্থান চালিত করেন। তিনি তাঁর অনুসারীদের আদিষ্ট করেন শত্রুদেরকে আতঙ্কিত করে তুলতে এবং আত্মঘাতী হামলা পরিচালনার মাধ্যমে তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করতে। এই অভ্যুত্থান ৬ই জুন পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল এবং এরপর একটি সাময়িক যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।[২]

---

[১] Ibid., p. 354.

[২] Al-Jazeera profile, 6 May 2004.

২০০৪ সালের আগস্ট মাসে শিয়াদের পবিত্রতম শহর নাজাফে মার্কিন বাহিনী আল-সদরকে আটকের প্রচেষ্টা চালালে মাহদি আর্মি আবারও বিশ্ব মনোযোগ কেড়ে নেয়। মাহদি আর্মির প্রায় দুই হাজার সদস্য এবং অন্তর্বর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী আইয়াদ আলাভি[১] প্রেরিত আঠারোশ ইরাকি নিরাপত্তাবাহিনী ও এর সাথে দুই হাজার মার্কিন সেনার মধ্যে একটি গুরুতর লড়াই সংঘটিত হয়। অবশেষে তিনি এবং তার হাজার হাজার অনুসারী যে মসজিদে আশ্রয় নিয়েছিল তারা সেটিকে দখল করে নেয়। এরপর শহরটিতে চালানো ধ্বংসযজ্ঞ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বহু মডারেট ইরাকিদের মধ্যবর্তী মিত্রতাকে নষ্ট করে দেয়।

ফাল্লুজার লড়াইয়ের সময় মুকতাদা আল-সদরের অনুসারীরা বাথিস্ট এবং জিহাদি গোষ্ঠীগুলোর সাথে একত্রিত হয়ে লড়াই করেছিল; যেটি ছিল সুন্নি এবং শিয়াদের মাঝে একটি অত্যন্ত বিরল মিত্রতা। তারা তখন নিজেদেরকে 'অস্ত্র-ভাই' হিসেবে আবিষ্কৃত করেছিল। ফাল্লুজার পরিস্থিতি ৯ এপ্রিল শুক্রবার বাগদাদের উম্মুল কুরা মসজিদে প্রায় দুই লক্ষ শিয়া এবং সুন্নিকে জুমার নামাজে একত্রিত করেছিল। মুকতাদা আল সদর তখন তার শত্রু বুশকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন—'এখন তুমি সমগ্র জাতির বিরুদ্ধে লড়ছ।' কিন্তু এই ধর্মনিরপেক্ষ ঐক্যের প্রদর্শন বেশিদিন স্থায়ী হয়নি।

আরেকটি ভরাডুবি

২০০৫ সালের আগস্ট মাসে পোলিশ প্রেসিডেন্ট মারেক বেলকা উল্লেখ করেন—'আমরা যুদ্ধপরবর্তী ইরাকে একটি জাতি গঠনে পুরোপুরিভাবে ব্যর্থ হয়েছি।'[২] মার্কিন সেনাদের সম্পর্কে একাশি শতাংশ ইরাকিদের মতামত হলো, তারা কোনো মুক্তিদাতা নয় বরং তারা দখলদার এবং কেবল মাত্র তেরো শতাংশের মতে এই আগ্রাসন নৈতিকভাবে সমর্থনযোগ্য।[৩] যুদ্ধপরবর্তী ইরাকের খুব সামান্য মানুষই মনে করে যে, তাদের জীবনমানের উন্নতি ঘটেছে। বর্তমানে বেকারত্বের হার পঞ্চাশ শতাংশে এসে পৌঁছেছে।[৪] অধিকাংশ অঞ্চলই পর্যাপ্ত পানি এবং বিদ্যুৎ সংযোগবিহীন, যেখানে তা স্কুল এবং হাসপাতাল পরিচালনার জন্য অত্যাবশ্যক। এমনকি সেখানে সর্বাধিক মৌলিক জনসেবাগুলো বাস্তবেই অনুপস্থিত। বেচটেল কর্পোরেশন কর্তৃক পুনর্নির্মিত পানির প্লান্টগুলোকে নিয়মিতভাবে প্রতিরোধ যোদ্ধাদের কর্তৃক হামলার শিকার হতে হচ্ছে এবং প্রতিনিয়তই সেগুলো খণ্ড-

---

[১] Allawi served from 1 June 2004—7 April 2005.
[২] The Scotsman, 3 August 2005.
[৩] USA Today, 30 April 2004.
[৪] The Washington Post, 20 June 2005.

বিখণ্ড হচ্ছে। এর ফলে অধিকাংশ ইরাকি পানের জন্য বিশুদ্ধ পানিটুকুও পাচ্ছে না। সেনা এবং প্রতিরোধ যোদ্ধাদের লড়াইয়ের মাঝে পতিত হবার ভয়ে সাধারণ লোকজন তাদের নিজস্ব শহরতলী এবং শহরগুলোর রাস্তায় চলাফেরা করতেও ক্রমশ আতঙ্কিত হয়ে উঠছে। নতুন সরকার কর্তৃক সেবা প্রদানের অক্ষমতার কারণে জনগণের প্রতিবাদ, বিক্ষোভ এবং দাঙ্গা ক্রমবর্ধমানভাবে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে।

ইরাকে গণতন্ত্রের বাস্তবায়ন বাস্তবিকই একটি অলীক কল্পনা। শিয়া এবং কুর্দি মন্ত্রীরা তাদের নিজস্ব স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুন্নিরা সমগ্র পদ্ধতিকেই বয়কট করছে। সুনিশ্চিতভাবেই, এরূপ একটি সিস্টেমকে গণতন্ত্র বলা চলে না, যদি না সমুদয় সমাজ এর বিভিন্নমুখী অধিকার এবং প্রয়োজনীয়তাকে সেটি সামগ্রিকভাবে প্রতিনিধিত্ব করে। অধিকন্তু, নির্বাচন কোনো ব্যক্তির গাড়িতে পেট্রোল ভরে দেয় না এবং ব্যালট বাক্সও শিশুদের খাবারের জোগান দিতে পারে না। ইরাকের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ আল-কায়েদা এবং অন্যান্য সালাফি গ্রুপসমূহের অনমনীয় মতাদর্শিক অবস্থানের কারণে আরও জটিলতার সম্মুখীন হবে। কারণ তারা মনে করে গণতন্ত্র হলো ধর্মদ্রোহিতা এবং তারা একটি সালাফি ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

২০০৫ সালের ৩০ জানুয়ারি নির্বাচনের এক সপ্তাহ পূর্বে আল-জারকাভি গণতন্ত্রের নিন্দা জানিয়ে ইসলামিক ওয়েবসাইটসমূহে একটি বক্তব্য প্রচার করেন এবং এতে অংশগ্রহণ না করার জন্য ইরাকি জনগণকে আহ্বান জানান। তার যুক্তি ছিল,

> ‘গণতন্ত্রিক সিস্টেমের প্রতিনিধি যারা মূলত জনসাধারণের প্রক্সি হিসেবে কাজ করে, তাদের দ্বারাই বিধানিক কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব সম্পাদিত হয় এবং এই পন্থায় আল্লাহর বদলে মানুষের আনুগত্য করা হয় যা স্পষ্টতই ধর্মদ্রোহিতা, বহুঈশ্বরবাদ এবং পদস্খলনের এটি একটি মৌলিক রূপ। তিনি আরও বলেন, গণতন্ত্র ধর্মীয় স্বাধীনতাকে অনুমোদন করে যার মধ্যে এক ধর্ম থেকে আরেক ধর্মে স্থানান্তরিত হওয়াও অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু শরিয়াহ অনুসারে যদি কোন মুসলিম ধর্ম ত্যাগ করে অন্য কোন ধর্মে দীক্ষিত হয়, তবে আইন হলো তাকে হত্যা করা।’

গণতন্ত্রের আরও অন্যান্য যেসব দিকগুলোকে আল-জারকাভি অনৈতিক হিসেবে দেখতে পান, সেগুলোর মধ্যে বাকস্বাধীনতাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং তিনি ধারণা দেন—‘এর মাধ্যমে সেসব বিষয়গুলোকেও অনুমোদন করা হয় যেটা ঐশ্বরিক বিষয়াদিতে আঘাত হানতে পারে এবং সর্বোপরি একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে আল্লাহর উপলব্ধি এবং প্রতিপত্তিকে কেবল উপাসনালয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে

দেওয়া হয়।' তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনকে পুরোপুরিভাবে অন্যায় এবং অকার্যকর হিসেবে দেখেন; কারণ ইসলাম অনুসারে ন্যায় হলো সেটাই যেটা কুরআন এবং সুন্নাহ সমর্থিত, এর মান্যকারীর সংখ্যা সামান্য বা বহু যাই থাকুক না কেনো।

ইরাকে গণতন্ত্রের চিহ্নিতকারী বৈশিষ্ট্য হলো দুর্নীতি, প্রতারণা এবং লিপ্সা। সেখানে ব্যবসায়িক সুযোগের সংখ্যা অগণিত। 'ইরাক পুনর্গঠন ২০০৬' নামে জর্ডানের আম্মানে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে সেসব কোম্পানির জন্য, যারা যুদ্ধ কর্তৃক সৃষ্ট সুযোগকে নিজেদের কাজে লাগানোর আকাঙ্ক্ষা করে। এর বিবরণপত্রে সাগ্রহে ঘোষণা করা হয়েছে—উদীয়মান ইরাকের জন্য একটি পূর্ণমাত্রার অবকাঠামো, সেবা এবং সিস্টেম নির্মাণ নিদারুণভাবে প্রয়োজনীয়।' এতে আরও আহ্বান জানানো হয়, 'এই অঞ্চলের সবচেয়ে আশাপ্রদ মার্কেটে একজন অভিনেতা হয়ে উঠুন... এই অঞ্চলের অন্য কোনো দেশে এত বিপুল ব্যবসা উৎপাদন সক্ষমতা নেই।'[১]

যেসব ইরাকিরা আমেরিকান বৃহৎ ব্যবসাসমূহের সাথে কাজ করে তারা বিভিন্ন উপায়ে লাভবান হতে পারে। তারা সেসব কাজের সাব-কন্ট্রাক্টরের দায়িত্ব পেতে পারে, যেগুলো বড় ধরনের লাভের নিশ্চয়তা দেয় অথবা যারা প্রশাসনিক পদে বিদ্যমান, তারাও এসব লাভজনক চুক্তি পাইয়ে দেবার বিনিময় বড় আকারের ঘুষ গ্রহণ করে। নতুন ইরাক বৈদেশিক সহায়তা হিসেবে প্রায় ১০০ বিলিয়ন ডলার পেয়েছে। দুর্নীতি পর্যবেক্ষণ সংস্থা 'ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল' এর মতে, এই পরিস্থিতি ইতিহাসের সবচেয়ে বৃহত্তম দুর্নীতি কেলেঙ্কারি তৈরি করতে পারে। বাস্তবেও, এই কেলেঙ্কারি আলাভি সরকারের অধীনে বেশ ভালোভাবেই চলেছে। এই দুর্নীতির মাত্রা এতটাই বেশি ছিল যে, যখন আলাভি নির্বাচনে পরাজিত হয় তখন ক্যাবিনেটের অধিকাংশ সদস্যই বিদেশে পালিয়ে যায় এই ভয়ে যে, হয়তো নতুন সরকারের অধীনে তাদের বিচারের মুখোমুখি হওয়া লাগতে পারে। তবে এজন্য তাদের উদ্বিগ্ন হওয়ার প্রয়োজন ছিল না। কারণ, এটা ব্যাপকভাবে স্বীকৃত ছিল যে, নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ঘুষ একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।

প্রচলিত আছে, মন্ত্রী এবং কর্মকর্তারা কোন চুক্তি অনুমোদন করার কারণে ৫-৬ শতাংশ মূল্য আপনা-আপনিই পেয়ে যায়। অস্ট্রেলিয়ান সাংবাদিক পল ম্যাকজিওফ বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ের একটি টেন্ডার সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিলেন যে—'বাগদাদে একজন ইরাকি ব্যবসায়ী আমাকে জানায়, উক্ত প্রকল্পের জন্য সর্বোচ্চ প্রয়োজন ছিল পনেরো মিলিয়ন ডলার। কিন্তু মন্ত্রীর সাঙ্গপাঙ্গরা এর থেকে চল্লিশ মিলিয়ন ডলার নিজেদের পকেটে ভরতে চাইল। তাই

---

[১] www.rebuild-iraq-expo.com.

তারা ব্যবস্থাপত্রের দায়িত্বপ্রাপ্তকে বলেছিল দরপত্রে এর মূল্য বাড়িয়ে সত্তর মিলিয়ন ডলার উপস্থাপন করতে, যাতে করে তারা তাদের অংশ পেতে পারে এবং একই সাথে দরপত্র আহ্বানকারীও একটি সন্তোষজনক অংশ লাভ করতে পারে।'[১] এসব উদ্যোক্তরা এই ব্যাপারে খুব সামান্যই গ্রাহ্য করে যে, ইরাকি ইলেকট্রিক গ্রীডের এই বিপজ্জনক অবস্থা বর্তমানে সমগ্র জাতির ভোগান্তির কারণ হচ্ছে।

বর্তমানে নিযুক্ত ইরাকি ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী হলেন আহমদ চালাবী, যিনি একদা জর্ডানে দুইশ মিলিয়ন ডলার ব্যাংক কেলেঙ্কারির কারণে বাইশ বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। তিনি সেখান থেকে পালিয়ে লন্ডনে চলে আসেন এবং সেখানে তিনি ইরাকি ন্যাশনাল কংগ্রেস নামক একটি নির্বাসিত সরকারের সভাপতির দায়িত্ব পান, যাদেরকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৯৭ মিলিয়ন ডলার তহবিল সরবরাহ করেছিল। অভিযোগ রয়েছে, সাদ্দামের WMD সম্পর্কিত তত্ত্বের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চালাবীকে এক মিলিয়ন ডলার দিয়েছিল, যেটা মনগড়া প্রমাণিত হলেও সাময়িকভাবে বুশকে আগ্রাসন চালানোর একটি বৈধ উপায় সরবরাহ করেছিল।[২] WMD সম্পর্কিত তথ্য ভুল প্রমাণিত হলে ২০০৪ সালে এই দুয়ের মাঝে একটি ফাটল সৃষ্টি হওয়ার পরও চালাবী ওয়াশিংটনের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখতে সমর্থ হয়।

রাজনৈতিকভাবে অর্থনৈতিকভাবে এবং নীতিগতভাবেও ইরাকের নতুন সরকার পুরোপুরিভাবে ব্যর্থ এবং নিরাপত্তাগত দিক বিবেচনায় এটি পুরাদস্তুর একটি বিপর্যয়। ২০০৫ সালের জুলাই মাসে প্রতিরোধ যুদ্ধের নতুন মাত্রায় দৈনিক গড়ে ৬৫ টি আক্রমণ সংঘটিত হয় এবং এর ফলে প্রতিদিন হতাহতের সংখ্যা বেড়েই চলছে। যোদ্ধারা দিন দিন আরও উদ্ধত এবং নৃশংস হয়ে উঠছে। প্রতিরোধ যোদ্ধাদের কর্তৃক সামরিক এবং কৌশলগত দক্ষতা এতটা বিস্তরভাবে উন্নীত হয়েছে যে, এমনকি যুদ্ধ-পোড়খাওয়া মার্কিন সেনা কর্মকর্তারাও অভিভূত না হয়ে পারছে না। তাদেরই একজন ফাল্লুজা দখলের সময় 'নিউইয়র্ক টাইমস'কে বলে— 'ইরাকিরা পদাতিক সেনাদের অগ্রগমনকে মর্টার ফায়ারের মাধ্যমে কভার দিয়েছে যা একটি অতিশয় কঠিন টেকনিক।' দক্ষতার এই বর্ধিত মাত্রার সাথে সাথে এবং অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যবস্তুর সাথে সমান্তরালভাবে বেসামরিক নাগরিকরা বাছবিচারহীন হত্যার শিকার হচ্ছে। এমনকি কিছু কিছু চরমপন্থিদের নিকটও এই সহিংসতার মাত্রাকে বাড়াবাড়ি মনে হয়েছে। ২০০৫ সালের আগস্ট মাসে সিরিয়ান সালাফি-জিহাদি তাত্ত্বিক আবু নাসের আল-তারতুসী আল-কায়েদাকে নবি

---

[১] The Age, Corruption: The Growth Industry of New Iraq, 2 May 2005.

[২] The Independent, 30 September 2003.

সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর এই বাণীকে স্মরণ করিয়ে দেন—'যে কোনো মুসলিমকে আঘাত করবে, সে জিহাদের কোন পুরস্কার পাবে না।' ২০০৫ সালের জুলাই মাসে তখনও জর্ডানে কারারুদ্ধ আবু মুহাম্মদ আল-মাকদিসি তার পূর্ব আশ্রিত আবু মুসআব আল-জারকাভির বিরুদ্ধে কথা বলেন এবং বিশেষভাবে নারী ও শিশুদের ওপর হামলা এবং শিয়াদেরকে লক্ষ্যবস্তু বানানোকে প্রশ্নবিদ্ধ করেন।

২০০৫ সালের অক্টোবর মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জানায় যে, এ পর্যন্ত তাদের ২,০১৫ সেনা নিহত হয়েছে এবং ১৪,০০০ হাজার সেনা আহত হয়েছে। আক্রমণ শুরুর পর ৬,১৪১ জন ইরাকি সেনা এবং পুলিশ সদস্য হতাহত হয়েছে। একজন মার্কিন সামরিক মুখপাত্র এপি নিউজকে জানায় যে, বর্তমানে দৈনিক গড়ে প্রায় ৬৪ জন করে বেসামরিক নাগরিক নিহত হচ্ছে এবং স্বীকার করেন—২০০৩ সালে আক্রমণের পর থেকে কমপক্ষে প্রায় ৩০,০০০ বেসামরিক লোক নিহত হয়েছে। যদিও স্বাধীন বিশ্লেষণগুলো বলছে এই সংখ্যা ১,০০,০০০ বা আরও বেশি। ইরাকি মানবাধিকার সংস্থা 'মাফকারাত আল-ইসলাম' ২০০৫ সালের জুলাই অবধি বেসামরিকদের নিহত হওয়া সংখ্যাকে ১,২৮,০০০ বলে দাবি করেছে, যার পঞ্চাশ শতাংশই হলো মহিলা এবং ১২ বছরের কম বয়সী শিশু।

জিহাদিদের ঘাঁটিগুলোতে পূর্ণমাত্রার অভিযান যেমন, ২০০৫ সালের আগস্ট মাসে আল-আনবার প্রদেশে 'অপারেশন কুইক স্ট্রাইক' আগ্রাসনের সূচনালগ্নেই উত্তরাঞ্চলের আনসার আল-ইসলামের ঘাঁটিসমূহে বোমাহামলা অথবা ফাল্লুজাকে বিধ্বস্ত করে দেওয়া প্রভৃতি কেবল সাময়িক এবং সীমিত প্রভাব ফেলেছে। নিরাপত্তা জালকে পাশ কাটিয়ে অন্যত্র যেকোনো স্থানে সংঘটিত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিরোধ যোদ্ধাদের চমকপ্রদক সক্ষমতা বিদ্যমান। সহজ ভাষায় বললে, ইরাকের অধিকাংশ অঞ্চলেই বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। রক্তাক্ত এই যুদ্ধটিতে প্রতিরোধ যোদ্ধারা কেবল জয়ই লাভ করছে না বরং তারা দর্শনীয়ভাবে জয় লাভ করছে।

জোট সেনারা কতজন বিদ্রোহীকে হত্যা করছে সেটা কোন ব্যাপারই নয়; কারণ তাদেরকে প্রতিনিয়ত শাহাদাত লাভে অধীর নতুন তরুণদের ঢেউয়ের মুখোমুখি হতে হচ্ছে যাদের একমাত্র চাওয়া তাদের সাথে সাথে যত বেশি সংখ্যক শত্রুকে নিয়ে মৃত্যুবরণ করা। সামরিক তত্ত্ববিদদের হিসাব মোতাবেক সশস্ত্র আগ্রাসী শক্তিকে কোনো গেরিলা যুদ্ধে জয়লাভ করতে হলে তাদের এবং শত্রুদের হতাহতের অনুপাত হওয়া উচিত এক বনাম দশ অর্থাৎ এজন্য ২০,০০০ ইরাকি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের নিহত হওয়া বাঞ্ছনীয়। যদিও সঠিক হিসাব পাওয়া অত্যন্ত দুঃসাধ্য, তবুও এটা মাত্রাতিরিক্তভাবে অসম্ভব যে, প্রতিরোধ যোদ্ধাদের হতাহতের

সংখ্যা এর অর্ধেকেও পৌঁছেছে। অধিকন্তু, সাধারণ ইরাকি জনগণের মধ্যে বিদ্রোহের জনপ্রিয়তাও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যর্থতার আরেকটি নিদর্শন। সেখানে বিদ্রোহ সমর্থক মিউজিক টেপ এবং সিডি বিক্রি অব্যাহতভাবে বেড়েই চলছে। সেগুলোর মাঝে সবচেয়ে জনপ্রিয় গায়ক হলো সাবাহ আল-জানাবি যার একটি গীতিকবিতা অনেকটা এরূপ—

আমেরিকা বাগদাদ দখল করে নেওয়ার জন্য এসেছে

আর্মি এবং জনগণের কাছে অস্ত্র এবং গোলাবারুদ রয়েছে

চলো আল্লাহর নাম নিতে নিতে লড়াইয়ে যোগদান করি।[১]

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আশেপাশের দেশগুলোতে জিহাদি প্রবণতা ছড়িয়ে পড়ার ভয়াবহ বিপদটিরও সম্মুখীন হতে হচ্ছে, যাদের অনেকেই ইতিমধ্যে যোদ্ধা এবং লজিস্টিক সরবরাহ দিয়ে ইরাক বিদ্রোহকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। উত্তর ইরাকে তুর্কি জিহাদিরা কুর্দি গোষ্ঠীসমূহের সাথে শক্তিশালী ঘাঁটি গেড়েছে এবং সুলাইমানিয়া, কিরকুক এবং মসুলেও তুর্কি যোদ্ধাদের উপস্থিতিকে লক্ষ করা যাচ্ছে। এই অঞ্চলজুড়েই—বিশেষত ইরাক, উপসাগরীয় অঞ্চল এবং সিরিয়ার মধ্যে গোত্রীয় সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। এসব গোষ্ঠীসমূহের অধিকাংশই সুন্নি এবং এরূপ আন্তঃসম্পর্ক ও পারিবারিক বন্ধন এসব গোষ্ঠীসমূহের বহু মুজাহিদিনের জন্য—যারা আল-কায়েদার সদস্য বা তাদের অনুরূপ মতাদর্শ ধারণ করে—ইরাকে স্থানান্তরিত হওয়া সহজতর করে দিয়েছে।

ইরাকে বর্তমানে একটি ভীতিকর অস্থিতিশীলতা এবং মস্তিষ্ক বিকৃতির রাজত্ব কায়েম হয়েছে। মার্কিন সেনাদের মধ্যে যুদ্ধ সংশ্লিষ্ট মানসিক অসুস্থতার সংখ্যা সতেরো হাজার থেকে এক লক্ষ বলে জানা যায় এবং সেখানে ২০০৪ সালের শেষ অবধি ত্রিশ জন মার্কিন সেনা আত্মহত্যা করেছে।[২] ফিলিস্তিনি লেখক এবং মধ্যপ্রাচ্য বিশেষজ্ঞ সাঈদ আবু রিশ এর মতে, সেখানে অকল্পনীয়ভাবে মার্কিন সেনাদের অব্যাহতভাবে তুর্কিতে পালিয়ে যাওয়ার রিপোর্ট পাওয়া যাচ্ছে। সম্ভবত ইরাকে আমেরিকান ব্যর্থতার সবচেয়ে বৃহৎ এবং সর্বাধিক বিপজ্জনক দিকটি

---

[১] Dilip Hiro, Secrets and Lies, p. 442.

[২] অবজার্ভার পত্রিকার একটি প্রতিবেদনে মার্কিন সেনাবাহিনীর সিনিয়র মেডিকেল কর্মকর্তারা পূর্বাভাস দেন যে, ইরাক থেকে প্রত্যাবর্তনকারী প্রতি পাঁচজন সেনার মধ্যে একজন সেনা পোস্ট-ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডারে ভুগবেন। ইরাকে বর্তমানে ১৫০,০০০ আমেরিকান সেনা মোতায়েন রয়েছে; যার অর্থ দাঁড়ায় ইরাক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনকারী প্রায় ৩০,০০০ সেনা মানসিক ক্ষতির সম্মুখীন হবে। (ইরাকের মার্কিন সেনাবাহিনীর প্রায় ৮৬ শতাংশ পর্যন্ত রণক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত রয়েছে, অন্যাদিকে আফগানিস্তানে এই হার কেবলমাত্র ৩১ শতাংশ)। See Peter Beaumont, 'Stress Epidemic Strikes American Forces in Iraq, The Observer, ২৫ January 2008.

২০০৫ সালের ১৮ই জুলাই চাথাম হাউসের (সাবেক রয়্যাল ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স) একটি প্রতিবেদনে উঠে আসে। সেটিতে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা উল্লেখ করেন যে, ইরাকের পরিস্থিতি আল-কায়েদা নেটওয়ার্কের প্রোপাগান্ডা, রিক্রুটমেন্ট এবং ফান্ডিংয়ের ব্যাপক উন্নতিসাধন করেছে, যেটা জোটের মাঝে একটি বড় ধরনের ফাটল সৃষ্টি করেছে এবং আল-কায়েদা সংযুক্ত জঙ্গিদের জন্য একটি আদর্শ লক্ষ্যবস্তু ও প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রের জোগান দিয়েছে।

ভবিষ্যৎ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য দ্বিতীয় উপসাগরীয় যুদ্ধটি ইতিমধ্যেই একটি ক্ষয়কারী যুদ্ধ হিসেবে প্রতিপন্ন হয়েছে; এই সময়ের মধ্যেই তাদের ব্যয় ২৫০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে এবং এটি যদি আরও কিছু বছর অব্যাহত থাকে তবে অতিসত্বর এর ব্যয় ৭০০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাবে। কেন্দ্রীয় বাজেট ঘাটতি ৫০০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছায় আমেরিকান অর্থনীতি একটি আকস্মিক দুর্দশায় পতিত হয়েছে। সাবেক সিআইএ কাউন্টার টেরোরিজম কর্মকর্তা মাইকেল শিউয়ার বলেন—'ওসামার (বিন লাদেন) জয়লাভের কোনো প্রয়োজনই নেই, সে আমাদেরকেই কেবল রক্তক্ষরণ করাতে করাতে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেবে।'[১]

সম্প্রতি মার্কিন প্রত্যাহার নিয়ে কিছু কথা শোনা যাচ্ছে এবং সাবেক সিআইএ প্রধান জন ডিউচ 'নিউইয়র্ক টাইমস' পত্রিকায় একে সমর্থন করে একটি আর্টিকেল প্রকাশ করেন। তিনি লিখেন—'যারা বলছে যে, আমাদের পূর্ণ মেয়াদে ইরাকে অবস্থান করা প্রয়োজন...এই সম্ভাব্যতাকে বিবেচনায় আনা আবশ্যক যে, ইরাকে আমরা আমাদের লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হব এবং এই পথে হাঁটলে বিশ্বাসযোগ্যতার ক্ষেত্রে এর চেয়েও ভয়াবহ ক্ষতির সম্মুখীন হব।' তিনি আরও বলেন—'বিদ্রোহের ভিত্তিগত অস্থিতিশীল প্রভাবটি অপ্রমাণিত এবং তিনি পরামর্শ দেন যে, ইরাককে কোনোরূপ বহিঃহস্তক্ষেপ ব্যতীত শান্তিপূর্ণভাবে বিকশিত হতে দেওয়াকে মেনে নেওয়া উচিত।'

২০০৫ সালের মে মাসে 'ওয়াশিংটন পোস্ট' প্রতিবেদন প্রকাশ করে যে, পেন্টাগন ইরাকে চারটি বৃহৎ বিমান ঘাঁটি নির্মাণের পরিকল্পনা করছে। দক্ষিণে তাল্লিল, পশ্চিমে আল-আসাদ, কেন্দ্রে বালাদ এবং উত্তরে ইরলিব অথবা কাইয়ারাহ। পত্রিকায় আরও উল্লেখ করা হয় যে, এই প্রতিটি সুরক্ষিত কৌশলগত চক্রনাভিতে বিমান এবং এর কর্মীবৃন্দ ছাড়াও বৃহৎ সৈন্যদল উপস্থিত থাকবে।

---

[১] James Sterngold, 'Casualty of War: the US Economy, The San Francisco Chronicle, 17 July 2005.

২০০৫ সালের জানুয়ারি মাসে এতে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল যে, পেন্টাগন ইরাকে একটি স্থায়ী সামরিক যোগাযোগ সিস্টেমের পরিকল্পনা প্রণয়ন করছে। এসব কিছু অদূর ভবিষ্যতে ইরাক থেকে পূর্ণাঙ্গ মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের বিষয়টিতে গুরুতর সন্দেহের জন্ম দেয়। যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরাক থেকে তাদের সেনাদের প্রত্যাহার করে নেয় এবং ইরাকিরা তাদের নিজস্ব প্রশাসনিক সমাধান নিজেরাই করে নেয়; তবে জিহাদি গোষ্ঠীসমূহ তাদের হলমার্ক-হত্যা এবং অঙ্গহানি করার অজুহাত থেকে বঞ্চিত হবে। একটি ঐক্যবদ্ধ ইরাক থেকে তাদের সরে আসতে হবে যেমনটা তারা বসনিয়া থেকে সরে এসেছিল; কারণ একটি উদীয়মান জাতিরাষ্ট্রে তাদের কোনো ভূমিকা থাকে না। এই ক্ষেত্রে এটাই সম্ভাব্য যে, ইরাক থেকে অভিজ্ঞ এবং সুপ্রশিক্ষিত অসংখ্য জিহাদি তাদের নিজেদের সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করার জন্য ঘরে ফিরে আসবে। এটি আফগান যুদ্ধের পরও ঘটেছিল এবং তারা আলজেরিয়া, মিশর এবং সৌদি আরবে দুর্নীতিগ্রস্ত ও স্বেচ্ছাচারী শাসন ব্যবস্থারসমূহের বিরুদ্ধে বৈরিতাকে পুনঃপ্রজ্বলিত করেছিল এবং তাদেরকে অস্থিতিশীল করে হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছিল। ইরাক ফেরত মুজাহিদরা তাদের ঘরেও ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করতে পারবে, কারণ বহু আরব ইরাকে মার্কিন সেনাদের বিরুদ্ধে লড়াইকে একটি নৈতিক দায়িত্ব হিসেবেই দেখে।

বিশেষ করে সৌদি আরবের জন্য ইরাক ফেরত স্বদেশি জিহাদি সন্তানদের নিয়ে ব্যাপক ভীতির কারণ রয়েছে। সৌদি আরবে জঙ্গি হামলার হুমকি ইতিমধ্যেই অশোধিত তেলের দাম বৃদ্ধি করে দিয়েছে এবং ইরাকে প্রতিনিয়ত প্রতিরোধ যোদ্ধাদের কর্তৃক তেলের পাইপ লাইন এবং ট্যাংকারে হামলা তেলের দাম রেকর্ড পরিমাণ বৃদ্ধি করেছে। ২০০৪ সালের মে মাসে জর্জ ডব্লিউ বুশ মন্তব্য করেন—'বিদেশি তেলের ওপর আমাদের নির্ভরতা অনেকটা আমেরিকান স্বপ্নের ওপর বিদেশি শুল্কের মতন' এবং তিনি ঘোষণা করেন 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অতি দ্রুত শক্তির বিকল্প উৎস খুঁজে বের করা প্রয়োজন।'

যতদিন পর্যন্ত এই দখলদারি চলমান থাকবে, বৈশ্বিকভাবে সংঘটিত এই প্রতিরোধ গজাতেই থাকবে। ইরাক এবং আফগানিস্তানে মার্কিন এবং তাদের মিত্রদের সামরিক হস্তক্ষেপ বৈশ্বিকভাবে অভূতপূর্ব বিরোধিতায় প্রতিফলিত হয়েছে। মাদ্রিদ এবং লন্ডনে বোমা হামলা ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইরাক আগ্রাসনে স্প্যানিশ এবং ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক সামগ্রিক সহায়তার সরাসরি পাল্টা জবাব। এসব হামলাসমূহের ক্ষেত্রে প্রথমে হুমকি দেওয়া হয়েছিল এবং এরপর তা বাস্তবায়ন করা হয়েছিল।

আল-কায়েদার কার্যপ্রণালির একটি নির্মম কার্যকারিতা বিদ্যমান, যেটা জঙ্গিগোষ্ঠীগুলোর ক্ষেত্রে একেবারে নতুন সংযোজন। লন্ডনের সাক্ষী হওয়া অনন্য

রোয়া জিহাদি যুবকরা পশ্চিমাদের জন্য একটি নতুন আতঙ্ক, যেটা তাদের পক্ষে হজম করা অসম্ভব। যেকোনো সরকার কর্তৃক মার্কিন আগ্রাসনের অব্যাহত সহযোগিতা কেবল এই নৈরাশ্য, উন্মত্ততা এবং ঘৃণার মাত্রাকে আরও বাড়িয়েই তুলবে এবং এগুলো চরম সহিংসতা উৎপাদন করতে থাকবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই আল-কায়েদা, অন্যান্য জিহাদি গোষ্ঠী এবং এরূপ কার্যক্রমে অংশগ্রহণে ইচ্ছুকদের জন্য ইরাকে একটি যথাযথ প্রশিক্ষণ ভূমি তৈরি করে দিয়েছে। অস্ত্রশস্ত্র, টাকাকড়ি, সহচর এবং প্রশিক্ষক সবই ইরাকে বিদ্যমান রয়েছে। সেখানে আরব মুজাহিদরা কোনো ভাষাগত প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীনও হচ্ছে না, যেমনটা তারা আফগানিস্তানে সম্মুখীন হয়েছিল; কারণ সেখানকার সবাই পশতু বলত। এ ছাড়াও সেখানে খুব সামান্যই সাংস্কৃতিক ভিন্নতা বিদ্যমান রয়েছে। ঠিক যেমনটা আল-কায়েদার জন্য তালেবানরা সহানুভূতিশীল নিমন্ত্রণকর্তারূপে ছিল, ঠিক তেমনই ইরাকি বেসামরিক নাগরিকরাও প্রতিরোধ যোদ্ধাদেরকে নিরাপদ আশ্রয়, টাকাকড়ি এবং সামরিক সরঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে। এই সুরক্ষা ব্যতীত তারা নিরাপত্তা বাহিনীকে এড়ানো অথবা টিকে থাকতে পারত না। তারাও আল-কায়েদা এবং অন্যান্য জিহাদি গোষ্ঠীসমূহের জন্য একটি কমন শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নতুন মিত্র হিসেবে প্রতিপন্ন হয়েছে। ইসলামি এবং আরব জাতীয়তাবাদের এই নতুন এবং মারাত্মক সমাহার—যেটা আমরা বর্তমান ইরাকে প্রত্যক্ষ করছি—এই অঞ্চলে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখতে পারে।

ইরাকের বর্তমান পরিস্থিতির সবচেয়ে সম্ভাব্য পরিণতি হলো সুন্নি যোদ্ধাদের সঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠ শিয়াদের একটি রক্তাক্ত সাম্প্রদায়িক যুদ্ধের আবির্ভাব। আল-কায়েদার ঘনিষ্ঠসূত্র আমাকে জানিয়েছে যে, এটিই আল-জারকাভি এবং আল-কায়েদা নেতৃবর্গ কামনা করে। আল-কায়েদা কেবল শিয়াদেরকে ধর্মদ্রোহী হিসেবেই গণ্য করে না, অধিকন্তু তারা তাদেরকে দখলদার বাহিনীর সহযোগিতার জন্যও অভিযুক্ত করে। আপাতত সুন্নি জিহাদিস্ট এবং মুকতাদা আল-সদরের মধ্যে একটি শান্তিচুক্তি বিদ্যমান রয়েছে। তবে আল-সদরের লোকেদের মূলত আরব এবং ইরানের সাথে কোনো সংযোগ নেই। অন্যদিকে গ্র্যান্ড আয়াতুল্লাহ আল-সিস্তানি এবং আবদুল হাকিমের দল মূলত ফার্সি শিয়াদের দ্বারা গঠিত এবং তারা ইরানের সমর্থনপুষ্ট। ২০০৫ সালের ২৫ আগস্ট সদরের মাহদি আর্মি এবং হাকিমের বদর ব্রিগেড একটি মারাত্মক সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে এবং এতে একজন নিহত এবং তেরো জন আহত হয়। শিয়াদের মধ্যে জাতিগত পার্থক্যের ভিত্তিতে একটি ফাটল সৃষ্টিকে প্ররোচিত করার জন্যও আল-জারকাভির একটি নিজস্ব কৌশল বিদ্যমান, যাতে করে তিনি তাদের সহজেই পরাভূত করতে পারেন। ইরাকে সুন্নিরা সংখ্যালঘিষ্ঠ এবং আল-কায়েদা মনে করে একটি সাম্প্রদায়িক যুদ্ধ

আশেপাশের দেশ থেকে তাদের সহায়তায় মুজাহিদদের আনয়ন করে এই অঞ্চলের জিহাদকে আরও সম্প্রসারিত করবে। সুন্নিরা তুরস্ক, সৌদি আরব, সিরিয়া এবং জর্ডানে সংখ্যাগরিষ্ঠ। আমি বিশ্বাস করি, আল-কায়েদা সিরিয়াতে একটি মার্কিন হস্তক্ষেপকে আরও স্বাগত জানাবে, কারণ সেখানে জিহাদের সম্প্রসারণ মুজাহিদদেরকে তাদের আরেকটি প্রধান শত্রু ইসরাইলের নিকটবর্তী করে দেবে।

পরিহাস্যকরভাবে মার্কিন বৈদেশিক নীতি এবং ইরাক ও আফগানিস্তানে সামরিক হস্তক্ষেপ থেকে সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়েছে তাদেরই দীর্ঘদিনের কৌশলগত শত্রু—ইরান। আফগানিস্তানে মার্কিনিরা শিয়া ইরানের ধর্মীয় শত্রু (সুন্নি) তালেবানকে ক্ষমতাচ্যুত করেছে। অন্যদিকে ইরাকে তারা ইরানের ধর্মনিরপেক্ষ শত্রু সাদ্দাম হুসাইনকে উৎখাত করেছে। অধিকন্তু ইরাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জড়িত হয়ে পড়ার কারণে সকলের অলক্ষ্যে তারা নিজেদের সামরিক এবং পারমানবিক সক্ষমতাকে উন্নীত করার মাধ্যমে নিজেদের ফায়দা হাসিল করছে এবং হঠাৎ করেই একটি আঞ্চলিক পরাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। ইরান এই দুটি মুখ্য বিজয় একটিমাত্র বুলেট না খরচ করেই এবং কোনো সৈন্য না হারিয়েই অর্জন করেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কার্যকরীভাবে ইরাককে একটি সোনার প্লেটে করে ইরানের সম্মুখে হাজির করেছে। ইরাকের প্রেসিডেন্ট তালাবানি ইরাক-ইরান যুদ্ধের সময় ইরানের ঘনিষ্ঠ মিত্র ছিল।

প্রধানমন্ত্রী এবং নতুন ইরাকি সরকারের অসংখ্য মন্ত্রী ইরানিয়ান 'রেভ্যুলেশনারি গার্ড' কর্তৃক প্রশিক্ষিত এবং অর্থায়িত হয়েছিল। SCIRI নেতা আল-হাকিমের বদর ব্রিগেডের সদর দপ্তর মার্কিন আগ্রাসনের পূর্বে ইরানে অবস্থিত ছিল। ইরাকে মার্কিন রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার পেছনের কলকাঠি গ্র্যান্ড আয়াতুল্লাহ আল-সিস্তানি ইরানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এর সবকিছুই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য চরমভাবে সমস্যাপূর্ণ। ইরাকের অভ্যন্তরে ইরানের এই শক্তিশালী প্রতিপত্তি—প্রকৃতপক্ষে যে সরকারকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃষ্ঠপোষকতা করছে, যদি আমেরিকা এবং ইসরাইল ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচিকে সামরিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে নিশ্চিহ্ন করে নিতে চায়—তবে তাদেরকেও হিসাবে রাখতে হবে।

ভবিষ্যতে যাই ঘটুক না কেন, একটি বিষয় সুনিশ্চিত। ইরাক আগ্রাসন প্রবলভাবে শক্তিশালী, প্রণোদিত এবং চাঙ্গা আল-কায়েদার জন্য তাদের নিদারুণ প্রয়োজনীয় নিরাপদ আশ্রয় এবং প্রশিক্ষণস্থলের জোগানকে সুনিশ্চিত করেছে এবং সমগ্র বিশ্বজুড়েই হাজার হাজার জিহাদি এবং সম্ভাব্য জিহাদিকে সক্রিয় করেছে, যারা এরূপ নির্মম এবং বিধ্বংসী সহিংসতা তৈরিতে সক্ষম—যেগুলো

আমরা নিউইয়র্ক, মাদ্রিদ, লন্ডন এবং অন্যত্র প্রত্যক্ষ করে যাচ্ছি এবং নিন্দা জানাচ্ছি।

পুনশ্চ[১]

প্রেসিডেন্ট বুশ কর্তৃক লড়াইয়ের সমাপ্তি ঘোষণার চার বছরেরও অধিক সময় পেরিয়ে গেছে এবং ইরাক বর্তমানে একটি গৃহযুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। ২০০৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সামাররায় অবস্থিত গোল্ডেন মসজিদে বোমা হামলা চালানোর পর থেকে শুরু করে সুন্নি ও শিয়াদের মধ্যে যে রক্তাক্ত সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের সূত্রপাত ঘটেছিল, সেটা আরও ঘনীভূত হচ্ছে। উক্ত হামলাটি প্রয়াত আবু-মুসআব আল-জারকাভির সুচিন্তিত স্ট্র্যাটেজির অংশ ছিল এবং তার মৃত্যুর পর থেকে এই সংঘাত আরও মারাত্মক হয়ে উঠেছে। অধিকন্তু, এখানে যদি ইরান, সৌদি আরব, মিশর, সিরিয়া এবং জর্দানের মতো অন্যান্য দেশ জড়িত হয়ে পড়ে তবে এই সংঘাত সমগ্র অঞ্চলজুড়েই ছড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

২০০৫ সালের ডিসেম্বর মাসের সংসদ নির্বাচনের পর ওয়াশিংটন কর্তৃক সমর্থিত এবং প্রতিপালিত দাম্ভিক 'ন্যাশনাল ইউনিটি গভর্নমেন্ট' বর্তমানে ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে এবং তীব্র সাম্প্রদায়িক প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে এর ভিত্তি প[...] গেছে। ২০০৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে স্বায়ত্তশাসিত নিরীক্ষক 'গভর্ন[...] অ্যাকাউন্টিবিলিটি অফিস' আল-মালেকির সরকার কর্তৃক ১৮ টির মধ্যে ১৫ মানদণ্ড পূরণ করতে ব্যর্থ হওয়ায় একে অকার্যকর ঘোষণা করে।

ইরানের সাম্প্রতিক পারমাণবিক সংকটের প্রাক্কালে ন্যাশনাল ইউনিটি গভর্নমেন্টের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব এবং ইরানের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যুক্তরাষ্ট্রের জন্য একটি নতুন এবং অপ্রত্যাশিত উভয়সংকট উপস্থাপন করেছে। যেখানে আমেরিকা একসময় ইরান আক্রমণ করার জন্য বশীভূত ইরাককে একটি স্প্রিংবোর্ড হিসাবে ব্যবহারের আশায় ছিল, তারাই এখন তাদের ১,৪০,০০০ সৈন্যকে ইরান কর্তৃক একদিকে এবং ইরাকের অভ্যন্তরীণ ইরান সমর্থিত মিলিশিয়া কর্তৃক (একটি নতুন চমক হিসেবে এই পক্ষে মুকতাদা আল-সদরের মাহদি ব্রিগেডও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে) আরেকদিকে বেকায়দায় আবিষ্কার করেছে। ইরানীরা কার্যকরভাবে ইরাকের অভ্যন্তরে মার্কিন মিত্রদের বিরুদ্ধে এক ক্ষয়কারী যুদ্ধ চালাচ্ছে। প্রায় চার মাস ধরে বাহ্যত অবরোধ এবং সার্বক্ষণিক রকেট ও মর্টার হামলার কারণে ২০০৭ সালের সেপ্টেম্বরের শুরুতে ব্রিটিশ সেনারা বসরা থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়। ন্যাশনাল গার্ড এবং নিরাপত্তা বাহিনীতে কোটি কোটি ডলার ব্যয় করার পর, আমেরিকা ও

[১] এই অংশটি চলমান অধ্যায়ের শেষে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণে সংযোজিত হয়েছে।-সম্পাদক

ব্রিটেন এখন আবিষ্কার করছে যে, যেসব শিয়া মিলিশিয়াদের একসময় তারা প্রশিক্ষিত ও সশস্ত্র করছিল তাদের বন্দুক এবং বোমাই এখন জোট সেনাদের হত্যা করছে। ইরাকে আক্রমণ এমন একটি পরিস্থিতিতে রূপান্তরিত হয়েছে যেটি বাস্তবিকই এই অঞ্চলের মার্কিন স্ট্র্যাটেজির জন্য একটি পাল্টা-আঘাত হিসেবে প্রতিপন্ন হয়েছে।

যদিও শিয়া মিলিশিয়ারা মিত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে এক হয়ে লড়াই করছে, কিন্তু তেল চোরাচালানের নতুন এবং অতিশয় লাভজনক ব্যবসার নিয়ন্ত্রণের জন্য তারা নিজেদের মধ্যেও লড়াইয়ে লিপ্ত। বাস্তবতা হলো, ইরাক বিশ্বের একমাত্র দেশ যার তেল ক্ষেত্রগুলিতে চোরাচালান রোধে কোনো ব্যবস্থা নেই। মোটকথা দেশটি এখন চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলায় পর্যবসিত হয়েছে।

যদিও ২০০৬ সালের জুন মাসে শুরুর দিকে আল-জারকাভির মৃত্যু ইরাকের নিরাপত্তা বাহিনীর জন্য একটি বিজয়ের প্রতিনিধিত্ব করেছিল, কিন্তু অসংখ্য সূত্র এখন পর্যন্ত আমাদের জানিয়েছে যে, আল-কায়েদার নেতৃবৃন্দ তার হঠাৎ অপসারণে স্বস্তি উপভোগ করেছিল—যেহেতু তিনি অনেকটা অনিয়ন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলেন। এখন তাকে নিরাপদে আল-কায়েদার বিখ্যাত নায়কদের তালিকায় স্থাপন করা যেতে পারে এবং আল-কায়েদার ভিডিও এবং সম্প্রচারে তার নাম প্রায়শ উল্লেখ করা হচ্ছে। বাস্তবে আইমান আল-জাওয়াহিরি ও ওসামা বিন লাদেন ২০০৫ সালের নভেম্বর মাসে জর্ডানের পশ্চিমা মালিকানাধীন হোটেলগুলিতে আল-জারকাভির প্ররোচিত হামলায় মারাত্মক অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন বলে জানা গেছে। র‍্যাডিসন হোটেল হামলায় হতাহতদের অধিকাংশই ছিল জর্ডানের নাগরিক, যারা সেখানে একটি বিবাহ অনুষ্ঠানে আগমন করেছিল। এই নৃশংসতা সেদেশে আল-কায়েদার সুনাম ও আবেদনকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

২০০৬ সালের ২৫ এপ্রিল আল-জারকাভি কর্তৃক প্রকাশিত ভিডিওতে আল-কায়েদার অন্যান্য নেতাদের মতো নিজ নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে যেসব সতর্কতা অবলম্বন করা হয়ে থাকে, সেগুলোর কোনোটিই প্রদর্শীত হয়নি। যেটা এই সংকেত প্রদান করে যে, তিনি স্বাধীনভাবে কাজ করছিলেন অথবা তিনি যথাযথ পরামর্শ পাচ্ছিলেন না। এবং সম্ভবত এটাই বাস্তব। আল-জারকাভি উক্ত ভিডিওতে অ্যারাবিয়ান র‍্যাম্বোর[১] মতো উপস্থিত হয়ে মরুভূমিতে মেশিনগান নিয়ে এলোপাতাড়ি গুলি ছুড়েছিলেন। মার্কিন গোয়েন্দাদের জন্য তাদের প্রযুক্তিগত

---

[১] 'র‍্যাম্বো' ডেভিড মোরেলের উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত একটি আমেরিকান অ্যাকশন চলচ্চিত্র সিরিজ। এর প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছেন মার্কিন অভিনেতা সিলভেস্টার স্ট্যালোন। এখন পর্যন্ত এ সিরিজের চারটি চলচ্চিত্র মুক্তি পেয়েছে।-অনুবাদক

উৎকর্ষতার সহায়তায় উক্ত স্থানকে ভৌগোলিকভাবে চিহ্নিত করতে খুব একটা অসুবিধা হয়নি। ছয় সপ্তাহেরও কম সময় পর, তিনি তার আস্তানায় একটি মার্কিন অভিযানে নিহত হন।

আল-জারকাভির মৃত্যু এই প্রতিরোধ যুদ্ধকে মোটেই শিথিল করেনি, বরং বাস্তবে ইরাক পূর্বের চেয়ে অধিকতর সহিংসতায় গভীরভাবে জড়িয়ে রয়েছে। আমি পুরোপুরিভাবে মনে করি, আল-জারকাভির মৃত্যুতে ইরাকে আল-কায়েদার উপস্থিতি এখন আরও বেশি এবং আরও সক্রিয় হয়ে উঠবে। এটা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, মৃত 'শহিদ' আল-জারকাভি একজন অনুপ্রেরণীয় ব্যক্তিত্ব এবং একটি আকর্ষিক রিক্রুটিং টুল হয়ে উঠেছে। যদিও আল-জারকাভি ধারণা করেছিলেন, তিনি ইরাকি জনগণের পক্ষে বক্তব্য রাখছেন কিন্তু তার কর্মকাণ্ড অসংখ্য সম্ভাব্য ইরাকি রিক্রুটদের বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। সংগঠনটির এই সমস্যাটি আবু হামজা আল-মুহাজিরের নিয়োগ দ্বারাও কাটিয়ে ওঠা যায়নি, যিনি আল-জাওয়াহিরির মতোই একজন মিশরীয় নাগরিক এবং আল-কায়েদায় যোগদানের পূর্বে ইজিপশিয়ান ইসলামিক জিহাদের সদস্য ছিলেন। ২০০৬ সালের অক্টোবর মাসে ইরাকি নাগরিক আবু ওমর আল-বাগদাদির নেতৃত্বে 'ইসলামিক স্টেট অফ ইরাক' গঠন এই প্রতিবন্ধকতাকে অপসারণ করেছে।

সপ্তম অধ্যায়

আল-কায়েদা ইন ইসলামিক মাগরেব

আল-কায়েদা ইন ইসলামিক মাগরেব

'এটি আমেরিকান শত্রুদের কাছে একটি চ্যালেঞ্জ। আমরা এটি জানিয়ে দিচ্ছি যে আমরা বিশ্বের যে কোনও জায়গায় উপনীত হতে সক্ষম।'

—আল-কায়েদার বিবৃতি, নভেম্বর ২০০২

মিশর, লেবানন, গাজা এবং উত্তর আফ্রিকায় নতুন নতুন শাখা খুলে সম্প্রতি আল-কায়েদা একটি বহুজাতিক কর্পোরেশনের মতো প্রতিনিয়ত প্রসারিত হয়েই যাচ্ছে। সর্বশেষটি বিভিন্ন কৌশলগত কারণে পশ্চিমাদের কাছে সবচাইতে উদ্বেগজনক। আলজেরিয়া-ভিত্তিক এই নতুন শাখা—'আল-কায়েদা ইন ইসলামিক মাগরেব' বা AQIM। আফ্রিকার একটি বিস্তৃত অঞ্চলের প্রবেশদ্বার স্বরূপ ভূমধ্যসাগরের কেবল একটি সংকীর্ণ প্রণালি ইউরোপের মূল ভূখণ্ড থেকে এই অঞ্চলটিকে পৃথক করে রেখেছে। মাগরিবের উত্তরাঞ্চলীয় পাহাড়ি ভূখণ্ডও তোরাবোরার অনুরূপ প্রশিক্ষণ শিবির এবং গুপ্ত আশ্রয়ের সুযোগ প্রদান করে (বিন লাদেন প্রায়শ আটলাস পর্বতমালার সুযোগ-সুবিধার দীর্ঘ বয়ান করেন) এবং AQIM দক্ষিণস্থ প্রত্যন্ত, জনশূন্য সাহারা মরুভূমি এবং পার্শ্ববর্তী দেশগুলির সাথে লাগোয়া সীমানাসমূহ পরিপূর্ণভাবে নিজেদের কাজে লাগাতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্রমশ প্রাকৃতিক সম্পদের (তেল ও গ্যাস) অধিকতর নির্ভরযোগ্য উৎস হিসাবে অস্থিতিশীল মধ্যপ্রাচ্যের চাইতে আফ্রিকার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করছে। এই অঞ্চলে AQIM এর শক্তিশালী উপস্থিতি তাদের এই এজেন্ডার জন্য হুমকিস্বরূপ।

সংগঠনটি আরও প্রমাণ করে যে কীভাবে 'হৃদয় ও মন' জয় করে নেওয়ার মার্কিন অভিযান ব্যর্থ হয়েছে এবং তাদের স্থানীয় এজেন্ডা উন্নীত হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে প্রধানতম শত্রু এবং স্থানীয় সরকারগুলিকে উক্ত অঞ্চলে মার্কিনীদের এজেন্ট হিসাবে স্থান দিয়েছে। ইসলামপন্থি দলগুলি এবং বিশেষত আল-কায়েদা—মার্কিন বৈদেশিক নীতির লক্ষ্যসমূহের প্রতি অনমনীয় বিরোধিতার কারণে মুসলিমবিশ্বে ক্রমবর্ধমানভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করছে। 'প্রোগ্রাম অন ইন্টারন্যাশনাল পলিসি অ্যাটিটিউডস' কর্তৃক ২০০৭ সালের এক প্রতিবেদনে উঠে আসে যে, মিশর, ইন্দোনেশিয়া, মরক্কো এবং পাকিস্তানের ৮০ শতাংশ মানুষ (সাম্প্রতিক দশকসমূহে আমেরিকার সাথে ভালো কূটনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে এমন দেশসমূহ) বিশ্বাস করে যে, আমেরিকা মুসলিমবিশ্বকে দুর্বল এবং বিভক্ত করার

চেষ্টা করছে। প্রধান তদন্তকারী স্টিভেন কুল এই রায় দেন যে, 'মুসলিমবিশ্বের জনগণ পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইসলামের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে।' তিনি আরও যোগ করেন—'এসব আমেরিকা-বিরোধী মনোভাবসমূহ মুসলিমবিশ্বে আল-কায়েদার বিকাশ, বিস্তার ও কার্যক্রমকে সহজতর করেছে।'[১]

২৪ জানুয়ারি ২০০৭ এ আবদুল মালেক দ্রোকদাল (আবু মুসআব আবদুল ওয়াদুদ নামেও পরিচিত), 'আলজেরিয়ান সালাফিস্ট গ্রুপ ফর প্রিচিং অ্যান্ড কমব্যাট (GSPC)' এর আমির আনুষ্ঠানিকভাবে একিউআইএম (AQIM) গঠনের ঘোষণা করেন এবং তিনিই এর আমির নির্বাচিত হন। মাগরেব পাঁচটি দেশ নিয়ে গঠিত। যথা—মরোক্কো, আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া, লিবিয়া এবং মৌরিতানিয়া। ড. আইমান আল-জাওয়াহিরি আল-কায়েদাকে ইজিপশিয়ান আল-জামাআহ আল-ইসলামিয়া (EGI) এর সাথে একইরূপ একীকরণের ঘোষণা দেওয়ার ঠিক এক মাস পরে, ২০০৬ সালের ১১ সেপ্টেম্বর উপরোক্ত দু'পক্ষের একীকরণের ঘোষণা দিয়েছিলেন। ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া মোটেই অযৌক্তিক নয় যে, আল-জাওয়াহিরিই ব্যক্তিগতভাবে সাম্প্রতিক সময়ের নতুন মৈত্রীতার এই স্ফীতির তদারকি ও সমন্বয় করেছেন, যা নাটকীয়ভাবে আল-কায়েদার উপস্থিতিকে প্রসারিত করেছে।

একিউআইএম এর গোড়াপত্তনের পর থেকেই অতীব সক্রিয়; যাদের কার্যকলাপের মধ্যে রয়েছে আলজেরিয়াতে দুটি শক্তিশালী বোমা হামলা (আলজিয়ার্স এবং কাবিলিয়ায়), মরক্কো এবং তিউনিসিয়ায় ব্যর্থ অথবা বানচাল হয়ে যাওয়া বড় বড় কিছু হামলা; এবং সমগ্র অঞ্চলজুড়েই পুলিশ, সিক্রেট সার্ভিস, সেনাবাহিনী এবং সীমান্তরক্ষীদের সাথে ঘন ঘন বন্দুক যুদ্ধ। উত্তর আফ্রিকার যোদ্ধাদের যুদ্ধাংদেহী মনোভাব এবং ঔপনিবেশিকদের বিরুদ্ধে সফল লড়াইয়ের সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে; এই ঐতিহ্য এবং আল-কায়েদার উদ্দীপনা এবং উস্কানির মিলিতরূপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, উক্ত অঞ্চলে তাদের প্রকল্প এবং এর মিত্রদের প্রতি একটি সত্যিকারের হুমকি ধারণ করে। আলজেরিয়ায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ তেলের মজুদ রয়েছে এবং তারা বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুদের অধিকারী। তাই এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই যে, পেন্টাগন আফ্রিকা ভিত্তিক একটি নতুন মিলিটারি কমান্ড আফ্রিকম প্রতিষ্ঠার জন্য এত তৎপরতা কেন প্রদর্শন করছে। এই প্রকল্পের জন্য কোনো (আলজেরিয়া ও লিবিয়াকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল) পৃষ্ঠপোষক দেশ পাওয়ার জন্য কূটনৈতিক প্রচেষ্টাসমূহ এখনও পর্যন্ত ব্যাপক

---

[১] www.usnews.com/usnews/news/articles/070523/23muslims.htm.

বৈরিতার মুখোমুখি হয়েছে।[১] মরোক্কো, সেনেগাল বা দক্ষিণ আফ্রিকাকেও বাধ্য করা হতে পারে, এবং পেন্টাগন বলছে ২০০৮ সালের শেষ দিকে আফ্রিকম[২] নিজ কার্যক্রম শুরু করতে পারবে।

১৯৮৮ সালে আল-কায়েদার গোড়াপত্তনের পর থেকেই উত্তর আফ্রিকানরা এই সংগঠনটির একটি প্রধানতম উপাদান এবং তারা তাদের নিজস্ব দেশসমূহ এবং ইউরোপেও বিভিন্ন সম্বন্ধযুক্ত (inter-connected) সেলের একটি নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করেছে, যেখানে তারা তাদের ঔপনিবেশিক অতীত-অভিজ্ঞতার কারণে তুলনামূলক স্বাচ্ছন্দ্যে পরিযান করতে পারে (এই বিষয়টি 'আল-কায়েদা ইন ইউরোপ' অধ্যায়ে বৃহত্তর পরিসরে আলোচনা করা হয়েছে)। ইউরোপে গমন করে উত্তর আফ্রিকান জিহাদিরা তাদের সহকর্মী দেশবাসীকে উগ্রপন্থি করে তোলে এবং তাদেরকে ইউরোপের অভ্যন্তরে আক্রমণ অথবা ইরাক যুদ্ধের জন্য নিয়োগ দেয়। আলজেরিয়ার জিএসপিসি (GSPC) এমনকি কানাডাতেও তাদের নেটওয়ার্ক বিস্তৃত করতে সক্ষম হয়েছে, যেখানে কর্তৃপক্ষের কাছে ২০০৫ সালের নভেম্বরে তাদের পৃষ্ঠোপোষিত একটি সেল আটক হয়েছিল।

যেমনটি আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি—প্যান-ইসলামিক (সুন্নি) গ্লোবাল ফ্রাঞ্চাইজির বিকাশ আল-কায়েদার লংটার্ম স্ট্র্যাটেজির মৌলিক বুনিয়াদ। মাগরেব প্রসঙ্গে, 'আরব মাগরেব' এর বিপরীতে নতুন উপাধি 'ইসলামিক মাগরেব' এর ওপর জোরদান, পর্বতমণ্ডিত কাবিলিয়ান অঞ্চলে বারবার সম্প্রদায়ের অন্তর্নিবেশ এবং সংহতি একে সত্যায়িত করে। তাদের আঞ্চলিক সরকারগুলির প্রতি বৈরী অনুভূতি ধারণ করার স্বাভাবিক কারণ রয়েছে, যেই সরকারগুলো প্রায়শ তাদের বিরুদ্ধে পক্ষপাত এবং বৈষম্যমূলক আচরণ করে থাকে। বারবাররা ভয়ংকর ও চৌকস যোদ্ধা হিসাবে পরিচিত এবং ১৯৬২ সালে ফরাসিদের বিরুদ্ধে 'ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট' (FLN) এর বিজয়ে তাদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল; তারা বর্তমানে AQIM এর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানে পরিণত হয়েছে।

একিউআইএম গঠন কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং একটি সাবধানী সুশৃঙ্খল অভিযানের সর্বশেষ পদক্ষেপ, যা আফ্রিকা মহাদেশের বেশিরভাগ অঞ্চলে আল-

[১] ইউনাইটেড স্টেট আফ্রিকা কমান্ড বা 'আফ্রিকোম' মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরের এগারোটি ইউনিফাইড কমব্যাটান্ট কমান্ডস এর একটি। আফ্রিকা অঞ্চলে আঞ্চলিক দ্বন্দ্ব নিরসনসহ সেখানে কোনো সামরিক অভিযান এবং ৫৩টি আফ্রিকান দেশের সাথে সামরিক সম্পর্ক বজায় রাখার উদ্দেশ্যে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মিশর ব্যতিত—যেটি কিনা ইউনাইটেড স্টেইটস সেন্ট্রাল কমান্ড এর অধীন—আফ্রিকা মহাদেশের সকল দেশ এর অন্তর্ভুক্ত। ২০০৭ সালের ১ অক্টোবর এটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ২০০৮ সালের ১ অক্টোবর থেকে এটি কার্যক্রম শুরু করে। এর সদর দপ্তর জার্মানির স্টুটগার্টে অবস্থিত।

[২] Simon Tisdall, 'Africa United in Rejecting US Request for Military HQ', The Guardian, 26 June 2007.

কায়েদার প্রভাব বিস্তারকে দৃষ্টিগোচর করাচ্ছে। তাই আমি মাগরেবের দিকে মনোনিবেশ করার আগে বাকি মহাদেশের পরিস্থিতিকে সংক্ষেপে বিবেচনা করব।

আফ্রিকার অন্যান্য অংশে আল-কায়েদা

আফ্রিকা মহাদেশের সাথে আল-কায়েদার যোগাযোগ দীর্ঘস্থায়ী এবং এর মূল অত্যন্ত গভীরে প্রোথিত। ড. আইমান আল-জাওয়াহিরিসহ আল-কায়েদার অনেক শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্বই মিশর থেকে এসেছেন। ওসামা বিন লাদেন নিজেও ১৯৯১ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৯৬ সালের মে মাস পর্যন্ত সুদানে ছিলেন এবং তার সংগঠনের অসংখ্য যোদ্ধা মাগরেব অঞ্চল থেকে উত্থিত হয়েছে। সুদানে তার ঘাঁটি থেকেই ওসামা বিন লাদেন আফ্রিকা-ভিত্তিক ইসলামপন্থি গোষ্ঠীগুলির সাথে যোগাযোগ স্থাপন শুরু করেছিলেন। এর ৩০০ মিলিয়ন মুসলিম সহকারে —যাদের বহুসংখ্যক যুদ্ধ ও রোগব্যাধির কবলে পড়ে শোচনীয় দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করে—আফ্রিকা ইসলামপন্থি দলগুলির জন্য একটি উর্বর রিক্রুটিং গ্রাউন্ড; অধিকন্তু এর অরাজকতা, যা এর এই মহাদেশের বেশিরভাগ অঞ্চলজুড়ে বিরাজমান এবং এর সাথে সর্বত্র ছিদ্রযুক্ত সীমানা মিলিত হয়ে এটিকে অশনাক্তযোগ্য গেরিলা ক্রিয়াকলাপগুলির জন্য একটি আদর্শ পরিবেশ সরবরাহ করেছে। এ ছাড়া, স্নায়ুযুদ্ধের প্রাক্কালে সিআইএ আফ্রিকায় তাদের গোয়েন্দা কার্যক্রমকে ছাটাই করে একেবারে ন্যূনতম পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল—যা একাংশে এই মহাদেশে জিহাদি তৎপরতার বিস্তারকে এবং কেন আমেরিকা আফ্রিকাজুড়ে ইসলামিজমের ত্বড়িৎ বৃদ্ধির পূর্বাভাস দিতে ব্যর্থ হয়েছে তার ব্যাখ্যা দেয়।

২০০১ সালের নভেম্বর মাসে তোরাবোরায় আফগান-আরব ঘাঁটিগুলিতে মার্কিন বোমা হামলার পর অসংখ্য মুজাহিদ স্বদেশে ফিরে যেতে না পেরে আফ্রিকা চলে গিয়েছিল। আফ্রিকা মহাদেশে ব্যাপক বিস্তৃত আল-কায়েদার উপস্থিতির ভিত্তি ইতিমধ্যেই আবু উবায়দা আল-বানশিরির নেতৃত্বে পরিচালিত একটি নিরলস রিক্রুটমেন্ট ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে প্রস্তুত ছিল, যিনি ১৯৯৬ সালের মে মাসে ভিক্টোরিয়া হ্রদে একটি ফেরি দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিলেন। প্রসংগত, আল-বানশিরি আজও জিহাদি সার্কেলে অন্যতম উঁচুমানের শহিদ মুজাহিদ হিসেবে বিদিত ও অভিনন্দিত। কবি-মুজাহিদ মালয় মোহেব আল-কান্দাহারির 'টিয়ারস ইন দ্য আইজ অফ টাইম' কবিতায় তার প্রতি সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়েছিল, যেটি আল-জাওয়াহিরি ২০০৪ সালের জানুয়ারি মাসে একটি ইন্টারনেট সম্প্রচারে আবৃত্তি করেছিলেন।[১]

---

[১] Reference to this can be found in English on the CNN website, at www.cnn.com/2006/WORLD/meast/01/20/zawahiri.tape/index.html.

পশ্চিম আফ্রিকার মৌরিতানিয়া, মালি, চাদ এবং নাইজেরিয়াসহ সকল দেশেই আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট অসংখ্য সক্রিয় গেরিলা গ্রুপ রয়েছে। এ ক্ষেত্রে মার্কিন-আল-কায়েদা মঞ্চে নাইজেরিয়া বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ৬০ মিলিয়ন মুসলিম এবং মার্কিন-বান্ধব সরকারের কারণে এটা অবাককর বিষয় নয় যে, বিন লাদেন (আল-জাজিরায় সম্প্রচারিত তার ১১ ফেব্রুয়ারি ২০০৩-এর বিবৃতিতে) একে 'মুক্তির সবচেয়ে প্রয়োজন' দেশসমূহের একটি হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন। বিন লাদেন সেখানে মুসলমানদের আমেরিকা দ্বারা সমর্থিত এসব নিপিড়ীক, স্বৈরাচারী, মুরতাদ শাসকদের দাসত্বের বিরুদ্ধে মুসলিমদের মবিলাইজ তথা একযোগে রুখে দাঁড়াবার আহ্বান জানান।[১] এরপর আসে তেলের বিষয়টি। আমেরিকা সৌদি আরব থেকে আমদানিকৃত তেলের সমপরিমাণ তেল নাইজেরিয়া থেকে আমদানি করে; এর পরিপ্রেক্ষিতে বিন লাদেন তার সাবধানী সুশৃঙ্খল 'ইকোনমিক জিহাদ'কে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে নাইজেরিয়াকেই প্রথম স্থানে রেখেছেন।

হর্ন অফ আফ্রিকায়[২] আল-কায়েদা সোমালিয়ায় সর্বাধিক সক্রিয় রয়েছে, যেটি আফ্রিকা মহাদেশে বিন লাদেনের প্রথম সামরিক হামলার ক্ষেত্র। ১৯৯৩ সালে আমেরিকান হেলিকপ্টার এবং মোগাদিশুতে সেনাবাহিনীর ওপর হামলার ঘটনা এই বইয়ের অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে। বাস্তবিকপক্ষে বিন লাদেনের লোকেরা ১৯৯১ সাল থেকেই সোমালিয়াতে অবস্থান করছিল। তারা সেখানে 'আল-ইত্তেহাদ আল-ইসলামি' (AIAI) এর মতো স্থানীয় ইসলামপন্থি গোষ্ঠীগুলোর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেছিল এবং তাদেরকে এতিমখানা ও স্কুল-সহ অন্যান্য সামাজিক কর্মসূচিতে সহযোগিতা করছিল। ১৯৯৬ এবং ১৯৯৭ সালে আদ্দিস আবাবায় বোমা হামলার জন্য (AIAI) দায়ী ছিল যার রেশ আজও বিদ্যমান।

সোমালিয়ায় ইসলামপন্থি দলগুলি এতটাই শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল যে ২০০৬ সালের জুন মাসে শেখ হাসান দাহির আয়েজের নেতৃত্বে সুপ্রিম 'ইসলামিক কোর্টস কাউন্সিল' সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য মোগাদিশু দখল করে নিয়েছিল; যার সম্পর্কে মনে করা হয় যে, আল-কায়েদার সাথে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। ২০০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ইথিওপিয়ান সেনাবাহিনীর সহায়তায় এই অভ্যুত্থানকে দমন করা হয়। কিন্তু সিআইএ এখনও গোয়েন্দা রিপোর্ট মোতাবেক সোমালিয়াকে হর্ন অফ আফ্রিকায় আল-কায়েদার প্রধান সদর দফতর হিসাবে বিবেচনা করে। সোমালিয়ান

---

[১] Messages to the World: The Statements of Osama bin Laden, p,183.

[২] 'হর্ন অফ আফ্রিকা' আফ্রিকা মহাদেশের পূর্বতম অঞ্চল। এটি ইরিত্রিয়া, ইথিওপিয়া, জিবুতি এবং সোমালিয়া নিয়ে গঠিত। সোমালিয়া উত্তর-পূর্ব দিকে শিঙের আকারে আরব সাগরে প্রসারিত হয়েছে বলে অঞ্চলটির এরকম নামকরণ হয়েছে। কেউ কেউ সুদান ও উত্তর-পূর্ব কেনিয়াকেও এই অঞ্চলের আওতায় রাখতে চান।-অনুবাদক

সরকারি সেনা এবং তাদের ইথিওপীয়ান সামরিক মিত্ররা যে গেরিলা গোষ্ঠীগুলির দ্বারা অবরুদ্ধ, সেসব গোষ্ঠীর মধ্যে আল-কায়েদাও বিদ্যমান (এবং এটি ক্রমবর্ধমান), যেটি সেখানে ইরাকের অনুরূপ বিদ্রোহ পরিচালনার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আল-জাওয়াহিরি ২০০৬ সালের জানুয়ারি মাসে একটি সম্প্রচারে সোমালিয়ান জিহাদিদের ইথিওপিয়ান দখলদারদের বিরুদ্ধে আত্মঘাতী অভিযান চালানোর আহ্বান জানান। এরপর ২০০৭ সালের জুন মাসে প্রধানমন্ত্রী আলি মুহাম্মাদ গেদি একটি আত্মঘাতী হামলার ঘটনায় অল্পের জন্য বেঁচে গিয়েছিলেন, এবং তার বাড়ির বাইরে উক্ত আত্মঘাতী কর্তৃক এগারো জন নিহত হয়। এই সংগঠনটি পূর্ব আফ্রিকার অন্যান্য অঞ্চলগুলিতেও অনুপ্রবেশ করেছে। ১৯৯৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে 'ওয়ার্ল্ড ইসলামিক ফ্রন্ট ফর জিহাদ অ্যাগেইনস্ট জিউস অ্যান্ড ক্রুসেডার' প্রতিষ্ঠার পরপরই নাইরোবি (কেনিয়া) এবং দারুস-সালামে (তানজানিয়া) মার্কিন দূতাবাসে বোমা হামলা ঘটে, যেখানে মোট ২২৪ জন নিহত হয়। সাম্প্রতিক আরও অন্যান্য হামলাসমূহ সেখানে আল-কায়েদার ক্রমাগত বিস্তারের সাক্ষ্যই দেয়। যেমন ২২ নভেম্বর ২০০২ সালে কেনিয়ার ইসরাইলি মালিকানাধীন 'প্যারাডাইজ হোটেলে' তিনজন আত্মঘাতী বোমা হামলা চালায় এবং সেখানে চৌদ্দজন নিহত হয় এবং আশিজন আহত হয়। একই সময়ে একটি ইসরাইলি চার্টার জেট লক্ষ্য করে ছোড়া তাদের সারফেস টু এয়ার মিসাইল তার লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে ব্যর্থ হয়েছিল।

আলজেরিয়ার ইসলামপন্থি গোষ্ঠীসমূহের পটভূমি

এখন পর্যন্ত জোটসংগঠন AQIM এর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো GSPC এবং আল-কায়েদা। এই গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যকার যোগাযোগ বহু বছরের পুরোনো। অভিজ্ঞ আলজেরীয় জিহাদিরা আল-কায়েদার শিবিরে প্রশিক্ষণ নিয়েছিল এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আফগান যুদ্ধে ওসামা বিন লাদেনের লোকদের সাথে মিলে যুদ্ধ করেছিল। আলজেরিয়ায় প্রত্যাবর্তনের পর তারা আর্মড ইসলামিক গ্রুপ (GIA)-সহ বিভিন্ন দেশীয় ইসলামপন্থি আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হয়ে ওঠে এবং এই GIA থেকেই ১৯৯৮ সালে GSPC আত্মপ্রকাশ করে।

GIA বা GSPC এর ইতিহাসটি জটিল ও রক্তাক্ত এবং গণতন্ত্রের দিকে আলজেরিয়ার সংগ্রামের মধ্যে এর সূত্রপাত নিহিত। ১৯৮৯ সালে আলজেরিয়ায় একটি নতুন নির্বাচনী আইন গৃহীত হয়, যার ফলে FLN এবং এর সামরিক সংস্থাপন কর্তৃক বিশ বছর শাসনকার্য পরিচালিত হওয়ার পর রাজনৈতিক দল গঠন এবং অবাধ নির্বাচন অনুমোদনপ্রাপ্ত হয়। সেই বছরই 'ইসলামিক স্যালভেশন ফ্রন্ট' (FIS) গঠিত হয়েছিল এবং ১৯৯০ সালে এটি স্থানীয় নির্বাচনে ৫৫ শতাংশ ভোট

পায়। ১৯৯১ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচনের প্রথম দফায় FIS ২৩২টি আসনের মধ্যে ১৮৮ টিতে জয়লাভ করে এবং তারা দ্বিতীয় দফায় বিপুল ভোটে জয়লাভের প্রত্যাশী ছিল। কিন্তু FLN এর জন্য একটি চূড়ান্ত অবমাননাকর ঘটনা ঘটে এবং তারা মাত্র পনেরোটি আসন লাভ করে। তখন সেনাবাহিনী হস্তক্ষেপ করে নির্বাচন বাতিল করে এবং রাষ্ট্রপতি চাদলিকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করে। নতুন রাষ্ট্রপতি মুহাম্মাদ বৌদিফের সভাপতিত্বে পাঁচ সদস্যের 'হাইয়ার স্টেট কাউন্সিল' ১১ জানুয়ারি, ১৯৯২ এ দায়িত্ব গ্রহণ করে। ছয় মাসেরও কম সময় পর বৌদিফকে তার এক দেহরক্ষী হত্যা করে, যার সাথে ইসলামপন্থি দলগুলির যোগসূত্র ছিল। নতুন প্রেসিডেন্ট আলি কাফি তার জায়গায় দায়িত্ব গ্রহণ করে।

অতঃপর FIS কে নিষিদ্ধ করা হয় এবং এর ৩০০০ সদস্যকে সাহারা মরুভূমির কারাগার শিবিরে প্রেরণ করা হয়। এরপর নতুন ইসলামপন্থি গোষ্ঠীর একটি বিস্তৃত বিন্যাস আবির্ভূত হয়, যার মধ্যে FIS এর প্রাক্তন সদস্য সৈয়দ মাখলৌফি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'মুভমেন্ট ফর এ ইসলামিক স্টেট (ME)' এবং আবদুল কাদের চেবুতি প্রতিষ্ঠিত 'ইসলামিক আর্মড মুভমেন্ট (MIA)'ও ছিল।

জুলাই ১৯৯২ এবং জানুয়ারি ১৯৯৩ সালের মধ্যে একটি নতুন গ্রুপের উত্থান ঘটে। মনসুর মেলিয়ানির নেতৃত্বে আলজিয়ার্স ভিত্তিক 'আর্মড ইসলামিক গ্রুপ GIA', যার নেতৃত্বে বহু আফগান-অভিজ্ঞ যোদ্ধা ছিল এবং তাদের মূল নেতৃত্বের মধ্যে আল-কায়েদারও সু-প্রতিষ্ঠিত যোগাযোগ বিদ্যমান ছিল। অন্যান্য গোষ্ঠীর বিপরীতে GIA এর গোড়াপত্তনের পর থেকেই একটি বিস্তর পরিসরের শত্রু নির্দিষ্ট করে নিয়েছিল এবং বিদেশিদেরকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছিল বিশেষত ইহুদি এবং খ্রিষ্টানদেরকে। আলজেরিয়ায় ভয়াবহ বেসামরিক গণহত্যার খবরাখবর এ সময়েই ছড়িয়ে পরা শুরু হয়েছিল। যদিও এটি নিশ্চিত যে, পরবর্তী সময়কালের নৃশংসতাগুলো GIA দ্বারাই পরিচালিত হয়েছিল, কিন্তু কিছু বিশেষজ্ঞ এই প্রাথমিক আক্রমণগুলির জন্য অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বাহিনীকে দায়ী করেন, যাদের উদ্দেশ্য ছিল জনগণকে আতঙ্কিত করে তাদেরকে ইসলামপন্থি দলগুলির বিরোধী করে দেওয়া। ডা. সা'দ আল-ফকিহ যেমনটা মন্তব্য করেছেন, 'আপনি এমন দুজন আলজেরীয় খুঁজে পাবেন না, যারা সে সময়ে ঠিক কি ঘটেছিল এ বিষয়ে একমত হতে পারবে।'

আলজেরিয়ায় আল-কায়েদা কখন সক্রিয়ভাবে কার্যক্রম শুরু করে এ প্রসঙ্গে মাগরেবের ইসলামপন্থি দলগুলির একজন আলজেরীয় বিশেষজ্ঞ হামিদা লায়াচি জোর দিয়ে বলেন যে, 'আল-কায়েদার সাথে সংশ্লিষ্ট আফগান-আরব যোদ্ধারা আলজেরিয়ায় একেবারে প্রথম দিককার ইসলামি গেরিলা হামলার সাথে জড়িত ছিল, যেটাতে ১৯৯১ সালের ২৯ নভেম্বর গুয়েমারের একটি সীমান্ত চৌকিতে দশ

জন সেনা নিহত হয়েছিল।' লায়াচির মতে, 'কারি সাইদ নামক একজন আল-কায়েদা দূত মেলানিয়ির সাথে ১৯৯২ সালে যোগাযোগ করার জন্য আলজেরিয়া সফর করেছিলেন—যে সময়টিতে তিনি MIA থেকে সরে যাচ্ছিলেন। ১৯৯৬ সালে তার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি আল-কায়েদার কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এবং উদীয়মান GIA মধ্যে সংযোগকারী ছিলেন।'[১]

আমি তখনই ১৯৯৩ সালের মাঝামাঝি থেকে শেষদিক অবধি আল-কায়েদা এবং সদ্য গঠিত GIA এর মধ্যবর্তী শীর্ষস্তরের যোগাযোগগুলো সম্পর্কে অবহিত ছিলাম এবং তাই আমার পক্ষে লায়াচির তথ্যসমূহে সন্দেহ পোষণ করার কারণ নেই। আমার পত্রিকা আল-কুদস আল-আরাবিতে ২০০৫ সালের আগস্ট মাসে প্রেরিত একটি দীর্ঘ এবং বিস্তৃত চিঠিতে আবু মুসআব আল-সুরি বর্ণনা করেছেন যে, তিনি কীভাবে ১৯৯৩ সালের অক্টোবর মাসে ওসামা বিন লাদেনের নিকট সফর করেছিলেন। 'আমাদের মধ্যে অনেকগুলো বৈঠক হয়েছিল, যেখানে আমরা আলজেরিয়ায় জিহাদের প্রশ্নে দীর্ঘ আলোচনা করেছিলাম'—আল-সুরি বলেছিলেন। তিনি আরও বলেন—'আলজেরিয়ার জিহাদি নেতাদের সাথে আমাদের যোগাযোগ ছিল এবং আমরা সেসব নেতাদের সাথে নিয়মিত বৈঠক করতাম এবং সেখানকার পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতাম। আমার কাছে স্প্যানিশ পাসপোর্ট থাকায় সেখানে আমার গমনাগমন সহজসাধ্য ছিল।' সাম্প্রতিককাল অবধি আমি ধরে নিয়েছিলাম যে, উক্ত বৈঠকসমূহ ইউরোপে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তবে বর্তমানে একটি সূত্র আমাকে জানিয়েছে যে, আল-সুরি কেবল অসংখ্য ঘটনায় আলজেরিয়া সফরই করেননি, বরং বাস্তবিকপক্ষে তিনি GIA এর জন্য বিন লাদেনের ব্যক্তিগত দূত হয়ে ওঠেন, পরবর্তী কালে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

আল-সুরি লন্ডনে থাকাকালীন ১৯৯৫ থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত GIA এর অতীব কট্টরপন্থি নিউজলেটার 'আল-আনসার'-এর সম্পাদনায় জড়িত ছিলেন। যেসব আলজেরীয় ইসলামপন্থিরা FIS এ ছিল না এবং GIA জোটেও অংশ নেয়নি, তারা তখন ফাস্ট স্যালভেশন আর্মি (AIS) নামক একটি জোটসংগঠনের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। ১৯৯৪ সালের জানুয়ারিতে লিয়ামিন জিরোয়াল প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর FIS এবং AIS এর সাথে সন্ধিস্থাপনের আলোচনা শুরু করেন। GIA এর প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল FIS এবং AIS এর সহযোগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার মাধ্যমে। এরপর এসব সংগঠনের বেশ কিছু সদস্য GIA

[১] Hamida Layachi, 'Le GSPC et al-Qa'ida ont conclu une alliance', Le Monde, 12 April 2007.

এর কাছে তাদের আনুগত্য স্থানান্তর করে, যেটি ছিল তখন পর্যন্ত আলজেরিয়ার সবচেয়ে সক্রিয় এবং বৃহত্তম গেরিলা গ্রুপ।

১৯৯৪ সালের আগস্ট মাসে GIA খিলাফতের ঘোষণা দেয় এবং শরিফ গৌস্মিকে খলিফা নির্বাচিত করে। গৌস্মি মাত্র এক মাস পরে নিহত হন এবং অক্টোবরে জ্যামেল জিতৌনি তার স্থলাভিষিক্ত হন।

আমার পত্রিকায় প্রেরিত একটি চিঠিতে আল-সুরি দাবি করেছেন যে, তিনি GIA-এর আমিরকে ব্যক্তিগত চিঠিপত্র বিনিময়ের সময় পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, 'কেবল প্রতিশোধ হিসাবেই নয় বরং উক্ত সামরিক শাসনকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য করার জন্য তাকে অবশ্যই ফ্রান্সে কঠোর আঘাত হানা উচিত, যেটিকে তারা গোপন রাখার চেষ্টা করছিল। এই কৌশল আলজেরিয়ান জিহাদের সমর্থনে উম্মাহকে সেখানে একত্রিত করবে, যেভাবে তারা আফগানিস্তানের জিহাদকে সমর্থন করেছিল।' এটি GIA এর ওপর আল-সুরির (এবং প্রসংগত, আল-কায়েদার) প্রভাবের একটি পরিমাপ যে, ঠিক এক মাস পর, ১৯৯৪ সালের ক্রিসমাসের প্রাক্কালে, সংগঠনটির কিছু কুশলী আলজিয়ার্সে একটি ফরাসী বিমান হাইজ্যাক করে। ফ্রান্সে অবতরনের সময় ফরাসি সেনারা তাদের হত্যা করলেও উক্ত ব্যর্থ প্রচেষ্টার পর নতুন বছরে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে GIA জিহাদের ডাক দেয়। আল-সুরি সন্তুষ্টির সাথে উল্লেখ করেছিলেন যে, 'জিতৌনির সাথে আমার অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ছিল, যিনি আমাকে একটি বিশেষ ধরনের আলজেরিয়ান মিষ্টান্ন পাঠিয়েছিলেন, যেগুলো তিনি আলজেরিয়ার সেনাবাহিনীর একটি গুদাম থেকে লাভ করেছিলেন এবং আমি ইংল্যান্ড এবং স্পেনের ভাইদের মাঝে সেগুলো বিতরণ করেছিলাম।'

GIA এর এরূপ হুমকি থাকা সত্ত্বেও যে, যে-ই ভোট দেবে তাকেই হত্যা করা হবে, নির্বাচনের মাধ্যমে নভেম্বর ১৯৯৫ সালের নির্বাচন লিয়ামিন জিরোয়াল প্রেসিডেন্সির বিষয়টি নিশ্চিত করে। তখন দেশটিতে ইসলামপন্থি গেরিলাদের সংখ্যা এর সর্বোচ্চ স্তরে প্রায় ২৮,০০০ এর কাছাকাছি পৌঁছেছিল, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আল-কায়েদা প্রেরিত বিদেশি স্বেচ্ছাসেবকও ছিল। GIA ১৯৯৫ সালের গ্রীষ্ম ও শরৎকালে ফ্রান্সে একের পর এক হামলা চালিয়ে আলজেরিয়ার বাইরে তাদের অভিযান চালানোর সক্ষমতা প্রদর্শন করে এবং তখন প্যারিস এবং লিয়নের গণপরিবহনকে লক্ষ্য করে একটি হামলায় ৮ জন নিহত এবং ১০০ জন আহত হয়। এই অভিযানগুলি আল-কায়েদার কেন্দ্রীয় কমান্ডের অনুমোদন উপযোগী ছিল। খুব সম্ভবত এর সদস্যরা এসব পদক্ষেপ জানত এবং অনুমোদন করেছিল।

GIA ক্রমবর্ধমান ধারাবাহিকতা এবং নির্মমতার সাথে বেসামরিক লোকদের ওপর আক্রমণ শুরু করে এবং স্বদেশবাসীদের নিকট এর জনপ্রিয়তা অনুপাতিক হারে হ্রাস পেতে থাকে। এই দলটি আরও বিবৃত করেছিল যে, তারা অন্যান্য ধর্মের লোকদেরকেও লক্ষ্যবস্তু বানাবে এবং ১৯৯৬ সালের এপ্রিল মাসে তিবিরিনে সাতজন ট্রাপিস্ট সন্ন্যাসীকে হত্যা করে অঙ্গহানী করা হয়েছিল।

জুলাই ১৯৯৬ সালে জিতৌনি নিহত হন এবং আন্তার জুবরি নতুন আমির নির্বাচিত হন। জুবরি একটি চরম তাকফিরি মতাদর্শের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। সেই মতাদর্শ অনুসারে যারা GIA সালাফিস্ট মতবাদের অনুসারী হবে না তারা কাফের এবং সরকারের সহযোগী। তখন পূর্বের যেকোনো সময়ের চাইতে অধিকতর ভয়ংকর গণহত্যার মাতলামি উদ্ভূত হয় এবং রমজান মাসে (ডিসেম্বর ১৯৯৭) প্রায় ১,৩০০ এরও বেশি মানুষ নিহত হয়। আবু কাতাদা এবং অন্যান্য সূত্রসমূহের মতে, GIA তে গোয়েন্দা সংস্থাগুলি দ্বারা নিয়মিতভাবে অনুপ্রবেশ ঘটেছিল, যারা এই বেসামরিক গণহত্যাকে GIA এর নিজের মৃত্যু ঘটানোর উপায় হিসাবে দেখেছিল এবং তারাই এই ক্রমবর্ধমান মনোবিকারিক এজেন্ডাকে উৎসাহিত করতে পর্দার আড়ালে কাজ করছিল। এর চূড়ান্ত পরিনতি ঘটে সময়ের সবচেয়ে নিকৃষ্ট গণহত্যাটির মাধ্যমে, যেখানে ১৯৮৯ সালের ১ জানুয়ারি রিলিজিয়ান প্রদেশে ৪১১ জন নিহত হয়।

আলজেরিয়ায় ১৯৯২ থেকে ১৯৯৮ সালের মধ্যে সর্বমোট আনুমানিক প্রায় দেড় লক্ষ বেসামরিক মানুষ নিহত হয়।[১] এসব গণহত্যার ঘটনা আলজেরিয়ার জণগণকে মানসিক আঘাতপ্রাপ্ত এবং তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এটি এমন একটি ঘটনা ছিল, যেটা পরবর্তী কালে ইরাকেও পুনরাবৃত্ত হয়েছিল। সেখানে আল-জারকাভির গোষ্ঠী বেসামরিকদের ওপর ভয়াবহ হামলার নজির স্থাপন করেছিল, যার ফলস্বরূপ এখন সুন্নি উপজাতি নেতারাও আল-কায়েদার বিরোধী হয়ে উঠেছে। এমনকি, যখন আল-জারকাভি নিহত হয়, তখন মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা কর্তৃক বেশকিছু চিঠি উদ্ধার হয়, যার মধ্যে একটি ছিল আল-কায়েদার কেন্দ্রীয় শুরা সদস্য আতিয়াহ আল-জাজায়িরি (আলজেরিয়ান) প্রেরিত, যেখানে তিনি তাকে GIA এর অনুরূপ ভুলটি না করার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন—'১৯৯৪ থেকে ১৯৯৫ সালের মধ্যে আলজেরিয়ায় GIA যখন ক্ষমতার একেবারে দ্বারপ্রান্তে ছিল ... তারা নিজেদের হাতেই নিজেদেরকে ধ্বংস করেছিল তাদের বুদ্ধির স্বল্পতা, বিভ্রম, জনগণকে উপেক্ষা করা, নিপীড়ন, বক্রতা,

---

[১] Jonathan Schanzer, 'Algeria's GSPC and America's "War on Terror", 2 October 2002; www.washingtoninstitute.org/templateC05.php?CID=1544.

তীব্রতা এবং এর পাশাপাশি উদারতা, সহানুভূতি ও বন্ধুত্বের অভাবের কারণে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার মাধ্যমে।'

GIA এর একজন আঞ্চলিক কমান্ডার হাসান হাত্তাব (যিনি আবু হামজা নামেও পরিচিত) সংগঠনটির ক্রমবর্ধমান নির্বিচার সহিংসতায় তিক্ত হয়ে তার সাথে আরও কয়েকশ গেরিলা নিয়ে সংগঠন থেকে চলে যান। ১৯৯৮ সালের শেষের দিকে তারা একটি নতুন এবং অধিকতর মধ্যপন্থি (আদর্শিকভাবে যদিও এটি যে খুব কম চরমপন্থি তা নয়) 'সালাফিস্ট গ্রুপ ফর প্রিচিং এবং কমব্যাট (GSPC)' নামক একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

লক্ষণীয় বিষয় হলো, আল-কায়েদার নেতৃবর্গও GIA এর কার্যক্রম থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে নেয়। আবু কাতাদা এবং আল-সুরির মতো মূল সাহায্যকারীরা, যারা এর আগে তাদের সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করেছিল তারা তখন বুঝতে পেরেছিল যে, তারা আলজেরীয় গোয়েন্দা এজেন্টদের দ্বারা বিভ্রান্তির শিকার হয়েছিল। ফলে GIA এর লজিস্টিক সহায়তা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং আল-আনসারের প্রকাশও বন্ধ হয়ে যায়। এমনকি রণক্ষেত্রেও, আল-কায়েদার বিদেশি মুজাহিদরা তাদের পূর্ববর্তী GIA নেতাদের বিরুদ্ধে চলে যায় এবং এর পরিবর্তে হাত্তাবের সংগঠন GSPতে যোগ দেয়। ওসামা বিন লাদেন হাত্তাবের নিকট তার দূত প্রেরণ করেন, তার কার্যক্রমে পৃষ্ঠপোষকতা করতে থাকেন এবং অবিকশিত GSPC কে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেন।

জিএসপিসি (GSPC)

১৯৯৯ সালের এপ্রিলে আবদুল আজিজ বোতেফ্লিকা আলজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তিনি সাত বছর ধরে চলমান গৃহযুদ্ধ, যেটা দেশকে ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছিল, তা অবসানের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করেছিলেন এবং গণভোটের মাধ্যমে নতুন বেসামরিক ঐক্য আইন প্রণয়নের জন্য তার প্রস্তাব উপস্থাপন করেছিলেন। এই পরিকল্পনাটি FIS এবং এর সশস্ত্র শাখা AIS এর সাথে দীর্ঘকালীন আলোচনার ফলাফল এবং এতে GIA এর পতন ঘটানোর সংকল্পও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এমনকি জনগনও তার এজেন্ডাকে সমর্থন করেছে। সরকারি পরিসংখ্যানগুলি মোতাবেক তিনি ৯৮.৬ শতাংশ ভোট পেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেন। বিভিন্ন গেরিলা দলগুলিকে একটি সাধারণ ক্ষমার সুযোগ দেওয়া হয়, যা AIS এবং অন্যান্য সশস্ত্র দলগুলির হাজার হাজার সদস্য দ্বারা গৃহীত হয়। আলবানির মতো বেশ কিছু উলামা ফতোয়ায় বিবৃত করেছিল যে, জাতীয় পুনর্মিলন প্রক্রিয়ার আলোকে আলজেরিয়ায় তখন জিহাদ অবৈধ হয়ে

গিয়েছে। হাজার হাজার জিহাদি তাদের অস্ত্র জমা দিয়েছিল এবং তাদেরকে মামলা-মোকদ্দমা থেকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়েছিল। সকল অভিপ্রায় এবং উদ্দেশ্যের আলোকে, GSPC তখন আলজেরিয়ার একমাত্র সশস্ত্র গেরিলা গ্রুপ ছিল এবং এটি তখন যথেষ্ট দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

GSPC এর উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক ইসলামের জনপ্রিয় সমর্থনকে পুনরুদ্ধার করা, যেটি পূর্বে FIS দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল এবং GIA দ্বারা প্রায় নির্বাপিত হয়ে গিয়েছিল। এই লক্ষ্যে তারা তাকফিরি মতাদর্শ থেকে ফিরে আসে, যেটি বেসামরিকদের লক্ষ্যবস্তু বানানোর বৈধতা দিত এবং এর পরিবর্তে তারা সামরিক প্রতিষ্ঠান, সেনা, পুলিশ এবং পর্যটকদের দিকে মনোনিবেশ করে। ২০০২ সালের মে মাসে এই গোষ্ঠী কর্তৃক প্রথম বড় ধরনের আক্রমণে মূলত বারবার কাবিলিয়ান অঞ্চলের রাজধানী তিজি ওউজুর নিকটে পনেরোজন আলজেরিয়ান সৈন্য নিহত হয়েছিল।

আলজেরীয় ইসলামপন্থি গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে লক্ষণাত্নক বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠা অভ্যন্তরীণ মারামারি শীঘ্রই GSPC তেও প্রকাশিত হতে শুরু করে। এটি সম্ভবত গোষ্ঠীটির দ্বারা গৃহীত অবকাঠামোর কারণে আরও বর্ধিত হয়ে ওঠে, যে অবকাঠামো অনুসারে সমগ্র দেশটিকে স্ব স্ব আমির বিশিষ্ট নয়টি জোনে বিভক্ত করা হয়েছিল। তারা আপাতদৃষ্টিতে কেন্দ্রীয় নেতার নিকট জবাবদিহিতা করতে বাধ্য ছিল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জোনটি ছিল এক নম্বরটি, যার সীমানা ছিল আলজিয়ার্স এবং পূর্ব দিকে কাবিলিয়ান অঞ্চলের কিছু অংশ। এটি সর্বদাই সংগঠনটির কেন্দ্রীয় আমিরের অধীন ছিল। পরবর্তী সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল সাহারার গভীরে অবস্থিত নয় নম্বর জোন। উত্তর-দক্ষিণ বিভাজনের উত্থানের সাথে সাথে হাত্তাবের প্রভাবের ক্ষেত্রটি সংকীর্ণ হয়ে যায়। GSPC এর অন্যতম কট্টরপন্থি কমান্ডার, আমর সাইফি (আব্দুর রাজ্জাক আল-বারা নামে পরিচিত, তিনিও হাত্তাবের মতোই আলজেরীয় স্পেশাল ফোর্সে একজন প্যারাট্রুপার ছিলেন), মালি, নাইজার এবং পাশাপাশি আলজেরিয়ান লোকদের নিয়ে গঠিত একটি ছোট বাহিনী জড়ো করেছিল। তার দলটি তখন নয় নম্বর জোনে গমন করে, যার আমির এক চক্ষুবিশিষ্ট মুখতার বেলমুখতার (আল-আওর নামেও পরিচিত) সীমান্তগুলিতে তার গেরিলা কৌশলের অনুমোদন করেছিল। সাইফির দলটি উত্তর নাইজারের সেনাদের সাথে পুরদস্তুর যুদ্ধসহ প্রতিবেশীদের সাথে বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়েছিল। ২০০৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে সাইফির লোকেরা সাহারা মরুভূমিতে বত্রিশ জন আতঙ্কিত ইউরোপীয় পর্যটকদের (বেশিরভাগ জার্মান) অপহরণ করে। সম্ভবত হিট-স্ট্রোকের কারণে একজন মহিলা মারা গিয়েছিলেন, তবে জার্মান সরকার কর্তৃক পাঁচ মিলিয়ন ডলার মুক্তিপণ প্রদানের পর বাকিদেরকে মুক্তি দেওয়া

হয়েছিল, যে অর্থ GSPC এর পরবর্তী অপারেশনসমূহের অর্থায়নে ব্যায়িত হয়েছিল। সাইফি আলজেরিয়ার মোস্ট ওয়ান্টেড গেরিলা হয়ে ওঠেন, যতদিন না তিনি 'মুভমেন্ট ফর ডেমোক্রেসি অ্যান্ড জাসটিস ইন চাদ' কর্তৃপক্ষের হাতে বন্দী হন এবং তারা তাকে ২০০৪ সালের মে মাসে আলজেরিয়ান কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করে। বেলমুখতার এবং সাইফি উভয়ই ২০০২/২০০৩ সালে আল-কায়েদা দূতদের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। হাত্তাব দ্বারা গৃহীত গৃহকেন্দ্রিক মনোনিবেশের চাইতে তাদের পন্থা আল-কায়েদা এজেন্ডার নিকটতম ছিল, যিনি মধ্যপন্থার প্রতি আহ্বান জানানো শুরু করেছিলেন এবং এমনকি সরকারের সাথে সীমিত পরিসরের আপসের প্রস্তাবও ব্যক্ত করেছিলেন।

২০০৩ সালের সেপ্টেম্বরে বা অক্টোবর মাসে হাত্তাবকে তার GSPC এর সহকর্মী কমান্ডাররা পদচ্যুত করে, যারা তাকে দুর্বল এবং মনোযোগ ও কৌশলের অভাব রয়েছে বলে বিবেচিত করেছিলেন। যদি তারা প্ররোচিত নাও করেন, তবুও আল-কায়েদা নেতৃবর্গ তার এই অপসারণকে মেনে নিয়েছিলেন, যারা তার নতুন আবিষ্কৃত 'নরমপন্থা' নিয়ে নাখোশ ছিলেন। ২০০৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে হাত্তাব আবু ইব্রাহিম মোস্তফা (নাবিল সাহারাভি নামেও পরিচিত) দ্বারা প্রতিস্থাপিত হন এবং প্রায় সাথে সাথেই তার দলটিকে আল-কায়েদার সাথে সংযুক্তির ঘোষণা দিয়ে একটি বিবৃতি জারি করেন। বার্তায় তিনি উদ্ধৃত করেন—'আমরা পাষণ্ড আমেরিকার বিরুদ্ধে ওসামা বিন লাদেনের জিহাদকে দৃঢ়রূপে এবং পরিপূর্ণভাবে সমর্থন করি এবং পাশাপাশি আমরা আমাদের আফগানিস্তান, ফিলিপাইন এবং চেচনিয়ার ভাইদেরও সমর্থন করি।'

আল-কায়েদার সাথে আবু ইব্রাহিম মোস্তফা স্পষ্টভাবেই যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বার্তা দিয়ছিলেন, সেটা অত্যাসন্ন ছিল না। বৈশ্বিক জিহাদ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য সত্ত্বেও, তার সক্রিয় এজেন্ডা তার পূর্বসূরিদের মতোই ঘরোয়া এবং অন্তর্নিহিত ছিল। আবু ইব্রাহিম মোস্তফা স্পষ্টতই এ সম্পর্কে অবগত ছিলেন এবং তাঁর একটি প্রিয় বক্তব্য ছিল GSPC যদি ইতিমধ্যে আলজেরীয় সরকার এবং এর সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এতটা ব্যস্ত না থাকত, তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের বিরুদ্ধে তারা সানন্দে লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করতে পারত। আবু ইব্রাহিম মোস্তফা ২০ জুন ২০০৪ সালে একটি বন্দুকযুদ্ধে নিহত হন।

আবদুল মালেক দ্রোকদাল আবু ইব্রাহিম মোস্তফার স্থলাভিষিক্ত হন এবং তিনিই GSPC এর বর্তমান আমির। গোড়া থেকেই স্পষ্ট ছিল যে, তিনি একটি উগ্রপন্থি আদর্শ সমর্থন করেন এবং ২০০৫ সালের সেপ্টেম্বরে হাসান হাত্তাব যখন আলজেরিয়ার সরকারের পক্ষ থেকে সাধারণ ক্ষমা গ্রহণের প্রস্তাব পেশ করেন তখন দ্রোকদাল 'GSPC তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে' মর্মে বিবৃতি প্রদান

করেন। তিনি বলেন—'যাই হোক না কেন, তিনি কোনোভাবেই আমাদের সাথে সম্পর্কিত নন।' এটি জিএসপিসির মধ্যে ফাটলের একটি কারণ ছিল। এই ধারণাকে পরিত্যাজ্য করে ইন্টারনেটে প্রকাশিত ২০০৫ সালের একটি সাক্ষাৎকারে দৃঢ়ভাবে তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, 'জনগণ, মুজাহিদরা এবং আমাদের সমর্থকরাই এই সাক্ষ্য বহন করে যে GSPC দৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ রয়েছে।' বাস্তবিকপক্ষে, ২০০৫ সালে বাউটিফ্লেক কর্তৃক সাধারণ ক্ষমা GSPC এরই উপকারে এসেছে, যার ফলে নরমপন্থী এবং কম প্রতিশ্রুতিবদ্ধরা এর থেকে পদত্যাগ করে ভবিষ্যৎ কার্যক্রম এবং রিক্রুটিং ভিত্তি হিসাবে এর একটি দৃঢ় কঠিন ভিত রেখে আসে।

দ্রোকদাল সক্রিয়ভাবে আল-কায়েদার সাথে একটি আনুষ্ঠানিক একীকরণ কামনা করতেন, এই যুক্তিতে যে—এটি তার সংস্থার অবস্থান এবং রিক্রুটিং সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলার পাশাপাশি অপারেশনাল স্ট্র্যাটেজিতে আরও বৈশ্বিক ফোকাসের দিকে যেতে পারবেন, যা তিনি ভবিষ্যৎ হিসেবে দেখতে পাচ্ছিলেন। তিনি আল-জারকাভির সাথে দৃঢ় সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন, যার কাছে তিনি ইরাকে তার সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানিয়ে বেশ কয়েকটি চিঠিও প্রেরণ করেছিলেন। 'আল-কায়েদা ইন দ্য ল্যান্ড অফ টু রিভার্স' এর আমির কর্তৃক প্রেরিত প্রতিনিধিরা দ্রোকদালকে ধারাবাহিক অসংখ্য বৈঠকে অপারেশনাল টেমপ্লেট সরবরাহ করেছিল। আলজেরিয়ার সংবাদপত্র আল-খবার অনুসারে অজ্ঞাত GSPC সূত্রের উদ্ধৃতি মোতাবেক (১২ সেপ্টেম্বর ২০০৬), আল-জারকাভিই ২০০৫ সালে এই গোষ্ঠীদ্বয়ের মধ্যবর্তী আনুষ্ঠানিক একীকরণের ধারণাকে প্রথমে অনুমোদন করেছিলেন। যখন তাকে হত্যা করা হয়েছিল দ্রোকদাল তখন 'লায়ন অফ ইসলাম এর মৃত্যুতে একটি শোকবার্তা' শিরোনামে বিবৃতি প্রকাশ করেছিলেন। অনেক গোষ্ঠীই আল-কায়েদার সাথে সম্পৃক্ততার দাবি করেছে, তবে কেন্দ্রীয় নেতৃবর্গের একটি কঠোর মতাদর্শগত মানদণ্ড রয়েছে যেটিকে কোনো আনুষ্ঠানিক সংযোজনকে নিশ্চিত করার জন্য অবশ্যই পূরণ করতে হয়।

GSPC তার লক্ষ্য পূরণে আরও কাছাকাছি এগিয়ে চলছিল এবং মাগরেবের সমস্ত সম্ভাব্য জিহাদিদের মধ্যে আলজেরিয়ানরাই আল-কায়েদার নিকট সর্বাধিক কার্যকর হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল, কারণ তারা বিদ্রোহের সাথে সুপরিচিত এবং পনেরো বছরেরও বেশি স্থায়ী গৃহযুদ্ধ তাদেরকে আরও অধিকতর পোড়খাওয়া যোদ্ধা করে তুলেছিল। GSPC যে আল-কায়েদা নেতৃত্বের নিকট ক্রমশ নেকনজর অর্জন করছিল, তার পক্ষের প্রথম প্রমাণ ছিল গোষ্ঠীটির বিভিন্ন কার্যক্রমের জন্য অভিনন্দন জানিয়ে ইন্টারনেটে আল-কায়েদা নেতাদের ধারাবাহিক বিবৃতিসমূহ। তার বৈশ্বিক অভিসন্ধিসমূহ নিশ্চিত করার জন্য দ্রোকদাল ইন্টারনেটেও

আফগানিস্তান, চেচনিয়া, লেবানন, সোমালিয়া এবং সুদানে GSPC শাখার উপস্থিতি ঘোষণা করেন। এই নতুন আমিরকে নিয়ে আলোচনায় চ্যাটরুমসমূহ গুন গুন করছিল এবং অনেক জিহাদিও এমন মতামত পোষণ করেছিলেন যে, দ্রোকদালও আবু মুসআব আল-জারকাভির মতোই একজন প্রভাবশালী নেতা হিসাবে নিজেকে অধিষ্ঠিত করবেন, যাকে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন।

আবদুল মালেক দ্রোকদাল

আবদুল মালেক দ্রোকদাল ২০ এপ্রিল ১৯৭০ সালে রাজধানী আলজিয়ার্সের প্রায় ৪০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে ব্লিডা অঞ্চলের একটি ছোট্ট শহর মেফতাহে জন্মগ্রহণ করেন। এই অঞ্চলের লোকেরা—যেটি কিনা GIA এর আদি পীঠস্থান ছিল—তাদের আপসবিরোধী মনোভাব এবং যুযুৎসা ও যুদ্ধপ্রিয়তার জন্য সুপরিচিত।

দ্রোকদাল একটি রক্ষণশীল ধার্মিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং একজন চমৎকার ছাত্র ছিলেন। তিনি গণিতে বিশেষজ্ঞতা অর্জন করেন এবং ব্লিডা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের স্নাতকোত্তর কোর্সে পড়াশোনার জন্য ভর্তি হন। ১৯৯২ সালে গৃহযুদ্ধ শুরু হলে তিনি পড়াশোনা ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ইন্টারনেটে পোস্ট করা একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বর্ণনা করেছেন যে, কীভাবে তিনি আলজেরীয় জিহাদের অন্যতম সেনাপতি শাইখ সাইদ মাখলৌফির সাথে যোগাযোগ করতে পেরেছিলেন। তিনি বলেন—'১৯৯৩ সালের ডিসেম্বরে আমি মুজাহিদ ভাইদের সাথে যোগ দিতে পেরে অত্যন্ত গর্বিত ছিলাম।' সূত্রসমূহ তাকে বাস্তববাদী, শান্ত মেজাজি, শক্তিশালী বক্তা এবং একজন উৎকৃষ্ট নেতা হিসাবে বর্ণনা করে।

তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে খুব কমই জানা যায়, যদিও আলজেরীয় জিহাদিদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে যে তিনি সম্প্রতি আটলাস পর্বতমালায় বিয়ে করেছেন যেখানে তিনি আত্মগোপনে রয়েছেন। তাঁর সম্পর্কে যা লেখা হয়েছিল তার বিপরীতে দ্রোকদাল বাস্তবিকপক্ষে আফগানিস্তান বা সুদানে আল-কায়েদার প্রশিক্ষণ শিবিরে কখনোই উপস্থিত ছিলেন না। তার অভিজ্ঞতা পুরোপুরি স্থানীয় এবং তিনি উপর্যুক্ত সাক্ষাৎকারে GIA বা GSPC সম্পর্কে সুসংগঠিত, মিলিটারিস্টিক সংগঠনের অনুভূতি ব্যক্ত করে এদের মাধ্যমে তার উত্থানের বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি ব্যক্ত করেন—

> 'আমাকে বিস্ফোরক প্রস্তুত করার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল... আমার পূর্বের কলেজের শিক্ষার কারণে ... ১৯৯৬ সালে, আমাকে দ্বিতীয় জোনের আল-আহওয়াল সেনাদের সকল মিলিটারি ওয়ার্কশপ

তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। অতঃপর আমি আল কুদস ব্রিগেডের কমান্ডিংয়ের দায়িত্ব পাই ... ২০০১ সালে, আমাকে GSPC তলব করেছিল এবং আমি ২০০৩ অবধি দ্বিতীয় জোনে তাদের প্রতিনিধি ছিলাম ... শাইখ আবু ইব্রাহিম মোস্তফার মৃত্যুর পর আমি ২০০৪ সালের গ্রীষ্মে GSPC এর আমির নির্বাচিত হই।'

GSPC থেকে আল-কায়েদা ইন দ্য ইসলামিক মাগরেব (AQIM)

৪ জুন, ২০০৫ সালে ১৫০ জন সশস্ত্র GSPC যোদ্ধা কর্তৃক সীমান্তের ওপারে মৌরিতানীয় সামরিক চৌকির হামলাকে আনুষ্ঠানিকভাবে আল-কায়েদায় যোগ দেওয়ার জন্য এই গোষ্ঠীটির দীর্ঘ অভিযানের ক্ষেত্রে এক মোড় হিসেবে বিবেচিত হয়। ইসরাইলের সাথে মৌরিতানিয়ার দহরম-মহরমের কারণে, যার সাথে এটি আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখে এবং ইরাকে মার্কিন আগ্রাসনের সমর্থন—প্রভৃতি কারণে দেশটি জিহাদিদের নিকট শত্রু রাষ্ট্র হিসাবে বিবেচিত হয়। GSPC যে মৌরিতানিয়ায় সক্রিয়ভাবে রিক্রুটিং করছিল—এই জনশ্রুতিটি আক্রমণকারী দলে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দেশটির নাগরিকদের উপস্থিতির কারণে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছিল। উক্ত হামলায় পনেরোজন মারা গিয়েছিল এবং সতেরোজন আহত হয়েছিল। এটি কোনো কাকতালীয় ঘটনা ছিল না যে, একটি মার্কিন আর্মি ডিভিশনের সামরিক অনুশীলনের জন্য সাহেলে আগমন করার ঠিক আগেরদিন এই হামলা হয়েছিল।

পরবর্তী আক্রমণগুলি স্বয়ং ওসামা বিন লাদেনকে ইন্টারনেট সম্প্রচারে 'আলজেরিয়ান মুজাহিদদেরকে' অভিবাদন জানাতে বাধ্য করে। GSPC ও একইভাবে আল-কায়েদা ইন দ্য ল্যান্ড অফ টু রিভার্স আলজেরীয় কূটনীতিক আলী বেলারুসি এবং ইজজুদ্দিন বেলকাদিকে আটক করলে জারকাভিকে অভিবাদন জানিয়ে ইন্টারনেট বিবৃতি প্রদান করে। বিবৃতিতে ঘোষণা দেওয়া হয় 'তাদের ওপর আল্লাহর বিচার প্রয়োগ করুন' এবং এক মাস পরে যখন তাদেরকে হত্যা করা হয়েছিল, তখন দ্রোকদাল তার সমর্থনকে পুনর্ব্যক্ত করেছিলেন। 'আল-কায়েদা ইন দ্য ল্যান্ড অফ টু রিভার্স' এবং GSPC এর মধ্যকার বন্ধনই আন্তঃসম্পর্কের চূড়ান্ত একত্রীকরণ এবং একীভূত হবার পেছনের মূল নিয়ামক ছিল।

২০০৫ সালে GSPC 'আল-কায়েদা ইন দ্য ল্যান্ড অফ বার্বার্স' নামক একটি উপগোষ্ঠী গঠনের ঘোষণা করেছিল, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল ইরাকের জন্য উত্তর

আফ্রিকান যোদ্ধাদের রিক্রুটিং এবং প্রশিক্ষিত করা।[১] এই দলটি স্বেচ্ছাসেবীদের উত্তরের আটলাস পর্বতমালা এবং দক্ষিণে সাহারার অস্থায়ী GSPC ক্যাম্পগুলিতে মৌলিক সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়েছিল। যেমন কীভাবে বন্দুক পরিচালনা এবং পরিষ্কার করতে হয়, লক্ষ্য অনুশীলন, ফিটনেস এবং মানসিক স্থিতিশীলতা নির্মাণ প্রভৃতি। এসব চলমান প্রশিক্ষণ শিবিরগুলিকে কর্তৃপক্ষ এবং মার্কিন নজরদারি শনাক্তকরণকে এড়ানোর জন্য প্রতি কয়েকদিন পরপরই স্থানান্তর করা হতো। সেই সময় GSPC প্রশিক্ষকরা আল-কায়েদার অত্যাধুনিক বিস্ফোরক কৌশলগুলির সাথে পরিচিত ছিল না—যেগুলো ইরাক আগমনের পরপরই শেখানো হয়েছিল।

আল-কায়েদা এবং GSPC এর মধ্যকার একীকরণের বিষয়টি ২০০৬ সালে ৯/১১ এর পঞ্চম বার্ষিকীতে আইমান আল-জাওয়াহিরির একটি ভিডিওতে ঘোষণা করা হয়েছিল এভাবে যে—'আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তারা আমেরিকান এবং ফরাসী ও তাদের ক্রুসেডার মিত্রদের নিকট একটি কাঁটা হয়ে উঠবে।' ৮ ডিসেম্বর আলজেরিয়ান সংবাদপত্র আল-খবারে দ্রোকদালের একটি বিবৃতি ছাপানো হয়েছিল, যেখানে তিনি বলেছিলেন যে, তাঁর দলটি আল-কায়েদায় যোগদান করেছে। যেটাকে তিনি বর্ণনা করেন, 'আমাদের ভাই এবং সুপ্রিম লিডার ড. আইমান আল-জাওয়াহিরির নেতৃত্বাধীন সত্যিকারের ইসলামি সংগঠন' হিসাবে। তখন তার এই মন্তব্য এই জল্পনার জন্ম দিয়েছিল যে, ওসামা বিন লাদেন মারা গেছেন।

আমেরিকান টার্গেটে GSPC তার প্রথম সরাসরি হামলা এর মাত্র তিন দিন পর এবং আল-জাওয়াহিরির বিবৃতির দুই মাসের মাথায় আঘাত হানে। ২০০৬ সালের ১১ ডিসেম্বর হালিবুর্টন গ্রুপের সহযোগী সংস্থা 'ব্রাউন অ্যান্ড রুট-কনডোর'-এর কর্মী বহনকারী একটি বাসে বোমা হামলা হয়, যারা ইরাক পুনর্নির্মাণে অত্যন্ত সক্রিয় ছিল। এতে দুজন মারা যায় এবং আটজন আহত হয়। নতুন নেতৃত্বের অধীনে 'আল-কায়েদা ইন দ্য ল্যান্ড অফ টু রিভার্স' দুটি গোষ্ঠীর মধ্যকার ভ্রাতৃত্বের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে একটি অভিবাদনসূচক বার্তা জারি করেছিল। সেখানে আরও বিবৃত হয়েছিল যে, 'ইরাক, আফগানিস্তান এবং অন্যত্র আমাদের ভাইদের পক্ষে প্রতিশোধ নিতে আমরা মুসলিম ভূখণ্ডে ক্রুসেডারদের স্বার্থসমূহে আঘাত হানার জন্য সকল মুসলিমদের আহ্বান করছি।'

২৬ জানুয়ারি ২০০৭ সালে দ্রোকদাল একটি নতুন বিবৃতি জারি করেছিলেন, যাতে তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, তার দলটিকে তখন আনুষ্ঠানিকভাবে 'আল-

[১] Jamestown Foundation, 'Al-Qa'ida in Iraq Endorse Their Cohorts in Algeria', Terrorism Focus, vol. 2, no. 12, 24 June 2005.

কায়েদা জিহাদ অর্গানাইজেশন ইন দ্য ইসলামিক মাগরেব' নামকরণ করা হয়েছে। এই নামটি আল-জারকাভির সংগঠনের অনুরূপ ডিজাইনে করা হয়েছিল, যেটাকে আনুষ্ঠানিকভাবে 'আল-কায়েদা জিহাদ অর্গানাইজেশন ইন দ্য ল্যান্ড অফ টু রিভার্স' নামকরণ করা হয়েছিল। দ্রোকদাল সেখানে ওসামা বিন লাদেনের জড়িত থাকার পরিস্থিতিটি এবং একইসাথে তার জীবিত থাকার বিষয়টি স্পষ্ট করেছিলেন এভাবে যে—'আল-কায়েদাতে যোগদানের প্রথম দিন থেকেই আমরা এই নামটি গ্রহণ করতে চেয়েছিলাম কিন্তু আমরা শাইখ ওসামার অনুমতির অপেক্ষায় ছিলাম, আল্লাহ তাকে নিরাপদে রাখুন।' অবশেষে সকল জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটল।

১১ এপ্রিল ২০০৭ সালে সদ্য গঠিত AQIM প্রথমবারের মতো বড়ো ধরনের হামলা পরিচালনা করেছিল এবং এগুলি তার নতুন মিত্রের সকল পরিচয়কে ছাপিয়ে গিয়েছিল। আলজিয়ার্সে দুটি সমন্বিত আত্মঘাতী হামলা প্রধানমন্ত্রীর বাড়ির সামনের অংশটি পুরোপুরি ধ্বংস করে দেয় এবং একটি পুলিশ স্টেশন মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়। এতে তেইশজন মারা যায় এবং ১৬০ জনেরও বেশি আহত হয়। আলজেরিয়ার কয়েক বছরের মধ্যে এগুলিই ছিল সবচেয়ে কার্যকর এবং মারাত্মক হামলা। তাদের দুঃসাহস এবং ব্যবহৃত কার্যপন্থা ছিল 'আল-কায়েদা ইন দ্য ল্যান্ড অফ টু রিভার্স'-এর প্রতিরূপ এবং এটা এই সম্ভাবনার প্রতি দৃঢ়ভাবে ইঙ্গিত দেয় যে, হয় আলজেরিয়ান মুজাহিদরা ইরাকের রণক্ষেত্রে অর্জিত অপারেশনাল এক্সপার্টাইস শিক্ষা দেওয়ার জন্য দেশে ফিরে এসেছিল নয়তো 'আল-কায়েদা ইন দ্য ল্যান্ড অফ অফ টু রিভার্স' আলজেরীয় জিহাদিদের আত্মঘাতী মিশনে প্রশিক্ষিতকরার জন্য প্রশিক্ষক প্রেরণ করেছিল। আল-কায়েদার শাখাগুলির মধ্যে একাত্মতার ওপর জোর দেওয়ার জন্যই আলজিয়ার্সে হামলা হওয়ার পরদিনই ইরাকে তারা তাদের সাহসিকতার প্রতিচ্ছবি দেখায়। ১২ এপ্রিল একজন আত্মঘাতী হামলাকারী বাগদাদের চূড়ান্ত সুরক্ষিত গ্রিন জোনে অবস্থিত ইরাকি পার্লামেন্টে প্রবেশ করতে সক্ষম হয় এবং ক্যাফেটেরিয়ায় নিজেকে উড়িয়ে দিয়ে আটজনকে হত্যা করে এবং এতে বিশ জন আহত হয়।

২০০৭ সালের ১১ জুলাই AQIM পুনরায় আঘাত হানে। সেদিন কাবিলিয়ায় একজন আত্মঘাতী হামলাকারী লখদারিয়া সামরিক ঘাঁটিতে বিস্ফোরকবাহী একটি ট্রাক দিয়ে হামলা চালায় এবং এতে দশজন নিহত এবং পঁয়ত্রিশজন আহত হয়। এসব আত্মঘাতী বোমা হামলার এই স্ফীতি আলজেরিয়ান কর্তৃপক্ষকে একেবারে নাড়িয়ে দিয়েছিল, যাদের এই শব্দের সাথে পরিচয় ছিল না বললেই চলে। ২০০৭ সালের মে মাসের গোড়ার দিকে আলজেরিয়ান পুলিশ মরুর শহরতলি এল ওয়েডের বাইরের একটি পাম বাগানে একটি প্রশিক্ষণ শিবির আবিষ্কার করেছিল। আলজেরিয়ান সংবাদপত্র 'লিবার্তে' জানায়, পুলিশ জব্দ করা কম্পিউটারে

ইরাকের জন্য পাঁচটি আত্মঘাতী বোমা হামলার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবকদের লেখা উইল এবং অছিয়তনামার সন্ধান পেয়েছিল।

স্থানীয় সূত্রসমূহ জানায় যে GSPC এর নতুন বৈশ্বিক সংশ্লিষ্টতা এবং সাথে আল-কায়েদা ব্র্যান্ডিংয়ের কারণে সংগঠনটির অবস্থান ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছিল। চরমপন্থি আলজেরিয়ান যুবকরা ইরাকে একজন শহিদ হিসেবে মারা যাওয়াকে চূড়ান্ত অর্জন বলে অনুভব করছিল, যেহেতু সেখানে সরাসরি তাদের শত্রু মার্কিনীদের সাথে লড়াইয়ের সুযোগ রয়েছে।

আল-কায়েদা কর্তৃক মিডিয়া, বিশেষত ইন্টারনেটের ক্রমবর্ধমান পরিশীলিত ব্যবহার আলজেরিয়ান গোষ্ঠীগুলোকে প্রভাবিত করছিল। ড্রোকদালের গোষ্ঠীটির স্থানীয় গেরিলা সংগঠন থেকে আল-কায়েদার বৈশ্বিক জিহাদের অংশ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এই ভূমিকা সম্পর্কে সতর্ক 'আল-কায়েদা ইন দ্য ল্যান্ড অফ টু রিভার্স'-এর মিডিয়া উপদেষ্টা আবু মায়সারা আল-ইরাকি জিহাদের উদ্দেশ্যে মুজাহিদদের একত্রিত করার জন্য সকল সম্ভাব্য মিডিয়া ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে ২০০৫-২০০৬ সালে একাধিক বিবরণী প্রকাশ করেছিলেন। হামলা এবং শহিদি অভিযানের ভিডিওসমূহে ইরাকি যোদ্ধাদের রিক্রুটিং এবং মনোবল বৃদ্ধির প্রচারণামূলক ভূমিকার ওপর জোর দিয়ে তিনি নতুন আলজেরিয়ান সহকর্মীদের আহ্বান জানিয়েছিলেন তাদের অভিযানের এই দিকটিকে বিকশিত করার জন্য। ড্রোকদাল GSPC এর প্রধান হওয়ার পর যখন 'আল-আনসার' বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তখন তাদের মিডিয়া উপস্থিতি একেবারেই সামান্য ছিল। এরপর তিনি একটি ওয়েবসাইট প্রতিষ্ঠা করে প্রথমে মাসিক এবং পরবর্তী কালে সাপ্তাহিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানের ক্রিয়াকলাপের আদর্শিক বক্তব্য সম্বলিত সাপ্তাহিক বুলেটিন প্রচার শুরু করেন। অন্যান্য জিহাদি সাইটগুলি থেকে এর লিঙ্ক প্রদান এই ইঙ্গিত দেয় যে, ইসলামি সংগঠনগুলির বিস্তৃত সম্মিলনে GSPC ও গৃহীত হচ্ছে।

২০০৬ সালের জানুয়ারি মাসে ড্রোকদাল 'আল-জামাআহ' নামে একটি অনলাইন ম্যাগাজিন চালু করেন, যেটিতে 'আল-কায়েদা ইন দ্য ল্যান্ড অফ অফ টু রিভার্স'-এর ওয়েবসাইটের অনুরূপ বিন্যাস গ্রহণ করা হয়েছিল। এটি একই রকম বিভাগে বিভক্ত ছিল এবং এর প্রায় ত্রিশ পৃষ্ঠাজুড়ে ইরাক, চেচনিয়া এবং মরক্কো প্রভৃতি অঞ্চলের জিহাদের বয়ান ছিল এবং বাকিগুলো ছিল মতাদর্শভিত্তিক। 'লে মোন্ডি ডিপ্লোমাটিক' জানিয়েছে যে, ২০০৬ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে 'আল-জামাআহ' প্রায় ৮৫,০০০ বার ভিসিট করা হয়েছিল। 'আল-কায়েদা ইন দ্য ল্যান্ড অফ অফ টু রিভার্স'-এর পদ্ধতি অনুকরণ করে, ড্রোকদালের সংগঠন একটি 'মিডিয়া কমিটি' গঠন করেছিল এবং সকল অপারেশনসমূহের প্রস্তুতি এবং সম্পাদনের ভিডিও ডকুমেন্টারির একটি সচল ধারা বজায় রাখতে শুরু করে।

২০০৭ সালের জানুয়ারি মাসে এই দলটি ব্রাউন অ্যান্ড রুট-কনডোর বাসে হামলার রেকি এবং প্রকৃত অভিযানের বিস্তারিত বিবরণ সমৃদ্ধ একটি ফিল্ম প্রকাশ করেছিল। ২০০৭ সালের মে মাসে আল-জাজিরা AQIM থেকে প্রাপ্ত একটি ভিডিও থেকে বাছাইকৃত কিছু অংশ প্রচার করেছিল, যার মধ্যে ছিল বোমা হামলাকারীদের তাদের মিশনের জন্য আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি, তাদের উইল এবং অছিয়তনামা এবং আরও 'শহিদদের' জন্য আহ্বান।

এই ধরনের ভিডিওগুলির উদ্দেশ্যটি কেবল গ্রুপের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে সহানুভূতিশীলদের এবং সম্ভাব্য রিক্রুটদের অবহিত করাই ছিল না বরং অন্যান্য যোদ্ধাদের মধ্যে বলসঞ্চার এবং তাদের তেজদীপ্ত করাও ছিল, যারা অধিকাংশই প্রত্যন্ত পাহাড় বা মরুভূমিতে প্রশিক্ষণ নিত এবং তাদের সাথে সহকর্মী মুজাহিদদের যোগাযোগ ছিল না বললেই চলে। AQIM এর সদস্যতার আন্তর্জাতিক মুখচ্ছবি তাদের ভিডিওগুলিতে ফুটে উঠত। একটি রিপোর্ট 'মুনির দ্য তিউনিশিয়ান' নামে একজন কমান্ডারকে নিয়ে করা হয়েছিল, আরেকটি মৌরিতানিয়ান জিহাদিদের সহকারে একটি যৌথ অভিযান প্রদর্শন করেছিল; আবার কোনোটি দলটির প্যান-মাগরেব গঠনপ্রণালির ওপরে জোর দেওয়ার জন্য নির্মিত ছিল। আরেকটিতে কোনো এক সাহারান প্রশিক্ষণ শিবিরে উত্তর আফ্রিকার সকল দেশগুলো থেকে আগত যোদ্ধাদের আল-কায়েদার গানে (বাদ্যযন্ত্র ব্যাতিত) অংশ নিতে দেখা যায়।

নিরাপত্তা সংস্থাসমূহ কর্তৃক হ্যাকিংয়ের কারণে AQIM এর ওয়েবসাইট অ্যাড্রেস বহুবার পরিবর্তন করতে হয়েছে এবং আমার এই লেখার সময় (জুলাই ২০০৭) এটি ডাউন ছিল। তবে, নিরাপত্তা সংস্থাসমূহকে এড়িয়ে অন্যান্য জিহাদি ওয়েবসাইটগুলির বিস্তৃত বিন্যাসের সহায়তায় নিয়মিত-পরিবর্তনশীল লিঙ্কসমূহের মাধ্যমে সর্বোচ্চ সংখ্যক দর্শকদের নিকট নিজেদের উপস্থিতি নিশ্চিত করে গোষ্ঠীটি তাদের সামগ্রিক অনলাইন উপস্থিতি অব্যাহত রাখছে।

মাগরেবের জিহাদি গোষ্ঠীসমূহ

যদিও GSPC উত্তর আফ্রিকার বৃহত্তম এবং সবচেয়ে শক্তিশালী জিহাদি দল এবং সাম্প্রতিক AQIM এর নেতৃত্বদানকারী দল, তবে কোনো দিক থেকেই এটি সেখানকার এরূপ একমাত্র দল নয়। সামগ্রিকভাবে উত্তর আফ্রিকার ইসলামি দলসমূহই নিপীড়িক রাষ্ট্রযন্ত্র বিরোধী একমাত্র সুসংহত বিদ্রোহী গোষ্ঠী এবং অধিকতর ন্যায়সংগত রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং এর সাথে সাথে দারিদ্র্য ও বেকারত্ব থেকে মুক্তি প্রদানের আশ্বাস দেয়। এমনকি যারা এই জাতীয় গোষ্ঠীগুলোর পরিকল্পিত শরিয়াহ আইনি ব্যবস্থার অধীনে থাকতে চান না, তারাও তাদের ঘরোয়া এবং

আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অবস্থানের জন্য প্রায়শ তাদের সমর্থন করে। এই অঞ্চলের শাসকরা রাজনৈতিক ইসলামের উত্থানকে ভয় করে এবং সর্বত্রই তাদের নিপীড়ন করে। এমনকি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আইনানুগ উত্থানেও এর ব্যতিক্রম হয়নি, যেমনটা ঘটেছিল আলজেরিয়ার FIS এর জয়ের ক্ষেত্রে।

মরক্কো

মরক্কোর কিং হাসান যখন ১৯৯১ সালে সাদ্দাম হোসেনের বিরুদ্ধে প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধের জোট বাহিনীতে যোগ দেওয়ার জন্য সেনা প্রেরণ করেন, তখন সেটা নিশ্চিতভাবেই তার প্রজাদের মারাত্মক রুষ্ট করেছিল। পরবর্তীকালে আফগান যুদ্ধ ফেরতদের নেতৃত্বে বিভিন্ন চরমপন্থি ইসলামিক গোষ্ঠীর উত্থান ঘটে এবং ১৯৯৩ সালে ক্যাসাব্লাঙ্কায় ম্যাকডোনাল্ডের একটি ফাস্ট ফুড আউটলেট এবং 'ওডজার সোসিয়েটি মেরোকেইন ডি ডাপিট এট দে ক্র্যাডিট ব্যাংকে' হামলার ঘটনা ঘটে। ১৯৯৪ সালে ক্যাসাব্ল্যাঙ্কার 'ম্যাক্রো ডিপার্টমেন্ট স্টোর' একই রকম পরিণতি ভোগ করে এবং মারাকেশের আটলাস অ্যাসনি হোটেলে দুজন স্প্যানিশ পর্যটককে হত্যা করা হয়। ইসলামপন্থি রাজনৈতিক দল 'হিযব আল-আদালা ওয়াল-তানমিয়া' (জাস্টিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি) ধীরে ধীরে প্রভাবশালী হয়ে ওঠে এবং ২০০০ সালের মার্চ মাসে তারা মুদাওয়ানা (ব্যক্তিগত আচরণের জন্য ইসলামিক কোড) সংস্কারের সরকারি পরিকল্পনার বিরুদ্ধে মিছিলে প্রায় এক মিলিয়ন মানুষকে একত্রিত করতে সক্ষম হয়েছিল।

নব্বইয়ের দশকজুড়ে ব্যাপক ধড়-পাকড় মরক্কোতে নিরবচ্ছিন্ন গেরিলা তৎপরতার সাক্ষ্য দেয়। ৯/১১ এর পরবর্তী সময়ে নিরাপত্তা বাহিনীর দমন অভিযানে আল-কায়েদার একজন নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তি মোল্লা বিলাল এবং তার সাথে সংযুক্ত অপারেটরদের কিছু সেল ধরা পরলে সেখানে ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক নেটওয়ার্ক উত্থানের প্রমাণ প্রকাশিত হওয়া শুরু করে। মোল্লা বিলাল (আবদুর রহিম মুহাম্মদ আবদুল নাসারি নামেও পরিচিত) আল-কায়েদার একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং ২০০২ সালের নভেম্বরে গ্রেপ্তার হওয়ার পূর্ব অবধি তিনি আল-কায়েদা সার্কেলে 'আমিরুল বাহর' বা 'সমুদ্রের আমির' (Emir of the Sea) হিসাবে পরিচিত ছিলেন। প্রচলিত আছে, তিনি ২০০২ সালের ১২ অক্টোবর 'ইউএসএস কোল' হামলার মূল পরিকল্পনাকারী ছিলেন এবং ২০০২ সালের অক্টোবর মাসে ইয়েমেন উপকূলে অবস্থিত ফরাসি পেট্রোল ট্যাঙ্কার 'লিমবার্গ'এ স্পিডবোটের মাধ্যমে আত্মঘাতী বোমা হামলার সাথেও জড়িত ছিলেন। নিরাপত্তা সংস্থাসমূহের তথ্য মোতাবেক, মরক্কোতে বসবাসকারী যেসব সৌদি নাগরিক ২০০২ সালের মে মাসে জিব্রাল্টার প্রণালিতে ন্যাটো জাহাজে হামলার জন্য

সেগুলোর চলাচল পর্যবেক্ষণ করছিল, তাদের তত্ত্বাবধানকারীও ছিলেন মোল্লা বিলাল।

বর্তমানে মরক্কোর প্রধান ইসলামপন্থি দলটি হলো মরোক্কান 'ইসলামিক কমব্যাট্যান্ট গ্রুপ (GICM)', যা ১৯৯০ এর দশকের শেষদিকে আল-কায়েদা এবং GSPC এর সাথে ঘনিষ্ঠ সংযোগ সহকারে আবির্ভূত হয়েছিল। GICM এর সদস্যরা বিদেশে বেশ কয়েকটি সেল গঠন করেছিল। 'আল-কায়েদা ইন ইউরোপ' অধ্যায়ে এর বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে। তারা দেশের অভ্যন্তরেও ক্রমশ সক্রিয় হয়ে উঠেছে এবং মরোক্কান কর্তৃপক্ষ ইসলামপন্থি নেতাকর্মীদের দ্বারা এর নিরাপত্তা সংস্থাসমূহে অনুপ্রবেশ নিয়ে শঙ্কিত। উদাহরণস্বরূপ, ২০০৩ সালের জানুয়ারিতে, একজন সেনা সার্জেন্ট, ইউসুফ আমানিকে মেকনেসে একটি GICM সেলের জন্য গুর্সিফ ব্যারাক থেকে বেশকিছু কালাশনিকভ হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

GICM কর্তৃক মরক্কোর অভ্যন্তরে প্রথমবারের মতো বড় ধরনের হামলা সংগঠিত হয় ১৬ই মে ২০০৩ সালে। সেইদিন চৌদ্দজন আত্মঘাতী বোমা হামলাকারী একইসময়ে একটি ইহুদি কমিউনিটি সেন্টার, একটি স্প্যানিশ রেস্তোঁরা, একটি হোটেল, বেলজিয়ামের কনস্যুলেট এবং মরক্কোর বৃহত্তম শহর ক্যাসাব্ল্যাঙ্কার ইহুদি কোয়ার্টার লক্ষ্য করে হামলা চালায়। দুজন হামলাকারী তাদের কর্মসম্পাদনের পূর্বে আটক হলেও বাকিরা সফল হয়েছিল। এতে পঁয়তাল্লিশজন মানুষ নিহত হয় এবং প্রায় শতাধিক মানুষ আহত হয়। এই হামলা আল-কায়েদার চিহ্নিতকারী সকল বৈশিষ্ট্যই বহন করে এবং সৌদি আরবের রিয়াদে আল-কায়েদার দায় স্বীকারকৃত অনুরূপ আরেকটি হামলার মাত্র চারদিন পর এটি সংঘটিত হয়েছিল।

মরোক্কান সরকার এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ব্যাপক বর্ধিত সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী আইন প্রণয়ন করে এবং আমেরিকা, ফ্রান্স এবং স্পেনের সাথে জোটবদ্ধ হওয়ার পাশাপাশি জনগণকে প্রশান্ত করার লক্ষ্যে আরও উদার ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হয়। এটা প্রতীয়মান হয়েছিল যে, এই পদক্ষেপগুলোর কিছুটা হলেও সুফল পাওয়া গেছে এবং প্রতিবেদন অনুযায়ী বেশকিছু সেল এবং নেটওয়ার্কের বিলোপ সাধন হয়। তবে ২০০৬ সালের গ্রীষ্মে একটি অভিযানের সময়, মরোক্কান পুলিশ GICM, GSPC, দ্য লিবিয়া ফাইটিং গ্রুপ এবং কয়েকটি ছোট তিউনিসিয়ান গ্রুপের একীভূত হওয়া বিষয়ে বেশকিছু নথি আবিষ্কার করে। এর ফলে প্রতীয়মান হয় যে, AQIM এর নীল নকশাটি ইতিমধ্যে প্রস্ফুটিত হয়েছিল। কিন্তু ২০০৭ সালের কিছু ধারাবাহিক ঘটনা এর সদ্যলব্ধ আত্মবিশ্বাসকে হ্রাস করে। ১১ মার্চ, ২৩ বছর বয়সী আবদুল ফাত্তাহ রায়দি ক্যাসাব্ল্যাঙ্কার একটি সাইবার

ক্যাফেতে আত্মঘাতী বেল্ট বিস্ফোরণের মাধ্যমে নিজেকে উড়িয়ে দেয়। যখন ক্যাফের মালিক লক্ষ্য করেছিল যুবকটি একপ্রকার চঞ্চলতা সহকারে জিহাদি ওয়েবসাইটসমূহ স্ক্যান করে যাচ্ছে তখন সে দরজা তালাবন্ধ করে পুলিশকে খবর দিয়েছিল। ২০০৩ সালের মে মাসে হামলার ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে রায়দীকে ইতিপূর্বে কারাবরণ করতে হয়েছিল। রায়দীর সেলের আরও চার সদস্যকে শনাক্তের পর পুলিশ ১০ই এপ্রিল তাদের গ্রেপ্তারের জন্য অভিযান চালায়। বাহ্যত সেই একই কায়দা অনুসরণ করে—যেটা রায়দীর নাটকীয় মৃত্যুর কারণ হয়েছিল, তিনজনই ধরা পড়ার পরিবর্তে নিজেকে উড়িয়ে দিয়েছিল এবং একজন পুলিশ অফিসারও এতে মারা যায়। অপর যুবকটি পুলিশের হাতে মারা পড়ে। ১৪ এপ্রিল ২০০৭ তারিখে আরও একটি হামলার প্রচেষ্টা করা হয়েছিল। এবারের লক্ষ্যবস্তু ছিল মার্কিন কনস্যুলেট, এর সংলগ্ন আমেরিকান ল্যাংগুয়েজ সেন্টার এবং বেলজিয়াম কনস্যুলেট নিয়ে গঠিত একটি প্রতীকী ত্রিভুজ। নিরাপত্তারক্ষীকে পথ জিজ্ঞাসা করায় উক্ত রক্ষীর সন্দেহের উদ্রেক হলে ওমর ও মুহাম্মদ মাহা নামক দুই ভাই মার্কিন কনস্যুলেটে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হওয়ার পর তাদের সুইসাইড বেল্টের বিস্ফোরণ ঘটায় এবং এর ফলে শুধু তারাই মারা গিয়েছিল।

এই সাম্প্রতিক হামলাগুলো ব্যর্থ অথবা পন্ড হয়ে গেলেও এসবকিছু একদল চরমপন্থি যুবকের মাঝে একটি বর্ধনশীল সংস্কৃতির ইঙ্গিত দেয়, যারা জিহাদ এবং শাহাদতকে ব্যাকুলভাবে কামনা করে এবং এই সন্দেহকে আরও জোরদার করে যে, আলজেরিয়ার মতো মরোক্কোও ইরাক ও আফগানিস্তানে গমনেচ্ছুক যোদ্ধাদের প্রস্তুতি নেওয়ার একটি আবাসস্থল হয়ে উঠেছে। এ ছাড়াও আত্মঘাতী বোমা হামলার ব্যবহার সেখানে আল-কায়েদার জড়িত থাকার ব্যাপারে জোরালো ইঙ্গিত প্রদান করে। মরোক্কো পুলিশ এই ঘটনাটি উদযাপন করতে তৎপর ছিল যে, তারা বিস্তৃত হত্যাকান্ডকে রোধ করে দিতে পেরেছে। তবে এটাও অনুধাবন করা আবশ্যক ছিল যে, এসব যুবকদের নিকট জিহাদের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা এতই গভীর ছিল যে, তাদের নিকট মৃত্যু অতি সামান্য কোনো কিছু ছিল। তাই বিনা দ্বিধায় তারা নিজেকে উড়িয়ে দিয়েছে। সম্ভবত, এই দিকে লক্ষ্য রেখে কর্তৃপক্ষের আনন্দিত হওয়ার পরিবর্তে বরং আরও বেশি সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। ক্যাসাব্ল্যাঙ্কা হামলার সময়নির্ধারণ একটি অধিকতর ভয়াবহ সম্ভাবনার দিকেই ইঙ্গিত করে, যেখানে AQIM ১১ এপ্রিল ২০০৭ তারিখে আলজিয়ার্স এবং ক্যাসাব্লাঙ্কায় যুগপৎ নাটকীয় আক্রমণের মাধ্যমে 'সন্ত্রাস' দৃশ্যে এর আগমন বার্তাই ঘোষণা করেছে।

তিউনিসিয়া

১৯৮৯ সালের নির্বাচনে যখন ইসলামিক দল 'হারাকাত আন-নাহদা' অপ্রত্যাশিত ভালো ফলাফল করে, তিউনিসিয়ার রাষ্ট্রপতি হাবিব বোর্গিবা এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ দলটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। দেশটির উক্ত নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার পর থেকে এর নতুন নামকরণ করা হয়েছিল আন-নাহদা (রেনেসাঁ)। আন-নাহদার প্রধান রশিদ ঘানুশিকে তার অনুপস্থিতিতে মৃত্যুদণ্ডের রায় দেওয়া হয়েছিল এবং বর্তমানে তিনি লন্ডনে বাস করছেন। এই বর্বর প্রতি-আচরণের পরও ঘানুশি তার দেশের গণতান্ত্রিক ঘাটতির শান্তিপূর্ণ সমাধানের আশাবাদী রয়েছেন। আল-কায়েদাসহ বহু চরমপন্থি ইসলামিক দলসমূহ কর্তৃক তাকে নিজেদের দলে ভেড়ানোর সকল আহ্বানকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং এর মাধ্যমে তাদের শত্রুতা অর্জন করেছেন।[১]

তিউনিসিয়ান সরকার সক্রিয়ভাবে সকল ঘরানার ইসলামপন্থিদের সাথে মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছিল। এটি একমাত্র আরব দেশ, যেটি মহিলাদের হিজাব পরা নিষিদ্ধ করে দিয়েছে এবং ইসলামের ওপর এর সক্রিয় দমন-পীড়ন দেশটির তরুণদের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ তৈরি করেছে। নিপীড়িত হওয়ার ফলে রাজনৈতিক ইসলাম আরও প্রভাবশালী হয়ে ওঠে এবং অবধারিতভাবেই, মহিলারা প্রতিবাদ হিসাবে হিজাব পরা শুরু করে। পুনরায় সেই শক্তিশালী প্রতীককে রাজনৈতিক করা হয়েছে। বেকারত্ব বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে যুবকরা ক্রমবর্ধমানভাবে উগ্রপন্থি হয়ে ওঠে এবং তাদের মোহমুক্তি ঘটে। এরপর দেশটি ইউরোপের সাথে সংযুক্তির পদক্ষেপ গ্রহণ করলে (এটি ২০১০ সালে ইইউ-এর মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চলে যোগ দিতে চেয়েছিল) ইসলামপন্থিরা তীব্রভাবে এর বিরোধিতা করে।

তিউনিসিয়া প্রথমবারের মতো আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট হামলার অভিজ্ঞতা লাভ করে ২০০২ সালের ১১ এপ্রিল তারিখে। সেইদিন ড্যেরবাতে অবস্থিত 'লা ঘিরিবা' সিনাগগের বাইরে একটি আত্মঘাতী ট্রাক বোমা বিস্ফোরিত হলে উনিশ জন মানুষ নিহত এবং কয়েক ডজন মানুষ আহত হয়। প্রাথমিকভাবে তিউনিসিয়ার কর্তৃপক্ষ সাংবাদিকদের জানিয়েছিল যে, সড়ক দুর্ঘটনায় একটি গাড়ি বিস্ফোরণের ফলে এই ঘটনাটি ঘটেছে। কিন্তু আট দিন পরে আমার পত্রিকা, আল-কুদস আল-আরাবিতে আল-কায়েদার আবু হাফস আল-মাসরি ব্রিগেডের কাছ থেকে প্রেরিত একটি ফ্যাক্সে তারা উক্ত ঘটনার দায় স্বীকার করে। দর্শনার্থীদের নিকট খুব জনপ্রিয় তিউনিসিয়ার সেই দ্বীপটিতে হামলার ঘটনায় নাটকীয়ভাবে দেশটির প্রধান

[১] Interview with the author, London, 2006.

বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের উৎস পর্যটন শিল্পে মারাত্মক ধ্বস নামে এবং অর্থনীতি দশ বছর পিছিয়ে যায়। তিউনিসিয়া তখন যেকোনো ভিন্নমতাবলম্বী কার্যক্রম দমন করতে ক্রমবর্ধমানভাবে মরিয়া হয়ে ওঠে এবং কিছু সময়ের জন্য হলেও এটি সফল বলে মনে হয়েছিল।

জিহাদি কর্মকাণ্ডে ইন্টারনেটের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা উপলব্ধি করে সরকার স্মার্টফিল্টার ব্যবহার করে এটি পর্যবেক্ষণ ও সেন্সর করা শুরু করে, এবং এই মার্কিন প্রযুক্তিটি সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত কর্তৃপক্ষের নিকটও খুব পছন্দনীয়। 'সাইবার-ভিন্নমতাবলম্বী'দের খুঁজে বের করা শুরু হয় এবং তাদের মারধর অথবা কারাবন্দী করা হয়। মুখতার ইয়াহিয়াভি নামে একজন ব্লগার তার লেখাকে ব্লক করে দেওয়ায় এতটাই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন যে, তিনি এক মাসেরও বেশি সময় ধরে অনশন করেছিলেন। দেশের বাইরে, তিউনিসিয়ান নাগরিকদের ইউরোপের অসংখ্য আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট সেলে শনাক্ত করা হয়েছে, যেমনটি আমি 'আল-কায়েদা ইন ইউরোপ' অধ্যায়ে বর্ণনা করেছি। এবং সম্প্রতি ২০০৭ সালের জুন মাসে মিলানে একটি সেলকে ভেঙ্গে দেওয়া হয়, যাদের বিরুদ্ধে ইরাকে ভ্রমণের জন্য যোদ্ধাদের রসদ সরবরাহের অভিযোগ আনা হয়েছে এবং সেই সেলটি কেবল তিউনিসিয়ানদের সমন্বয়ে গঠিত ছিল। ইরাকের বিদ্রোহেও তিউনিসিয়ানরা বিশেষভাবে জড়িত। তিউনিশিয়ান ডিফেন্স লয়ার সামির বেন আমরের মতে—যিনি ইসলামপন্থা সংশ্লিষ্ট মোকাদ্দমার একজন বিশেষজ্ঞ—২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাস অবধি প্রায় ৭০০ তিউনিসিয়ান যুবককে ইরাক জিহাদে যোগ দেওয়ার সক্রিয় প্রচেষ্টার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

তিউনিসিয়ানরা আল-কায়েদার বহু হাইপ্রোফাইল আন্তর্জাতিক অভিযানে জড়িত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ—নর্দান অ্যালায়েন্সের কমান্ডার আহমেদ শাহ মাসউদের হত্যাকাণ্ড। ৯ সেপ্টেম্বর ২০০১ সালে দুইজন তিউনিসীয় সংবাদকর্মীর ছদ্মবেশে বিস্ফোরভরতি একটি ক্যামেরার সাহায্যে তাদের লক্ষ্যবস্তু সহকারে নিজেদেরকেও উড়িয়ে দিয়েছিল।[১] সাম্প্রতিক ক্রিয়াকলাপ সম্ভবত এই ইঙ্গিত প্রদান করে যে, দেশটির অভ্যন্তরে বিভিন্ন জিহাদি সেল পুনরায় সক্রিয় হয়ে উঠছে, সম্ভবত অন্যান্য মাগরেব দেশে সক্রিয় থাকা প্রত্যাবর্তনকারী যোদ্ধাদের সহায়তায়। ২০০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে তিউনিসে মার্কিন ও ব্রিটিশ দূতাবাসে হামলা চালানোর একটি পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করে দেওয়া হয়েছিল। তখন শহরটির দক্ষিণের একটি এলাকায় একটি সশস্ত্র ইসলামপন্থি দল এবং নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যে দশ দিন ধরে ভয়ংকর একটি বন্দুকযুদ্ধ পুরো এলাকাটিকে নাড়িয়ে দিয়েছিল।

---

[১] 'Trial of 4 tied to Afghan's Killers', New York Times, 30 March 2005.

উক্ত ঘটনায় বারোজন ইসলামপন্থি, তাদের নেতা ৩৬ বছর বয়সী লাসাদ সাসিসহ নিহত হয়—যিনি একজন সাবেক তিউনিসীয় পুলিশ কর্মকর্তা ছিলেন এবং তিনি গ্রেপ্তার এড়াতে মিলান থেকে আলজেরিয়ায় পালিয়ে এসেছিলেন। মিলানে তাকে GSPC এর সাথে সংশ্লিষ্ট একটি সেল পরিচালনার জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছিল। সাসি এবং আরও পাঁচজন মৃত যোদ্ধা সীমান্ত পাড়ি দিয়ে আলজেরিয়া থেকে তিউনিসিয়ায় এসেছিলেন। সাসি আলজেরিয়ায় আটলাস পর্বতমালায় তার সাথিদের একটি GSPC প্রশিক্ষণ শিবিরে উক্ত মিশনের জন্য প্রস্তুত করেছিল।[১]

এসব বিবরণী প্যান-মাগরেব জিহাদি কর্মকাণ্ডে তিউনিশীয়দের জড়িত থাকার ব্যাপ্তিকে প্রদর্শন করে, যেটাকে আল-কায়েদা বর্তমানে কাজে লাগাতে চাইবে। যেহেতু তিউনিসিয়ায় কোনো বড় ধরনের জিহাদি সংগঠন নেই, তাই দেশের অধিকাংশ উগ্র ইসলামপন্থিদের নিকট AQIM-এর সদস্যপদ লাভ করা একটি আকুল কামনা।

মৌরিতানিয়া

১৯৯৫ সালে মৌরিতানিয়া তৃতীয় আরব রাষ্ট্র হিসেবে ইসরাইল রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি প্রদান করে। অন্যদুটি হলো জর্ডান এবং মিশর, যাদের এই হিব্রু রাষ্ট্রটির সাথে সীমান্ত রয়েছে; এবং এই পদক্ষেপটি মৌরিতানিয়াকে সামগ্রিকভাবে সকল মুসলিমদের কাছে এবং বিশেষভাবে নিজস্ব জনগোষ্ঠীর কাছে অগ্রহণীয় করে তোলে। রাষ্ট্রপতি মুয়াবিয়া ওয়ালাদ আত-তায়াহ সরকার ২০০০ সালের ফিলিস্তিনি ইন্তিফাদার প্রাক্কালে ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য আরব লিগের আবেদনকেও প্রত্যাখ্যান করেছিল। ৩ আগস্ট ২০০৫ তারিখে একটি রক্তপাতহীন সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তায়াহ-এর সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা হলেও তার উত্তরসূরীরা এবং বর্তমান রাষ্ট্রপতি সাইয়িদি মুহাম্মদ ওয়ালুদুশ শাইখ আবদাল্লাহিও আমেরিকাপন্থি এবং ইসরাইলপন্থি বৈদেশিক নীতিরই অনুসারী এবং ২০০৭ সালের এপ্রিল মাসে আবদাল্লাহির শপথ অনুষ্ঠানে দেশটিতে এযাবৎকাল পর্যন্ত আগত সর্বাধিক জ্যেষ্ঠ মার্কিন প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিল।

সুদানের মতো মৌরিতানিয়াও—আরবি শাসকগোষ্ঠী এবং দরিদ্র, কৃষ্ণ-আফ্রিকান জনগোষ্ঠীর মধ্যে জাতিগত কলহের সম্মুখীন, যা ইসলামপন্থি দলগুলির অটল উত্থানের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। দেশটির অভ্যন্তরে বেশ কয়েকটি সালাফি গোষ্ঠী রয়েছে এবং যেসব মৌরিতানীয়রা প্রাক্তন GSPC এর পদকে সজ্জিত করেছিল, তারা সম্ভবত বর্তমানে AQIM কর্মীতে পরিণত হয়েছে। আবদাল্লাহি

[১] Craig S. Smith, 'Tunisia is Feared to be a New Base for Islamists', International Herald Tribune, 20 February 2007; www.iht.com/articles/2007/02/20/news/tunisia.php.

সরকার তার আলজেরিয়ার প্রতিবেশীর (যা মৌরিতানিয়ায় তেলভিত্তিক পণ্যাদির উৎপাদন ও বিতরণের ৫৫ শতাংশ উপভোগ করে) সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে এবং দেশদুটি দক্ষিণ আলজেরিয়া, পশ্চিম সাহারা এবং মালি নিয়ে গঠিত সাহারান ত্রিভুজে অস্ত্রব্যবসা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে একত্রে কাজ করে। তবুও, ইসলামপন্থি তৎপরতাকে দমিত রাখার সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, দেশটির অভ্যন্তরীন সূত্রসমূহ জানায়, সাম্প্রতিক মাসগুলিতে AQIM কর্তৃক মৌরিতানিয়া মরুপ্রান্তরে ছোট ছোট অস্থায়ী প্রশিক্ষণ শিবির পরিচালনার সংবাদ পাওয়া গেছে, যারা সেখানে গেরিলা কলাকৌশল এবং বিস্ফোরক ব্যবহারের নিয়মাবলি শিক্ষা দেয়। মাগরেবকে সাব-সাহারান আফ্রিকার সাথে সংযুক্ত করায় দেশটির বিশেষ কৌশলগত গুরুত্বও রয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের উৎসগুলির ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করার জন্য পশ্চিমারা ক্রমশ অন্যান্য তেল সরবরাহকারীদের দিকে ঝুঁকে পড়ার কারণে মৌরিতানিয়াও এই ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ব্রিটিশ এবং অস্ট্রেলিয়ান তেল কোম্পানি ২০০৩ সালে মৌরিতানিয়া উপকূলে তেল ক্ষেত্র আবিষ্কার করে।

লিবিয়া

আল-কায়েদার শীর্ষ তালিকায় লিবিয়ীরা সর্বদাই জোরালোভাবে উপস্থিত ছিল। আবু আনাস আল-লিব্বি ছিলেন ১৯৯৮ সালে মার্কিন দূতাবাস বোমা হামলার পেছনের অন্যতম প্রধান পরিকল্পনাকারী। আবু হাফস আল-লিব্বি ২০০৪ সালে তার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত আল-জারকাভির লেফটেন্যান্ট ছিলেন। আবু ফারাজ আল-লিব্বি ছিলেন আবু হাফস আল-মাসরির উত্তরসূরি, যাকে ২০০৫ সালে আটক করা হয়। ইবনে শেখ আল-লিব্বি আফগানিস্তানে আল-কায়েদার প্রশিক্ষণ শিবির আল-খালদুনের কমান্ডার ছিলেন। এই সকল ব্যক্তিরা কোনো না কোনো সময়ে লিবিয়ী ইসলামিক ফাইটিং গ্রুপের (আল-জামাআহ আল-ইসলামিয়াহ আল-মুকাতিলাহ বি-লিবিয়া— LIFG) সদস্য ছিলেন, যেটি লিবিয়ার বৃহত্তম স্থানীয় ইসলামপন্থি সংগঠন, যাদের আফগানিস্তানের জিহাদের সময় থেকেই ওসামা বিন লাদেনের সংস্থার সাথে সাথে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। বিন লাদেন যখন সুদানে স্থানান্তরিত হন, তখন তার সাথে আসা ৩০০ আফগান আরবের মধ্যে ৭০ জন ছিল লিবিয়ী, এবং প্রতিবেদন অনুযায়ী শত শত লিবীয় এখনও পাকিস্তানে এবং আফগানিস্তানে আল-কায়েদার সক্রিয় সদস্য হিসেবে রয়ে গেছেন।

আফগান লিবিয়ীরা কর্নেল গাদ্দাফিকে উৎখাত করার এজেন্ডা নিয়ে ১৯৯৫ সালে LIFG প্রতিষ্ঠা করেছিল। কর্নেল গাদ্দাফিকে তারা কাফের মনে করত। সেই একই বছর নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে তাদের সহিংস সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছিল এবং এতে উভয় পক্ষেরই কয়েক ডজন লোক মারা গিয়েছিল। ১৯৯৬ সালে দেশটির

পূর্বাঞ্চলের দারনাতে LIFG কর্মীরা আট পুলিশ সদস্যকে হত্যা করেছিল। ব্রিটিশ সরকার গাদ্দাফির এই প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে নিজেদের কাজে লাগাতে তৎপর ছিল, কারণ গাদ্দাফি সেই সময় অনবদ্যভাবে আমেরিকা ও তার মিত্রদের বিরোধিতা করছিল এবং ১৯৮৮ সালের লকারবি বিমান দুর্ঘটনার পেছনে তার জড়িত থাকার ব্যাপারটি ব্যাপকভাবে মনে করা হচ্ছিল।

ব্রিটিশ প্রাক্তন গোয়েন্দা ডেভিড শেলারের মতে, M-16 ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে LIFG কর্তৃক লিবিয়ী এই নেতাকে হত্যাপ্রচেষ্টার একটি অভিযানকে সমর্থন এবং অর্থায়নও করেছিল। সেখানে ইসলামপন্থি ও সরকারি বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ এক দশকেরও বেশি সময় ধরে পর্যায়ক্রমে অব্যাহত রয়েছে। ৩০শে মে ২০০৫ সালে, দার্নায় বেশ কয়েকজন LIFG যোদ্ধাকে গ্রেপ্তারের প্রতিক্রিয়া হিসাবে, আমার পত্রিকায় লিবিয়ার একটি আল-কায়েদা সেল বার্তা প্রেরণ করেছিল, যেটা 'ফিল্ড কমান্ডার আবুল বার-আল-লিবির স্বাক্ষরযুক্ত ছিল। সেখানে 'যদি আমাদের বন্দীদের মুক্তি না দেওয়া হয় তবে অবিশ্বাসী মুরতাদদের মাথা এক এক করে ফেলে দেওয়া হবে' প্রভৃতি হুমকির বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সম্ভবত সেই সময় সেলটির উল্লেখযোগ্য কোনো আক্রমণ চালানোর সক্ষমতা ছিল না। লিবিয়ার কর্তৃপক্ষ আপাতত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনেছে বলে মনে হলেও ইতিমধ্যেই সেখানে আল-কায়েদার স্পষ্ট উপস্থিতি রয়েছে এবং AQIM নিজেদের অবস্থান আরও শক্তিশালী হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ইরাকে লিবীয় জিহাদিদের সক্রিয় অভিজ্ঞতা অর্জন নিশ্চিতভাবেই একটি উদ্বেগজনক বিষয়। এমনকি LIFG গাদ্দাফির বিরুদ্ধে অভ্যন্তরীণ লড়াইয়ের দিকে মনোনিবেশ করার সিদ্ধান্ত নিলেও, স্বতন্ত্র ব্যক্তিবর্গ তাদের অনুভূত বৃহত্তর শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য AQIM এ যোগ দিতে কোনো কুণ্ঠাবোধ করবে না।

উপসংহার

AQIM আল-কায়েদা নেটওয়ার্কের ক্রমবর্ধমান বিশ্বায়নের একটি লক্ষণমাত্র। মার্কিন নেতৃত্বাধীন ইরাক আক্রমণ এর জন্য প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে এবং বর্তমানে সেটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং আল-কায়েদা—উভয়ের জন্যই একটি মূল চাবিকাঠি হয়ে উঠেছে। মরক্কোর ইউনিভার্সিটি অফ হাসান II আল-মোহাম্মদিয়ার রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক মুহাম্মাদ দরিফ এটাই লিখেছেন যে—'আল-কায়েদা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্র্যাটেজি একই। উভয়েই ইরাকে জয়লাভ করতে চায়, যাতে তারা সমগ্র অঞ্চলটিতেই পরিবর্তন আনতে পারে।'[১]

[১] Craig Whitlock, 'Terrorist Network Lures Young Moroccans to War in Far-Off Iraq', Washington Post, 20 February 2007.

সেখানকার বিশেষজ্ঞদের মতে GIA এর আতঙ্কের বছরগুলির পরে জনগণের কাছে AQIM তুলনামূলকভাবে জনপ্রিয়, যেহেতু এটি বেসামরিক নাগরিকদের বদলে সামরিক, পুলিশ এবং বহুজাতিক সংস্থাগুলোকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছে। অধিকন্তু, আলজেরিয়ান সরকার দুর্বল প্রেসিডেন্টের শাসনাধীন এবং এটি মোটেই সুরক্ষিত নয় এবং তার কোনো প্রত্যক্ষগোচর উত্তরসূরিও নেই। ইতিহাস এটাই বলে যে, কেন্দ্রীয় সরকার যত বেশি দুর্বল হয়, ইসলামপন্থি সংগঠনগুলো ততবেশি ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করে (সোমালিয়া এ ক্ষেত্রে একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ)। এমনকি আল-কায়েদার নিকটতম সূত্রসমূহ এর দীর্ঘমেয়াদে টিকে থাকার সম্ভাবনা নিয়ে খুবই সাবধানী। আফগান জিহাদের সময় আলজেরীয়রা বিশেষভাবে তর্কপ্রবণ এবং শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী হিসেবে দুর্নাম অর্জন করেছিল এবং মাগরেবের ইসলামপন্থি দলগুলির রেকর্ড বিশ্লেষণেও দেখা যায়, সেগুলো অভ্যন্তরীণ বিরোধ, দলাদলি এবং বিভক্ত গোষ্ঠী দ্বারা ভরপুর।

দ্রোকদাল আরবিভাষী বারবার গোষ্ঠীগুলোর সাথে মৈত্রী স্থাপনের ব্যাপারে সাবধানী ছিলেন এবং মুখতার বেলমুখতার—যে ১১ এপ্রিলের হামলার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে একটি বৈঠকে (২০০৭ সালের মে মাসে বিসক্রায়) সমালোচনা করেছিল—তার সাথে মতানৈক্য নিরসনে দক্ষ কূটনীতি প্রয়োগ করেছিলেন। আলজেরিয়ার সূত্রসমূহ জানিয়েছে, উক্ত বৈঠকে কার্যপ্রণালিসংক্রান্ত কিছু মাত্রার সহযোগিতা ও সম্মতিতে পৌঁছানো হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, উভয় পক্ষই ক্লাসিকাল সশস্ত্র পন্থার পরিবর্তে যেটা পূর্বে বেলমুখতারের পছন্দসই ছিল, বোমা হামলার জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করা নিয়ে (যেমন, মোবাইল ফোন, স্যাটেলাইট ফোন) ঐকমত্য পোষণ করেছে। দ্রোকদালের নেতা থাকার বিষয়টিও একেবারে সুনিশ্চিত নয়। আমার এই লেখার সময় (অক্টোবর ২০০৭) আলজেরিয়ার কিছু সূত্র দাবি করেছে তাকে হয়তো নেতৃত্বের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হতে পারে।

২০০৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে হাসান হাত্তাব AQIM এর গুপ্তহত্যার ঝুঁকির বদলে কর্তৃপক্ষের কাছে নিজেকে সোপর্দ করে সাধারণ ক্ষমা গ্রহণ করেন। AQIM দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার মূল বিষয়টি নেতৃত্বের প্রতি সম্মিলিত আনুগত্য বজায় রাখার সক্ষমতার ওপরও নির্ভরশীল। AQIM যে আরেকটি প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে পারে সেটা হলো, আলজেরিয়ান ইসলামপন্থি গোষ্ঠীগুলোর অখণ্ডতায় একটি দীর্ঘস্থায়ী অনাস্থা, যারা প্রায়শই সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টদের দ্বারা অনুপ্রবেশের শিকার হয়। যেমনটা ঘটেছিল GIA এর ক্ষেত্রে এবং এর ফলেই তারা সর্বনাশা পরিণামের সম্মুখীন হয়েছে। যদিও বর্তমানে, এরূপ নিদর্শন দেখা যাচ্ছে যে,

AQIM নেতৃত্ব অতীত অভিজ্ঞতা এবং আল-কায়েদার অন্যান্য শাখার উদাহরণসমূহ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছে।

সূত্রসমূহ আমাকে জানিয়েছে, উদাহরণস্বরূপ তারা বর্তমানে নিরাপত্তা এবং সামরিক সংস্থাগুলো থেকে নিজেদের কর্মী সংগ্রহের জন্য দৃঢ় প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, যে বিষয়টি সৌদি আরবে অত্যন্ত কার্যকর প্রমাণিত হয়েছিল। তবু এটি নিশ্চিত নয় যে, অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত গোষ্ঠীসমূহ, যেমন (GICM)—যাদের মধ্যে রেষারেষির ইতিহাস রয়েছে, তারা AQIM এর সামগ্রিক নেতৃত্বকে মেনে নেবে। এটি হওয়ারই সম্ভাবনা বেশি যে, AQIM এর নন-আলজেরীয় সদস্যরা অন্য সংস্থাগুলি থেকে দলত্যাগী আথবা অনভিজ্ঞ থাকবে। ৫ জুন ২০০৭ তারিখে বিভিন্ন ইসলামি ওয়েবসাইটগুলিতে পোস্ট করা একটি ভিডিও থেকে এর সম্ভাবনা প্রমানিত হয়। 'ম্যাসেজ ফ্রম দ্য ইয়ুথ অফ দ্য আল-গুরাবা ক্যাম্প টু দ্য ইসলামিক ন্যাশন' শিরোনামের ভিডিওতে বেশকিছু মরোক্কানকে দেখা যায় এবং ভিডিওটির শেষে আবু আবদুর রহমান আল-মাগরেবি নামক একজন জিহাদি বলেন—'আমি মুসলিম যুবকদের, এবং বিশেষত মরোক্কর যুবকদের বলবো, তোমাদের মাল-সামানা গুছিয়ে আলজেরিয়ার পর্বতে চলে এসে আল্লাহর ডাকে সাড়া দাও।'

এই সংগঠনটির বর্তমান সদস্যসংখ্যা কত, তা স্পষ্ট নয় এবং অনুমান করা হয় কয়েক শত থেকে হাজারের মধ্যে। তবে সংখ্যা যতই কম থাক না কেনো, AQIM এর নিরবচ্ছিন্ন উপস্থিতি এরূপ 'ফাটল' তৈরির জন্য যথেষ্ট, যা সরকারি কাঠামোকে হুমকির মুখে ফেলতে পারে। নতুন AQIM যদি তার একতা, শক্তি এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে তবে উত্তর আফ্রিকার অগনিত বিক্ষুব্ধ যুবকদের জন্য এটি একটি ম্যাগনেট হয়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে। অধিকন্তু, যেসব ইরাক ফেরত অভিজ্ঞ যোদ্ধারা নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করতে পারবে না, এটি তাদের জন্য একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থলে পরিণত হতে পারে। আলজেরিয়ার বৈচিত্র্যময় ভূখণ্ড এবং জনশূন্যতা কেবল তোরাবোরার সাথেই তুলনীয় হতে পারে এবং আফগানিস্তানের বিপরীতে, আলজেরিয়া হবে একটি আরবিভাষী অতিথিসেবক। এই গোষ্ঠীটি যদি অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ এবং কলহ দ্বারা ভেঙে না পড়ে, তবে AQIM-এর উপস্থিতি পাশ্চাত্য স্বার্থ ও তাদের স্বদেশের জন্যও একটি মারাত্মক বিপত্তি ডেকে আনতে পারে।

অষ্টম অধ্যায়

আল-কায়েদা ইন ইউরোপ
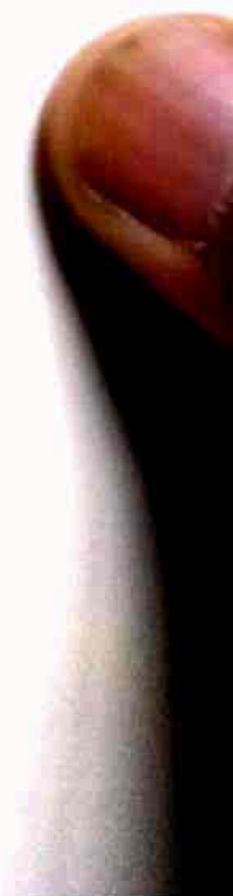
ইউরোপে আল-কায়েদা

'কোন ধর্মমতে তোমাদের মৃতরা নিরীহ বলে বিবেচিত হয় কিন্তু আমাদের মৃতরা তোমাদের নিকটে মূল্যহীন? কোন যুক্তিতে তোমাদের রক্তকে আসল এবং আমাদের রক্তকে পানির চেয়েও সস্তা মনে হয়? পরিপূরক ব্যবস্থা ন্যায়বিচারেরই অংশ। যারা বৈরিতার সূত্রপাত ঘটায় তারাই ন্যায়বিরুদ্ধ।'

—ওসামা বিন লাদেন,
'টু দ্য পিপলস অফ ইউরোপ'
১৫ এপ্রিল ২০০৪

২০০৪ সালের ১১ মার্চের মাদ্রিদ বোমা হামলা, ২০০৫ সালের ৭ জুলাই লন্ডন বোমা হামলা, ডাচ চলচ্চিত্র নির্মাতা থিও ভ্যান গগের হত্যাকাণ্ড, ড্যানিশ কার্টুনের বিরুদ্ধে সহিংস বিক্ষোভ এবং ইউরোপীয় মাটিতে ইসলামিক জঙ্গিদের দ্বারা অন্যান্য বহু ক্রিয়াকলাপ স্পষ্ট করে দেয় যে, জিহাদ এখন আর পৃথিবীর প্রত্যন্ত কোনো অঞ্চলে সংঘটিত কোনো যুদ্ধ নয়। অন্যদিক থেকে পর্যবেক্ষণ করলে, ইউরোপ এখন নিজেকে একটি প্রধান লক্ষ্যবস্তু এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও এর মিত্রদের বিরুদ্ধে আল-কায়েদার দ্বিতীয় যুদ্ধক্ষেত্র হিসাবে আবিষ্কার করেছে। ঠিক যেভাবে আফগান ও বসনিয়াযুদ্ধ—যুদ্ধভিজ্ঞ মুজাহিদদের প্রত্যাবর্তনের দুটি ঢেউ প্রসূত করেছিল এবং যাদের অনেকেই ইউরোপে আশ্রয় পেয়েছিল; ইরাকের যুদ্ধটিও সেভাবে পশ্চিমে তাদের ধর্মতাত্ত্বিক বার্তা এবং সামরিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য নিবেদিতপ্রাণ জিহাদিদের একটি তৃতীয় ঢেউ তৈরি করছে। শুধু পার্থক্য হলো, ১৯৯০ এর দশকের গোড়ার দিকে আশ্রয় প্রার্থনা করা আফগান আরবরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপকে তাদের বৈধ শত্রু হিসাবে না দেখলেও, ইরাক থেকে প্রত্যাবর্তনকারীরা নিশ্চিতভাবেই তাদের সেভাবে গণ্য করে।

এ ছাড়াও, ইউরোপ এবং ইরাকের মাঝে প্রণোদিত এবং কখনো কখনো আল-কায়েদার কেন্দ্রীয় নেতৃবর্গের দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত মুজাহিদদের একটি দ্বিমুখী প্রবাহ বিদ্যমান। কিছু কিছু ইউরোপীয় দেশে বিশেষত ইতালিতে, 'জিহাদি পর্যটক'দের উপস্থিতি লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এরা সাধারণত উত্তর আফ্রিকান মুসলমান, যারা আবাসনের জন্য আবেদন করার উদ্দেশ্যে নিয়ে ইউরোপীয় শহরগুলিতে

আগমন করে না, বরং তাদের স্বদেশিক লড়াই অথবা ইউরোপের অভ্যন্তরে সম্ভাব্য আক্রমণ পরিচালনা জন্য সদস্য সংগ্রহ এবং সেল নির্মাণের উদ্দেশ্য নিয়েই আগমন করে।

ইরাক যুদ্ধ 'ঘরোয়া জিহাদি' নামক আরেকটি নতুন ধারণার জন্ম দিয়েছে, যারা তাদের প্রাক্তন আশ্রয়দাতাকে ধ্বংস করার জন্য সদা প্রস্তুত। তারা হলো দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রজন্মের মুসলিম অভিবাসী, যারা তাদের অধিকতর সহিষ্ণু পিতামাতার প্রজন্ম কর্তৃক পরিগৃহীত দ্বিতীয় স্তরের সামাজিক মর্যাদা নিয়ে অসন্তুষ্ট ও অপমানিত। সমকক্ষ মুসলমানদের ওপর সংগঠিত নিপীড়নের নিরবচ্ছিন্ন মিডিয়া ও অনলাইন রিপোর্ট এবং এর পাশাপাশি বর্ণবাদ ও ইসলামফোবিয়ার নিজস্ব অভিজ্ঞতা তাদের ক্রোধে আরও জ্বালানি সরবরাহ করে। যে ক্রমবর্ধমান নিবিড় পর্যবেক্ষণ এবং সন্দেহের অধীনে ইউরোপের ৩২ মিলিয়ন মুসলমানরা বর্তমানে নিজেদের আবিষ্কার করছে, ভবিষ্যতে এসব মুসলিমের ওপর এর গুরুতর প্রভাব পড়বে। কারণ, এর ফলে মিলিট্যান্ট ইসলামের আবেদন আরও প্রতিপালিত এবং বিস্তৃত হচ্ছে। তদুপরি, ইউরোপ 'সাংস্কৃতিক ও নৈতিক লড়াই' নামক একটি নতুন ধরনের জিহাদের রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে, যেটা ওসামা বিন লাদেন কর্তৃক ২৩ এপ্রিল ২০০৬ তারিখের অডিও বার্তাতে চিহ্নিত করা হয়েছিল। এটি ডেনমার্কে নবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিদ্রূপকারী কার্টুন প্রকাশ পরবর্তী দাঙ্গা, 'ধর্ম অবমাননাকারী' চলচ্চিত্র নির্মাতা থিও ভ্যানগগের হত্যাকাণ্ড, ফ্রান্সে হিজাব বিতর্ক প্রভৃতির মাধ্যমে সবচেয়ে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে।[১]

ইউরোপে আল-কায়েদার উপস্থিতি বৈচিত্র্যময় এবং অতিশয় চোরাগোপ্তা। প্রায়শ কোনো এজেন্ডার অংশীদার অন্যান্য ইসলামি গোষ্ঠীগুলির মাধ্যমে অথবা ইন্টারনেটের মাধ্যমে অর্জিত অনুপ্রেরণা, দক্ষতা এবং যোগাযোগে স্ব-প্রণোদিত সেলগুলির মাধ্যমে তারা প্রকাশ লাভ করে। প্রবীণ এবং অভিজ্ঞ প্রাক্তন-মুজাহিদ রিক্রুটারদের দ্বারা গঠিত এবং নেতৃত্বদানকারী পরস্পর সংযুক্ত সেলের সময়কাল অনেক পূর্বেই ফুরিয়ে গিয়েছে। এই বিষয়টি নতুন নতুন জিহাদি সেলগুলোর কর্মতৎপরতা এবং তাদের সন্ধান পাওয়া গোয়েন্দা সংস্থাগুলির জন্য বিশেষভাবে দুঃসাধ্য করে তুলেছে এবং আল-কায়েদার সমৃদ্ধিলাভের জন্য একটি আদর্শ পরিস্থিতি তৈরি করেছে।

---

[১] সেপ্টেম্বর ২০০৪ সালে ফরাসি সরকার স্কুলে মুসলিম ছাত্রীদের হিজাব পরিধান নিষিদ্ধ ঘোষণা করে আইন প্রণয়ন করে।

ইউরোপে ইসলাম : একটি ঐতিহাসিক সংযোগ

অষ্টম শতাব্দীর পর থেকে ইসলাম ইউরোপীয় ইতিহাসে প্রথমে স্পেনে এবং তারপরে বলকান অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে।

স্পেন

সমগ্র আরব বিশ্ব থেকে আগত মুসলিম বাহিনী ৭১১ সালে উত্তর আফ্রিকা থেকে অভিযান চালিয়ে ইবেরীয় উপদ্বীপের অধিকাংশ এলাকা জয় করে নেয় এবং ৭৫৬ থেকে ১০৩১ সাল পর্যন্ত আন্দালুসীয় উমাইয়া রাজবংশ উক্ত অঞ্চলকে শাসন করে। তখন এর রাজধানী ছিল কর্ডোভা। তৃতীয় আবদুর রহমান কর্তৃক ৯২৯ সালে প্রতিষ্ঠিত খেলাফত ১০৩১ সালের গৃহযুদ্ধ অবধি স্থায়ী ছিল এবং এই সময়কালটি আন্দালুসিয়ার 'স্বর্ণযুগ' হিসাবে ব্যাপকভাবে বিবেচিত হয়; যদিও অবশেষে খ্রিষ্টানরা ১৪৯২ সালের পূর্বে মুসলমানদের সেখান থেকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারেনি।

মুসলিম স্পেন ছিল ইউরোপের বাকি অংশের জন্য সভ্যতার একটি আলোকবর্তিকা। খিলাফতের রাজধানী কর্ডোভায় তখন বাধানো এবং প্রজ্বলিত সড়কপথ ছিল। এ ছাড়াও ছিল উঁচু উঁচু বইয়ের দোকান এবং সত্তরটিরও বেশি গ্রন্থাগার। বাকি ইউরোপ কীভাবে কাগজ তৈরি করতে হয় সেটা জানার ৪০০ বছর পূর্বের অবস্থা হলো এটি। সেখানে আরব এবং ইউরোপীয় উভয় বিশ্ব থেকেই শিক্ষার্থীরা শিক্ষালাভের জন্য আগমন করত। চিকিৎসা, জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিত, অ্যালজেবরা (একটি আরবি শব্দ) অর্থাৎ বীজগণিত, আইন, ইতিহাস, ফার্মাকোলজি ইত্যাদি আরও অন্যান্য ক্ষেত্রে ইসলামিক আন্দালুসিয়ার অগ্রগতি এমন এক উত্তরাধিকারের সূচনা করেছিল, যা পরবর্তী শতাব্দীর পর শতাব্দী-যাবৎ ইউরোপকে উপকৃত করেছে। কমলালেবুর বাগান—যা আজকের ইউরোপকে বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে, সেই ফলগুলো মধ্যপ্রাচ্য থেকে আমদানি করা হয়েছিল। যেমনটা হয়েছিল সেচ কলাকৌশলের ক্ষেত্রেও, যার ফলে সেগুলোর শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে।

বলকান অঞ্চল

অটোমান সাম্রাজ্য ১২৯৯ থেকে ১৯২২ পর্যন্ত, পুরো সাত শতাব্দী যাবৎ বিস্তৃত ছিল। ১৫১৭ সালের পর থেকে অটোমান সুলতানরা একইসাথে ইসলামের খলিফাও ছিলেন। অটোমান সাম্রাজ্য খিলাফত বা ইসলামিক রাষ্ট্রের সমার্থক ছিল, যে বিষয়টি আল-কায়েদা মতাদর্শীরা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত দেখতে চায়।

১৪৫৩ সাল থেকে ১৬৮৩ সালের নিষ্পত্তিমূলক ভিয়েনা যুদ্ধের পূর্ব অবধি, দ্রুতগতিতে বর্ধনের ফলে দক্ষিণ-পূর্ব এবং মধ্য ইউরোপের বেশিরভাগ অঞ্চল অটোমানদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। তবে ভিয়েনা যুদ্ধে পোলিশ এবং হাবসবার্গ সেনাবাহিনীর সম্মিলিত বাহিনীর কাছে অটোমানরা পরাজিত হয়েছিল। কিন্তু ১৯১৬ সালের সাইকস-পিকট চুক্তির পূর্ব অবধি অটোমান সাম্রাজ্য একটি মূখ্য হিসেবেই বিদ্যমান ছিল, যে চুক্তির ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ফরাসী ও ব্রিটিশরা অটোমান সাম্রাজ্যকে নিজেদের দখল অথবা নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়। ইউরোপের অভ্যন্তরে অটোমান প্রভাব বলকানদের মধ্যে সর্বাধিক স্থায়ী ছিল। কেবল মাত্র ১৯১২ সালে সার্বিয়া, মন্টিনিগ্রো, গ্রীস এবং বুলগেরিয়া পতনশীল সাম্রাজ্যের বাহিনীকে বহিষ্কারের জন্য একত্রিত হলে অটোমানরা সেখানে তাদের নিয়ন্ত্রণ হারায়। বর্তমানে, আলবেনিয়ার জনসংখ্যার ৭০ শতাংশ, বসনিয়া-হার্জেগোভিনায় ৪০ শতাংশ এবং ম্যাসাডোনিয়ায় ৩০ শতাংশ মুসলিম। এই ঐতিহাসিক পটভূমি আল-কায়েদার বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে স্পেন এবং বলকানের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে সহায়তা করে। কেননা, যদি কোনো অঞ্চল একবার দারুল ইসলাম বা মুসলিম ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে সেটি চিরকালের জন্য মুসলিম অঞ্চল হিসাবে পরিগণিত হয়।

আফগানিস্তান পরবর্তী পর্ব : ইউরোপে জিহাদিদের প্রথম অভিপ্রয়াণ

১৯৯২ সালে (যখন নাজিবুল্লাহকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়) আনুমানিক প্রায় ১৫,০০০ থেকে ২০,০০০ আফগান যুদ্ধভিজ্ঞ তাদের জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্তন করতে সমর্থ হয়নি, কারণ সেক্ষেত্রে সন্ত্রাসবাদী হিসেবে তাদের ফাঁসি অথবা কারাবাসের সম্মুখীন হতে হতো। এইসব ব্যক্তিদের জন্য তখন প্রধান তিনটি উপায় ছিল, যথা—হয়তো বসনিয়া অথবা চেচনিয়ার মতো সংঘাতময় অঞ্চলে গিয়ে জিহাদ চালিয়ে যাওয়া, অথবা ওসামা বিন লাদেনের সাথে যোগদান করা যিনি ১৯৯২ থেকে ১৯৯৬ সাল অবধি নিরাপদে সুদানে ভিত্তি গেড়েছিলেন, নয়তো পাশ্চাত্যে রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করা। বিন লাদেন সেই সময় ইসলামপন্থিদের জন্য পাশ্চাত্যে রাজনৈতিক আশ্রয়ের পুরোপুরি বিরোধী ছিলেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, তিনি স্বয়ং কোনো ইউরোপীয় রাষ্ট্রে বসবাসের চাইতে মৃত্যুকেই বেছে নেবেন। তিনি আমাকে ডা. আইমান আল-জাওয়াহিরির এই আশঙ্কাকেও প্রকাশ করেছিলেন যে, 'মুজাহিদিনের সন্তানরা এতে করে ইউরোপীয় হয়ে যাবে' এবং এমনকি তখন 'কাফের' রাষ্ট্রে বসতি স্থাপনের বিরুদ্ধে ফতোয়াও জারি

করেছিলেন।[১] এই সমস্যাটি তখনই মিটে গেল, যখন 'আল-জিহাদ'-এর মুফতি ড. সাইয়িদ ইমাম (আবদুল কাদের বিন আবদুল আজিজ) বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গকে এই ফতোয়া প্রদান করেন যে, 'অস্থায়ীভাবে ইউরোপে অবিশ্বাসীদের সাথে বসবাস করতে পারবেন, যতক্ষণ-না যথাযথ শরিয়ত বাস্তবায়নকারী এমন কোনো দেশ প্রতিষ্ঠিত হয়, যেখানে আপনারা গমন করতে পারবেন।' তিনি সুদানকে এরূপ কোনো দেশ হিসাবে বিবেচনা করেননি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে এবং ডিকলোনাইজেশন প্রক্রিয়া মোতাবেক বহু ইউরোপীয় রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত উদার অভিবাসন এবং রাজনৈতিক আশ্রয়-নীতি থেকে সুবিধা নিয়ে নব্বইয়ের দশকের প্রথমার্ধে হাজার হাজার আফগান-আরব পশ্চিমা ইউরোপীয় দেশগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সাদর সম্ভাষণী এবং সর্বাধিক উদার ছিল লন্ডন, যা ব্রিটিশ রাজধানীকে সকল ঘরানার জিহাদি এবং উগ্র ইসলামপন্থিদের চুম্বকে পরিণত করে। যেখানে তারা তাদের কাযকারবার নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে পারত।

আল-জাওয়াহিরি এই সময়কালের বহু পূর্বেই ইউরোপে শক্তিশালী যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন এবং ১৯৮০'র দশকের শেষদিকে আফগানিস্তান থেকে আহত মুজাহিদদের চিকিৎসার জন্য ইউরোপীয় দেশগুলোতে, প্রধানত অস্ট্রিয়া ও জার্মানিতে বেশ কিছু সফরের মাধ্যমে উক্ত যোগাযোগকে আরও দৃঢ় করেন। সেসব ভ্রমণগুলোর সময় তিনি ইউরোপীয় মসজিদগুলোতে বয়ানও পেশ করতেন। স্বয়ং বিন লাদেনসহ অন্যান্য আরও অনেক উদীয়মান আল-কায়েদা নেতা ১৯৮০'র দশকে জিহাদি প্রচেষ্টার পক্ষে সমর্থন জোগাতে ইউরোপ ভ্রমণ করেছিলেন। এই ইউরোপীয় পরিচিতিসমূহ আফগান জিহাদের সময় মুজাহিদদের কাছে পণ্য ও সরঞ্জাম প্রেরণের মাধ্যমে তাদের যোগ্যতা প্রমাণ করেছিল। আমি মনে করি না যে, আল-কায়েদার নেতৃবর্গের সেই সময় ইউরোপকে নিয়ে এটা ব্যাতিত ভিন্ন কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল অথবা এর মাঝে ইউরোপজুড়ে জিহাদি সেলের কোনো 'নেটওয়ার্ক' তৈরির কোনো কৌশল ছিল, যেমনটা মাঝেমধ্যেই বলা হয়। এটা আমার কাছে মনে হয় যে, ১৯৯০ দশকজুড়ে আফগান-আরবদের ইউরোপে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ছড়িয়ে পড়া এবং অন্যান্য ইসলামি আন্দোলন যেমন আলজেরিয়ার সালাফিস্ট গ্রুপ ফর প্রিচিং অ্যান্ড কমব্যাট (GSPC) এবং মরোক্কান ইসলামিক কমব্যাট্যান্ট গ্রুপ (GICM)—যারা ইউরোপে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল এবং পরবর্তী কালে আল-কায়েদার সাথে সংযোগ স্থাপন করেছিল—প্রভৃতির উত্থানের ফলে প্রায় স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এর বিকাশ ঘটেছে।

---

[১] Author's interview with Hani al-Sabai, director of the al-Maqrizi Centre for Historical Studies, London, April 2006.

বসনিয়া : জিহাদিদের পূর্ব-পশ্চিম মেলবন্ধন এবং ইউরোপে দ্বিতীয় অভিপ্রয়াণ

'বসনিয়ায় একটি চরম শক্তিশালী ইসলামিক মৌলবাদী উপস্থিতি বিদ্যমান, যার ক্ষতিপূরণ ইউরোপকে আগত কয়েক দশক ধরে প্রদান করতে হবে; কারণ বসনিয়াতে এই ঘাঁটি না থাকলে ইউরোপে কোনো সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা সম্ভব হতো না।'

—স্লোবোডান মিলোসেভিচ,
আদালতে দেওয়া বক্তব্য, হেগ,
নেদারল্যান্ডস।
৩ ফেব্রুয়ারি, ২০০৬

মুজাহিদদের আফগানিস্তান ত্যাগ করার সময়েই বসনিয়া থেকে জিহাদের নতুন ডাক উঠে আসে, যেটি আফগান-আরবদের জন্য আরেকটি বিকল্প উপস্থাপন করার পাশাপাশি ইউরোপের ইচ্ছুক স্বেচ্ছাসেবীদেরকেও লড়াইয়ে তাদের দাঁতের ধার বৃদ্ধি করার একটি সুযোগ নিয়ে আসে। ১৯৯২ থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত চলা বসনিয়ার গৃহযুদ্ধে প্রায় আড়াই লক্ষ থেকে তিন লক্ষ মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল এবং সেটি ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপে সংঘটিত সবচেয়ে রক্তাক্ত গণহত্যার লড়াই। নিহত অথবা বাস্তুচ্যুতদের অধিকাংশই ছিল বসনিয়ান মুসলিম। সেসময় প্রায় পাঁচ হাজার মুজাহিদ তাদের সাহায্যের জন্য ছুটে গিয়েছিল।[১] তুলনামূলকভাবে বসনিয়া আফগানিস্তানের তুলনায় ইউরোপীয় জিহাদের জন্য একটি আদর্শ রণক্ষেত্র ছিল যেখানে তারা সহজেই প্রবেশ করতে পারত। ভৌগোলিকভাবেও মধ্যপ্রাচ্য এবং ইউরোপের মধ্যখানে এর অবস্থানের জন্য এটি আল-কায়েদার মতাদর্শ এবং সংশ্লিষ্টতার পাশ্চাত্যমুখী সম্প্রসারণের জন্য একটি আদর্শ প্ল্যাটফর্মও ছিল। বসনিয়ায় যুদ্ধভিজ্ঞ আফগান-আরবরা পশ্চিম ইউরোপের অপক্ক রিক্রুটদের সাথে মিলেমিশে লড়াই করেছিল। জিহাদের বৈশ্বিক সম্প্রসারণে বিশেষত ইউরোপের মধ্যে এটি একটি প্রধান নিয়ামক হতে পারত। এখানে ইউরোপীয় পাসপোর্টধারী মুজাহিদরা কেবল একে অপরের সাথেই নয়, বরং আল-কায়েদার কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সাথেও সংযোগ স্থাপন করেছিল। ড. আইমান আল-জাওয়াহিরি ১৯৯৩ সালে বসনিয়ার আল-কায়েদা অভিযানের দায়িত্বে ছিলেন

---

[১] Evan Kohlmann, Al-Qa'ida's Jihad in Europe: The Afghan–Bosnian Network, p, xii.

এবং সম্ভবত স্বয়ং ওসামা বিন লাদেনও ১৯৯৩ সালে ভিয়েনা থেকে একটি বসনিয়ান পাসপোর্ট[১] উত্তোলন করে ১৯৯৪[২] থেকে ১৯৯৬ সালের মধ্যে তিনবার দেশটির মুজাহিদের শিবিরগুলো পরিদর্শন করেছিলেন।

যখন যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুজাহিদ ডেটন চুক্তির ফাঁকফোকর নিজেদের কাজে লাগায়, যেটি তাদের বসনিয়ায় থাকার অনুমতি দিয়েছিল—যদি তারা সেখানকার অধিবাসী মহিলাদের বিবাহ করে নেয়। এবং এর ফলে বোকিনজা দোঞ্জার মতো বেশ কয়েকটি ছোট ছোট সালাফিস্ট ছিটমহল স্থাপিত হয়, যেখানে শতাধিক ভীনদেশী যোদ্ধা আবাসন স্থাপন করেছিল। তবে এগুলো পাশ্চাত্যঘেঁষা বসনিয়ান মুসলিমদের নিকট খুব একটা পছন্দসই ছিল না, এবং আফগানিস্তানের অভিজ্ঞতার বিপরীতে এটি স্থানীয় মুসলিমদের সাথে টেকসই সম্পর্ক তৈরি করতে ব্যর্থ হয়। সুতরাং আল-কায়েদার বসনিয়ান অভিযান পরিপূর্ণ সফলতা লাভ করতে পারেনি।

মুজাহিদদের সিংহভাগ অন্যত্র আশ্রয় গ্রহনের আশায় বসনিয়া ত্যাগ করে। কানাডাসহ অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলি বসনিয়ান যোদ্ধাদের স্বাগত জানায়, যেমনটা তারা করেছিল আফগান আরবদের ক্ষেত্রেও। এর ব্যতিক্রম ছিল ফ্রান্স, যারা ১৯৯০-এর দশকজুড়ে আলজেরীয় সন্ত্রাসী হামলার শিকার হয়েছিল। তাই তারা আফগান কিংবা বসনিয়ান কোনো মুজাহিদকেই আশ্রয় দিতে অস্বীকৃতি জানায়। বসনিয়ান যুদ্ধভিজ্ঞদের যারা পাশ্চাত্যে সংস্থাপিত হয়েছিল, তারা দ্রুতই তাদের উপস্থিতি অনুভূত করায় বেশকিছু সফল এবং খর্বিত প্লটে জড়ানোর মাধ্যমে ৯/১১-এর হাইজ্যাকারদের কমপক্ষে দুইজন, নওয়াফ আল-হামজি এবং খালিদ আল-মিহদার ১৯৯৫ সালে বসনিয়াতে যুদ্ধ করেছিল। এ ছাড়াও ছিল আবদুল আজিজ আল-মুকরিন, যিনি পরবর্তী সময়ে আল-কায়েদা ইন অ্যারাবিয়ান পেনিনসুলার (সৌদি আরব) নেতৃত্ব দিয়েছিল।

ইউরোপে মুসলিম অভিবাসী

বর্তমানে বত্রিশ মিলিয়ন মুসলিম ইউরোপে বসবাস করছে যাদের অধিকাংশই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ইউরোপে উদ্ভূত 'ইকোনোমিক মিরাকল' এর ফলে ভালো বেতনের চাকরির প্রতিশ্রুতি দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে অভিবাসিত হয়েছিল। উক্ত সময়

[১] Many sources, including Wall Street Journal, 1 November 2001.

[২] একাধিক সূত্র বিশেষত সাংবাদিক ইভ-অ্যান প্রেন্টাইস দ্য হেগ আদালতে মিলোয়েভিয়ার বিচারের সাক্ষ্য দেওয়ার সময় বলেছিলেন যে, তিনি এবং ডের স্পিগেলের রেনাট ফ্লোটেল ওসামা বিন লাদেনকে ১৯৯৪ সালের নভেম্বরে বসনিয়ার প্রয়াত রাষ্ট্রপতি আলিজা ইজেতোবেগোভিচের কার্যালয়ে যেতে দেখেন।

থেকে দুই প্রজন্ম পর অনেক ইউরোপীয় দেশই এখন সেসব কর্মীদের প্রয়োজনের উদ্বৃতাংশ হিসেবে আবিষ্কার করে এবং ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের প্রত্যন্তে মুসলিম অভিবাসীদের (প্রায়শ বেকার) ঘেটো এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠী তৈরি করেছে। এসব যুবকরা এখন তাদের অবনমিত পরিস্থিতির প্রতিবাদে বিক্ষিপ্তভাবে দাঙ্গায় জড়িত হয়। এমনকি সেখানে যেসব মুসলিম যুবকরা সুশিক্ষিত এবং চাকরিজীবী (যেমন লন্ডন এবং মাদ্রিদ বোমা হামলার নেতৃত্বদ্বয়), তারাও বর্ণবাদ, ইসলামফোবিয়া অথবা ক্রমবর্ধমানভাবে পরস্পরবিরোধী সংস্কৃতি এবং নৈতিক মূল্যবোধভিত্তিক তাদের নিজস্ব স্বকীয় পছন্দের ফলে সামাজিক হেনস্তার অভিজ্ঞতার শিকার হয়ে থাকে। এসব তরুণ জনগোষ্ঠী ইসলামিক জঙ্গিদের পূর্বের প্রজন্ম কর্তৃক রিক্রুটিংয়ের জন্য সর্বাধিক উপযুক্ত, যাদের অনেকেই আফগান ও বসনিয়ান যুদ্ধের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন।

আবু মুসআব আল-সুরি (তার জীবনী বিশদভাবে এই অধ্যায়েই বর্ণিত হয়েছে) ১৯৯০ এর দশকে ইউরোপে বসবাসরত একজন সাবেক আফগান যোদ্ধা হিসেবে তার অভিজ্ঞতা লিখেছিলেন। ইউরোপে মুজাহিদরা কীভাবে তাদের সময় কাটাত এবং ১৯৯৭ সালে টনি ব্লেয়ার ব্রিটেনের ক্ষমতায় আসার পরে কীভাবে সবকিছু নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায়—এই উভয় দিকই তার বর্ণনায় স্পষ্ট হয়। তিনি বলেন—'লন্ডন ছিল ইসলামপন্থি গোষ্ঠী এবং তাদের স্ব স্ব দেশের সরকার বিরোধী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে একটি যোগাযোগ কেন্দ্র। আমরা ব্রিটেনের বাইরের জিহাদি নেতাদের সাথেও যোগাযোগ বজায় রেখেছিলাম, বিশেষত ডা. আইমান আল-জাওয়াহিরি—যিনি আমাকে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর ফোন করতেন এবং আমি লন্ডনের শহরতলির একটি টেলিফোন বুথে তার কলগুলো রিসিভ করতাম। জন মেজরের সরকার অত্যন্ত কুশলী ছিল এবং আমাদের সাময়িক শান্তিচুক্তি মেনে নিয়ে ব্রিটেন এবং এর জনগণের স্বার্থ সুরক্ষার জন্য খেটে গেছেন, যার সারকথা ছিল যে, আমরা কখনই ব্রিটেনকে টার্গেট করব না। যতক্ষণ না নিরাপত্তা বাহিনী আমাদের আগ বেড়ে ঘাটাতে আসে, ... ১৯৯৭ সালে টনি ব্লেয়ার ক্ষমতায় আসার পর তিনি এই অলিখিত বোঝাপড়াটি ছিন্নভিন্ন করে ফেলেন এবং মুজাহিদদের পেছন থেকে ছোড়া মারেন আইন পরিবর্তন এবং তাদের হয়রানির মাধ্যমে। আমি মনে করি এটা অনেক পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছিল যে, টনি ব্লেয়ার তখনই আমেরিকান ছত্রছায়ায় মুসলিমবিশ্বে আক্রমণ করার অভিপ্রায় ধারণ করেন।'

জার্মানি, ইতালি, স্পেন, নেদারল্যান্ডস, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক এবং ব্রিটেন প্রত্যেকেই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রত্যাবর্তনকারী মুজাহিদদের গ্রহণ করেছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের বীরত্বগাথা কাহিনি এবং ইসলামি পোশাকধারী এসব জিহাদিরা তাদের ইউরোপীয় অভিবাসী স্বদেশিদের থেকে একেবারে ভিন্ন। তারা ক্ষুব্ধ মুসলিম

তরুণদের তাদের পিতামাতার প্রজন্ম কর্তৃক শিকার হওয়া সামাজিক হেনস্থা এবং বয়কটকে সম্মুখে এনে তাদেরকে আরও ক্ষুব্ধ করে তোলেন। ইউরোপের অসংখ্য বিক্ষুব্ধ মুসলিম যুবকের অনুভূত 'ব্যক্তিত্ব সংকটে'র সমাধানও ইসলাম প্রদান করে। 'উম্মাহ' কনসেপ্ট এর মাধ্যমে—যেখানে জাতীয়তাবাদের কোনো তোয়াক্কা করা হয় না এবং বিচ্ছিন্নতা ও বিভক্তি একাত্মতা দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়।

নতুন প্রজন্মের সম্ভাব্য রিক্রুটদের প্রেক্ষাপটকে বিবেচনায় রেখে আল-কায়েদা নেতা আইমান আল-জাওয়াহিরি এবং প্রয়াত আবু মুসআব আল-জারকাভির সাম্প্রতিক ভিডিওগুলোতে (যথাক্রমে ২৭ এপ্রিল এবং ২৪ এপ্রিল ২০০৬) ইংরেজি সাবটাইটেল যোগ করা হয়েছিল। এমনকি সম্ভবত হলিউডের দৃশ্যকল্প দেখে বেড়ে ওঠা তরুণদের আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে ভিডিওর শুরুতে আল-জারকাভি মেশিনগান নিয়ে নিজেকে র‍্যাম্বো-স্টাইলে উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ইরাক-পরবর্তী ইউরোপীয় মাটিতে হামলাগুলোর বেশিরভাগ সংগঠনকারীই ছিল ইউরোপের দীর্ঘদিনের অভিবাসী বা অভিবাসীদের সন্তান।

ইউরোপের প্রথম প্রজন্মের জিহাদি নেতৃবৃন্দ

বহু গুরুত্বপূর্ণ আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিই ১৯৯০ এর দশকে অথবা এর পূর্বে ইউরোপে বাসস্থান গড়ে তুলেছিলেন এবং সেখান থেকে আল-কায়েদার কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সাথে যোগাযোগ বজায় রাখতেন। প্রথম প্রজন্মের বৈশ্বিক জিহাদিদের এই অভিপ্রয়াণই এখনকার সমগ্র ইউরোপজুড়ে বিদ্যমান জিহাদি সেলগুলোর অতিমাত্রিক সম্প্রসারণ এবং জটিল নেটওয়ার্কের ভিত্তিস্বরূপ ছিল। আবু মুসআব আল-জারকাভি অনেক পূর্বেই ইউরোপীয় নেটওয়ার্কের কৌশলগত গুরুত্বকে বুঝতে পেরেছিলেন এবং পাশ্চাত্য ও ইরাকের মাঝে মুজাহিদদের গমন-প্রস্থানের একটি দ্বিমুখী প্রবাহ বজায় রেখেছিলেন। ইউরোপীয় নেটওয়ার্ক কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং কীভাবে এর বিকাশ ও সম্প্রসারণ অব্যাহত রয়েছে, নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদসমূহ পাঠককে এর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রদান করবে।

১—আবু মুসআব আল-জারকাভি

এই ধারণা সুপ্রতিষ্ঠিত যে, প্রয়াত আল-জারকাভি সমগ্র ইউরোপজুড়ে জিহাদি সেলের নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আবু মুসআব আল-সুরির সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজায় রেখে কার্যক্রম পরিচালনা করতেন; যদিও অভ্যন্তরীণ কিছু সূত্র আমাকে জানিয়েছে যে, ব্যক্তিগত পর্যায়ে এই দুই ব্যক্তির মধ্যে মতভিন্নতা ছিল। সামগ্রিকভাবে আল-কায়েদার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক সেলগুলোর মূল নেতারা (এবং বিশেষত ইউরোপের মূল ভূখণ্ডের হামলার সাথে সংশ্লিষ্টরা) ছিল জর্দান

(আল-জারকাভির মতো) অথবা সিরিয়ান (আল-সুরির মতো) বংশোদ্ভূত। তবে, সাম্প্রতিক সেলগুলো নিজেদের সরাসরি আল-কায়েদা নামকরণের বদলে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রায় ত্রিশের অধিক সংগঠনের আওতাধীন, যাদের ধর্মতাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারা এবং লক্ষ্য আল-কায়েদার অনুরূপ। যেমন আলজেরিয়ার 'সালাফিস্ট গ্রুপ ফর প্রিচিং অ্যান্ড কমব্যাট (GSPC)' এবং 'মরোক্কান ইসলামিক কমব্যাট্যান্ট গ্রুপ (GICM)'। আল-জারকাভির আত-তাওহিদ ওয়াল-জিহাদ নেটওয়ার্কের সদস্যরা (যে দলটিকে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে আল-কায়েদা সংগঠনের সাথে একত্রিত করার পূর্বে নেতৃত্ব দিতেন) ৯/১১-এর পর বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং অনেকেই ইউরোপের দিকে যাত্রা করে। ২০০২ সালের এপ্রিল মাসে জার্মানিতে উক্ত গ্রুপের এগারো সদস্যকে আটক করা হয়েছিল। তারবার্তার প্রমাণসমূহ আল-জারকাভির সাথে তাদের নিয়মিত যোগাযোগ উন্মোচন করে। তারা অস্ত্রও সংগ্রহ করেছিল এবং বার্লিনে ইহুদি লক্ষ্যবস্তুতে হামলার পরিকল্পনা করেছিল।[১]

অন্যান্য যেসব সদস্যরা বাকি ইউরোপীয় দেশগুলিতে পরিযায়ী হয়েছিল, তারাও হয়তো এই এগারো জনের মতোই সক্রিয় রয়েছে। মরক্কোর আমের আল-আজিজি আল-জারকাভির একজন ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন, যিনি স্পেনে বসতি স্থাপন করেছিলেন এবং তার উত্তর আফ্রিকান স্বদেশিদের আবু দাহদাহর 'সোলজার্স অফ আল্লাহ' সেলের জন্য রিক্রুটের সাথে জড়িত ছিলেন। আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট এই গ্রুপটি ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে ২০০৪ সালের মার্চ মাসে মাদ্রিদের ট্রেন বোমা হামলার সাথে জড়িতরা এই সেলটি থেকেই উঠে এসেছিল।

আল-কায়েদার নেটওয়ার্কের কাছে এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হলো ইরাক এবং ইউরোপের মাঝে জিহাদিদের একটি দ্বিমুখী প্রবাহ। বিস্ফোরক ও শহরযুদ্ধে অভিজ্ঞ এবং ফ্রন্টলাইনে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এ জাতীয় যোদ্ধারা ইউরোপে প্রত্যাবর্তন করে আল-কায়েদার স্লিপার সেলের ভিত্তি তৈরি করে। এক দশকেরও বেশি সময় ধরে প্রতিষ্ঠিত যোগাযোগের মাধ্যমে আল-জারকাভি নতুন রিক্রুটদের গমনাগমন ও প্রশিক্ষণের জন্য প্রণোদিত এবং উৎসাহিত করতে সক্ষম ছিলেন। ইটালিয়ান গোয়েন্দা প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০০৪ সালে তারা কমপক্ষে দুটি সেল চিহ্নিত করেছিল, যার একটি ছিল মিলানে এবং অন্যটি ফ্লোরেন্সে। তারা সক্রিয়ভাবে ইরাকের জন্য আত্মঘাতী বোমা হামলাকারী ও যোদ্ধা সংগ্রহ করছিল। তখন জার্মানি, স্পেন এবং হল্যান্ডের অন্যান্য কিছু সেলের সাথে মিলানের

---

[১] Roger Boyes, 'Al-Zarqawi's Europe Cell Jailed', The Times, 27 October 2005.

সেলটির সংযোগও উঠে এসেছিল।[১] ২০০৬ সালে স্পেনের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট তিনটি সেল ভেঙে দেয় এবং পঞ্চাশজনকে গ্রেপ্তার করে, যাদের মধ্যে কয়েকজন ছিল আফগান-আরব এবং তারা সকলেই আল-জারকাভির কাছে প্রেরণের জন্য যোদ্ধা সংগ্রহ করছিল।[২] 'দ্য ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউন' একটি প্রতিবেদনে চল্লিশের অধিক ব্রিটিশ নাগরিককে আটকের খবর প্রকাশ করেছিল, যারা ইরাকের সুন্নি ট্রায়াংগেলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিল। এ ক্ষেত্রেও পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকায় ছিল আল-জারকাভি।[৩] প্রায় সব ইউরোপীয় দেশগুলির সাথে জড়িত এরূপ আরও অসংখ্য প্রতিবেদন রয়েছে। সম্ভবত আল-জারকাভির সবচেয়ে চমকপ্রদ রিক্রুট ছিল মুরিয়েল দেগউক। সে ছিল আল-জারকাভির তৃতীয় মহিলা আত্মঘাতী বোমা হামলাকারী, যে বাকুবাহ শহরের কাছে ইরাকি পুলিশকে লক্ষ্য করে হামলা চালিয়ে নিজেকে উড়িয়ে দিয়েছিল। সে বেলজিয়ামের নাগরিক ছিল এবং মরোক্কান বংশোদ্ভূত একজন বেলজিয়ানের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সময় ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং পরবর্তি সময়ে তার স্বামীই তাকে ইরাকের জন্য রিক্রুটিং করেছিল।

২—আবু মুসআব আল-সুরি

যদিও ২০০৫ সালের সেপ্টেম্বরে তাকে আটক করা হয়েছে এবং তার বর্তমান অবস্থান জানা যায় না, তবুও আবু মুসআব আল-সুরি একজন শীর্ষস্থানীয় আল-কায়েদা মতাদর্শিক এবং কৌশলবিদ হিসেবেই বিদ্যমান রয়েছেন এবং তার কার্যপ্রণালি জিহাদি ওয়েবসাইটগুলিতে ব্যাপকভাবে প্রচারিত এবং উল্লেখিত হয়। আমি মনে করি, ইউরোপে জিহাদি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলায় তিনি একটি বুনিয়াদি ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং এটিকে সংগঠনটির কৌশলগতভাবে একটি আবশ্যক বিষয়বস্তুতে পরিণত করেছিলেন। আবু মুসআব আল-সুরি প্রকৃতপক্ষে মোস্তফা সেতমারিয়াম নাসেরের উপনাম এবং সেই লাল-চুলো সিরিয়ান যাকে আমি তোরাবোরায় ওসামা বিন লাদেনের গুহায় দেখতে পেয়ে বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলাম। তার জন্ম ১৯৫৮ সালে এবং তিনি মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে পড়াশোনা করেন। তিনি তরুণ বয়সেই মুসলিম ব্রাদারহুডের সাথে সংযুক্ত একটি সিরিয়ান দলে যোগ দিয়েছিলেন। এরপর তিনি আফগান জিহাদে লড়াই করেন

---

[১] Jamestown Foundation, 'Global Terrorism Analysis', Terrorism Monitor, vol. 3, no. 4, 24 February 2005.
[২] Renwick McClean, 'Spain Arrests Suspected Leader of Islamic Recruiting Cells', New York Times, 12 January 2006.
[৩] Robert S. Leiken and Steven Brooke, 'Al Qaeda's Second Front: Europe', International Herald Tribune, 15 July 2005.

এবং সেখানেই ওসামা বিন লাদেন এবং তার উদীয়মান আল-কায়েদার সাথে সখ্যতা গড়ে তুলেছিলেন। ১৯৮৮ সাল থেকেই তিনি আল-কায়েদার জন্য সামরিক কলা-কৌশল ও সমরপ্রণালি, বিস্ফোরক এবং শহুরে গেরিলা যুদ্ধে অভিজ্ঞ একটি 'অভিজাত' যোদ্ধাদল গড়ে তোলার প্রশিক্ষণ দিয়েছেন।[১]

বিন লাদেনের সাথে মতভিন্নতার পর আল-সুরি ১৯৯৭ সালে আল-কায়েদা ত্যাগ করেন এবং তালেবান নেতা মোল্লা ওমরের মিডিয়া উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৯৯ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত আফগানিস্তানে ব্যক্তিগত প্রশিক্ষণ শিবির পরিচালনা করেছিলেন এবং সেখানে অংশগ্রহণকারীদের রাসায়নিক হামলা এবং পয়জন (Poison) ব্যবহারের ওপর প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। তালেবানের পতনের পরে তিনি আল-কায়েদার নেতৃবর্গের সাথে পুনরায় সংযুক্ত হন। ২০০৫ সালে ইন্টারনেটে পোস্ট করা একটি স্মৃতিচারণের তিনি উল্লেখ করেন—'২০০১ সালের নভেম্বর মাসে আমি জিহাদ এবং আমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য শাইখ ওসামা বিন লাদেনকে আমার বাইয়াত প্রদান করেছিলাম।'[২] একই স্মৃতিচারণে আল-সুরি নিশ্চিত করেছিলেন যে, তাঁর অনেক প্রশিক্ষণার্থীই পশ্চিমা পাসপোর্টধারী। প্রায় পনেরো বছর লন্ডন, প্যারিস এবং স্পেনে অবস্থানের কারণে তার নিজস্ব ইউরোপীয় সংযোগও ছিল ব্যাপক বিস্তৃত। ১৯৯২ সালে তিনি স্প্যানিশ নও-মুসলিম মহিলা এলেনা মোরেনোর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন এবং তার একটি স্প্যানিশ পাসপোর্টও ছিল। এই দুয়ের সাথে তার লাল চুল, সবুজ চোখ এবং শ্বেতকায় ত্বক তাকে সমগ্র ইউরোপজুড়ে অবাধ চলাচলে সুযোগ করে দেয়।

১৯৯৫ সালে আল-সুরি এলেনা এবং দুই সন্তানকে নিয়ে লন্ডনে চলে আসেন। এখানে তিনি আলজেরিয়ান আর্মড ইসলামিক গ্রুপের (GIA) সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হয়ে পড়েন এবং সেসময় অতিমাত্রায় চরমপন্থি নিউজলেটার 'আল-আনসার' সম্পাদনা করতেন। ১৯৯৮ সালে, যখন আফগানিস্তান দৃঢ়ভাবে তালেবানদের নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছিল এবং অন্যদিকে লন্ডন জন মেজরের সরকারের 'নিরাপদ আশ্রয়স্থল' বৈশিষ্ট্যটি হারিয়ে ফেলেছিল, তখন আল-সুরি তার পরিবারকে নিয়ে জালালাবাদে স্থানান্তরিত হন।

---

[১] Evan Kohlmann,
http://www.globalterroralert.com/pdf/0705/abumusabalsuri.pdf–Abu Musab al-Suri: 'Dirty Bombs for a Dirty Nation'.

[২] Statement by Omar Abdul Hakim (also known as al-Suri) published on International Islamic resistance website, August 2005.

আল-সুরি ছিলেন অতিমাত্রায় বুদ্ধিমান এবং জিহাদি অভিজ্ঞতা ও ইতিহাস নিয়ে ইন্টারনেটে বিস্তৃত মোটা মোটা বই লিখে তিনি একজন বিশিষ্ট কৌশলবিদ ও বিশ্লেষক হয়ে ওঠেন।[১] তার লেখাগুলি বিশ্বব্যাপী জিহাদিদের জন্য প্রতিটি দেশে ছোট ছোট অজ্ঞাতনামা এবং স্বায়ত্তশাসিত সেল গঠনের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছে—যারা নগরযুদ্ধে দক্ষ হবে এবং পর্যটন স্থান, তেল ও বিদ্যুৎ লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানবে। এটি বর্তমানে ইরাকের বাইরের জিহাদি কার্যক্রমে ব্যাপক আকারে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যদিও আল-সুরি অবিচলভাবে ১৯৯৫ সালের প্যারিস মেট্রো বোম্বিং, ৯/১১, মাদ্রিদ এবং লন্ডন বোমা হামলা প্রভৃতি ক্রমিক আক্রমণের সাথে নিজের সরাসরি শারীরিক সম্পৃক্ততাকে অস্বীকার করেন; কিন্তু হামলাকারীদের প্ররোচনায় তিনি তার ভূমিকাকে নিশ্চিত করেছেন। তিনি স্বীকার করেছেন যে, তিনি GIA কমান্ডার আবু আবদুল্লাহ আহমদ এবং তার ঊর্ধ্বতনদের ফ্রান্সের মূল ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে আঘাত হানার পরামর্শ দিয়েছিলেন।[২] তিনি আরও স্বীকার করেছেন যে, তিনি লন্ডনের আন্ডারগ্রাউন্ডকে 'উপযুক্ত লক্ষ্যবস্তু' হিসাবে একদল প্রশিক্ষণার্থীকে পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং আরও উল্লেখ করেন যে, 'আমি যে বীজ রোপণ করেছিলাম তা ফল দিতে শুরু করেছে দেখে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।' স্পেনে তার কার্যক্রম সম্বন্ধে এটা নিশ্চিত যে তিনি 'সোলজার্স অফ আল্লাহ' সংগঠনের সদস্য ছিলেন। ২০০১ সালে তার অনুপস্থিতিতে তাকে সংগঠনটির সদস্য থাকার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। কিন্তু এর পূর্বেই ১৯৯০ এর দশকের শেষের দিকে তিনি পুরোপুরিভাবে থাকার জন্য আফগানিস্তানে চলে এসেছিলেন।

যদিও তিনি আটক রয়েছেন, তবুও আল-সুরি বৈশ্বিক জিহাদে শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করেই চলছেন। তার জ্বালাময়ী বিবৃতিসমূহ ইন্টারনেটে ব্যাপকভাবে পাওয়া যায়। এসবে বলা হয়—

> 'ব্রিটেন, ইতালি, হল্যান্ড, ডেনমার্ক, জার্মানি, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, রাশিয়া ও ফ্রান্স আক্রমণ করতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ইউরোপ এবং অন্যান্য শত্রু দেশগুলিতে ছড়িয়ে থাকা মুজাহিদদের এগিয়ে আসা উচিত... আমাদের দেশ এবং সারা বিশ্বে তাদের স্বার্থকে আক্রমণ

---

[১] এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী রচনাগুলোর একটি হলো আঠারো অধ্যায়ে সজ্জিত, 'মুলাহাজাত হাওলা তাজরিবাতিল জিহাদিয়্যাহ ফি সুরিয়া' (সিরিয়ার জিহাদি অভিজ্ঞতার কিছু পর্যালোচনা), যেটি ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। ২০০৪ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি দাওয়াত আল-মুকাওয়ামা আল-ইসলামিয়্যাহ আল-আলামিয়্যাহ (আন্তর্জাতিক ইসলামী প্রতিরোধের পয়গাম) নামে ১৬০০ পৃষ্ঠার একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন, যেখানে তিনি জিহাদের ভবিষ্যত কৌশলগুলির একটি রূপরেখা তৈরি করেছিলেন।

[২] August 2005 statement.

করুন। ইরাক, আফগানিস্তান এবং আরব উপদ্বীপে সেনা প্রেরণকারী দেশগুলিতে আক্রমণ করুন ... ইউরোপের স্লিপার সেলগুলি জাগ্রত হওয়া উচিত, যুদ্ধ এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং শত্রুরা এখন পরাজয়ের দ্বারপ্রান্তে।'

৩—আবু দাহদাহ

আবু দাহদাহ ১৯৬৩ সালে সিরিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তার প্রকৃত নাম ইমাদুদ্দিন বারাকাত ইয়ারকাস। তিনি সিরিয়ান মুসলিম ব্রাদারহুডের সদস্য ছিলেন। ১৯৮২ সালে তিনি সিরিয়া থেকে পালিয়ে যান[১] এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৮৬ সালে স্পেনে চলে আসেন। সেখানে তিনি একজন স্প্যানিশ মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন এবং স্পেনের নাগরিকত্ব লাভ করেন। তিনি সেখানে বেশ কয়েকটি ব্যবসা গড়ে তুলেছিলেন। ১৯৯০ এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে আবু দাহদাহ এবং অন্যান্য প্রাক্তন মুসলিম ব্রাদারহুডের সদস্যরা মাদ্রিদে 'সোলজার্স অফ আল্লাহ' সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ইউরোপে আল-কায়েদার ক্রিয়াকলাপের উদীয়মান প্যাটার্ন বজায় রেখে, বাহ্যত স্বায়ত্তশাসিত এই সেলটি সদস্য আদান-প্রদান এবং অনুরূপ আদর্শের মাধ্যমে আল-কায়েদার সাথে সংযুক্ত ছিল।

স্পেনীয় গোয়েন্দা সংস্থা ১৯৯৭ সাল থেকে আবু দাহদাহের ফোনে আড়ি পাতা শুরু করে এবং তারা ইন্দোনেশিয়া থেকে হামবুর্গ পর্যন্ত বিশ্বজুড়ে আল-কায়েদার সেলগুলির সাথে তার সংযোগের ব্যাপক প্রমাণ সংগ্রহ করে।

২০০১ সালে, আবু দাহদাহ ১১ সেপ্টেম্বর হামলার পূর্বে মুহাম্মাদ আতা এবং অন্যান্য চক্রান্তকারীদের মধ্যে স্পেনে একটি চূড়ান্ত পরিকল্পনা সভার আয়োজনে সহায়তা করেছিল। সেই বছর নভেম্বর মাসে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং সাতাশ বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়—৯/১১ হামলার চক্রান্তে তাঁর ভূমিকার জন্য পনেরো বছর এবং সন্ত্রাসী সংগঠনে নেতৃত্বদানের জন্য বারো বছর। তার বিরুদ্ধে আল-কায়েদার জন্য তহবিল সংগ্রহ এবং ১৯৯০-এর দশকের শেষভাগ থেকে ২০০১ সালের শেষ অবধি আফগানিস্তানে আবু মুসআব আল-সুরি পরিচালিত প্রশিক্ষণ শিবিরে যুবকদের প্রেরণ করার অভিযোগ আনা হয়েছিল।

আবু দাহদাহ কারাগারে থাকার কারণে, তার দলটির নেতৃত্ব অবশেষে ২০০৩ সালে তিউনিসিয়ান সারহান বিন আবদুল মাজিদ ফখেতের হাতে আসে। প্রথমদিককার সিরিয়ার 'সোলজার্স অফ আল্লাহ' বর্তমানে উত্তর আফ্রিকানরা পরিচালনা করে (মূলত আল-জারকাভির সহযোগী আমের আজিজির অত্যন্ত

[১] The Syrian army massacred up to 10,000 Muslim Brothers in 1982.

সফল রিক্রুটিং মেথডের কারণে) এবং এই দলটিই পরবর্তী সময়ে আল-কায়েদার ব্যানারে মাদ্রিদে বোমা হামলা চালিয়েছিল।

৪—আবু কাতাদাহ আল-ফিলিস্তিনি

আলজেরিয়ার সরকারি কর্মকর্তাদের ছেলেমেয়েদের হত্যার বৈধতা দিয়ে তার ১৯৯৫ সালের ফতোয়ায় আতঙ্কিত থাকায় আবু কাতাদাহর সাথে দেখা করতে আমি দ্বিধায় ছিলাম। যাকে সাধারণত মিডিয়ায় 'ইউরোপে আল-কায়েদার আধ্যাত্মিক নেতা' হিসাবে বর্ণনা করা হতো। যখন তিনি ২০০5 সালের গ্রীষ্মে আমার অফিসে উপস্থিত হয়েছিলেন (যদিও সে সময় তাকে গৃহবন্দী করা হয়েছিল এবং বিভিন্ন অভিযোগে অভিযুক্ত ছিলেন) তখন তাকে আমার সস্নেহ, তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিমান বলেই মনে হয়েছিল, যদিও অনস্বীকার্যভাবেই তার রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মতাদর্শে তিনি ছিলেন চরমপন্থি। বর্ণময় চরিত্রের এবং দাড়িওয়ালা এই আলেম আমাকে তাঁর পুরো সাক্ষাৎজুড়েই বিনোদিত রাখেন। কবিতা, সাহিত্য এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক বিষয়ের পাশাপাশি ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কেও অলংকারিক ভাষায় কথা বলেছিলেন। তবে, এই লোকটি যে কতটা বিপজ্জনক এই বিষয়ে আমি সর্বক্ষণই সচেতন ছিলাম—যদি কিনা তার সম্পর্কে আনীত অভিযোগগুলি সত্য হয়ে থাকে।

আবু কাতাদাহ—যার আসল নাম ওমর উসমান আবু ওমর ফিলিস্তিনের বেথেলহামে ১৯৬০ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি জর্দানের নাগরিকত্ব অর্জন করেছিলেন এবং বিখ্যাত মতাদর্শিক আবু মুহাম্মদ আল-মাকদিসির সাথে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। ১৯৮০ দশকের শেষদিকে আবু মুসআব আল-জারাকাভির মতো তিনিও আফগানিস্তানে গমন করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, আবু কাতাদাহই এই দুজনকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন এবং তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, ওসামা বিন লাদেনের কাছে তিনিই আল-জারকাভির বাইয়াত হস্তান্তর করেছিলেন।

আবু কাতাদাহ একটি ভুয়া সংযুক্ত আরব আমিরাতের পাসপোর্টে যুক্তরাজ্যে গমন করেছিলেন এবং ১৯৯৩ সালে সাফলভাবে রাজনৈতিক আশ্রয়ের আবেদন করেছিলেন। লন্ডনে সে সময় তাকে যারা চিনত এমন লোকদের মতে, ১৯৯০ এর দশকের মাঝামাঝি সময়গুলিতে তিনি তার সর্বোচ্চ চরমপন্থি অবস্থায় ছিলেন। তখন তিনি GIA কে প্ররোচিত করছিলেন এবং (প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে) GIA-এর জন্য রিক্রুটিং করছিলেন। পরবর্তী কালে তিনি আবিষ্কার করেন যে, তিনি আলজেরীয় সিক্রেট সার্ভিস কর্তৃক ধোঁকাগ্রস্ত হয়েছিলেন এবং তারাই তাকে অতিমাত্রায় চরমপন্থার দিকে প্ররোচিত করেছিল উদাহরণস্বরূপ, উপর্যুক্ত ফতোয়া। তার নিকটবর্তী একটি সূত্র আমাকে জানিয়েছে যে, তখন তিনি মারাত্মক মানসিক

আঘাতের শিকার হয়েছিলেন এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট বহু মুসলিমের কাছে ক্ষমা চাইতে বাধ্য হয়েছিলেন। এরপর সম্ভবত তিনি আল-কায়েদার সার্কেলে চলে এসেছিলেন এবং জামাল আল-ফাদল (২০০১ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি নিউইয়র্কের সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে কেনিয়ার নাইরোবি এবং তাঞ্জানিয়ার দারুস-সালামের মার্কিন দূতাবাসদ্বয়ে বোমা হামলাসংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর সাক্ষ্যগ্রহণের সময়) জানিয়েছিলেন যে, ১৯৯৮ সালে তিনি আল-কায়েদার ফতোয়া বোর্ডের একজন সদস্য ছিলেন। একই বছর জর্ডানে একাধিক বোমা হামলার জন্য প্ররোচিত করার অভিযোগে তার অনুপস্থিতিতে তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের রায় দেওয়া হয়। ১৯৯৯ সালে তাঁর বিরুদ্ধে পেত্রার নিকটস্থ একটি খ্রিষ্টান প্রতিষ্ঠানে আক্রমণ করার জন্য মূলত জর্ডানীয়দের সমন্বয়ে গঠিত একটি গ্রুপকে তহবিল দেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছিল।

২০০১ সালের ফেব্রুয়ারিতে স্ট্রসবার্গের একটি ক্রিসমাস মার্কেটে হামলার পরিকল্পনায় জড়িত থাকার অভিযোগে আবু কাতাদাকে ব্রিটেনে গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। তখন তার দখলে ১,৭০,০০০ ইউরো থাকলেও তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আনা হয়নি। ৯/১১ এর পরে, মুহাম্মাদ আতা'র হামবুর্গের ফ্ল্যাটে তাঁর বক্তৃতার ভিডিও পাওয়া গিয়েছিল; এ ছাড়াও তিনি তথাকথিত ব্রিটিশ সু-বোম্বার রিচার্ড রিডের একজন পরামর্শদাতা ছিলেন বলে অভিযোগ করা হয়।

২০০১ সালের ডিসেম্বর মাসে আবু কাতাদাহ আত্মগোপনে চলে যান। কিন্তু তাকে দশ মাস পর খুঁজে বের করে বেলমার্শ কারাগারে প্রেরণ করা হয়। ২০০৫ সালের মার্চ মাসে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল এবং নিবিড় পর্যবেক্ষণের আদেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ২০০৫ সালের আগস্টে তাকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হয় এবং বর্তমানে তিনি কারাগারেই রয়েছেন। বর্তমানে জর্ডান এবং বেশ কয়েকটি ইউরোপীয় দেশ তার হস্তান্তর চাইছে।

টার্গেট ইউরোপ : অনুঘটক ইরাক

ওসামা বিন লাদেন প্রায়ই ফ্রান্স এবং বিশেষত ব্রিটেনের প্রতি দীর্ঘদিনের মুসলিম ক্ষোভের কথা উল্লেখ করেন। এ সবকিছু দুটি ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে উদ্ভূত, যেগুলো উম্মাহর জন্য মারাত্মক প্রভাব বয়ে এনেছিল। প্রথমত ১৯১৬ সালের ১৬ মে তারিখের 'সাইকস-পিকট চুক্তি', যেটি কার্যকরীভাবে মধ্যপ্রাচ্যকে ব্রিটিশ এবং ফরাসী নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলে বিভক্ত করেছিল, এবং এর ধারাবাহিকতায় ১৯১৭ সালের ২ নভেম্বরের কুখ্যাত 'বেলফোর ঘোষণা', যেটি ফিলিস্তিনে ইহুদিদের 'নিজস্ব দেশ' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইহুদিবাদী পরিকল্পনার জন্য ব্রিটিশ

সামর্থনের রূপরেখা বিবৃত করেছিল—স্পষ্টতই এই বিষয়টিকে উপেক্ষা করে যে, ইতিমধ্যেই ফিলিস্তিন ছিল ফিলিস্তিনিদের আবাসভূমি। বিন লাদেনের মতে বিশ্বাসঘাতকতার এসব দৃষ্টান্তসমূহ এখনও বেদনাদায়কভাবে প্রাসঙ্গিকই রয়ে গেছে। বুশ-ব্লেয়ার চুক্তি সেই একই ক্রুসেডার ব্যানারের অধীনে এবং তা সেই একই উদ্দেশ্যে গৃহীত হয়েছে এবং তা হলো—মুসলিম নিধন ও লুণ্ঠন।

ইউরোপীয় মাটিতে কোনো আল-কায়েদা কুশলী কর্তৃক প্রথম আক্রমণের ঘটনা ঘটে ১৯৯১ সালের নভেম্বরের প্রথম দিকে। সেই ঘটনায় একজন ধর্মান্তরিত পর্তুগিজ মুসলিম, পাওলো হোসে ডি আলমেইডা সান্টোস রোমে আফগানিস্তানের প্রাক্তন রাজা মুহাম্মদ জহির শাহকে হত্যার চেষ্টা চালিয়েছিল। সান্টোস আফগানিস্তানে আল-কায়েদার শিবিরে প্রশিক্ষণ নিয়েছিল এবং আক্রমণটির পরিকল্পনা করার ক্ষেত্রে ওসামা বিন লাদেনের সাথে তিনবার বৈঠক করেছিল। জহির শাহ তখন আফগানিস্তানে প্রত্যাবর্তনের পরিকল্পনা করছিলেন এবং এতে তালেবান ও মুজাহিদদের অবস্থানের ক্ষতিসাধনের ব্যাপক সম্ভাবনা ছিল। তার কাছে পৌঁছানোর জন্য সান্টোস সাংবাদিকের ছদ্মবেশ নিয়েছিল। কিন্তু হলিউডি মেলোড্রামার মতো ভাগ্যের জোরে, বাদশা তখন তার বুক পকেটে থাকা টিনের তৈরি চুরুটের প্যাকেটের কারণে বেঁচে গিয়েছিলেন, যার ফলে ঘাতকের ছুরিটি তার হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হয়েছিল।

যেমনটা আমি ইতিমধ্যেই নিশ্চিত ছিলাম যে, ইউরোপে আল-কায়েদার উপস্থিতি সাংগঠনিক অপেক্ষা মূলত আদর্শিক ছিল। শিথিলভাবে সংযুক্ত গ্রুপসমূহের একটি নেটওয়ার্ক (কেউ কেউ এর সংখ্যা ত্রিশের মতো বলে উল্লেখ করেন) অনুরূপ ধর্মতাত্ত্বিক এবং রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা ধারণ করত এবং প্রায় ক্ষেত্রে সেগুলোতে একই ব্যক্তিবর্গ থাকত। তবে তার মানে এই নয় যে, মতাদর্শ সাংগঠনিকতার চাইতে দুর্বল কোনো কিছু। আমি মনে করি, আফগানিস্তান ও বসনিয়াতে যুদ্ধ পরবর্তী ইউরোপজুড়ে জিহাদিদের ছড়িয়ে পড়া এবং এর উত্তরকালীন স্বদেশি ইসলামপন্থি সংগ্রামগুলির সাথে যেমন, আলজেরিয়ায় তাদের সংশ্লেষের ফলেই এই পরিস্থিতি স্বয়ংক্রিয়ভাবে আবির্ভূত হয়েছিল। ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত আলজেরিয়ার আর্মড ইসলামিক গ্রুপ (GIA) এর কয়েকশ সদস্য আফগানিস্তানে সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল এবং ওসামা বিন লাদেনের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিল। এই দলটি আল-কায়েদা কর্তৃক আর্থিক ও ব্যাবহারিকভাবে সমর্থন পেয়েছিল, যতক্ষণ না এটির নির্বিচার সহিংসতা এ দুয়ের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করে এবং ১৯৯৮ সালে এর ভাঙনের মাধ্যমেই সালাফিস্ট গ্রুপ ফর প্রিচিং অ্যান্ড কমব্যাট (GSPC) সৃষ্টি হয়েছিল। GSPC পরবর্তীকালে আল-কায়েদার সাথে সহযোগিতা করতে সম্মত হয় এবং ২০০৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে

দুটি গ্রুপের মধ্যে সম্পর্কের বিষয়টি একটি আনুষ্ঠানিক একীকরণে পর্যবসিত হয়, যে বিষয়টি জিহাদি ওয়েবসাইটগুলোতে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছিল। ১৯৯২ থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত GIA এবং আল-কায়েদার মধ্যে সংযুক্তকারী অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে আবু মুসআব আল-সুরি এবং আবু কাতাদাহও ছিলেন। ইউরোপীয় লক্ষ্যবস্তুতে আক্রমণকারী প্রথম আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীটি ছিল GIA। ১৯৯৪ সালের ক্রিসমাসের প্রাক্কালে GIA এর চার সদস্য ১৭০ জন যাত্রী সম্বলিত আলজিয়ার্সে এয়ার ফ্রান্সের একটি বিমান হাইজ্যাক করেছিল। তারা তিন জিম্মিকে হত্যা করেছিল এবং বিমানটিতে ডিনামাইট ভরতি করে ফ্রান্সের উদ্দেশ্যে উড়াল দিয়েছিল, যেখানে তাদের পরিকল্পনা ছিল প্যারিসের আইফেল-টাওয়ারকে ধ্বংস করে দেওয়া। কিন্তু বিমানটি মার্সেইতে জ্বালানি ভরার জন্য থামার সাথে সাথে ফরাসি কমান্ডাররা সেখানে অতর্কিত আক্রমণ চালায় এবং উক্ত চার হাইজ্যাকারকেই হত্যা করে।

২৫ জুলাই ১৯৯৫ সালে প্যারিসের সেন্ট মিশেল রেলস্টেশনে একটি ট্রেনের ভেতরে নেইলসভরতি একটি গ্যাস ক্যানিস্টার বিস্ফোরিত হয়। এতে সাতজন নিহত এবং দেড় শতাধিক মানুষ আহত হয়েছিল। ফরাসি রেলপথ এবং প্যারিস মেট্রোকে লক্ষ্য করে GIA এর ধারাবাহিক বোমা হামলার মধ্যে সবচেয়ে রক্তাক্ত হামলাটি সেই বছরই সংগঠিত হয়েছিল এবং সেই ঘটনায় দশ জন মারা গিয়েছিলে এবং ১৮০ জন আহত হয়েছিল।

২০০৩ অবধি ইউরোপে আল-কায়েদা অথবা আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট সেল দ্বারা স্বল্পসংখ্যক সরাসরি আক্রমণ হলেও গোয়েন্দা সংস্থা এবং পুলিশ কর্তৃক অসংখ্য সেল ভেস্তে গিয়েছিল। এগুলোর মধ্যে মূলত আলজেরীয়দের দ্বারা গঠিত ফ্র্যাঙ্কফুর্ট সেলও ছিল, যারা ২০০০ সালে স্ট্রসবার্গের ক্রিসমাস মার্কেটে হামলার পরিকল্পনা করেছিল।

এ ছাড়া জার্মানি সেই কুখ্যাত হামবুর্গ সেলের আতুড়ঘর ছিল, যেখান থেকে ৯/১১ হাইজ্যাকাররা প্রসূত হয়েছিল। দলটির প্রধান মিশরীয় মুহাম্মদ আতা এবং তার সেলের ছয় সহকর্মীর প্রায় সকলেই ১৯৯২ থেকে ১৯৯৭ সালের মধ্যে পড়াশোনার জন্য জার্মানিতে পাড়ি জমিয়েছিলেন। মরোক্কান মুনির মুতাসাদ্দিক (যিনি ২০০৬ সালের নভেম্বর মাসে জার্মান ফেডারেল হাই কোর্টে ৩,০০০ লোককে হত্যার সহযোগী হিসেবে দোষী সাব্যস্ত হন) মুহাম্মাদ আতার সাথে ১৯৯৫ সালে সালে সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং তাকে জার্মান-মরোক্কান সাইয়িদ বাহাজি এবং হামলার পূর্বে আফগানিস্তানে চলে আসা আরেক মরোক্কান জাকারিয়া এসবারের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন, যারা এখনও অবধি বহাল তবিয়তে রয়েছেন। এসবারের জিয়াদ সামির জারাহকে দলে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন এবং

১৯৯৭ সালে আতা সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে আগত মারওয়ান আল শেহহির সাথে একটি জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ স্কুলে সাক্ষাৎ করেছিলেন। ইয়েমেনি আশ্রয়প্রার্থী রামযি বিন আল-শাইবাহ আল-কুদস মসজিদে এই দলের দেখা পেয়েছিলেন, যেখানে চরমপন্থি মরোক্কান ইমাম আল-ফিজাজী প্রায়শ বয়ান পেশ করতেন। আল-ফিজাজী এই ধারাবাহিক বর্ণনার একজন পুনরাবৃত্তকারী ব্যক্তি (তিনি মাদ্রিদ বোমা হামলাকারীদের আনাগোনা ছিল এমন একটি মসজিদেও বয়ান পেশ করেছিলেন) এবং ২০০৩ সালের মে মাসে ক্যাসাব্ল্যাঙ্কা বোমা হামলায় জড়িত থাকার অভিযোগে তিনি বর্তমানে মরক্কোর কারাগারে রয়েছেন।

২০০২ সালে পাকিস্তানে আটক হওয়া রামযি বিন আল-শাইবাহকে জিজ্ঞাসাবাদ থেকে পাওয়া তথ্যমতে, হামবুর্গ সেলের কিছু সদস্য চেচনিয়ার জিহাদে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু ঘটনাচক্রে মৌরিতানিয়ান ব্যবসায়ী মোহামেদৌ ওলাদ সালিহের সাথে একটি জার্মান ট্রেনে তাদের সাক্ষাৎ তাদের জীবন এবং বিশ্বের ইতিহাসকে চিরকালের জন্য পরিবর্তিত করে দেয়। আল-কায়েদার সাথে সংযোগের অভিযোগে সালিহ দীর্ঘদিন যাবৎ সন্দেহের তালিকায় ছিলেন এবং বর্তমানে তিনি গুয়ান্তানামো বে কারাগারে বন্দী রয়েছেন। কিন্তু জার্মান বা মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার কেউই তখন জানত না যে, তিনি সেই সময় জার্মানিতে বসবাস করছিলেন। সালিহ আতা এবং অন্যান্যদের জানান যে, চেচনিয়াতে প্রবেশ করা খুব কষ্টকর এবং এর পরিবর্তে তিনি তাদের আফগানিস্তানে যাওয়ার পরামর্শ দেন। ১৯৯৯ সালে তিনি আফগানিস্তানে তাদের ভ্রমণ এবং ওসামা বিন লাদেনের সাথে তাদের একটি বৈঠকের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। হামবুর্গ বাহিনী তৎক্ষণাৎই বিন লাদেনের কাছে বাইয়াত প্রদান করেছিল এবং নিউইয়র্ক এবং ওয়াশিংটনের ওপর হামলার প্রস্তুতিমূলক প্রশিক্ষণের মিশন নিয়ে প্রত্যাবর্তন করে। ২০০১ সালে স্পেনে আবু দাহদাহের মাদ্রিদ সেল কর্তৃক মূল পরিকল্পনা সভাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

২০০৩ সালের ১৯ মার্চ মার্কিন নেতৃত্বাধীন ইরাক আক্রমণের পর ইউরোপীয় ও ইহুদি লক্ষ্যবস্তুতে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট হামলার ঘটনা নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়। ২০০৩ সালের ১৬ মে ক্যাসাব্ল্যাঙ্কার একটি জিউস কালচারাল সেন্টার এবং অন্যান্য লক্ষ্যবস্তুগুলোতে একটি সমন্বিত আত্মঘাতী বোমা হামলায় পঁয়তাল্লিশ জন নিহত হয় এবং শতাধিক মানুষ আহত হয়। হামলার লক্ষ্যবস্তুগুলির মধ্যে একটি স্প্যানিশ কালচারাল সেন্টারও ছিল, যেখানে নিহতদের মধ্যে চারজন ছিল স্প্যানীশ নাগরিক। মরোক্কান কর্তৃপক্ষ এই হামলার জন্য মরোক্কান ইসলামিক কমব্যাটান্ট গ্রুপকে (GICM) দায়ী করে।

২০০৩ সালের ১৫ নভেম্বর ইস্তাম্বুলের একটি আল-কায়েদা সেল নেভ শালোম এবং বেথ ইসরায়েল সিনাগগে দুটি আত্মঘাতী ট্রাক বোমা হামলা চালিয়ে ২৫ জনকে হত্যা করে এবং এতে কমপক্ষে ৩৫০ জন আহত হয়। আমার পত্রিকা আল-কুদস আল-আরবিতে আবু হাফস আল-মাসরি ব্রিগেড এই হামলার দায় স্বীকার করে একটি ই-মেইল প্রেরণ করেছিল। এর মাত্র পাঁচ দিন পর ব্রিটিশ স্বার্থকে লক্ষ্যবস্তু বানানো হয় এবং ব্রিটিশ কনস্যুলেট এবং HSBC ব্যাংকের বাইরে দুটি আত্মঘাতী ট্রাক বোমা হামলা চালানো হয়। ব্রিটিশ কনসাল-জেনারেল রজার শর্ট এই হামলায় মারা যাওয়া বত্রিশ জন ব্যক্তির মধ্যে একজন ছিলেন এবং সেখানে আরও প্রায় ৪০০ জন আহত হয়েছিল।

মাদ্রিদ, ১১ মার্চ ২০০৪

যখন সকালের ভীড়ের সময়ে মাদ্রিদের তিনটি ব্যস্ত স্টেশনের চারটি ট্রেনের ময়লার ঝুড়ি অথবা লাগেজ র‍্যাকে রাখা দশটি বোমা বিস্ফোরিত হয়, তখন ২০০ জনেরও অধিক মানুষ নিহত হয় এবং ১,৫০০ এরও অধিক মানুষ আহত হয়। যদিও স্প্যানিশ, ব্রিটিশ এবং আমেরিকান সকল সরকারই ETA কে দোষারোপ করতে ছুটে এসেছিল, কিন্তু আল-কুদস আল-আরবি পুনরায় আবু হাফস আল-মাসরি ব্রিগেডের কাছ থেকে একটি ই-মেইল পায়, যেখানে তারা উক্ত হামলার দায় স্বীকার করেছিল। স্পেনকে 'ইসলামিক ভূখণ্ড' দাবি প্রসঙ্গে আমি তাৎক্ষণিকভাবে হতবাক হয়েছিলাম। সেখানে লিখা ছিল—

> 'ডেথ স্কোয়াড [আবু হাফস আল-মাসরি ব্রিগেডস] ক্রুসেডার ইউরোপের গভীরে প্রবেশ করে সফলভাবে ক্রুসেডার জোটের অন্যতম স্তম্ভ স্পেনকে একটি বেদনাদায়ক আঘাত হানতে সফল হয়েছে। এই বোমা হামলাসমূহ ছিল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ক্রুসেডার স্পেনের সাথে পুরোনো হিসাব-নিকাশের একটি অংশ।'

সার্বিক বিবেচনায় এটাই প্রতীয়মান হয়েছিল যে, মাদ্রিদ বোমাহামলা পরিকল্পনাটি আল-কায়েদার কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কর্তৃকই প্রণয়ন করা হয়েছিল অথবা কমপক্ষে তাদের দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল। ২০০৩ এর অক্টোবরে বিন লাদেন ইরাক আক্রমণ সম্পর্কিত রাষ্ট্রপতি বুশের কাছে নিজের বার্তায় স্পষ্টভাবে স্পেনকেও হুমকি দিয়েছিলেন, এভাবে যে—

'আমরাও এই আগ্রাসনে জড়িত সকল দেশের বিরুদ্ধে বিশেষত ব্রিটেন, স্পেন, অস্ট্রেলিয়া, পোল্যান্ড, জাপান এবং ইতালিতে যথাযথ সময় ও স্থানে প্রতিশোধ নেওয়ার অধিকার রাখি।'[১]

এ ছাড়াও ২০০৩ সালের অক্টোবর মাসে গ্লোবাল ইসলামিক মিডিয়া ওয়েবসাইটে (আল-কায়েদার প্রধান ইন্টারনেট উপস্থিতি) স্পেনে আক্রমণ করার আহ্বান জানানো হয়েছিল। ইউরোপের মাটিতে আজ অবধি আল-কায়েদার সবচেয়ে ভয়াবহ আক্রমণটিতে সংগঠনটির জড়িত থাকার স্বীকৃতি জানাতে পশ্চিমা সরকারগুলির অনীহা প্রকাশ করার পেছনের কারণ ছিল স্পষ্টতই সেসব অভিযোগগুলি এড়িয়ে যাওয়া যে, তাদের ইরাক আক্রমণ দ্বারাই এই হামলাকে উসকে দেওয়া হয়েছিল। এটাও সকলের নিকট স্পষ্ট যে, আক্রমণটির তারিখ ঠিক করা হয়েছিল ঠিক তিন দিন পরবর্তী স্প্যানিশ সাধারণ নির্বাচনের পূর্ব-সময়সূচির সাথে মিল রেখেই। হামলার পর অবিশ্বাস্যভাবে প্রায় ১,১৪,০০০০০ মানুষ যেটা স্পেনের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশ, এই হামলার পেছনে কারা জড়িত তা জানাতে চেয়ে রাস্তায় নেমে এসেছিল।

১৩ মার্চ মাদ্রিদের একটি মসজিদের নিকটের ময়লার ঝুড়িতে রাখা একটি ভিডিওটেপ বার্তায় 'আল-কায়েদা ইন ইউরোপ'-এর পক্ষ থেকে এই ট্রেন বোমাহামলার দায় স্বীকার করা হয়েছিল। তখনই প্রথমবারের মতো এই সমন্বিত নামটি ব্যবহার করা হয়েছিল। এই হামলার সাথে জড়িতরা আবু দাহদাহের 'সোলজার্স অফ আল্লাহ' সংগঠনটি থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। এটির প্রতিষ্ঠাতা সদস্যরা ছিল সিরিয়ান এবং সেখানে সদস্যদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল উত্তর আফ্রিকান বা মূলত মরোক্কান। তাদের সাথে আমের আজিজির মাধ্যমে GICN এবং আবু মুসআব আল-জারাকাভির সংযোগ ছিল, যার বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ অভিযোগ করেছিল যে, সে একজন GICM রিক্রুটার ছিল।

ভিডিওটেপে মরক্কান উচ্চারণের একজনকে দেখা যায়, (সম্ভবত বিবৃতিটির লেখক নয়) যিনি অবগত করেন যে, বোমা হামলাটি 'অপকর্মা বুশ এবং তার মিত্রদের সাথে সহযোগিতার এবং বিশ্বব্যাপী বিশেষত ইরাক ও আফগানিস্তানে যে দুষ্কার্য তোমরা করছ তার একটি পাল্টা জবাব।' এরপর স্পেনের জনগণ দর্শনীয়ভাবেই প্রধানমন্ত্রী আজ্নারের পার্টিডো পপুলারকে (পিপলস পার্টি) ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেয় এবং তার বদলে জোসে লুইস রড্রিগেজ যাপাতেরো প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করে, যিনি ইরাক থেকে স্পেনের ১,৩০০ সেনা প্রত্যাহারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। মরোক্কান সরকার মাদ্রিদ আক্রমণ এবং বিগত বছরের ক্যাসাব্লাঙ্কায়

---

[১] Statement issued by Osama bin Laden.

সংগঠিত একাধিক বোমা হামলার মধ্যকার সংযোগ তদন্তের জন্য নিজস্ব গোয়েন্দা দল প্রেরণ করেছিল। এর মধ্যে একটি সংযোগ ছিল মুস্তাফা আল-মায়োনি, মাদ্রিদ সেলের নেতা সারহান বিন আবদুল মাজিদ ফাখেত এর শ্যালক, যিনি 'সোলজার্স অফ আল্লাহ' গ্রুপ এবং ক্যাসাব্ল্যাঙ্কা বোমা হামলা চালানোর জন্য দায়ী GICM সেল এই উভয়েরই সদস্য ছিলেন।

মাদ্রিদ হামলা আল-কায়েদার ত্রাসিত সুরের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল এই কারণে যে, এটি কোনো আত্মঘাতী হামলা ছিল না। সম্ভবত এই দলটি আবার আঘাত হানতে আদিষ্ট ছিল এবং দ্বিতীয় বার হয়তো তারা নিজেরাই শহিদ হয়ে যেত। এই ব্যাপারটি এভাবে প্রমাণিত হয়, যখন মাদ্রিদের শহরতলী লেগনেসে পুলিশ তাদের ফ্ল্যাটে অভিযান চালানোর পর বোমা হামলায় জড়িত সেখানে অবস্থিত সাতজনই গ্রেপ্তারের বদলে আত্মঘাতী বেল্ট দিয়ে নিজেকে উড়িয়ে দেওয়াকেই বেছে নেয়। বসনিয়ার পুলিশ দাবি করেছিল যে, মাদ্রিদ সেলের এগারো জন বসনিয়া-হার্জেগোভিনার একটি ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ নিয়েছিল;[১] তবে অন্য কোনো সূত্র দ্বারা এটি প্রমাণিত হয়নি। এটা কোনো অসম্ভাব্য বিষয় নয় যে, প্রশিক্ষণের জন্য তাদের অন্য কোনো জায়গায় গমন করতে হয়নি। কারণ আবু মুসআব আল-সুরি, যিনি প্রাথমিক মাদ্রিদ নেটওয়ার্ক, 'সোলজার্স অফ আল্লাহ'-এর সাথে সংযুক্ত ছিলেন এবং তিনি ছিলেন আল-কায়েদার অন্যতম প্রধান বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ এবং সম্ভবত তিনি যখন ইউরোপ থেকে আফগানিস্তান চলে যান তখন তার প্রশিক্ষিত দক্ষ কর্মীদের অনেককেই সেখানে রেখে এসেছিলেন। সেই দলটি সুনিশ্চিতভাবেই তাদের বোমা প্রস্তুত করার জ্ঞানের পাশাপাশি অস্ত্র হিসেবে মৃত্যুর মনস্তাত্ত্বিক গ্রহণযোগ্যতাকেও তাদের কাছে প্রদর্শন করেছিল।

মাদ্রিদ সেলের প্রায় সকল সদস্যই উত্তর আফ্রিকার অভিবাসী এবং প্রধানত নিম্ন আর্থ-সামাজিক পদমর্যাদার ছিল। এই অবস্থার ব্যতিক্রম ছিল সারহান বিন আবদুল মাজিদ ফাখেত, যিনি শীর্ষস্থানীয় একটি স্প্যানিশ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন। কিন্তু উঁচুমানের এই একাডেমিক অর্জন সত্ত্বেও তিনি রিয়েল-এস্টেট সংস্থার বিক্রয়কর্মী হিসেবে তুলনামূলকভাবে নীচু পদে কাজ করতেন।[২] মাদ্রিদ বোমা হামলাকারীদের ব্যাকগ্রাউন্ড এটাই দেখিয়েছিল যে, সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিষয় বাদ দিলেও—যেটা কিছুটা হলেও তাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছিল, রিক্রুটমেন্ট—বিদ্যমান সামাজিক নেটওয়ার্কের ওপরও নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ পারিবারিক বন্ধন এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান

---

[১] Sofia News Agency, Bulgaria, 11 May 2005.
[২] El Mundo, 8 April 2004.

(দেওবন্দি মিশনারি গ্রুপ জামাআতুত তাবলিগ ওয়াদ দাওয়াতে সেলটির তিনজনের সাক্ষাৎ হয়েছিল)।

বাহ্যত ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে তার ১৯৯৮ সালের ফতোয়ার বিপরীতে ওসামা বিন লাদেন মাদ্রিদ বোমা বিস্ফোরণের পরে ইউরোপের জনগণকে সাময়িক যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তার ২০০৪ সালের ১৫ এপ্রিলের ইশতেহারে তিনি 'মুসলিমদের ওপর আক্রমণ বা তাদের বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করতে যেসব রাষ্ট্র প্রতিশ্রুতি দেবে তাদের বিরুদ্ধে তিনি অভিযান বন্ধ রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।' এই যুদ্ধ বিরতি প্রস্তাব তিন মাসের মধ্যে গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল এবং এটি পুরোদস্তর উপেক্ষিত হয়েছিল।

থিও ভ্যানগগ হত্যাকাণ্ড

২০০৪ সালে আমরা সেই জিনিসটির বিস্ফোরণ দেখতে পাই, যেটাকে ওসামা বিন লাদেন 'ইউরোপের সাংস্কৃতিক ও নৈতিক জিহাদ' বলে অভিহিত করেছিলেন। এই নতুন ব্যাপারটির প্রথম ঘটনাটি ঘটেছিল সেই বছরের আগস্ট মাসে, যখন ফরাসি পার্লামেন্ট স্টেট স্কুলগুলোতে ইসলামিক হিজাবসহ সুস্পষ্ট ধর্মীয় পোষাকসমূহ পরিধানের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করেছিল। এর ফলে বিশ্বব্যাপী মুসলিম জনমনে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল এবং ইরাকে দুজন ফরাসী সাংবাদিক অপহরণসহ মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সংগঠিত হয়েছিল।

২০০৪ সালের নভেম্বর মাসে ডাচ চলচ্চিত্র নির্মাতা ও লেখক থিও ভ্যানগগ তাঁর সাবমিশন (Submission) চলচ্চিত্র প্রকাশের পর, যেখানে কুরআনের আয়াত অঙ্কিত স্বচ্ছ কাপড়ে সজ্জিত নগ্ন নারীদের ছবি অন্তর্ভুক্ত ছিল; ইসলামপন্থিদের কাছ থেকে ক্রমাগত মৃত্যুর হুমকির পেতে থাকেন। তার নিয়মিত সংবাদপত্র কলামগুলিতে ভ্যানগগ দীর্ঘদিন ধরেই ইসলামের তীব্র সমালোচক ছিলেন এবং হল্যান্ডের মুসলিম জনগণ সম্পর্কে প্রায়শ অবমাননাকর মন্তব্য করতেন। তিনি মার্কিন নেতৃত্বাধীন ইরাক আক্রমণের একজন সমুচ্চ সমর্থকও ছিলেন। এর কোনো কিছুই তাকে দেশের ৯,২০,০০০ মুসলিম অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার ৮.৮ শতাংশের নিকট আদরনীয় করে তোলেনি, যাদের অধিকাংশই তার চলচ্চিত্রটির সাবমিশন নিয়ে মারাত্মক ক্ষিপ্ত ছিল। তারা একে চরম অবমাননাকর ও ব্লাসফেমি হিসেবে চিহ্নিত করেছিল।

২ নভেম্বর দিনের শুরুর দিকে দ্বিতীয় প্রজন্মের একজন ডাচ-মরোক্কান, মুহাম্মাদ বুয়েরি ভ্যানগগকে লক্ষ্য করে আটটি গুলি ছুড়ে এবং ছুরি দিয়ে তার শিরশ্ছেদ করে। ভ্যান গগের মৃতদেহে ছুরির সাহায্যে গেঁথে দেওয়া পাঁচ পৃষ্ঠার একটি নথিতে চলচ্চিত্রটির চিত্রনাট্যের লেখক সোমালি শরণার্থী আয়ান হিরসি

আলিকে হুমকি দেওয়া হয় এবং সেটি 'তাকফির ওয়াল-হিজরা'র মতাদর্শের ভিত্তিতে সাজানো হয়েছিল, যা একটি চরমপন্থি সালাফিস্ট স্কুল অফ থট। আল-জারকাভির এক সময়ের আশ্রয়দাতা আবু মুহাম্মাদ আল-মাকাদিসি এবং আবু কাতাদাহর এক ঘনিষ্ঠ সহযোগী দ্বারা এই চিন্তার বিকাশ ঘটেছিল। মুহাম্মাদ বোয়েরিকে ডাচ পুলিশদের সাথে একটি বন্দুকযুদ্ধের পর গ্রেপ্তার করা হয় এবং আবিষ্কৃত হয় যে, এই কাজের পেছনে কেবল তিনি একাই জড়িত ছিলেন না। তিনি একটি সালাফিস্ট-জিহাদি সেলের সদস্য ছিলেন যেটি হফস্ট্যাড নেটওয়ার্ক হিসাবে পরিচিত ছিল এবং ইউরোপজুড়ে এর বিস্তৃত সংযোগ ছিল। ক্যাসাব্ল্যাঙ্কা ও মাদ্রিদ বোমা বিস্ফোরণের সাথেও তাদের সংযোগ ছিল। পরবর্তী সময়ে ডাচ পুলিশ দলটির আরও ১৩ জন সন্দেহভাজন সদস্যকে গ্রেপ্তার করে, যাদের বেশিরভাগই ছিল উত্তর আফ্রিকান মুসলিম। তাদের মধ্যে রশিদ বেলকাসেমকে লন্ডনের টিউব বোমাহামলার ঠিক দু-সপ্তাহ আগে ২২ জুন ২০০৫ সালে পূর্ব লন্ডনে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। বেলকাসেমকে অস্ত্র রাখা এবং সশস্ত্র জিহাদের রিক্রুটিংয়ের জন্য অভিযুক্ত করা হয়।[১] স্প্যানিশ পুলিশ মাদ্রিদ বোমা হামলা তদন্তের সদর দফতর ন্যাশনাল কোর্টে ২০০৪ সালের অক্টোবরে একটি হামলার ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করে দেওয়ার পর সেখানে আলজেরিয়ান মুহাম্মাদ আছরাফের নেতৃত্বে 'মার্টার্স ফর মরক্কো' নামক একটি দলের অস্তিত্ব পাওয়া যায়, যাদের সাথে বোয়েরি এবং হফস্ট্যাড নেটওয়ার্কের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। স্পেনীয় পুলিশ আবিষ্কার করেছিল যে, আছরাফ সেই ডাচ গ্রুপটিকে তহবিল সরবরাহ করেছিল এবং ফোনে বোয়েরির সাথে কথাও বলেছিল। গ্রেপ্তারের পর, বোয়েরির কাছে তাঁর নিজের শাহাদাতকে বরণ করা নিয়ে একটি বিদায়ী কবিতা পাওয়া গিয়েছিল, যার নাম ছিল 'ইন ব্লাড জিডোপ্ট' (Immersed in Blood : রক্তে নিমগ্ন)। বোয়েরি অবশ্য নিজ কর্তৃক শহিদ হয়ে যাননি এবং বর্তমানে হত্যার দায়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করছেন।

লন্ডন বোমা হামলা (৭ জুলাই ২০০৫)

২০০৫ সালের জুলাইয়ের ৭ তারিখে পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত তিন তরুণ ব্রিটিশ নাগরিক এবং বাকিংহামশায়ারের জ্যামাইকান বংশোদ্ভূত আরেক তরুণ লন্ডনের ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমে নিজেদেরকে বিস্ফোরিত করে। এই ঘটনায় ৫৬ জন মারা যায় এবং সাতশের অধিক মানুষ আহত হয়। হামলার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই 'দ্য সিক্রেট অর্গানাইজেশন অফ আল-কায়েদা ইন ইউরোপ' জিহাদি ওয়েবসাইট 'আল-কালাহ'তে হামলার দায় স্বীকার করেছিল। ভীতিসঞ্চারক মেলোড্রামাটিক রীতিতে বোমা হামলাকারীরা বিস্ফোরণগুলির মাধ্যমে একটি আগুনের ক্রুশ তৈরির

---

[১] Channel 4 special report by Simon Israel, June 2005.

পরিকল্পনা করেছিল, যেটা ভূগর্ভস্থ নেটওয়ার্কের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব এবং পশ্চিমমুখী অবস্থান করত। কিন্তু আঠারো বছর বয়সী হাসিব মীর হুসেন আন্ডারগ্রাউন্ড ত্যাগ করে একটি বাস উড়িয়ে দেওয়ায় এই ধর্মীয় প্রতীকায়নটি সফল হয়নি।

অন্যান্য বোমা হামলাকারীরা হলো বাইশ বছর বয়সী শেহজাদ তানভির, উনিশ বছর বয়সী জার্মেই লিন্ডসে এবং ত্রিশ বছর বয়সী মুহাম্মাদ সিদ্দিক খান এবং তিনিই এই দলের প্রধান ছিলেন। হামলাকারীদের আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুদের সকলেই তাদের এই কর্মকাণ্ডে চূড়ান্ত বিস্ময় এবং অবিশ্বাস প্রকাশ করেছিল। শেহজাদ তানভির ছিল পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত। কঠোর পরিশ্রমী, সুপ্রতিষ্ঠিত শেহজাদকে তানভির মুহাম্মদ আলী নামক একজন প্রতিবেশী 'ব্রিটিশ সংস্কৃতিতে মিশে যাওয়া আদর্শ প্রতিলিপি' হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন।[১] তার পরিচিত অধিকাংশ ব্যক্তিই তাকে একজন 'উচ্চাভিলাষী কলেজ ছাত্র' হিসেবে বর্ণনা করেছিল, যার অনেক শেতাঙ্গ ব্রিটিশ বন্ধু ছিল। সে ক্রিকেট খেলা খুব পছন্দ করত এবং একই সাথে সে ছিল শান্ত এবং ভদ্র।

হাসিব হুসেন বোমা হামলাকারীদের মধ্যে এই কারণে কিছুটা ব্যতিক্রম যে, তার পরিচিত ব্যক্তিদের কেউ কেউ মারামারিতে তার আগ্রাসী মনোভাব এবং সহিংসতার কথা উল্লেখ করেছিল, যেটা এশীয় বনাম শেতাঙ্গদের মধ্যে প্রায়শই ঘটে থাকে।[২] বোমা হামলার দুবছর পূর্বে যখন তার বয়স ছিল ষোল বছর, তখন সে চরমপন্থি ইসলামের সাথে জড়িত হয়ে পড়ে, যেটা নাটকীয়ভাবে এবং বাহ্যত চিরকালের জন্য তাকে পরিবর্তিত করে দেয়। ২০০৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তার বিশ্ববিদ্যালয় শুরু করার কথা ছিল এবং সে পারিবারিকভাবে ঠিক করা তার বিয়েতে রাজিও হয়েছিলেন।

জের্মেই লিন্ডসে তার কৈশোরকাল লীডস থেকে বিশ মাইল দূরের হডার্সফিল্ডে কাটিয়েছেন। যদিও তাঁর জ্যামাইকান মা ছিল একজন সুসমাচারী খ্রিষ্টান। সে ২০০১ সালে পনেরো বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং তার নাম জের্মেই লিন্ডসে থেকে পরিবর্তন করে আবদুল্লাহ শহিদ জামাল রেখেছিল। বাদবাকি হামলাকারী বিশেষত মুহাম্মদ সিদ্দিক খানের সাথে তার লিডসের গ্র্যান্ড মসজিদে সাক্ষাৎ হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে সে পেইন্টবলিং খেলায় তাদের সাথে যোগ দিত। মাত্র ষোলো বছর বয়সে সে সামান্থা লেথওয়াইট নামক একজন নওমুসলিম মেয়েকে বিয়ে করেছিল এবং উনিশ বছর বয়সী তার স্ত্রীকে নিয়ে লুটনে বসবাস

---

[১] Milan Rai, 7/7: The London Bombings, Islam and the Iraq War, p, 31.
[২] Ibid., p, 45.

করতে স্থানান্তরিত হয়েছিল। সামান্থা লেথওয়াইট প্রাথমিকভাবে এটা বিশ্বাস করতে অস্বীকার করেছিল যে, তার স্বামী উক্ত বোমা হামলায় কোনোভাবে জড়িত ছিল। কেবল কিং ক্রস স্টেশনে সকাল ৮টা ২০ মিনিটে সেই চারজনের কুখ্যাত সিসিটিভি ফুটেজ তাকে শেষপর্যন্ত বিশ্বাস করতে বাধ্য করে।

এই হামলাকারীদের সকলেই দ্বৈত জীবনযাপন করত, এমনকি তাদের নিকটাত্মীয়দের অজান্তেই বিদেশ ভ্রমণ করেছিল। তবে এই দলের জ্যেষ্ঠ সদস্য মুহাম্মাদ সিদ্দিক খান (জন্ম ২০ অক্টোবর ১৯৭৪) ছিল সর্বাধিক কপটচারী এবং নিঃসন্দেহে সেই বাকিদের চরমপন্থি হওয়ার জন্য দায়ী ছিল। ১৯৯৫ সালে বাণিজ্য ও শিল্প অধিদপ্তরে (DTI) কাজ শুরু করার পূর্বে, যেটাকে সে বিরক্তিকর চাকরি বলে উল্লেখ করেছিল, বিশ বছর বয়সী খান আমেরিকাতে বেড়াতে গিয়েছিল। তারা জানিয়েছে যে, সে তখন কাউবয় বুট পরে ফিরে এসেছিল এবং সে তার পাকিস্তানি-মুসলিম পরিচয়কে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করে পশ্চিমা পোশাক পরে নিজেকে 'সিড' হিসেবে অভিহিত করে। এমনকি সে স্থায়ীভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে যাওয়ার কথা বলেছিল। ১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে খান DTI থেকে অব্যাহতি নিয়ে বিজনেস ম্যানেজমেন্ট পড়ার জন্য লিডস মেট্রোপলিটন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। সেখানেই তার স্ত্রী হাসিনার সাথে তার দেখা হয়েছিল। খান ২০০১ সাল থেকে ২০০৪ সাল অবধি লিডসের বিস্টন এলাকার হিলসাইড প্রাইমারি স্কুলে লার্নিং মেনটর হিসাবে চাকরি করেছিল। লিডস এডুকেশনাল ডিপার্টমেন্ট থেকে উক্ত চাকরির নথিতে তার দীর্ঘমেয়াদি অনুপস্থিতি আবিষ্কৃত হয় যার সর্বশেষটি ছিল তিন মাসেরও অধিক সময়। তাঁর উপস্থিতি নিশ্চিতভাবেই স্বাভাবিক ছিল না। তাঁর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সহনশীলতা হয়তো উক্ত দৃশ্যমান স্বাচ্ছন্দ্যে অবদান রেখেছিল, যা দিয়ে খান আরেকটি গোপন জীবন অতিবাহিত করত।

গোয়েন্দা প্রতিবেদনে দেখা যায়, লন্ডন বোমা হামলা ঘটনার পূর্বে তিনি পাঁচ বছর ধরে আল-কায়েদার জ্যেষ্ঠ নেতাদের সংস্পর্শে ছিলেন। অস্ট্রেলিয়ান পত্রিকা '*দ্য এজ*'-এ ২৭ অক্টোবর ২০০৫ এর একটি নিবন্ধে সন্ত্রাসবাদ বিষয়ক গবেষক রোহান গুণরত্ন দাবি করেন, খান ২০০০ সালে দক্ষিণ ফিলিপাইনের জামায়াতে ইসলামিয়ায় একটি ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। সেই সফরে তার আশ্রয়দাতা ছিল উক্ত সংগঠনেরই প্রধান হাম্বালি, যিনি পরবর্তী সময়ে ২০০৪ সালে আল-কায়েদার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং ২০০২ সালের অক্টোবর মাসের ইন্দোনেশিয়ার বালি দ্বীপে সংঘটিত নৃশংস হামলার ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে আটক হন। ১৯৯৯ সালে জ্যামাইকান বংশোদ্ভূত জিহাদি আলেম আবদুল্লাহ আল-ফয়সাল (বর্তমানে হত্যার উস্কানির দায়ে কারাগারে রয়েছেন) প্রথমবারের মতো বোস্টন

মসজিদে বয়ান পেশ করার সময়েই খান প্রথম চরমপন্থি ইসলামের সংস্পর্শে এসেছিলেন। এই ঘটনা যে খানের জীবনের মোড় পরিবর্তনকারী একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল, সেটা ২০০৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মসজিদের ইমাম হামিদ আলী কর্তৃক একজন ছদ্মবেশী সাংবাদিকের নিকট করা মন্তব্য থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়। সেই ইমামও খান এবং অন্যান্য হামলাকারীদের প্রশংসা করে বলেছিল যে, তারা জনগণকে এই দিকে মনোযোগী হতে বাধ্য করেছে যে, শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ কোনো ফল বয়ে আনে না এবং তিনি তাদের 'আবদুল্লাহ আল-ফয়সালের সন্তান'[১] বলেও অভিহিত করেছিলেন। আল-ফয়সাল এরপরও কমপক্ষে তিনবার বোস্টন মসজিদে বয়ান করেছিলেন।

২০০১ সালে বার্নলে, ওল্ডহাম এবং ব্র্যাডফোর্ডে ভয়াবহ বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল, যেখানে জড়িতদের অধিকাংশই ছিল মুসলিম যুবক। ২০০৫ সালের নভেম্বর মাসে ফ্রান্স, বেলজিয়াম এবং ডেনমার্কের বিক্ষোভের মতোই এর সাথে জড়িতরা তাদের বিরুদ্ধে বঞ্চনা এবং বৈষম্যের অভিযোগ করেছিল এবং এগুলো বাস্তবেও যথেষ্ট পরিমাণে উপস্থিত ছিল। বোস্টনের সেই যুবক কয়েক বছরের ব্যাবধানে ক্রমবর্ধমানভাবে চরমপন্থি হয়ে ওঠে এবং ১১ সেপ্টেম্বর ও ইরাকে মার্কিন আগ্রাসনের মতো ঘটনাগুলির দ্বারা আরও অধিকতর প্রোৎসাহিত হয়। স্থানীয় ইসলামিক বুকশপ এবং মসজিদের অধীনস্থ জিমটি তাদের পনেরো সদস্যের 'মোল্লা ক্রু' নামক একটি দলের সদর দফতর ছিল এবং তাদের কেন্দ্রে ছিল সেই তিনজন। উক্ত গ্রুপটি পশ্চিমা অবক্ষয় এবং সীমালঙ্ঘনের বিরুদ্ধে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করত। এর ক্রিয়াকলাপের মাঝে মুসলিম বংশোদ্ভূত হেরোইন আসক্তদের আসক্তিমুক্ত করাও অন্তর্ভুক্ত ছিল, যেখানে তারা কোল্ড টার্কি পদ্ধতি অনুসারে মাদকাসক্তকে মাদকবিহীন একটি ঘরে আবদ্ধ করে রাখতো। 'মোল্লা ক্রু' পুলিশের নিকট পরিচিতই ছিল, যারা মনে করত উক্ত গ্রুপটি একটি উপকারী সামাজিক সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করে। তবে, জিমের ব্যবহারকারীরা এর চরমপন্থি এজেন্ডা সম্পর্কে অবগত ছিল এবং অনেক পূর্বেই একে 'আল-কায়েদা জিম' নামকরণ করেছিল।

তিনজন ব্রিটিশ মুসলিম হামলাকারীর প্রত্যেকেই ২০০৪ সালে পাকিস্তান ভ্রমণ করেছিল এবং তারা মীনরাশি পদ্ধতিতে যাত্রা করেছিল। ফটোগ্রাফ প্রদর্শন করে যে, প্রত্যেকেই আইনত পাকিস্তানে প্রবেশ করেছিল এবং একইভাবে প্রস্থানও করেছিল। খান ও তানভির ২০০৪ সালের ১৯ নভেম্বর তুর্কি এয়ারলাইন্স ফ্লাইট ১০৫৬ তে করে করাচিতে আগমন করেছিল এবং দুজনেই তুর্কি এয়ারলাইন্সের

---

[১] Ali Hussain, Jonathan Calvert and Gareth Walsh, 'British Imam Praises London Tube Bombers', Sunday Times, 12 February 2006.

ফ্লাইট ১০৫৭ তে ২০০৫ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি প্রত্যাবর্তন করেছিল। নথি থেকে জানা যায়, ২০০৪ সালের জুলাই মাসে সৌদি আরব এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট এসভি-৭১৪-তে করে হাসিব হুসেন করাচিতে গিয়েছিল। তবে তার বহির্গমন সম্পর্কে স্পষ্ট জানা যায়নি।

সেই ভ্রমণে তারা কি করেছিল তা স্পষ্ট জানা যায়নি, তবে খুব সম্ভবত তারা ৭ জুলাইয়ের হামলার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। ইন্টারনেট থেকে বোমা তৈরির বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যেতে পারে তবে একটি আত্মঘাতী মিশনের জন্য প্রয়োজনীয় মানসিক ও আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি কেবল অনলাইনে পাওয়া অসম্ভব বলেই মনে হয়। আফগানিস্তান-পাকিস্তান পার্বত্য অঞ্চলে প্রবেশ করতে ইচ্ছুক লোকেদের জন্য পাকিস্তান একটি সর্বজন স্বীকৃত প্রবেশদ্বার, যে অঞ্চলে বহু আল-কায়েদার যোদ্ধা এবং সম্ভবত বিন লাদেন ও আল-জাওয়াহিরিও লুকিয়ে রয়েছেন।

লন্ডনের বোমা হামলাকারীরা ব্যক্তিগতভাবে আল-কায়েদা নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎ করেছিল কিনা তা স্পষ্ট জানা না গেলেও, উক্ত সফরে তাদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যোগাযোগ করার সকল উপায় তাদের কাছে বিদ্যমান ছিল। বোমা বিস্ফোরণের পর প্রচারিত বার্তা পরোক্ষভাবে প্রদর্শন করে যে, কমপক্ষে আল-জাওয়াহিরির সাথে খানের বিস্তৃত সাক্ষাৎ হয়েছিল। বোমা হামলার পর দায় স্বীকার করে প্রেরিত বিবৃতিটি মিশরীয় জিহাদি গোষ্ঠীর চরমপন্থি আদর্শিক ভাষায় রচিত হয়েছে এবং আমি প্রায় নিশ্চিত যে এটি স্বয়ং আল-জাওয়াহিরি রচনা করেছিলেন। আল-কায়েদার আল-সাহাব প্রযোজনা সংস্থা কর্তৃক খানের অছিয়তনামাটি সম্ভবত এই ভ্রমণের সময় তৈরি করা হয়েছিল এবং সম্ভবত তানভিরেরটাও—যেটা খানের কয়েক মাস পরে মুক্তি পেয়েছিল। যদি এরূপ না হয়ে থাকে, তবে সেটা আল-সাহাবের কাছে পৌঁছানোর মাধ্যম খানের আয়ত্বে ছিল যেটা খানের সাথে আল-কায়েদার উচ্চপদস্থ নেতাদের সংশ্লিষ্টতাকে প্রমাণ করে। (স্পষ্ট ইয়র্কশায়ার উচ্চারণে) খান সেসব শব্দ ব্যবহার করেছিল যেটা সেই সময়কার ওসামা বিন লাদেনের ব্যবহৃত ভাষার ব্যবহারকে প্রতিধ্বনিত করে। উদাহরণস্বরূপ, মাদ্রিদে বোমা বিস্ফোরণের পর ১৫ এপ্রিল ২০০৪ সালে সম্প্রচারিত 'ম্যাসেজ টু দ্য পিপল অফ ইউরোপ' বার্তায় বিন লাদেন বলেছিলেন—'নিরাপত্তা প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার। আমরা এটিকে কেবল তোমাদের নিজেদের জন্য একচেটিয়াকরণ করতে দেবো না।' অন্যদিকে খান সতর্ক করে বলেছিল, 'যতদিন না আমরা নিরাপত্তা অনুভব করতে পারব, ততদিন তোমরা আমাদের লক্ষ্যবস্তুই থাকবে।'

খানের ভিডিওটি আরেকটি দিক দিয়ে কৌতূহলউদ্দীপক, যেটা ধারণা দেয় যে, এটি আল-কায়েদার শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের তত্ত্বাবধানেই তৈরি করা হয়েছিল। তিনি

বলেছিলেন—'এই সময়ের নায়ক যেমন আমাদের প্রিয় শাইখ ওসামা বিন লাদেন, ডা. আইমান আল-জাওয়াহিরি এবং আবু মুসআব আল-জারকাভি...।' ভিডিওতে আল-কায়েদার সাথে আল-জারকাভির গোষ্ঠীর আনুষ্ঠানিক জোটবদ্ধ হওয়ার তথ্য প্রদান (ডিসেম্বর ২০০৪) কেবল কাকতালীয় হওয়া সম্ভব না। এরূপ মহাসমারোহে এই তিন নেতাকে সন্নিহিত করা জিহাদি দর্শকদের ওপর বড় ধরনের প্রভাব ফেলেছিল। ভিডিওটির সাথে আল-জাওয়াহিরির একটি বিবৃতিও সংযুক্ত করা হয়েছিল, যেখানে তিনি সরাসরি ব্যক্ত করেন যে, বোমা হামলাটি ছিল ব্রিটেনের পররাষ্ট্রনীতির প্রত্যক্ষ পাল্টা জবাব, ঠিক ৯/১১ যেমনটা আমেরিকান পররাষ্ট্রনীতির পাল্টা জবাব ছিল। আল-জাওয়াহিরি ইউরোপের নিকট ভবিষ্যতে আরও হামলার হুমকি দিয়েছিলেন, যেহেতু ২০০৪ সালের এপ্রিল মাসে বিন লাদেনের প্রস্তাবিত সাময়িক যুদ্ধবিরতিকে উপেক্ষা করা হয়েছিল। লন্ডন বোমা হামলার গভীরে অন্তর্নিহিত সামাজিক কারণগুলিকে উপেক্ষা করা কোনোভাবেই উচিত নয়। অসংখ্য তরুণ মুসলিম যারা ইউরোপে পরিত্যক্ত, বঞ্চিত ও অবহেলিত বোধ করে; তাদের মতোই খান এবং তার সহযোগীরা 'উম্মাহ' পরিচয়ের একটি দৃঢ় একাত্মতা অনুভব করেছিল। বিন লাদেন তার ২৩ এপ্রিল ২০০৬ এর অডিওটেপে বলেছিলেন যে—'পশ্চিমারা আজও জাতিগত আধিপত্যে বিশ্বাসী এবং তারা অন্যান্য জাতিকে হীন জ্ঞান করে। তারা মানবকুলকে শেতাঙ্গ প্রভু এবং রঙিন দাস এই দুই ভাগে বিভক্ত করে।' আইকনিক ইসলামপন্থি নেতা যেমন লাদেন এবং প্রয়াত আল-জারকাভি দীর্ঘদিনের এই অবিচার ও বৈষম্য নিরসনের উপলক্ষ হিসাবে বিবেচিত হন এবং ব্রিটিশ মুসলিম যুবকদের উগ্রবাদী জিহাদি গোষ্ঠীভুক্ত হওয়ার অকল্পনীয় প্রমাণসমূহ ইঙ্গিত দেয় যে, এভাবে তাদের শক্তিশালী ভাবমূর্তি বাড়ানো তাদের জন্য একটি অতিসাধারণ বিষয়মাত্র।

লন্ডনের আন্ডারগ্রাউন্ডে ২১ জুলাই ২০০৫ তারিখে চারটি বোমার একটিও বিস্ফোরিত না হলে আরেকটি বোমা হামলার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। উক্ত ঘটনায় অভিযুক্ত সকলেই ছিল উত্তর আফ্রিকার বাসিন্দা। ইরিত্রিয়ান বংশোদ্ভূত ব্রিটেনের নাগরিকত্ব পাওয়া সাতাশ বছর বয়সী ইব্রাহিম মুখতার সাইদ, সাতাশ বছর বয়সী ইথিওপিয়ান বংশোদ্ভূত ব্রিটেনের নাগরিকত্ব পাওয়া ওসমান হুসেন, চব্বিশ বছর বয়সী সোমালিয়ার বাসিন্দা ইয়াসিন হাসান ওমর এবং রামযি মুহাম্মাদ। আবু হাফস আল-মাসরি ব্রিগেড পুনরায় এই ঘটনার দায় স্বীকার করে এবং জানায় যে ইরাকে শান্তি ফিরে না আসা অবধি ইউরোপে এসব হামলা অব্যাহত থাকবে।

ড্যানিশ ব্যাঙ্গচিত্র সংকট

২০০৫ সালের শেষ দিকে সাংস্কৃতিক জিহাদের সর্বাধিক লক্ষণীয় ঘটনার সূত্রপাত ঘটে। প্রথমবারের মতো ৩০ সেপ্টেম্বর তারিখে সর্বাধিক বিক্রিত ড্যানিশ পত্রিকা জিল্যান্ডস-পোস্টেনে নবী মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একাধিক নিন্দনীয় ব্যাঙ্গাত্মক কার্টুন প্রকাশিত হওয়া শুরু হলে বিশ্বজুড়ে হাজার হাজার মুসলিম এর বিরুদ্ধাচরণে রাস্তায় নেমে এসেছিল। এই বিক্ষোভ কয়েক মাস ধরে অব্যাহত থাকে এবং ক্রমাগত ক্রোধ ও আবেগের মাত্রা বাড়ার সাথে সাথে বহু লোক মারাও যায়। উদাহরণস্বরূপ, ২০০৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে, পাকিস্তানি পুলিশের গুলিতে কমপক্ষে পাঁচ জন বিক্ষোভকারী নিহত হয় এবং নাইজেরিয়ায় মুসলমানরা গির্জাসমূহে হামলা এবং আগুন জ্বালালে পনেরো জন খ্রিষ্টান নিহত হয়। এসব বিক্ষোভ ঐতিহাসিকভাবে এই কারণে গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, সেখানে আমরা মুসলমানদের ধর্ম ও মর্যাদার ওপর আঘাতের প্রতিক্রিয়ায় সমগ্র উম্মাহকে বিশ্বব্যাপী একত্রিত হতে দেখেছিলাম।

ওসামা বিন লাদেন প্রায়শ এই বিদ্রোহের মূল চরিত্র হিসাবে আবির্ভূত হতে থাকেন, উদাহরণস্বরূপ রামাল্লায় বিক্ষোভকারীরা এই স্লোগান দিয়েছিল— 'আমাদের নেতা বিন লাদেন/ডেনমার্কের ধ্বংস অনিবার্য।' ২০০৬ সালের ২৩ এপ্রিল বিন লাদেন কার্টুন সংকট নিয়ে তার প্রতিক্রিয়াকে ফতোয়ার আকারে প্রকাশ করেছিলেন, যেমনটা আয়াতুল্লাহ খোমেনি ১৯৯০ সালে ব্রিটিশ লেখক সালমান রুশদির বিরুদ্ধে করেছিল। বিন লাদেন তার সমর্থক মুসলিমদের আহবান জানান—

> 'যেসব ক্রুসেডার-সাংবাদিক আমাদের নবী মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিরুদ্ধে এরূপ নিকৃষ্ট অপরাধ সংগঠন করে তাদের অবশ্যই শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে...উম্মাহ এই বিষয়ে একমত যে, যে-ই রাসুলকে অবমাননা অথবা কলুষিত করার প্রচেষ্টা চালাবে, তাকে অবশ্যই হত্যা করতে হবে।'

পশ্চিমা গণমাধ্যমগুলির জন্য এরূপ ব্যাঙ্গচিত্র প্রকাশ করা এবং পরবর্তী কালে পুনরায় এর পুনরুৎপাদন করা নিঃসন্দেহে অসুস্থ মানসিকতা ও বিকারগ্রস্ততার লক্ষণ ছিল। অনেক পশ্চিমা বিশেষজ্ঞের অবস্থানই উক্ত ড্যানিশ কার্টুন সংকটে বাস্তবিকই কিংকর্তব্যবিমূঢ় বলে মনে হয়েছিল এবং তারা বাকস্বাধীনতার যুক্তি দেখিয়ে এর সমর্থনসূচক প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল। আল-জাওয়াহিরি ২০০৬ সালের ৪ মার্চ একটি ভিডিওবার্তায় এই প্রসঙ্গে বলেন, 'কেউ ইহুদি অথবা সমকামীদের অপমান করার সাহস করে না।' মুসলিম মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব বিশেষত এমন এক সময়ে মারাত্মক বিপজ্জনক, যখন মুসলিম জনগোষ্ঠীর মাঝে ক্রোধ এবং

অসন্তুষ্টি ব্যাপক আকারে বিরাজমান এবং এই সংকটকে আল-কায়েদার জন্য 'ইসলামের বিরুদ্ধে ক্রুসেডারদের যুদ্ধের ধারাবাহিকতা' হিসাবে উপস্থাপন করা আরও অধিকতর সহজ করে দিয়েছে এবং এভাবেই এর নিজস্ব রাজনৈতিক এজেন্ডার উন্নতিসাধনে ভূমিকা রাখছে।

উপসংহার

ইউরোপের জিহাদি উপাদানসমূহ প্রতিষ্ঠিত ও সমৃদ্ধ এবং এগুলো অধিকাংশ দেশেই পরস্পর সংযুক্ত সুপ্ত কিংবা সক্রিয় সেল আকারে বিদ্যমান। এসব সেলগুলো বহুবিধ সশস্ত্র ইসলামপন্থি গ্রুপের সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত, যাদের নিজ নিজ স্থানীয় এজেন্ডা থেকে থাকলেও তারা আল-কায়েদা মতাদর্শ এবং এর দীর্ঘমেয়াদি রাজনৈতিক/ধর্মতাত্ত্বিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার অনুসারী এবং এর নেতৃত্বকে স্বীকৃতি জ্ঞাপন করে।

এই গোষ্ঠীগুলিতে প্রায়শ সমমনা একাধিক গোষ্ঠীতে সক্রিয় কমন সদস্যও থাকে, যারা মূল আল-কায়েদার ব্যক্তিত্বদের নিকট একটি চ্যানেল সরবরাহ করে, যদিও এসব চ্যানেল পরোক্ষ অথবা কঠোর হয়ে থাকে। এসব নেটওয়ার্ক কার্যকর রাখতে সঠিক ও ধারাবাহিকভাবে তথ্য প্রবাহ, প্রচারণা এবং ব্যাবহারিক সামরিক প্রশিক্ষণ সরবরাহের ক্ষেত্রে ইন্টারনেট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ইউরোপে জিহাদি উপস্থিতি বর্তমানে তিনটি প্রধান বর্গ নিয়ে গঠিত। নব্বইয়ের দশকের আফগান-আরব এবং বসনিয়ান যোদ্ধাদল যারা পশ্চিমে আশ্রয় পেয়েছিল এবং তারা হলো ইউরোপ ভিত্তিক আল-কায়েদা কুশলীদের প্রথম প্রজন্ম। মূলত তাদের সংযোগের কারণেই ইউরোপীয় নেটওয়ার্ক আজও বিদ্যমান রয়েছে। অতীতে এসব ব্যক্তিরা প্রধানত জিহাদি সেলসমূহের রিক্রুটার এবং প্রধান হিসেবে ভূমিকা পালন করত (এবং এরূপ ভূমিকা পালন করার জন্য তাদের অনেকেই বর্তমানে কারাগারে রয়েছেন)। কিন্তু নাইন ইলেভেন এবং ইউরোপীয় মাটিতে নৃশংসতার পরিপ্রেক্ষিতে তারা বর্তমানে ধারাবাহিক এবং কঠোর নজরদারির আওতাধীন রয়েছেন। এর অর্থ এই নয় যে, তারা আর কোনও বিপদ ধারণ করে না, বরং তাদের জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা, সেটা সরাসরি সামরিক প্রশিক্ষণ, কৌশলগত বিশ্লেষণ অথবা মতাদর্শ যাই হোক না কেন, সেগুলো ব্যাপকভাবে প্রভাবক্ষমই রয়ে গেছে এবং কোনো সন্দেহ নেই যে, তারা তরুণ প্রজন্মকে চরমপন্থি কর্মকাণ্ডে প্ররোচিত করতে সর্বাধিত সক্ষম।

ইউরোপীয় জিহাদিদের সর্বাধিক সক্রিয় গোষ্ঠীটি অসন্তুষ্ট মুসলিম অভিবাসী যুবকদের দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় প্রজন্মকে নিয়ে গঠিত, যারা সাংস্কৃতিক পরিচয়গত সমস্যা নিয়ে ক্ষুব্ধ। তাই তারা উম্মাহর সাথে একাত্নতায় এর সমাধান খোঁজ করে।

ইউরোপীয় মাটিতে সাম্প্রতিক হামলাসমূহ এরূপ যুবকদের দ্বারাই সংগঠিত হয়েছে, যারা মসজিদ, কারাগার, ব্যক্তিগত যোগাযোগ বা জিহাদি ওয়েবসাইটগুলির মাধ্যমে চরমপন্থা অবলম্বনের দিকে ঝুঁকেছে, এবং তারা এমনকি নিজস্ব সেলও গড়ে তুলেছে। তবে বর্তমানে ক্রমবর্ধমানভাবে স্থানীয় ধর্মান্তরিত ইউরোপীয়দের মধ্যেও ইরাকে কিংবা নিজ দেশেই সহিংসতায় জড়িত হওয়ার ঘটনাও ঘটছে। এই ঘরোয়া জিহাদিদের ওপর পুলিশের নজরদারি প্রায় অসম্ভব, কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাদবাকি হাজার হাজার অন্যান্য যুবক থেকে তাদের চিহ্নিতকারী কোনো বৈশিষ্ট্য থাকে না। অনেক ক্ষেত্রে এই সেলগুলো স্বায়ত্তশাসিতভাবেই আক্রমণের পরিকল্পনা এবং সংগঠন করে, যদিও আত্মঘাতী বোমা হামলার ক্ষেত্রে আমি নিশ্চিত যে, এ ক্ষেত্রে সামান্য পরিসরে হলেও প্রশিক্ষণ জড়িত থাকে। এই আপাত স্বায়ত্তশাসন সত্ত্বেও এই যুবকরা গোপনীয় সংযোগবিশিষ্ট নেটওয়ার্কে অংশ নিতে সক্ষম, যেটা তাদেরকে অনিবার্যভাবেই আল-কায়েদার দিকে পরিচালিত করে, যেমনটা আমরা দেখেছি লন্ডন বোমা হামলার ক্ষেত্রে।

লন্ডনের সেলটির মতোই 'রোপণকৃত' ঘরোয়া জিহাদি এবং ইউরোপের ক্রমবর্ধমান বিচ্ছিন্ন ও বস্তিবাসী অভিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে তাদের সাথে যোগ দেওয়ার বিপুল সম্ভাবনা আল-কায়েদার নেতৃবৃন্দের নিকট অত্যন্ত লোভনীয়। এগুলো সাম্প্রতিক (এপ্রিল ২০০৬) সময়ের বিন লাদেন (যেটাতে ড্যানিশ কার্টুনিস্টদের বিরুদ্ধে ফতোয়া রয়েছে) এবং আল-জাওয়াহিরি (যিনি বিন লাদেনের মতোই পর্দা করতে ইচ্ছুক ফ্রান্সের মুসলিম মহিলাদের ওপর চলমান নিপীড়নের উল্লেখ করেন) উভয়ের বিবৃতিতে ইউরোপীয় ইস্যুসমূহের উল্লেখ দ্বারাও প্রমাণিত হয়। আরও গুরুতরভাবে, আল-জাওয়াহিরির ২৭ এপ্রিল ২০০৬ এবং ২৪ এপ্রিল আল-জারকাভির সম্প্রচারিত উভয় ভিডিওবার্তাতেই ইংরেজি সাবটাইটেল বিদ্যমান ছিল এই বিষয়কে মাথায় রেখে যে, অধিকাংশ দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় প্রজন্মের ইউরোপীয় মুসলিম অভিবাসীর আরবি সম্পর্কে কোনো জ্ঞানই নেই। অধিকন্তু, সামরিক নির্দেশনাবলি, মতাদর্শ এবং বুলেটিনবোর্ডসহ ক্রমবর্ধমান জিহাদি ওয়েবসাইটগুলি ইংরেজি এবং অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় পোস্ট করা হচ্ছে।

বিগত দশকে ইউরোপে একটি নতুন গোষ্ঠীর উদয় ঘটেছে এবং যা মূলত উত্তর আফ্রিকানদের সমন্বয়ে গঠিত, যাদের বলা যেতে পারে 'জিহাদি পর্যটক'। ভুয়া দলিলপত্রের সাহায্যে ইউরোপীয় শহরগুলোতে আগমন করে যাদের একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে সামরিক সেল প্রতিষ্ঠা এবং এর জন্য সদস্য সংগ্রহ। এদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশটি আলজেরিয়ান GSPC নেটওয়ার্কের সাথে জড়িত, যেটি আল-কায়েদার সাথে খুব ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। যদিও তাদের প্রাথমিক লক্ষ্য

আলজেরিয়ার চলমান বিদ্রোহের জন্য পেশীশক্তি সরবরাহ করা, কিন্তু এই সেলগুলোর উপস্থিতি সুনিশ্চিতভাবেই একটি উদ্বেগের বিষয়, যেহেতু তারা ইউরোপের অভ্যন্তরে আল-কায়েদার ঠিকাদার হিসেবে হামলার ঝুঁকি বহন করে। প্রাথমিকভাবে, ইতালিতে ছাড়া (এবং বিশেষত মিলানে, যা ইসলামিস্ট ক্রিয়াকলাপের কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠেছিল) ইউরোপের অধিকাংশ দেশেই এই নেটওয়ার্কটির শাখা রয়েছে এবং 'তাকফির ওয়াল-হিজরাহ' সংস্থার সাথেও তাদের বিস্তৃত যোগাযোগ রয়েছে এবং পাঠকদের নিশ্চয় স্মরণ আছে যে, এই সংস্থাটিই থিও ভ্যানগগ হত্যার সাথে জড়িত ছিল।

আমি মনে করি যে, ইউরোপের ওপর আল-কায়েদার নেতৃত্বের কঠোর দৃষ্টি রয়েছে এবং আরও অধিক হামলা অত্যাসন্ন। যতদিন ইউরোপ ইরাকে জড়িত থাকবে এবং মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন এজেন্ডার প্রতি সমর্থনকে অব্যাহত রাখবে, ততদিন পর্যন্ত এটি জিহাদিদের নিকট একটি 'বৈধ লক্ষ্যবস্তু' হিসেবেই বিবেচিত হবে।

২০০৪ সালের ২৪ এপ্রিলে প্রয়াত আল-জারকাভি তার বিবৃতিতে বিন লাদেন কর্তৃক ইউরোপীয়দের দেওয়া সাময়িক যুদ্ধবিরতি সুযোগকে প্রত্যাখানের বিষয়টি তুলে এনে বলেছিলেন যে—'যদি তোমরা একে গ্রহণ করতে, তবে সেটা তোমাদের জন্যই ভালো হতো, কিন্তু তোমাদের অহংকারই একে অস্বীকার করতে বাধ্য করেছে।' মৃত্যুর পূর্বে আল-জারকাভি সযত্নে ইরাকে তার বাহিনীর জন্য ইউরোপীয় রিক্রুটদের অবিচ্ছিন্ন আগমন নিশ্চিত করেছিলেন। আমাদের এখনও ইরাক থেকে প্রত্যাবর্তনকারী বিপুল সংখ্যক ইউরোপীয় মুজাহিদদের প্রভাবের মুখোমুখি হওয়া বাকি রয়েছে, যারা খুব সম্ভবত চরম উগ্রবাদী ও যুদ্ধভিজ্ঞ এবং তারা শত্রুদের সামরিক কৌশলে সুবিশারদ একটি গোষ্ঠীর জন্ম দেবে। আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি যে, আল-কায়েদা মার্কিন পরাশক্তি এবং এর পশ্চিমা মিত্রদের ধ্বংস করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই শাসন ব্যবস্থাগুলির পতনের জন্য অভ্যন্তরীণ হামলা অপেক্ষা উত্তম কি আর কোনো পন্থা হতে পারে? আল-কায়েদার সামরিক কৌশলবিদ মাক্কাভি সংগঠনটির দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায়—যেটি সর্বশেষ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে—একটি চতুর্থ পর্যায়ের চিত্র তুলে ধরেন, যেখানে সংগঠনটি একটি মতাদর্শ ও পথনির্দেশক নীতিমালা সম্বলিত, শিথিলভাবে সংযুক্ত বৈশ্বিক নেটওয়ার্ক হয়ে উঠবে। এবং আমরা এখন ইউরোপে এই পর্যায়কেই প্রত্যক্ষ করছি।

নবম অধ্যায়

আল-কায়েদার ভবিষ্যৎ

আল-কায়েদার ভবিষ্যৎ

সাম্প্রতিক ঘটনাবলি—বিশেষ করে ইউরোপ এবং মিশরের শারম-আল-শেইখে আল-কায়েদার বিধ্বংসী হামলাসমূহ এটাই প্রকাশ করে যে, এটির অস্তিত্ব কেবল টিকেই রয়নি বরং তাদের একটি দীর্ঘমেয়াদি স্ট্র্যাটেজি এবং দৃঢ় মতাদর্শিক ভিত্তিও বিদ্যমান রয়েছে। একইসঙ্গে এটি এর পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি, ইতিবৃত্ত এবং স্ট্র্যাটেজিক পরিবর্তনের সাথে অভিযোজন এবং রূপান্তরের সক্ষমতাও রাখে।

এসব হামলাগুলো স্থানীয় আন্ডারগ্রাউন্ড সেল কর্তৃক সম্পাদিত হয়েছে এবং আক্রমণকারীদের অনেকেই ছিল ঘরোয়া আত্মঘাতী। আফগান প্রশিক্ষণ শিবির অথবা চরমপন্থি ইসলামি গোষ্ঠীসমূহের সাথে কোনোরূপ সংযোগ না থাকায় এরূপ কুশলীরা পশ্চিমা গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের কাছে বিভীষিকাময় দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে। তাদেরকে অনুসরণ করা বা শনাক্ত করা একেবারেই অসম্ভব। তাই গোয়েন্দা সংস্থাসমূহ এসব হামলা প্রতিহত করা তো দূরের কথা; বরং এগুলোর পূর্বাভাস দিতেও পুরোপুরিভাবে ব্যর্থ হয়েছে। এমনকি যদিও তারা এর মূল হোতাদেরকে পরবর্তী কালে আটক করতে সক্ষম হয়েছে; কিন্তু মনে হয় না যে, এগুলো এরূপ হামলাসমূহের ব্যাপ্তির ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব ফেলবে।

সকল লক্ষণই নির্দেশ করে যে, আল-কায়েদা প্রকৃতপক্ষে আরও শক্তিশালী হয়েছে। নিজেদেরকে একটি মতাদর্শে (IDEOLOGY) রূপান্তরিত করার কারণে শারীরিক এবং ভৌগোলিক বাধা-বিপত্তিসমূহ এখন আর এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। সেসব গোষ্ঠীগুলোর নিকট এটি একটি বৈশ্বিক ব্যানার হয়ে উঠেছে, যাদের এজেন্ডাসমূহ একই ধরনের। আল-কায়েদার প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, মতাদর্শ এবং দীর্ঘকালীন স্ট্র্যাটেজিসমূহ এখন আর পূর্বের মতো কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে সীমাবদ্ধ নেই বরং সেগুলো সাইবার স্পেসের সর্বত্র বিদ্যমান রয়েছে এবং সহজেই সেগুলোতে অ্যাক্সেস করা যায়। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে কেউই তাই আল-কায়েদার প্রজেক্টে অংশগ্রহণ করতে পারছে।

অধিকন্তু, কোনো ক্ষমতাশালী মুসলিম নেতৃত্বের সামসময়িক ঐতিহাসিক অভাবকে বিন লাদেন পূর্ণ করে দিয়েছেন, যিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং এর মিত্রদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ করবেন এবং মুসলিমবিশ্বকে এর হারানো ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে দেবেন; লক্ষ লক্ষ মুসলিমের নিকট এভাবেই তিনি গৃহীত হন। এটা আমাদের পছন্দ হোক বা না হোক, জীবিত এবং মৃত উভয় অবস্থাতেই বিন

লাদেন আমাদের সময়ের একজন গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে রয়েছেন এবং থাকবেন।

চরমপন্থি সংগঠনের ইতিহাসে আল-কায়েদা অনন্যসুলভ। এসব গোষ্ঠীর ইতিহাসে এটিই প্রথম সংগঠন, যার বৈশ্বিক উপস্থিতি বিদ্যমান। এর জন্য দুইটি ফ্যাক্টর দায়ী। প্রথমত পৃথিবীব্যাপী মুসলিম অভিবাসী এবং দ্বিতীয়ত ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর—ইন্টারনেট। এর মাধ্যমেই যেকোনো জায়গার যেকোনো মুসলিম তাৎক্ষণিকভাবেই 'ইলেকট্রনিক উম্মাহ'র অংশ হয়ে যেতে পারছে এবং এই বিষয়টি আল-কায়েদাই প্রথমে এবং সর্বাগ্রে সম্পাদন করতে পেরেছে।

সাংগঠনিক দৃষ্টিকোণ থেকেও আল-কায়েদা অনন্যসুলভ। এর একটি কেন্দ্রীয় পরিচালনাপর্ষদ বিদ্যমান, যেটি একইসাথে নেতৃত্ব এবং অনুপ্রেরণার উৎস উভয় হিসেবেই কাজ করে। বাস্তবিকপক্ষে এটিও ইন্টারনেটের কারণেই সম্ভব হয়েছে। যেটা এর আদর্শিক এবং কৌশলগত কাঠামোর জোগান দেয়, নিয়ন্ত্রণ করে, আপডেট করে এবং এসবের অনুসরণে সেসব কমান্ডার বরং প্রকৃতপক্ষে যেকোনো গ্রুপ বা ব্যক্তিই সক্রিয় হতে পারে।

সর্বোপরি আল-কায়েদা অনন্যরকমের বিপজ্জনক, কারণ এটি বিশ্বের ১.৩ বিলিয়ন মুসলিমদের মধ্যে থেকে হাজার হাজার বা খুব সম্ভবত মিলিয়ন মিলিয়ন মুসলিমকে ইসলামি ব্যাখ্যা প্রয়োগ করে মবিলাইজ করার সক্ষমতা রাখে।

দীর্ঘমেয়াদি স্ট্র্যাটেজি

যে জিনিসটি আল-কায়েদাকে এত ভিন্নরকম করে তুলেছে এবং তাদের নিজেদের সীমানায় এত সফল করে তুলেছে; আমি মনে করি এর কারণ হলো, তারা ব্যাপক শ্রমসাধ্যভাবে তাদের অভিজ্ঞতা, গবেষণা এবং পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে একটি দীর্ঘমেয়াদি স্ট্র্যাটেজি গড়ে তুলেছে এবং এই স্ট্র্যাটেজিই আল-কায়েদার ভবিষ্যৎ পথনির্দেশক। সু-জ্ঞাত, সু-পণ্ডিত এবং সু-অবহিত আল-কায়েদা নেতৃত্বের বুদ্ধিবৃত্তিক পরাক্রম এবং প্রশস্ততাকে পশ্চিমাদের কখনোই অবমূল্যায়ন করা উচিত নয়। এটা আমার কাছে মনে হয়েছে যে, স্বীয় শত্রুদেরকে পরাজিত করার লক্ষ্যে আল-কায়েদা স্ট্র্যাটেজির চারটি রূপ বিদ্যমান :

১. সামরিক স্ট্র্যাটেজি

২. মুসলিমবিশ্বের জন্য এর মতাদর্শিক এবং রাজনৈতিক স্ট্র্যাটেজি

৩. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং এর মিত্রদের জনগণের জন্য এর মতাদর্শিক এবং রাজনৈতিক স্ট্র্যাটেজি

৪. অর্থনৈতিক স্ট্র্যাটেজি

১. সামরিক স্ট্র্যাটেজি

২০০৫ সালের ১১ মার্চ আল-কুদস আল-আরাবিতে '২০২০ সাল অবধি আল-কায়েদার স্ট্র্যাটেজি' নামক একটি ডকুমেন্টের সারবস্তু প্রকাশিত হয়েছিল। উক্ত ডকুমেন্টটি আল-কায়েদার প্রধান সামরিক কৌশলবিদ আল-মাক্কাভি কর্তৃক ইন্টারনেটে পোস্ট করা হয়েছিল। তিনি হলেন একজন ছায়ামানব এবং তার সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায়নি কেবল এটা ব্যতীত যে, তিনি একসময় ইজিপশিয়ান আর্মিতে একজন সমর-বিশারদ হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ডকুমেন্টটিতে দেখা যায় যে, আল-কায়েদা ইতিমধ্যেই তাদের মাস্টারপ্ল্যান অনুযায়ী কাজ শুরু করে দিয়েছে; যার উদ্দেশ্য হলো উম্মাহকে সকল ধরনের উৎপীড়ন-নিপীড়ন থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদি জিহাদি অভিযান পরিচালনা করা। এই মাস্টারপ্ল্যানের পাঁচটি সুস্পষ্ট ধাপ বিদ্যমান।

প্রথম ধাপে আল-কায়েদার লক্ষ্য হলো, আল-মাক্কাভির ভাষ্যমতে—'প্রকাণ্ড আমেরিকান হস্তি'কে মুসলিম ভূখণ্ডে আগ্রাসন চালাতে প্ররোচিত করা। এটি ছিল নাইন ইলেভেনের হামলা, যার পরিকল্পনা ১৯৯৮ সালের শেষ দিকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। এর ফলস্বরূপ আমেরিকা প্রথমে আফগানিস্তান এবং পরবর্তী কালে ইরাকে পূর্ণমাত্রায় আক্রমণ করে বসে।

এই পরিকল্পনার দ্বিতীয় ধাপটি হলো, আরেকটি 'প্রকাণ্ড হস্তি' স্বয়ং উম্মাহকে জাগিয়ে তোলা এবং আল-মাক্কাভির ভাষ্যমতে এটা করার সবচেয়ে কার্যকরী উপায় হলো বিপুলসংখ্যক আমেরিকান সৈন্যকে মুসলিম ভূখণ্ডে টেনে আনা, যেটা উম্মাহকে উন্মাদ করে দেবে এবং একটি পূর্ণমাত্রার দ্বন্দ্বের দিকে ঠেলে দেবে। এই পরিস্থিতিটি মধ্যযুগীয় ক্রুসেডের স্মৃতিকে স্মরণ করিয়ে দেবে। এটি নিশ্চিতভাবেই আমেরিকার প্রতি সুদূরপ্রসারী ঘৃণার সৃষ্টি করবে এবং উম্মাহকে জাগিয়ে তুলবে, যাদের ওপরই আল-কায়েদা নির্ভর করে। কোনো জিহাদ পরিচালনার জন্য আল-কায়েদাকে প্রথমে মুজাহিদদের মবিলাইজ করতে হতো। ইরাকে রক্তাক্ত বিদ্রোহের ধাপে ধাপে বৃদ্ধি এবং বিদেশি যোদ্ধা ও ইরাকি স্থানীয় যোদ্ধাদের আপাতদৃষ্টিতে প্রতীয়মান অসীম ভান্ডার—এই রণক্ষেত্রেও আল-কায়েদার সফলতারই সাক্ষ্য দেয়। এসব আগুয়ান ঘটনাবলি আল-কায়েদা নেতাদের নখদর্পণে থাকাকে অনেকে দৈবজ্ঞ মনে করতে পারেন। কিন্তু আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, যখন আমি ১৯৯৬ সালে বিন লাদেনের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলাম, তখন তিনি তার উদ্দেশ্যকে এভাবে বিবৃত করেছিলেন—'আমেরিকাকে আমরা মুসলিম ভূখণ্ডে নিয়ে এসে লড়াই করাব।'

আল-মাক্কাভি নির্দেশিত তৃতীয় ধাপটি হলো, এই লড়াইকে সমগ্র অঞ্চলজুড়ে বিস্তৃত করে দেওয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে একটি দীর্ঘমেয়াদি এবং ক্ষয়কারী যুদ্ধে

জড়িয়ে ফেলা। এটি ইতিমধ্যে ঘটেছে এবং এর সাথে আফগানিস্তানের পূর্ব কার্যক্রমও পুনরায় যুক্ত হয়েছে। এই উভয়টিই ইরাকে মার্কিন সেনা ও তাদের দৃঢ়সংকল্পকে দুর্বল থেকে দুর্বলতর করে দিচ্ছে। তাদের লক্ষ্য হলো একটি 'জিহাদ ট্রায়াঙ্গেল অফ টেরর' সৃষ্টি করা যেটা আফগানিস্তান থেকে শুরু হয়ে বর্তমান নিষ্ক্রিয় ইরান, দক্ষিণ ইরাক ও অতঃপর দক্ষিণ তুর্কি এবং দক্ষিণ লেবানন হয়ে সিরিয়াতে পৌঁছুবে।

চতুর্থ ধাপটি হলো, সাংগঠনিক পরিবর্তন আনয়নের মাধ্যমে একটি বৈশ্বিক নেটওয়ার্কে (Ctlobal Network) রূপান্তরিত হওয়া, যেটা আল-কায়েদাকে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বাহিনীসমূহের নজর এবং নাগালের বাইরে নিয়ে যাবে। আল-কায়েদা নিজেদেরকে একগুচ্ছ পথনির্দেশক নীতি (গাইডিং প্রিন্সিপাল) অর্থাৎ একটি মতাদর্শে রূপান্তরিত করার মাধ্যমে সকল রাষ্ট্রের সীমানা অতিক্রম করে ফেলবে এবং সেখানে সংযুক্তি ও মুক্তকরণ অতি সহজ হয়ে যাবে। সাম্প্রতিক হামলাসমূহের কুশলীদের (যেমন লন্ডন এবং কাসাব্লাঙ্কা) স্থানীয় চরমপন্থি ইসলামিক দলগুলোর সাথে কোনো প্রত্যক্ষ সংযোগ ছিল না বললেই চলে। তারা আফগানিস্তানের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রেও কখনো যায়নি। তাই এসব নৃশংসতার পূর্বে তাদেরকে শনাক্ত করতে পারা পুরোপুরিভাবে অসম্ভব ছিল। ভাবাদর্শিক এবং স্ট্র্যাটেজিক সংলগ্নতা নিশ্চিত করে—পরিকল্পনা, সিদ্ধান্ত এবং কৌশল নির্ধারণে এর স্থানীয় কমান্ডারদের পূর্ণাঙ্গ স্বায়ত্তশাসন এই সংগঠনটিকে একটি অপরিমেয় নমনীয়তা প্রদান করেছে। আল-কায়েদার কার্যক্রমসমূহ ইন্টারনেটে সুস্পষ্টভাবে অঙ্কিত রয়েছে এবং সেগুলো অতি সহজলভ্য।

পঞ্চম এবং চূড়ান্ত ধাপটি হলো, বহুমুখী ফ্রন্টে যুদ্ধ ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রকাণ্ড সক্ষমতাকে নিঃশেষ করতে থাকা; কারণ তারা এই উপসাগরীয় অঞ্চলের সকল তেলক্ষেত্রগুলোকেই আয়ত্তে রাখতে চাইবে এবং ইসরাইলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চাইবে। মাক্কাভি বলেন, এই ক্ষেত্রে আমেরিকার সামরিক বাজেট একে দেউলিয়াত্বের দিকে ঠেলে দেবে এবং এই অর্থব্যয় একটি আকস্মিক বিপদে রূপান্তরিত হয়ে প্রকাণ্ড এই সুপারপাওয়ারে একটি অন্তঃবিস্ফোরণ ঘটাবে। যদি এসব কিছুকে আপনাদের অস্বাভাবিক বলে মনে হয়, তবে এটা বিবেচনায় আনা কর্তব্য যে, বস্তুত এগুলোই সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের জন্য দায়ী ছিল।

বিভিন্ন সোর্স অনুযায়ী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পতনের পর আল-কায়েদা তার পরিকল্পনা মোতাবেক ঘৃণিত আরব শাসন ব্যবস্থাকে সহজেই উৎখাত করবে এবং খেলাফতের পুনঃপ্রবর্তন করবে। বিন লাদেন উল্লেখ করেন, ক্ষমতাশালী ইসলামিক আর্মি এবং অবিশ্বাসীদের মধ্যে একটি চূড়ান্ত এবং মীমাংসিত সংঘর্ষ

মুসলিমদের বিজয় এবং খিলাফতের আবির্ভাবে পর্যবসিত হবে। যেকোনো দিক থেকে, এটিই আল-কায়েদার স্বপ্ন।

২. মুসলিমবিশ্বের জন্য এর মতাদর্শিক এবং রাজনৈতিক স্ট্র্যাটেজি

আল-কায়েদা এর গোড়াপত্তনের পর থেকেই অনেক ভুল করেছে। তাদের ১৯৯৮ সালের ফতোয়া—যেখানে বিবৃত করা হয়েছিল যে, ক্রুসেডার এবং ইহুদিদের হত্যা করা বৈধ, অনেক সহানুভূতিশীলদের থেকেও এবং কিছু সদস্য কর্তৃকও এটি ব্যাপক বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছে। এই ফতোয়ার অন্যতম একজন বিশিষ্ট বিরোধী হলেন বিন লাদেনের 'লন্ডনের দূত' খালিদ আল-ফাওয়ায, যিনি বর্তমানে বৃটেনের একটি কারাগারে অবরুদ্ধ রয়েছেন। তিনি 'আল-কুদস আল-আরাবি'তে এ সম্পর্কে তার মতামত ব্যক্ত করে বিবৃতি দিয়েছিলেন যে—'কেবল তাদের সরকার শত্রুপক্ষ হওয়ার কারণেই আমেরিকান নাগরিকদের হত্যা করা বৈধ নয়।' তিনি আরও বলেন যে, 'সেখানে অনেক মুসলিম আমেরিকান এবং অনেক নন-মুসলিম আমেরিকান রয়েছে যারা তাদের সরকারের নীতির বিরোধিতা করে।' (এটা এখানে উল্লেখ করা জরুরি যে, ইরাক থেকে স্প্যানিশ সৈন্যদের প্রত্যাহারের পর স্পেনের জনগণকে একটি সাময়িক যুদ্ধবিরতি উপহারের মাধ্যমে বিন লাদেন এই ফতোয়াকে পরোক্ষভাবে প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। আমেরিকান নির্বাচনের পূর্বে সেদেশের জনগণের উদ্দেশে প্রেরিত বার্তায় তিনি বলেছিলেন যে, তারাই কেবলমাত্র তাদের নিরাপত্তার জন্য দায়ী; যেটি পরোক্ষভাবে প্রকাশ করে যে, এ ক্ষেত্রেও যুদ্ধবিরতি সম্ভব।)

নাইন ইলেভেনের হামলা নিয়েও মুসলিমদের মতামত বিভক্ত। কেউ কেউ এটাকে দেখে সন্ত্রাসের একটি সর্বনাশা ঘটনা হিসেবে, যেখানে প্রায় ৩,০০০ আমেরিকান নাগরিক নিহত হয় এবং এর ফলস্বরূপ তালেবান সরকারের পতন ঘটে; এ ছাড়া এই হামলা ইসলাম এবং মুসলিমদের ভাবমূর্তিকে বিকৃত করেছে, ইরাক এবং আফগানিস্তানে মার্কিন আগ্রাসনকে টেনে এনেছে এবং সর্বোপরি শক্তিশালী পশ্চিমা এবং দুর্বল মুসলিমবিশ্বের মধ্যে একটি সংঘর্ষের সৃষ্টি করেছে। অপরপক্ষে, এরূপ অনেক ব্যক্তিই রয়েছেন, যারা মনে করেন যে—এটি আমেরিকান শত্রুদের কাছ থেকে একটি প্রতিশোধ নিয়ে দিয়েছে এবং এটা প্রদর্শন করেছে যে, তারা তাদের যে মুক্তহাতকে মধ্যপ্রাচ্যে প্রসারিত করেছে এবং ইসরায়েল ও দুর্নীতিবাজ স্বৈরাচারী আরব শাসনসমূহের ব্যবস্থার প্রতি সমর্থন অব্যাহত রেখেছে—সেটা আর অবারিত রবে না।

বিন লাদেন এবং আল-জাওয়াহিরি সর্বদাই তাদের জনসংযোগের দিকটি নিয়ে সচেতন। আল-জাওয়াহিরি তার '*নাইটস আন্ডার দ্য প্রফেট ব্যানার*' বইয়ে (পূর্বেও উদ্ধৃতিটি উল্লেখ করা হয়েছে) উল্লেখ করেন—

> 'আমাদের অবশ্যই জনগণের সম্মান, বিশ্বাস এবং ভালোবাসাকে জয় করে নিতে হবে। জনগণ আমাদের ততক্ষণ ভালোবাসবে না, যতক্ষণ না তারা অনুভব করবে যে আমরা তাদেরকে ভালোবাসি; তাদের যত্ন নেই এবং তাদের প্রতিরক্ষার জন্য সদা প্রস্তুত।'

তিনি আরও স্বীকার করেন যে,

'আল-কায়েদা তখনই উম্মাহকে জয় করে নেবে, যখন আমরা তাদের পছন্দসই কোনো লক্ষ্যবস্তুকে নির্ধারণ করব এবং এমন একটি লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানব যেটাতে আঘাত হানা ব্যক্তিদের প্রতিও তারা সহানুভূতিশীল হবে।' ২০০৩ সালে জর্জ ডব্লিউ বুশ সেটাই সরবরাহ করেছেন যেটাকে আল-জাওয়াহিরি অভিহিত করেছিলেন—'এমন একটি লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানব যেটাতে আঘাত হানাকে বহু মুসলিম সমর্থন করবে', অর্থাৎ ইরাকের মাটিতে দেড় লক্ষ আমেরিকান সৈন্যের একটি দখলদার বাহিনী।

এ ছাড়া যেখানে শিয়াদেরকে লক্ষ্যবস্তু বানানো পূর্বে অগ্রহণীয় ছিল, সেটা এখন ইরাক এজেন্ডার একটি অংশ হয়ে গিয়েছে। পূর্বে যেখানে সম্ভাব্য সমান্তরাল নাগরিক হতাহতকে পরিহার করা হতো, বর্তমানে সেখানে বিদ্রোহী হামলায় শত শত ইরাকি নিহত হচ্ছে। এই পরিস্থিতিকে আল-জারকাভি ২০০৫ সালের ১৮ মে এভাবে বর্ণনা করেন—'জিহাদকে বিনষ্টকারী বৃহত্তর শত্রুকে আক্রান্ত করার ক্ষেত্রে মুসলিমদের রক্তপাত বৈধ।' আল-কায়েদার নিকট আফগানিস্তান অপেক্ষা ইরাক অনেক দিক থেকেই একটি উত্তম ঘাঁটি। সেখানে আরবিভাষী সরকার এবং সংস্কৃতি বিদ্যমান। ভৌগোলিকভাবে, ইরাক এই অঞ্চলের কেন্দ্রবিন্দু এবং ইসলামিক দিক দিয়েও ইরাক সৌদি আরব এবং ফিলিস্তিনের মতোই গুরুত্বপূর্ণ এবং খিলাফাতের প্রাচীন পাদপীঠ। ইরাকে আল-কায়েদার সমর্থকরা সুন্নি আরব, যারা দখলদারির পর তাদের পক্ষাবলম্বনকে বেছে নিয়েছে; কারণ তারা অধিকতর অপমানজনকভাবে রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তারা এর প্রতিশোধ গ্রহণ ও ক্ষমতার পুনরুদ্ধারে ব্যাকুলভাবে আগ্রহী। যদি ইরাকে কোন সাম্প্রদায়িক গৃহযুদ্ধ শুরু হয়, তবে পার্শ্ববর্তী সুন্নি সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশসমূহ ইরাকি সংখ্যালঘু সুন্নিদের মিত্রে পরিণত হবে এবং এটি উক্ত অঞ্চলে একটি ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলবে। আল-কায়েদা এই ধাপটিকে তাদের দীর্ঘমেয়াদি প্রজেক্ট 'খিলাফাত পুনঃপ্রবর্তন' এর একটি বুনিয়াদ হিসেবে শনাক্ত করেছে।

আল-কায়েদা মুসলিমবিশ্বের বহু শাসনব্যবস্থা কর্তৃকই বিরোধিতার সম্মুখীন এবং তাদের প্রচেষ্টার একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো আমেরিকার পাশাপাশি সেসব জায়গাতেও বিদ্রোহকে উসকে দিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে জনগণকে মবিলাইজ করা। আল-জাওয়াহিরি প্রায়শ বিবৃত করেন যে, 'তিনি কোনো নিপীড়ক শাসনব্যবস্থার অধীনতার চাইতে কোন চরম অরাজক রাষ্ট্রে থাকাকেই অগ্রাধিকার দেবেন।' তিনি এবং বিন লাদেন উভয়ই দুর্নীতিতে সয়লাব এসব আরব রাষ্ট্রব্যবস্থাসমূহকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং জায়নবাদীদের সহযোগী হিসেবে অভিযুক্ত করে আসছেন। তাদের সেসব টেপবার্তা সমগ্র মুসলিমবিশ্বজুড়েই ব্যাপক জনপ্রিয় এবং এগুলো আল-কায়েদার জিহাদি রিক্রুটমেন্টকে আরও সহজতর করছে।

মুসলিমবিশ্বের একটি উল্লেখযোগ্য গোষ্ঠীর কাছে আল-কায়েদা একটি অনন্য এবং আকর্ষণপূর্ণ দর্শন সরবরাহ করে যাচ্ছে যেখানে বিশ্বাস, ইসলামি পরিচয় এবং রাজনৈতিক সত্তার প্রতিশ্রুতি—সবকিছুই একীভূত এবং এগুলো সেই পরিবর্তনের সম্ভাবনাকে সৃষ্টি করেছে, যেটা এই অঞ্চলে বহু যুগ ধরে অনুপস্থিত। মুসলিম জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ আল-কায়েদা সমর্থিত তালেবান ঘরানার শরিয়াহ-ভিত্তিক শাসনব্যবস্থাকে স্বাগত জানাবে কিনা, সেটা সন্দেহপূর্ণ। কিন্তু এই সমস্যাটি ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের মধ্যে কোনরূপ বৈরিতার সৃষ্টি করবে না, যতক্ষণ মার্কিন সেনারা তাদের ভূখণ্ডে অবস্থান করবে এবং আল-কায়েদাও অব্যাহতভাবে উম্মাহকে এই দখলদারি থেকে মুক্তির প্রতিশ্রুতি দিতে থাকবে।

৩. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং এর মিত্রদের ক্ষেত্রে মতাদর্শিক এবং রাজনৈতিক স্ট্র্যাটেজি

শতকরা আশি ভাগের বেশি মুসলিম মনে করে আমেরিকার যুদ্ধ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে নয়, বরং ইসলামের বিরুদ্ধে। আল-কায়েদাও একটি সভ্যতার সংঘর্ষকে উসকে দিতে ইচ্ছুক, যেখানে মৌলবাদী খ্রিষ্টান এবং মৌলবাদী মুসলিম একে অপরের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে এবং যার পরিণামস্বরূপ বিশ্বাসী এবং কাফেরদের মধ্যে একটি পূর্ণমাত্রার যুদ্ধ শুরু হবে। তবে আল-কায়েদা কামনা করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই যুদ্ধে একাকীই লড়ুক।

আল-কায়েদা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং এর মিত্রদের মধ্যে একটি ফাটল সৃষ্টি করতে ইচ্ছুক। মাদ্রিদ এবং লন্ডন হামলার দ্বারা এই পদক্ষেপে সংগঠনটি ইতিমধ্যে একটি বৃহৎ প্রভাব ফেলেছে। ২০০৫ সালের ৪ আগস্ট আল-জাওয়াহিরি একটি টেপ বার্তায় ব্রিটিশ জনগণকে উদ্দেশ্য করে বলেন—'ব্লেয়ার লন্ডনের কেন্দ্রস্থলে ধ্বংস ডেকে এনেছে' এবং বহু ব্রিটিশ জনগণ বাস্তবিকই ইরাক আগ্রাসনে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্তের জন্য তাকে ব্যক্তিগতভাবে দোষী সাব্যস্ত করছে। আল-

কায়েদার আরেকটি ভাবনা হলো, যদি জনগণকে তাদের শাসকদের বিরোধী করে দেওয়া যায় এবং তাদের দুর্ভাগ্যের জন্য শাসকদের অভিযুক্ত হিসেবে দাঁড় করানো যায়, তবে বিভিন্ন রাষ্ট্র এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও আন্তঃবিস্ফোরণ ঘটতে পারে। জনগণের মাঝে অসন্তোষের বীজ বপনের উদ্দেশ্যে বিন লাদেন ইরাকে বুশ প্রশাসনের স্বার্থকে ব্যাপকভাবে লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছেন। তিনি বলেন—'বাস্তবে পরাজিত পক্ষ হলে তোমরা—আমেরিকান জনগণ এবং তোমাদের অর্থনীতি।'

একজন সাধারণ নাগরিক তার কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার পথে যদি বোমা হামলার শিকার হয়, তবে এরূপ কোনো সরকারকে মেনে নেওয়া অসম্ভব যেটি তাদেরকে কেবল প্রতিরক্ষা দিতেই ব্যর্থ নয়, বরং তাদের দোরগোড়াতেও সন্ত্রাস ডেকে আনছে। এসব হামলাসমূহ যে অস্বাচ্ছন্দ্য, অনাস্থা এবং নিরাপত্তাহীনতার দীর্ঘস্থায়ী অনুভূতি রোপণ করছে, সেগুলো জনগণকে তাদের নেতৃবর্গ থেকে আরও বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে।

যেসব সরকার ভীতিকে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগানোর প্রচেষ্টা করছে—যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্য এবং দ্রুতগতিতে সেসব কঠোর নিয়ন্ত্রণমূলক আইন বাস্তবায়নের চেষ্টা করছে সেগুলোও তাদের নিজেদেরকেই বিপদে ফেলবে। ২০০১ সালের মার্কিন 'প্যাট্রিয়টিক অ্যাক্ট'কে ১৯৩৩ সালের হিটলারের 'রাইখট্যাগ ফায়ার ডিক্রি'র সাথে তুলনা করা হচ্ছে; যেখানে জনগণের নিরাপত্তা স্বার্থের বুলি আউড়িয়ে নাগরিক স্বাধীনতাকে সীমিত করে দেওয়া হয়েছে। 'প্যাট্রিয়টিক অ্যাক্ট'টি সুস্পষ্টভাবে বন্দি-নীতিমালা, গণমাধ্যম ও বাক-স্বাধীনতা, সংগঠন ও যোগাযোগের স্বাধীনতা এবং তথ্য যোগাযোগের গোপনীয়তার অধিকারসংক্রান্ত বিষয়গুলোর জন্য ব্যাপকভাবে সমালোচিত হচ্ছে। ২০০৫ সালে টনি ব্লেয়ারের 'প্রিভেনশন অফ টেরোরিজম অ্যাক্ট' নিজ দেশেই ব্যাপক বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছে। তার ব্যাপারে অভিযোগ আনা হয়ছে যে, আটশ বছর ধরে ব্রিটিশ বিচারব্যবস্থার নিরপেক্ষতাকে এখানে মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। 'টরি মেম্বার অফ পার্লামেন্ট' বরিস জনসন সম্পর্কে এ মন্তব্য করেন যে, এটাকে প্রথম নজরেই দক্ষিণ আফ্রিকার BOSS সিকিউরিটি সার্ভিস এবং CHEKA-সহ প্রত্যেক সিক্রেট সার্ভিস পুলিশ সার্ভিসের সাথে মিলসম্পন্ন মনে হয়।

এই সমস্যাটি কেবল ব্রিটেনেই সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং এর প্রতিক্রিয়া দ্রুতই সমগ্র ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে প্রত্যক্ষ হচ্ছে। ইসলামপন্থিদের বিরুদ্ধে এই 'ডাইনী শিকার' অভিযান—যেটা এই ধৃষ্টতার ওপর ভিত্তি করে যে—'সকল মুসলিমই সহিংসতা সমর্থক' যা স্পষ্টতই ভুল, এবং এটি জিহাদিদের প্রতি সহানুভূতি এবং তাণ্ডবলিলার আরও বৃহৎ নেটওয়ার্ক তৈরি করতে পারে।

এই চরম নিপীড়ন, অযৌক্তিক বিদ্বেষ এবং অবিচারের বৈধতা দেওয়ার জন্য যতই কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে, ততই আরও বিধিসম্মত এবং সমর্থনযোগ্য প্রতিক্রিয়া দেখা যাবে; বিশেষ করে মুসলিমদের কাছ থেকে, যারা হয়তো ইতিমধ্যেই নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন এবং প্রান্তিক অনুভব করছে।

৪. অর্থনৈতিক স্ট্র্যাটেজি

অর্থনৈতিক ফ্রন্টে যুদ্ধ চালনা আল-কায়েদা এবং এর মাল্টি-মিলিওনিয়ার নেতা ওসামা বিন লাদেনের নিকট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমেরিকান জনগণের উদ্দেশ্যে ২০০৪ সালের ২৪ অক্টোবর প্রেরিত একটি বার্তায় বিন লাদেন বরং আনন্দের সাথে উল্লেখ করেন :

> '(নাইন ইলেভেনের) এই ঘটনায় আল-কায়েদা ৫ লক্ষ ডলার ব্যয় করেছে; যেখানে আমেরিকার এই ঘটনা এবং পরবর্তী প্রভাবের কারণে ৫০০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি ক্ষতি হয়েছে। অর্থাৎ এটা বলা যায় যে, আল-কায়েদার প্রতি ১ ডলার ব্যয়ে আমেরিকার এক মিলিয়ন ডলার ক্ষতি হয়েছে... সকল অনুগ্রহ আল্লাহরই এবং তাঁরই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।'

এই হামলাটির অন্যান্য অর্থনৈতিক মন্দ প্রভাবও পড়েছে। এর কারণে আরব বিনিয়োগকারীরা উদ্বিগ্ন হয়ে গিয়েছিল যে, তাদের সম্পত্তিসমূহ হয়তো বাজেয়াপ্ত করা হতে পারে। তাই তারা পশ্চিমা অর্থনৈতিক স্থাপনাসমূহ থেকে তাদের বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার সরিয়ে নিয়েছে এবং এর বদলে মুসলিমবিশ্বে বিনিয়োগ করেছে। তেলের মূল্যস্ফীতি থেকে প্রাপ্ত বিশালাকার রাজস্বও বর্তমানে উপসাগরীয় দেশগুলোতেই বিনিয়োগ করা হচ্ছে এবং এর ফলে সেখানকার অর্থনীতির রমরমা অবস্থা দেখা দিয়েছে।

তেলের পাইপলাইন এবং স্থাপনায় নিয়মিত বিদ্রোহী আক্রমণ, যেটাকে তথাকথিত 'টেরর প্রিমিয়াম' বলে অভিহিত করা হচ্ছে; ইতিমধ্যে তেলের মূল্যে প্রভাব ফেলেছে এবং রেকর্ড পরিমাণ তেলের মূল্যকে বাড়িয়ে দিয়েছে। আল-কায়েদা প্রতিনিয়ত OPEC কুশলীদের আহ্বান জানাচ্ছেন তেলের উৎপাদন হ্রাস করার জন্য, যাতে করে তেলের মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং পশ্চিমা অর্থনীতিকে চেপে ধরা যায়। কেবল তেলের মূল্যই মার্কিন অর্থনীতিকে ক্ষয় করছে না। আল-কায়েদা নেতৃবৃন্দের ঘনিষ্ঠ সূত্র থেকে জানা যায়, আল-জাওয়াহিরি ইয়েল পল কেনেডি রচিত ঐতিহাসিক 'রাইজ অ্যান্ড ফল অফ দ্য গ্রেট পাওয়ারস' বইটির একজন পরম ভক্ত এবং স্ট্র্যাটেজিক পরিকল্পনার প্রসঙ্গে এটাকে তিনি একটি রেফারেন্স বুক

হিসেবে ব্যবহার করেন। সংক্ষেপে কেনেডির তত্ত্বসমূহ পর্যবেক্ষণের আলোকে বলা যায় যে, শক্তিশালী সাম্রাজ্যসমূহের পতনের পেছনে তিনটি কারণ রয়েছে।

- অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য বিপুল ব্যয়।
- বিশ্বে বিস্তৃত সামরিক উপস্থিতি এবং মিত্রদের দেওয়া অর্থনৈতিক প্রতিশ্রুতি।
- ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শক্তিশালী বৈদেশিক প্রতিযোগিতা।

আল-জাওয়াহিরি বিশ্বাস করেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি পতনশীল সাম্রাজ্য এবং এটি ইতিমধ্যেই কেনেডির প্রথম এবং দ্বিতীয় শর্ত পূরণ করে ফেলেছে। মূলত আল-কায়েদার প্রকৃত হামলা অথবা হামলার হুমকির কারণেই অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা অত্যন্ত ব্যয়বহুল হয়ে উঠেছে। জর্জ বুশ বারংবার দাবি করেন যে, তিনি ইরাক আক্রমণ করেছেন সেখানে সন্ত্রাসের সাথে মোকাবিলা করার জন্য, যাতে এটি আমেরিকায় উপস্থিত না হতে পারে। কিন্তু অনেক বিশেষজ্ঞই বিশ্বাস করেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নাইন ইলেভেনের বা এর সমপ্রভাবের আরও হামলা অত্যাসন্ন।

ইউরোপের অনেক দেশের সঙ্গে, উত্তর-পূর্ব এশিয়া, পূর্ব এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য এবং দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার অনেকগুলো দেশের সাথেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক প্রতিশ্রুতি বিদ্যমান এবং তারা এখন আফগানিস্তান ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে ইরাকে একটি বাস্তব সংঘর্ষে লিপ্ত। তারা ক্রমবর্ধমানভাবে ইরানের বিরুদ্ধেও একটি মারমুখী অবস্থান গ্রহণ করছে এবং মার্কিনীরা ইরাক নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় ইরান তাদের পারমাণবিক প্রকল্পে পুনঃঅভ্যুত্থান ঘটানোর সুযোগ পাচ্ছে। ইরাক যুদ্ধ দ্রুতই একটি ক্ষয়কারী যুদ্ধে পরিণত হচ্ছে এবং মার্কিন অর্থনীতিকে মারাত্মকভাবে ক্ষয় করে চলছে। অধিকাংশ হিসাব অনুসারে প্রতি মাসে পাঁচ বিলিয়ন ডলার করে ২০০৫ সালের জুন মাসেই এই যুদ্ধের খরচ ২৫০ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে এবং কিছু কিছু বিশেষজ্ঞের মতে এটি অতি দ্রুতই ৭০০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবে। যেমনটা বিন লাদেন আমেরিকান জনগণের উদ্দেশে একটি বার্তায় এটাকে এভাবে উল্লেখ করেন—'জিহাদিস্ট যুবকরা সম্প্রতি বুশকে ইরাক এবং আফগানিস্তান এই দুটি যুদ্ধ চালিয়ে নেওয়ার জন্য একটি জরুরি বাজেটের শরণাপন্ন হতে বাধ্য করেছে। এসবই আমেরিকান অর্থনীতিতে রক্তক্ষরণ করতে করতে একে দেউলিয়া করে দেওয়ার পরিকল্পনাকে সফলতায় প্রতিপাদন করবে ইনশাল্লাহ।'

কেনেডির তৃতীয় শর্তটি হলো কোনো উদীয়মান প্রতিদ্বন্দ্বী সুপারপাওয়ার কর্তৃক বৈশ্বিক বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতার আগমন। আল-জাওয়াহিরির (এবং অধিকাংশ অর্থনীতিবিদদের) মতে, ইতিমধ্যেই চীন এবং ভারত এরূপ চ্যালেঞ্জ ধারণ করছে

এবং পরবর্তী দশকে এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং এর অর্থনীতির প্রতি একটি বাস্তবমুখী হুমকি হিসেবে দেখা দিতে।

কি হবে যদি বিন লাদেন আটক কিংবা নিহত হন?

বিন লাদেন প্রায়শই শপথ করে বলেন যে, তিনি কখনোই জীবিত ধরা দেবেন না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিন লাদেনকে আটক করা এবং আল-কায়েদাকে ধ্বংস করার আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইতিমধ্যেই বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে এবং তাদের হাজার হাজার সৈন্যকে খুইয়েছে; যদিও তারা খুব সামান্যই অর্জন করতে পেরেছে। বিন লাদেন এবং আল-জাওয়াহিরি যতদিন যথাস্থানে বহাল থাকবেন ততদিন এটাকে আল-কায়েদার একটি রাজনৈতিক এবং প্রোপাগান্ডিক বিজয় হিসেবেই দেখা হবে।

বাস্তবিকই কেউ জানে না যে, এই লোক দুটি কোথায় লুকিয়ে রয়েছে। কিন্তু এই নিয়ে তত্ত্বের কোনো শেষ নেই। অনেকেই মনে করেন, তারা প্রায় ১৫০০ মাইলজুড়ে বিস্তৃত আফগানিস্তান-পাকিস্তান বর্ডারের উপজাতীয় অঞ্চলেই এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় স্থানান্তরিত হচ্ছেন। এই অঞ্চলটি প্রায় পুরোপুরিভাবে পাকিস্তান সরকার এবং সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণের বাইরে। এই অঞ্চলটি খুবই রুক্ষ এবং পর্বতময়; এবং এটি সেই উপজাতি অধ্যুষিত এলা[illegible] যারা বিন লাদেনের ভক্ত এবং তাকে তারা দেখে একজন বীর মুজাহিদ হি[illegible] যিনি আফগানিস্তানের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করে যাচ্ছেন এবং তার ভাই[illegible] সহায়তার জন্য সকল সহায়-সম্পত্তি এবং আরাম-আয়েশকে বিসর্জন দিয়েছেন।

পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থার সাবেক প্রধান জেনারেল আসাদ দুররানি মনে করেন যে, বড় বড় শহরগুলোই বিন লাদেনের লুকিয়ে থাকার জন্য সবচেয়ে উপযোগী। এটা সত্য যে, যেসব প্রধান আল-কায়েদা ব্যক্তিত্বকে আটক করা হয়েছিল তাদের অধিকাংশকেই করাচি, ফয়সালাবাদ, পেশোয়ার, রাওয়ালপিন্ডি প্রভৃতি বড় বড় শহরগুলো থেকে আটক করা হয়েছে।

বিন লাদেনের একজন ঘনিষ্ঠ সহযোগী আমাকে জানিয়েছিল যে, তিনি আল-কায়েদার 'মবিলাইজেশন এন্ড রিক্রুটমেন্ট' এর জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্য আবু জুবাইদাহর সাথে একই বাড়িতে অবস্থান করছিলেন যাকে ২০০২ সালের মার্চ মাসে ফয়সালাবাদ থেকে আটক করা হয়। উক্ত সহযোগী আমাকে জানিয়েছিল যে, যুক্তরাষ্ট্র-পাকিস্তান জয়েন্ট ফোর্স পরিচালিত উক্ত অভিযানের মাত্র তিন দিন পূর্বে বিন লাদেন সেই বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছিলেন। এটাকে সম্ভাব্য বলেই মনে হয় এবং আমি এই সম্ভাবনাকে নাকচ করে দিতে চাই না যে, তিনি পুরোপুরিভাবে পাকিস্তান ত্যাগ করে চলে গেছেন।

যখন আমি বিন লাদেনের সাথে সাক্ষাৎ করি তখন তিনি আমাকে জানিয়েছিলেন যে, তিনি হয়তো ইয়েমেনের পার্বত্য অঞ্চলে চলে যেতে পারেন। তখন থেকেই আমি খোঁজখবর পেয়েছিলাম তিনি ইয়েমেনে সেখানকার উপজাতীয় গোষ্ঠীগুলোর সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য এবং স্থানান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনাকে যাচাই করে দেখার জন্য অনেক দূত পাঠিয়েছেন। তিনি যেসব উপজাতীয় নেতাদের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন তাদের একজন হলেন সাদর অঞ্চলের শাইখ বিন শাজ। তার ইয়েমেনি এবং চতুর্থ স্ত্রী আমাল আল সাদাহ ২০০২ সালে সেখানেই ফিরে এসেছিলেন।

আত্মগোপনে থাকার জন্য অন্যান্য সম্ভাব্য আশ্রয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে কাশ্মীর এবং সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের ইসলামিক রিপাবলিকসমূহ—যেমন উজবেকিস্তান, আজারবাইজান অথবা এমনকি চেচনিয়াও।

সাম্প্রতিক মাসগুলোতে বিন লাদেন যেসব ভিডিও এবং অডিও সম্প্রচার করেছেন সেগুলোর কোয়ালিটি দেখে মনে হয় না যে, তিনি কোন সেকেলে উপজাতীয় অঞ্চলে অবস্থান করছেন। তার বার্তাসমূহ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, তিনি এবং আল-জাওয়াহিরি কোনো আরামদায়ক এবং নিরাপদ জায়গায়ই অবস্থান করছেন এবং তারা সমগ্র বিশ্ব ও আরব অঞ্চলের রাজনৈতিক ঘটনাবলি সংঘটনের সাথে সাথেই সেগুলোর খবর পেয়ে যান। বিন লাদেন আমাকে বলেছিলেন যে, সুদান থেকে বিতাড়িত হয়ে আফগানিস্তানে চলে আসার পর থেকেই তিনি কোনো মডার্ন কমিউনিকেশন ইকুইপমেন্ট যেমন মোবাইল অথবা স্যাটেলাইট ফোন, ইন্টারনেট, ই-মেইল, প্রভৃতি ব্যবহার করছেন না। তিনি বর্তমানে তথ্য এবং নির্দেশনা আদান-প্রদানের জন্য বার্তাবাহক কর্তৃক হাতে লেখা চিঠিপত্রকেই অগ্রাধিকার দেন। তবে তিনি তাঁর অনুসারীদের মাধ্যমে হালনাগাদ খবরাখবর রাখেন; তারা ইন্টারনেট ক্যাফে থেকে সর্বশেষ খবর এবং তথ্যাবলি ডাউনলোড করে সেগুলোকে তার জন্য প্রিন্টিং অথাবা সিডিতে করে প্রেরণ করে।

এসব কারণে বিন লাদেন এবং আল-জাওয়াহিরির চিহ্নকে খুঁজে বের করা দুঃসাধ্য বলে পরিগণিত হয়েছে। কেবল তাদের চাতুর্য এবং সতর্কতার জন্যই নয় বরং তারা ব্যক্তিগত নিরাপত্তাকে নিজেদের বিষয় বানিয়ে নিয়েছেন। বিন লাদেন কেবল তার পরিচিত কোন অঞ্চলেই একজন দেহরক্ষী এবং বিশ্বস্ত সহকারীদের একটি ছোট দলের সাহায্যে চলাফেরা করেন। এটি কোনোভাবেই সত্য নয় যে, তার উচ্চতার জন্য (ছয় ফুট তিন ইঞ্চি) তাকে খুব সহজেই শনাক্ত করা যাবে, যদি তিনি পাকিস্তান-আফগানিস্তান বর্ডারের মধ্যবর্তী পাহাড়ি অঞ্চলে থেকে থাকেন। কারণ এই উপজাতীয় অঞ্চলের বেশিরভাগ লোকই এরূপ উচ্চতা বিশিষ্ট এবং তারা তার মতোই পোশাক পরিধান করে। বিন লাদেনের নিরাপত্তার অনেক বিস্ময়কর

সাফল্যের একটি পরিচায়ক হলো, বর্তমানে তার সাথে তার দুই স্ত্রী এবং প্রায় বিশ জন ছেলেমেয়ে আত্মগোপনে রয়েছে এবং এখনও অবধি তার স্ত্রীবর্গ ও সন্তানসন্ততি এবং এমনকি আল-জাওয়াহিরিরও অজানা রয়ে গেছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের অদৃষ্টের জোরে সাদ্দাম হুসাইনকে খুঁজে পেতে সক্ষম হয়েছিল। কারণ তিনি ছিলেন দাম্ভিক, অসাবধান এবং তিনি একই এলাকায় চলাচল করতেন। এমনকি যদিও তিনি ফেরারি ছিলেন তবুও তিনি রাষ্ট্রপ্রধানের মতো আচরণকে অব্যাহত রাখেন; তিনি গোত্র নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন, তার অনুসারীদের সাথে যোগাযোগ করতেন এবং তার দেহরক্ষীদের অনেকেই অবিশ্বস্ত ছিল। অধিকন্তু, ইরাকে তখন এক লক্ষ বিশ হাজার মার্কিন সেনা ছিল এবং তিন-চতুর্থাংশেরও বেশি ইরাকি তার বিরোধী ছিল। যখন সাদ্দাম হুসাইন ক্ষমতা থেকে বেদখল হয়ে যান, তার অনেক অনুসারীই তাকে পরিত্যাগ করে এবং তার পূর্বেকার সামান্য জনপ্রিয় সমর্থন আরও ক্ষীণতর হয়ে যায়। এর ঠিক বিপরীত ঘটনাগুলো ঘটেছে বিন লাদেনের ক্ষেত্রে। তিনি এমন সব এলাকায় চলাচল করেন যেখানকার লোকজন আল-কায়েদার সমর্থক বলে সুবিদিত এবং তার অনুসারীরা তার প্রতি ভীষণভাবে বিশ্বস্ত এবং তার প্রতিরক্ষার জন্য তারা সর্বদাই জীবন দিতে প্রস্তুত। আফগানিস্তানের উপজাতি এলাকাগুলোসহ বর্ডারের বিভিন্ন উপজাতি অঞ্চলগুলোতে মার্কিন সেনাদের সংখ্যা ২০,০০০ এরও কম। এ ছাড়াও যেসব সম্ভাব্য দেশগুলোতে তিনি লুকিয়ে থাকতে পারেন সেসব দেশগুলোতেও তার হদিস খুঁজে বের করার জন্য খুব সামান্যই মার্কিন প্রচেষ্টা বিদ্যমান।

বিন লাদেন এবং আল-জাওয়াহিরি যতদিন জীবিত থাকবেন, ততদিন অব্যাহতভাবে পর্দার আড়াল থেকেই ঘটনাবলিকে প্রভাবিত করতে থাকবেন। তারা জিহাদ এবং সহিংসতার উদ্দীপক স্বরূপ আরও রেকর্ডিং এবং ঘটনা পরবর্তী বিবৃতি ইন্টারনেটে প্রচার চালিয়ে যাবেন। অতীতে এসব বিবৃতির পরপরই সাধারণত হামলা সংঘটিত হতো। ২০০২ সালে ৬ অক্টোবর বিন লাদেন পশ্চিমা অর্থনৈতিক স্বার্থগুলোতে হামলার জন্য তার অনুসারীদেরকে নির্দেশনা দেন। সেই একই দিনে ফরাসি সুপারট্যাঙ্কার 'লিমবার্গ'কে একজন আত্মঘাতী হামলাকারী একটি ছোট নৌকার সাহায্যে ফুটো করে দেয়। ছয় দিন পর ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপ বালির একটি নাইটক্লাবে বোমা বিস্ফোরণে ২০০ জন নিহত হয়। (এই ক্লাবটিতে বিদেশি পর্যটকদের আনাগোনা ছিল; বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়ান পর্যটকদের, যারা আফগান যুদ্ধে একটি উল্লেখযোগ্য মার্কিন মিত্র)। ২০০২ সালের ডিসেম্বর মাসে আল-জাওয়াহিরি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফের নিন্দা জানানোর সামান্য পরই প্রেসিডেন্ট দৈবক্রমে একটি হত্যাপ্রচেষ্টা থেকে বেঁচে গিয়েছিল।

২০০৪ সালের মাদ্রিদ বোমা হামলার পূর্বে বিন লাদেন এবং আল-জাওয়াহিরি উভয়ই টেপ বার্তায় ইরাক যুদ্ধে নিরাপরাধ শিকারদের প্রতিশোধ নেওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন। এটা আমার কাছে মনে হয় যে, কেবল কোনো খাঁটি সুযোগ বা সৌভাগ্যজনক আঘাতের মাধ্যমেই বিন লাদেনকে আটক করা বা হত্যা করা সম্ভব হতে পারে।

কিন্তু জীবিত বা মৃত উভয় অবস্থাতেই বিন লাদেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য অভূতপূর্ব সমস্যার কারণ হিসেবেই থাকবেন। তাকে যদি জীবিত আটক করা হয়, তবে প্রশ্ন দাঁড়াবে তাকে কীভাবে বিচারের সম্মুখীন করা হবে? কোন আইনের অধীনে অথবা কোন দেশেই বা তার বিচার হবে? অপরদিকে যদি তাকে হত্যা করা হয় তবে সেটাও তাকে একজন শহিদ বা মহান ব্যক্তিত্বে রূপান্তরিত করবে এবং এটি একটি রক্তাক্ত প্রতিশোধ ডেকে আনতে পারে।

সাদ্দাম হুসাইনের আটকের পর তার অনুসারীদের মধ্যে কোন আশাহীনতা বা মরিয়া ভাবের সৃষ্টি হয়নি এবং সুনিশ্চিতভাবে বিদ্রোহকেও থামিয়ে দেয়নি; বরং এর বিপরীত অবস্থাই সত্য। ১৯৬৬ সালে যখন সাইয়েদ কুতুব জামাল আবদুন নাসের কর্তৃক মৃত্যুদণ্ডের শিকার হন, তখন এটি তাকে একজন 'বীর' এ রূপান্তরিত করে। পূর্বে লেখক হিসেবে তিনি অপ্রসিদ্ধ থাকলেও তাঁর মৃত্যুর পর তার বইয়ের চাহিদা শত গুণ বৃদ্ধি পায়। যদি কোনো না কোনো উপায়ে বিন লাদেনকে সরিয়েও দেওয়া হয়, তবে এটি আল-কায়েদাকে ধ্বংসে কোনো সহায়তা করবে না। আল-কায়েদার সাম্প্রতিক অভিযানসমূহের প্যাটার্ন এটাই প্রদর্শিত করেছে যে, এই সংগঠনটির একটি নিজস্ব পরমায়ু বিদ্যমান। এর একটি সামগ্রিক ভাবাদর্শগত সত্তা বিদ্যমান, যার দ্বারা এটি আরও দৃঢ় এবং সুসংহত হয়েছে এবং তাই সুনিশ্চিতভাবেই এর নেতার মৃত্যুর পরও এটি দীর্ঘকাল টেকসই থাকবে। সর্বোপরি, জীবিত এবং মৃত উভয় অবস্থাতেই বিন লাদেন এই সংগঠনটির নেতা এবং অনুপ্রেরণা হিসেবেই থাকবেন।

তাহলে এখন করণীয় কি?

যেমনটা আমরা দেখেছি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই আল-কায়েদাকে ইরাকে যেমন এর অতীব প্রয়োজনীয় ভৌগোলিক ভিত্তি সরবরাহ করেছে, একইভাবে জিহাদিদের প্রশিক্ষণ এবং যুদ্ধ অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগও করে দিয়েছে। ইত্যবসরে এই সংগঠনটি সত্যিকারার্থেই বৈশ্বিক উপস্থিতি লাভ করেছে। নাইন ইলেভেনের হামলাসমূহ পরিচালনার জন্য আল-কায়েদা কুশলীদেরকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ করতে হয়েছিল এবং সেখানে তাদের নিরাপত্তা বাধাসমূহ ভেদ করতে হয়েছিল। কিন্তু এখন আর এসবের কোনোই প্রয়োজন নেই। বর্তমানে ইরাক, আফগানিস্তান,

পাকিস্তান এবং ইউরোপে আল-কায়েদার শাখা রয়েছে যেগুলো সম্পূর্ণভাবে স্ব-শাসিত এবং স্বাধীন। এগুলো ছাড়াও আরও অনেক দেশেই আল-কায়েদার শাখা নিয়ে তথ্য পাওয়া যায় যেমন আলজেরিয়া, উজবেকিস্তান এবং ফিলিস্তিন, যারা পূর্ণ স্বাধীনতা উপভোগ করে এবং উল্লেখযোগ্য সক্ষমতার অধিকারী।

নিরাপত্তা বাহিনীতে আঘাত হানা বা মিডিয়ার মনোযোগ আকর্ষণের জন্য কোনো ছোটখাটো হামলা পরিচালনায় কোন শাখার আমিরের জন্য সংগঠনটির সুপ্রিম লিডার বিন লাদেন অথবা আল-জাওয়াহিরির নির্দেশনার প্রয়োজন হয় না। তবে, অনুমতির প্রয়োজন আবশ্যক এরূপ কোনো মুখ্য অভিযানের ক্ষেত্রে পরামর্শসভা অনুষ্ঠিত হয়। মাদ্রিদ বোমা হামলার পরিকল্পনা কেন্দ্রের সাথে পরামর্শ এবং সমন্বয় করেই করা হয়েছিল; তবে প্রকৃত হামলাটি আল-কায়েদার নতুন অবকাঠামোর সাথে মিল রেখে স্বাধীনভাবে স্থানীয় সেলগুলো কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়েছিল। আল-কায়েদার প্রথম লক্ষ্য হচ্ছে, বর্তমান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিও-কনজারভেটিভ প্রজেক্টকে নস্যাৎ করে দেওয়া; কারণ একে তারা মুসলিমবিশ্বে মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়া সকল রাজনৈতিক এবং নীতিসংক্রান্ত সমস্যার মূল হিসেবে বিবেচনা করে।

আল-কায়েদার আল-জাওয়াহিরি এবং পরবর্তী সময়ে আল-জারকাভি বিন লাদেনকে রাজি করাতে সক্ষম হয়েছেন যে, যে-সকল কার্যক্রম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে দুর্বলতর করবে, সেগুলোর সবকিছুই বৈধ। বিন লাদেন আল-কায়েদার আধ্যাত্মিক নেতা হিসেবে অবিসংবাদিত রয়েছেন। কিন্তু সর্বাঙ্গীণ সামরিক সেনাপতি অবস্থানে তার পলাতক অবস্থা কিছু শূন্যতার সৃষ্টি করলেও এই শূন্যতা প্রায় সুনিশ্চিতভাবেই আল-জারকাভি কর্তৃক পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে। সৌদি নাগরিক আবু আব্দুল্লাহ আহমেদ কর্তৃক পোস্টকৃত 'আল-কায়েদা ইন দ্য ল্যান্ড অফ টু রিভার্স' থেকে একটি সাম্প্রতিক বার্তায় তাকে মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকার জন্য সংগঠনটির সবচেয়ে উপযুক্ত আমির বলে চিহ্নিত করা হয়। আল-কায়েদার নতুন প্রজন্মের নেতারাও যথাস্থানেই বহাল রয়েছেন; যাদের আরেকজন প্রধান ব্যক্তিত্ব হলেন লাল শ্মশ্রুধারী আবু মুসআব আল-সুরি এবং এসব কারণেই সংগঠনটি দিন দিন আরও চরমপন্থি হয়ে উঠেছে। ইরাকে বর্তমানে শত্রুদেরকে আতঙ্কিত এবং সন্ত্রাসিত করার লক্ষ্যেই পরিকল্পিত বিস্তর পরিসরের লক্ষ্যবস্তুকে নির্দিষ্ট করে চালানো নিরন্তর সহিংসতায় নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে।

অন্যান্য ইসলামপন্থি সংগঠন যেমন মুসলিম ব্রাদারহুড প্রভৃতি থেকে যেটা আল-কায়েদাকে ভিন্নতা দিয়েছে সেটা হলো, এর মতাদর্শিক নমনীয়তা এবং লক্ষ্যসমূহের বিস্তৃত পরিসর। যদিও এই নেতৃত্বের নিজস্ব ধর্মতাত্ত্বিক প্ল্যাটফর্ম মূলত সালাফি, কিন্তু সংগঠনটির ছাতা বহুবিধ স্কুল অফ থট (মাযহাব) এবং রাজনৈতিক

চিন্তাধারাকে পরিবেষ্টন করে নেওয়ার মতো যথেষ্ট প্রশস্ত। আল-কায়েদার সদস্য এবং সমর্থক গোষ্ঠীর মধ্যে ওয়াহাবি, হানাফি, মালেকি, শাফেয়ি, আশাআরি-মাতুরিদি প্রভৃতি বহু মতাদর্শিক গোষ্ঠী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সেখানে এমন অনেকেও রয়েছে যাদের বিশ্বাস এবং অনুশীলন সরাসরি সালাফিজম বিরোধী। উদাহরণস্বরূপ, আফগান মুজাহিদদের অন্যতম নেতা ইউনুছ খালিস; তিনি ছিলেন একজন সুফি—যিনি দরবেশদের কবর জিয়ারত করতেন এবং তাদের বরকত গ্রহণ করতেন। এটি এমন একটি অনুশীলন, যেটা বিন লাদেনের ওয়াহাবি-সালাফি স্কুল অফ থট এর ঘোর বিরোধী। এই প্যান-ইসলামিক পলিসির একমাত্র ব্যতিক্রম হলো শিয়া মতবাদ। আল-কায়েদা স্পষ্টতই এর বিরোধী এবং তারা একে ধর্মদ্রোহিতা হিসেবেই দেখে। ইরাকে তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে পরিপূর্ণভাবে সহায়তাকারী বদর ব্রিগেডের সাথে খোলাখুলিভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং এমনকি শিয়া বেসামরিকদেরকেও লক্ষ্যবস্তু হিসেবে বিবেচনা করছে।

হোয়াইট হাউসের কাউন্টার-টেররিজম সমন্বয়ক রিচার্ড এ. ক্লার্ক ২০০৪ সালে প্রকাশিত তার 'অ্যাগেইনস্ট অল এনিমিস : ইনসাইড আমেরিকা'স ওয়ার অন টেরর' বইয়ে মন্তব্য করেন—'আল-কায়েদা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি যে হুমকি ধারণ করে, সেটির প্রকৃতি এবং মাত্রাকে উপলব্ধি করতে জ্যেষ্ঠ প্রশাসনিক কর্মকর্তারা ব্যর্থ হয়েছেন। আরেকটি স্নায়ুযুদ্ধ বিশ্লেষণধর্মী কাঠামোর আলোকে চিন্তা করার কারণে শীর্ষ কর্মকর্তারা আল-কায়েদা নিজ থেকেই যে ভয়াবহ বিপদ ধারণ করে, সেটিকে উপলব্ধি করতে না পেরে বরং এর মদদদাতা শক্তির খোঁজ করে গেছে।' রিচার্ড ক্লার্ক বিশ্লেষণ করে তুলে ধরেন, এই কারণেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে এত শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হচ্ছে। তার তত্ত্বানুসারে নাইন-ইলেভেনের পূর্বেও হোয়াইট হাউজ সার্কেলে সংখ্যাগরিষ্ঠের মত ছিল যে, প্রতিটি টেরোরিস্ট নেটওয়ার্কের পেছনে কোনো-না-কোনো রাষ্ট্র বিদ্যমান, যেটা তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করে এবং তাদেরকে প্রতিরক্ষা দেয় এবং যদি সেই রাষ্ট্রটিকে ধ্বংস করে দেওয়া যায় তবে উক্ত নেটওয়ার্ক এবং তাদের কর্তৃক আরোপিত হুমকিও নস্যাৎ হয়ে যায়। এটিও একটি কারণ যার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাদ্দাম হুসাইন এবং আল-কায়েদার মধ্যে একটি সংযোগ প্রমাণ করতে এতটা মরিয়া ছিল। এরূপ সম্পর্কের প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও আমেরিকান নিও-কনজারভেটিভরা ইরাক আক্রমণের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পর্ককে জোগাড় করেই ছেড়েছে।

এমন কোন শত্রুকে পরাজিত করা অসম্ভব, যেটাকে ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, দেখা যায় না বা উপলব্ধি করা যায় না। আল-কায়েদা সন্ত্রাসের ইতিহাসে পুরোপুরি নতুন কোনো একটা কিছু। কোনো ভৌগোলিক স্থিতি না থাকা সত্ত্বেও এটি একটি জাতিরাষ্ট্রের মতোই আস্পর্ধা ধারণ করে। সমগ্র বিশ্ব এবং সাইবার-

স্পেসজুড়ে এর সদস্যবর্গ বিদ্যমান কিন্তু তাদেরকে চিহ্নিত করার জন্য কোনো সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্যও বিদ্যমান নেই। আল-কায়েদার সাথে যুদ্ধটি একেবারে গোঁড়া থেকেই ভুল অনুমানের ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে। এটি একটি অদৃশ্য শত্রু এবং তাই তাদের বিরুদ্ধে কোন সেনাবাহিনী ব্যবহার করা নিতান্তই ব্যর্থতা। বুশ কর্তৃক বারংবার উচ্চারিত মন্ত্র যে, তিনি সন্ত্রাসের পরিকাঠামোকে ধ্বংস করছেন—এটি নিছক একটি কল্পনা যখন এটা আল-কায়েদার ক্ষেত্রে আসে। আল-কায়েদার অবস্থান এবং এর সৈন্যদের ওপর কার্পেট বম্বিং করা নিতান্তই অসম্ভব, যেহেতু তারা ইন্টারনেট সংযুক্ত হয়ে কোন পার্সোনাল কম্পিউটারের সামনে বসে তাদের সামরিক কৌশল উন্নীত করে এবং তাদের প্রতি দেওয়া নির্দেশনাবলিকে গ্রহণ করে।

কেবল নিরাপত্তার উন্নয়নও আল-কায়েদাকে উচ্ছেদ করবে না। কারণ এই নেটওয়ার্কটির সফলতা এবং টিকে থাকা কোনো ব্যক্তিবর্গ বা কোনো গোষ্ঠীর ওপর নির্ভরশীল নয় এবং বিন লাদেন নিজেও এখন আর এর জন্য আবশ্যক নন। সিকিউরিটি সংস্থাসমূহকে বাড়তি অর্থ, লোকবল এবং ক্ষমতাদান হয়তো আক্রমণের মাত্রাকে সামান্য কমিয়ে আনতে পারে; কিন্তু এটি তাদের পুরোপুরি মূলোৎপাটন করতে পারবে না।

আল-কায়েদার সাথে সমঝোতার আশাও বাস্তবিকপক্ষে বহু দূরবর্তী কোন কল্পনা বলেই প্রতীয়মান হয়। কেউ অবশ্য কোন অশরীরীর সাথে দরাদরিও করতে পারে না! এই ধারণাটি সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়ে দেওয়া যায় না। কেউ কি কোনদিন কল্পনা করেছিল যে, ব্রিটেন একদিন আইরিশ রিপাবলিকান আর্মির সাথে সমঝোতায় পৌঁছাবে অথবা ইসরাইল ইয়াসির আরাফাতের সাথে, যাদেরকে একসময় নৃশংস সন্ত্রাসী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছিল? অতি অবশ্যই, এ ক্ষেত্রে সমস্যাটি হলো আল-কায়েদার দাবিসমূহ হচ্ছে বৈশ্বিক এবং এগুলো কোনো এলাকা বা নির্দিষ্ট রাষ্ট্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

যে একমাত্র পথকে আমি সম্মুখে দেখতে পাই সেটা হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক এটাকে স্বীকার করে নেওয়া যে, 'সশস্ত্র পদক্ষেপ কোনো শূন্য থেকে উদগত হয় না।' আল-কায়েদার কার্যক্রমসমূহ কোনো বুদ্ধিবৃত্তিহীন হিংস্র সহিংসতা নয়। তারা মূলত এক সেট সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য সহকারে একটি সামরিক পদক্ষেপ, যারা জনপ্রিয়তা, সহানুভূতি, আবরণ এবং মানব গোলাবারুদ দ্বারা টিকে রয়েছে।

কোনো অগ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট থেকেই আল-কায়েদার মতো গোষ্ঠীসমূহের প্রতি সমর্থন তৈরি হয়। আল-কায়েদা এসব সমর্থকদেরই লড়াই করার সুযোগ প্রদান করে, যেটাকে সমগ্র মুসলিমবিশ্ব বহুকাল যাবৎ প্রত্যক্ষ করেনি। দীর্ঘমেয়াদে আল-কায়েদা যেটা প্রদান করতে চায়

সেটাকে অনেক মুসলিমই হয়তো পছন্দ করবে না; তাদের কয়জনই-বা কোনো তালেবান স্টাইলের শাসনব্যবস্থার অধীনে বসবাস করতে ইচ্ছুক? কিন্তু এটা বর্তমানের সাপেক্ষে কোন ইস্যু নয়।

আল-কায়েদার বিস্তার এবং ক্ষমতাকে হ্রাস করার জন্য প্রথম যেটা প্রয়োজন সেটা হলো, এর রিক্রুটদের রমরমা অবস্থাকে হ্রাস করা। এর জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে এর সামরিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে এবং সামান্য পরিসরে কিছু কিছু মুসলিমদের মতে এর ভুল নীতি, লোভ এবং অনৈতিক জীবনব্যবস্থাও—যে তীব্র ঘৃণা, অসন্তোষ এবং বিরোধিতা তৈরি করেছে, এগুলোর মূল কারণকে সমাধান করতে হবে। এটা খুবই উপযুক্ত যে, এই অঞ্চলে স্বৈরতান্ত্রিক এবং উৎপীড়নমূলক শাসনব্যবস্থাসমূহের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ মদদসমূহ সমগ্র মুসলিমবিশ্বজুড়ে এর ঘৃণিত হবার আরেকটি বড় কারণ। শুধু তাই নয়, এসব শাসনব্যবস্থাসমূহকে সমর্থন জুগিয়ে যাওয়ার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে প্রচণ্ড রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং নিরাপত্তাজনিত ক্ষতির সম্মুখীন হওয়া লাগতে পারে; বিশেষ করে যখন এর নিজস্ব অর্থনীতিই বৃহদাকারের সমস্যা এবং ঘাটতির সম্মুখীন। বর্তমানে এটি সুস্পষ্ট যে, এসবের কোনোটিই অর্জিত হয়নি।

কোনো শাসনব্যবস্থায় দুর্নীতি এবং উৎপীড়নের মাত্রা এবং ইসলামি চরমপন্থার প্রাদুর্ভাব, যেটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমাদের লক্ষ্যভুক্ত বানাচ্ছে, এই উভয়ের মধ্যে একটি সরাসরি সামঞ্জস্য বিদ্যমান। এই ব্যাপারটি ঘটেছে সৌদি আরবের ক্ষেত্রেও। এটি এই অঞ্চলের সর্বাধিক দুর্নীতিগ্রস্ত এবং অত্যাচারী শাসনব্যবস্থা। এখান থেকেই আল-কায়েদার প্রধানসহ এর প্রায় সত্তর ভাগ সদস্যই উদ্ভূত হয়েছে। আপাতত আল-কায়েদার সাথে বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে মনোযোগকে অবশ্যই ইরাকের ওপর কেন্দ্রীভূত রাখতে হবে। অন্য যেকোনো কিছুর চাইতে ইরাকের পরিস্থিতি আল-কায়েদাকে একটি নিরাপদ আশ্রয় এবং মার্কিন দখলদারি উৎখাতে জীবন দিতে প্রস্তুত এরূপ সীমাহীন যোদ্ধার জোগান দিচ্ছে। সেখানে মার্কিন উপস্থিতি সমগ্র মুসলিমবিশ্বে আল-কায়েদার বৃহত্তর সমর্থন অথবা কমপক্ষে অ-বিরোধীতা আনীত করেছে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো, ফিলিস্তিন-ইসরাইল দ্বন্দ্বের স্থায়ী সমাধান ব্যতীত এই অঞ্চলে কোনো দীর্ঘকালীন অথবা প্রত্যয়জনক শান্তির আশা করা সম্ভব নয়। এটি আরেকটি বইয়ের বিষয়বস্তু হতে পারে। যতদিন পর্যন্ত মার্কিন নীতি এবং এর কারণে মধ্যপ্রাচ্যের বিশাল অংশজুড়ে—বাস্তব বা অনুভূত—অস্থিরতা অব্যাহত থাকবে, আমরা আশা করতেই পারি যে, আল-কায়েদা আরও শক্তিশালী হতে থাকবে এবং তাদের কার্যক্রমের পরিধি আরও বিস্তৃত হবে।

।। সমাপ্ত ।।

হয়েছিল। আমাদের সময়ের সবচেয়ে আলোচিত, বিস্ময়কর ও নাটকীয় একটি ঘটনা। প্রবল ক্ষমতাধর আমেরিকাকে বিশ্বের সামনে যারপরনাই অস্বস্তিতে ফেলে দেওয়া এই ঘটনাটি তার জন্য তাৎক্ষণিক দুর্ভোগের কারণই ছিল না শুধু; ছিল এক দীর্ঘমেয়াদি বিপর্যয়ের সূচনা। বস্তুত এটি ছিল আমেরিকার জন্য একটি মরণফাঁদ। কাউবয় চরিত্রের আমেরিকা 'ওয়ার অন টেরর' ঘোষণার মাধ্যমে এই মরণফাঁদে পা দিয়ে যে অনিশ্পত্তিযোগ্য ভুলটি করেছে, এর খেসারত দিতে হবে হয়তো তার সাম্রাজ্যিক মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। এরিক মারগোলিস একে ব্যক্ত করেন 'আমেরিকার রক্তক্ষরণ' বলে। বহু পশ্চিমা গবেষকের সতর্কবাণী উপেক্ষা করেও যখন আমেরিকা এই চোরাবালিতে পা দেয়, তখন তার জন্য আর ফিরে আসার পথ ছিল না। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অনন্ত যুদ্ধের নামে আমেরিকা ও তার পশ্চিমা মিত্রদের একের পর এক ভুল নীতি কীভাবে আল-কায়েদাকে ক্রমশ হৃষ্টপুষ্ট, অপ্রতিরোধ্য ও অজেয় এক শক্তিতে পরিণত করেছে, তার জীবন্ত দাস্তান এই বই।

আবদুল বারি আতওয়ানের বর্ণনাশৈলী আকর্ষণীয় ও মনমুগ্ধকর; একই সঙ্গে তাত্ত্বিক ও বস্তুনিষ্ঠ। ওসামা বিন লাদেনের ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক জীবন, আল-কায়েদা প্রতিষ্ঠার পটভূমি; এর কাঠামো ও ভাবাদর্শ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, পরিকল্পনা ও কর্মপন্থা, নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনা, সংকট ও সম্ভাবনা এবং আত্মঘাতী বোমা হামলার ভেতর-বাহির, সাইবার জিহাদ, সৌদি আরব-ইরাক-উত্তর আফ্রিকা-ইউরোপে এর বিস্তৃত নেটওয়ার্ক· ইত্যাদি মোটকথা আল-কায়েদাকে উপলব্ধি করতে যা-কিছু প্রয়োজন; এখানে তিনি উল্লেখ করেছেন। ফলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আতওয়ানের এই বইটি প্রাইমারি সোর্স বা আকরগ্রন্থের মর্যাদা পেয়েছে এবং আল জাজিরার তথ্যমতে বিশ্বের পনেরোটি ভাষায় এটি অনূদিত হয়েছে। পাঠকদেরকে এই বই আমাদের চেনাজানা জগতের বাইরে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে